RAMAKRISHNA MISSION
‘স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু’
শারদীয়া
সমাজশিক্ষা
৬৬ বর্ষ, সেপ্টেম্বর ২০২২, ভাদ্র–আশ্বিন ১৪২৯
লোকশিক্ষা পরিষদ
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর

নবপত্রিকার স্নান

সমাজশিক্ষা

SAMAJSIKSHA

শারদীয়া সংখ্যা ১৪২৯

রামকৃষ্ণ মিশনের গ্রামোন্নয়নমূলক একমাত্র বাংলা মাসিক পত্রিকা

৬৬ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০২২ : ভাদ্র–আশ্বিন ১৪২৯

'সমাজশিক্ষা' দপ্তর

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা–৭০০ ১০৩

Phone : 033-2427-4300/4500/4502 (Extn. 534); Fax : 2477-2070

E-mail : rkmsamajsiksha@gmail.com

১০১ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯–স্থিত এ. জি. প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত ও সম্পাদক, ইনস্টিটিউট অফ সোসাল এডুকেশান অ্যান্ড রিক্রিয়েশান, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা ৭০০ ১০৩ থেকে ব্যবস্থাপক সম্পাদক স্বামী সর্বলোকানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

ডি.টি.পি.–তে অক্ষর বিন্যাস, প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ : রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ।

Managing Editor : Swami Sarvalokananda, Editor : Swami Ishtavratananda, printed by Swami Sarvalokananda at A. G. Printers of 101 Baithak Khana Road, Kolkata-700 009, published by him for Secretary, Institute of Social Education and Recreation at Ramakrishna Mission Ashrama, Narendrapur, Kolkata-700 103, West Bengal.

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

নরেন্দ্রপুর, কলকাতা ৭০০ ১০৩, ফোন ঃ ২৪৭৭ ২২০৭

সমাজশিক্ষার ৬৬ বছর

সমাজশিক্ষার বিজ্ঞপ্তি ও চাঁদার হার ঃ

	এক বছরে			তিন বছরে			১৫ বছরের আজীবন সদস্য			২০ বছরের পৃষ্ঠপোষক সদস্য		
কিভাবে নেবেন	প্রকৃত মূল্য	আপনি দেবেন	সাশ্রয়	প্রকৃত মূল্য	আপনি দেবেন	সাশ্রয়	প্রকৃত মূল্য	আপনি দেবেন	সাশ্রয়	প্রকৃত মূল্য	আপনি দেবেন	সাশ্রয়
হাতে (১১+১ সংখ্যা	৩৬০ টাকা	১৮০ টাকা	১৮০ টাকা	১০৩০ টাকা	৫০০ টাকা	৫৩০ টাকা	৫০০০ টাকা	৩০০০ টাকা	২০০০ টাকা	৭২০০ টাকা	৪০০০ টাকা	৩২০০ টাকা
সডাক (১১+১ সংখ্যা	৩৯০ টাকা	২০০ টাকা	১৯০ টাকা	১১৭০ টাকা	৫০০ টাকা	৬৭০ টাকা	৫৮৫০ টাকা	৩০০০ টাকা	২৮৫০ টাকা	৭৮৮০ টাকা	৪০০০ টাকা	৩৮৮০ টাকা

এছাড়া—প্রতি সাধারণ সংখ্যার দাম—২০ টাকা, শ্রীরামকৃষ্ণ জয়ন্তী সংখ্যা (মার্চ মাসে)-র দাম—৩০ টাকা, কৃষি সংখ্যা (জুন মাসে)-র দাম—৩০ টাকা, এবং শারদীয়া সংখ্যা-র দাম—১০০ টাকা।

Registered ডাকে নিতে হলে প্রতি সংখ্যায় অতিরিক্ত ২৫ টাকা দিতে হবে।

'সমাজশিক্ষা' পত্রিকার গ্রাহকভুক্তিকরণ ও নবীকরণ হবে প্রতি বছর জানুয়ারি ও এপ্রিল থেকে। পুরাতন গ্রাহকদের ক্ষেত্রে পত্রিকা-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য 'গ্রাহক নম্বর' বাধ্যতামূলক। অনুগ্রহপূর্বক গ্রাহক নম্বর নিয়ে যোগাযোগ করবেন। গ্রাহক নম্বর ছাড়া কোনোরকম পরিষেবা আমাদের পক্ষে অসুবিধাজনক।

যে-কোনো অর্থ চেক-এ গ্রহণ করা হয় এবং সঙ্গে আধার কার্ড ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। দয়া করে M.O. করুন। M.O.-তে message-এ লিখবেন 'Samajsiksha Subscription' এবং পুরোনো গ্রাহকরা অবশ্যই গ্রাহক নম্বর দেবেন।

সেপ্টেম্বর, ২০২২

সম্পাদক
'সমাজশিক্ষা' পত্রিকা।

সমাজশিক্ষা পত্রিকার গ্রাহক / সদস্য হওয়ার জন্য আবেদনপত্র

সম্পাদক, সমাজশিক্ষা,
রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কোলকাতা – ৭০০ ১০৩

মহাশয়,

আমি সমাজশিক্ষা পত্রিকার ১ বছর/৩ বছর/আজীবন/পৃষ্ঠপোষক সদস্য হতে ইচ্ছুক। এজন্য চাঁদা বাবদ মোট .... টাকা (চেক/মানি অর্ডারে) পাঠালাম। ইংরাজী .... ২০ মাস থেকে ডাকযোগে পত্রিকা নেব। নীচে আমার নাম ঠিকানা দিলাম। ধন্যবাদান্তে—

Name : .... *Phone :* ....

Address : ....

District : .... *Pin :* ....

Date : ....

....
(*Signature*)

[Cheque / Draft must be drawn in favour of 'RAMAKRISHNA MISSION ASHRAMA, NARENDRAPUR]

নূতন ও পুরোনো চাঁদা অবিলম্বে পাঠিয়ে দিন !

সমাজশিক্ষা

৬৬ বর্ষ, ২০২২

শারদীয়া সংখ্যা ১৪২৯

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ
স্বামী সর্বলোকানন্দ

সম্পাদক ঃ
স্বামী ইষ্টব্রতানন্দ

সমাজশিক্ষা ২০২২ সালের শারদীয়া সংখ্যা ১৪২৯ বঙ্গাব্দের দুর্গাপূজার প্রাক্কালে আপনাদের সামনে উপস্থিত। করোনা আতঙ্ক সেভাবে আর মানুষকে বিব্রত ও বিপর্যস্ত করতে সাহস করছে না। মানুষ আবার তাদের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে শুরু করেছে। মহামায়া লোভ, লালসা, অহঙ্কার ইত্যাদিকে দমন করার জন্য করোনাসুর পাঠিয়ে আমাদের সাবধান করেছেন। ‘সাবধানের মার নেই’—এই ভাবনাকে সঙ্গে রেখেই এবারে শারদীয়া সমাজশিক্ষা তার ডালি সাজিয়েছে। এই চরম আনন্দের লগ্নে সমাজশিক্ষার পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহকগণ, বিজ্ঞাপনদাতাগণ, লেখক-লেখিকাগণ, স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকাবৃন্দ ও দাতাগণ, আজীবন গ্রাহকগণ, পৃষ্ঠপোষক সদস্যবৃন্দ এবং যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজশিক্ষা পত্রিকাকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জোগাচ্ছেন সেই সকল মানুষদের ‘সমাজশিক্ষা’র পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও হার্দিক অভিনন্দন।

আশ্রম–সন্দেশ

অতি প্রবীণ সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণলোকে

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে সন্ন্যাসীর শরীরত্যাগ। সাহিত্যকীর্তির জন্য স্বয়ংপ্রকাশ্যমান স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ মহারাজ রামকৃষ্ণলোকে প্রস্থান করলেন। গত ২৮ জুলাই, বৃহস্পতিবার, তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে বিকাল ৪.২০ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল তিরাশি (৮৩) বছর। নরেন্দ্রপুরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে যে সকল উদীয়মান তরুণ কিংবদন্তী সন্ন্যাসী স্বামী লোকেশ্বরানন্দ মহারাজের যন্ত্র হবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে এসেছিলেন; তরুণ শশাঙ্ক (স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ) ছিলেন তাদেরই অন্যতম।

১৯৬২ সালে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবর্ষের সূচনা মহোৎসবের প্রাক্কালেই নবম সঙ্ঘগুরু স্বামী মাধবানন্দজীর নিকট তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে কৃতার্থ হন। ১৯৬৪ সালে তিনি নবীন ব্রহ্মচারী হিসাবে নরেন্দ্রপুর আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৭২ সালে দশম সঙ্ঘাধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁকে স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ নামে ভূষিত করে সন্ন্যাস–মন্ত্রে অভিষিক্ত করেন।

বিদ্যালয়ের আবাসিক ভবনের দায়িত্ব যে কী নিখুঁতভাবে পালন করা যায়, সে বিষয়ে শশাঙ্ক মহারাজ ছিলেন উদাহরণ বিশেষ। ছাত্রদের বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে অত্যন্ত ভালো ফলাফল–এর প্রধান কারণ যে তিনি––সে–কথা সে–সময়কার বিদ্যালয়ের সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। নরেন্দ্রপুর বিদ্যালয়কে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মানচিত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদানে তাঁর ভূমিকা অপরিহার্য।

স্বভাব–সাহিত্যিক স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ মহারাজের রচনা এতই উৎকৃষ্টমানের হতো, দৈনিক আনন্দবাজার, বর্তমান প্রভৃতি পত্রিকায় প্রতি উৎসবেই বা তিথিপূজায় প্রকাশিত হতো। দেবেন্দ্রানন্দ নাম দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ–অনুরাগিরা তাঁকে জানত বা চিনত।

এরপর আসে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের 'সমাজশিক্ষা'র কথা। বিগত প্রায় তিন/চার দশক ধরে তিনি ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র গ্রামোন্নয়নমূলক পত্রিকা 'সমাজশিক্ষা'র সম্পাদকমণ্ডলীর একজন অন্যতম সম্পাদক। মূল সম্পাদক হিসাবে তাঁর নাম প্রকাশিত না হলেও, দীর্ঘকাল ধরে তিনি সমাজশিক্ষায় সম্পাদকীয় 'আমাদের কথা' লিখে যান। আর এই 'আমাদের কথা'র সম্পাদকীয় রচনাগুলি নিয়ে তাঁর সংকলিত গ্রন্থটি এখনও বহু পাঠাগারে গর্বের সঙ্গে শোভা পাচ্ছে। তাঁর সম্পাদকীয় রচনার সাহিত্য–মূল্য এত উন্নতমানের হতো যে, অনেকেই ঐ 'আমাদের কথা' পড়েই গ্রাহক হবার জন্য উন্মুখ থাকত। স্বামী সুপর্ণানন্দ যখন আশ্রম সম্পাদক, তখনই তাঁকে সমাজশিক্ষার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হিসাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়। প্রায় ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি 'সমাজশিক্ষা'র সম্পাদকীয় বিভাগের প্রধান স্তম্ভ হিসাবে নিজের মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন।

তাঁর সাহিত্যস্রষ্টামূলক উল্লেখযোগ্য পুস্তক হলোঃ *কলকাতাবাসিনী শ্রীমা সারদামণি, ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবছরে শ্রদ্ধাঞ্জলি, সচিত্র সাইক্লোনিক সন্ন্যাসী, সচিত্র স্বামী বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমা, শ্রীরামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের নিবেদিতা, বেলুড় মঠের জ্যান্ত দুর্গাপূজা ও অন্যান্য উৎসব, বেলুড় মঠে স্বামীজীর দুর্গাপূজা, দেবী–মানবী সারদা, শান্তিরূপিণী সারদা, চিরজাগ্রত বিবেকানন্দ প্রভৃতি।*

তাঁর অবর্তমানে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। পিছিয়ে–পড়া দরিদ্র, অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত সাধারণ মানুষের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদত। তিনি নিজের সর্বস্ব দিয়ে এদেরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপনে সহায়তা করেছেন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি মানবকল্যাণ ভাবনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের এই মহাপ্রাণ সুসাহিত্যিক মৃদু স্বভাবের সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণ চরণে চির–আশ্রয় নিয়ে মানবজীবনকে সার্থক দিশা দিয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত পথে ছাত্র ও ভক্ত মানুষরা অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের মণিমুক্তা লাভ করুক––এই প্রার্থনা।

(সমাজশিক্ষার সংবাদদাতা)

মূল্যায়ন

পাঠকের দরবারে

মাটির স্পর্শ ছত্রে ছত্রে

সর্বস্তরের মানুষের জন্য এটি একটি ব্যতিক্রমী পত্রিকা, লেখাগুলিতে মাটির স্পর্শ ছত্রে ছত্রে অনুভব করা যায়। বিশেষ করে চাষীভাইদের জন্য অত্যন্ত উপকারী তথ্যসমৃদ্ধ রচনাগুলি প্রশংসনীয়। এছাড়া বাচ্চাদের জন্য ক্যুইজ, ছড়া, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কাহিনী, পুরাণ-যুগের বড় বড় মনীষীদের কথা অবশ্যই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নীতি ও আদর্শের পথে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। পত্রিকাটির দীর্ঘ জীবন কামনা করি। **—কস্তুরী পাল, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা**

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ খান মহিলা মহাবিদ্যালয়, মেদিনীপুর

সমাজশিক্ষা ভীষণ রকম প্রাসঙ্গিক

সমাজশিক্ষা আমাদের জীবনকে শিক্ষা দেয়, সুষ্ঠুভাবে বাঁচতে শেখায়। জীবনের অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই। আবার কখনো প্রশ্ন করতেও শিখি। নিয়মিত পড়তে পড়তে সমাজশিক্ষা আর নিছক একটি পত্রিকা নেই, কখন যে রোজকার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে অজান্তেই। কথ্য বাংলায় খুব সাধারণ ভাষায় জীবনের বিভিন্ন স্তরের সহজ বোঝাপড়া। চাষবাস-এর ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত সমাধান—যা সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে অথবা গুরুত্বপূর্ণ সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ খনার বচন-এর বিকল্প মনে হয়। যে-কোনো দ্বিধার উত্তর খুঁজতে এই পত্রিকার আশ্রয় নিই। আজকের দিনে সমাজশিক্ষা ভীষণ রকম প্রাসঙ্গিক। **—ডাঃ পূর্বা বসু, চিকিৎসক**

নিউ টাউন, রাজারহাট, থাকদাঁড়ি রোড, কলকাতা-১৫৬।

সমাজশিক্ষা—যথার্থই যুগোপযোগী

সমাজশিক্ষা পত্রিকা দীর্ঘ ৬৬ বছর ধরে গ্রামীণ কৃষি বিকাশের লক্ষ্যে উন্নত পদ্ধতিতে ফল, ফুল, মাছ, সবজি ইত্যাদি চাষের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিচ্ছে। পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে করে তুলেছে বিষময়। সমাজশিক্ষা মানুষের বহির্জগতের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্জগতের উন্নতির দিকে নজর দিয়েছে—যা যথার্থই যুগোপযোগী বলে মনে করি। গতবারের 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বিশেষ সংখ্যা' তারই দৃষ্টান্ত। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ১৫০তম জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে সমাজশিক্ষা পত্রিকার গত আগস্ট সংখ্যায় তাঁর জীবন ও আদর্শের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। যদিও নেতাজী বিষয়ক সংখ্যাটি পড়ে মনে হলো 'শেষ হয়েও হলো না শেষ', কারণ প্রবন্ধের সংখ্যা খুবই সীমিত। তবুও আশাকরি নবীনপ্রজন্ম প্রবন্ধগুলো পড়ে ত্যাগ ও সেবাব্রতে উদ্বুদ্ধ হবে। **—স্বামী একরূপানন্দ, রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর।**

সমাজশিক্ষা সর্বাঙ্গীণ, সার্বভৌম, সর্বতো সার্থক

সমাজশিক্ষা পত্রিকাটি অধুনা অবক্ষয়ী সমাজের প্রেক্ষাপটে চিরায়ত মূল্যবোধ যাপনে স্থৈর্য এবং বিশ্বাস সঞ্চার করে। সহজ ভাষার সরল প্রকাশে দৈনন্দিন উদাহরণের পৌষ ফাগুনে সম্মিলিত সমাজকে জীবনশিক্ষায় ঋদ্ধ করে। কখনো ছোট ছোট পুরাণের গল্পে চিরন্তন নীতি শেখায়, কখনো অপারগ চাষী ঘরে বসে পায় সহজ সমাধান, কখনো তাপিত শরীর নিরাময় হয় ডাক্তারবাবুদের দেওয়া পরামর্শের মাধ্যমে, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মৃতিচারণ পরিচয় করায় ত্যাগের মহিমা, ধাঁধাগুলি জাগায় সৃজনশীল ভাবনার প্রাথমিক পাঠ, আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ জাগে ঠাকুর রামকৃষ্ণের মিঠে ছড়ায়।

এভাবেই সমাজশিক্ষার পাতাগুলি আত্মিক হয়ে মিশে যায় আমাদের রক্তে। বড় বড় বুদ্ধির দীপ্তি নেই কিন্তু আছে সাধারণের বোধগম্য স্নিগ্ধ উদ্ভাস। এই পত্রিকার লেখাগুলি অবাধ, ভারহীন হয়ে আমাদের নিয়ে যায় 'দীনতা হতে অক্ষয় ধনে সংশয় হতে সত্য সাধনে'। সেই জন্য সমাজশিক্ষা, সর্বাঙ্গীণ, সার্বভৌম, সর্বতো সার্থক। **—গৌরী ঘোষ, ৯বি বার্জ টাউন, পোঃ মেদিনীপুর, জেলা ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর।**

সমাজশিক্ষা যেন বহুতলবিশিষ্ট শপিং মল

ঠাকুর এবং স্বামীজীর অসীম প্রভাব নেতাজীর সঠিক দিশা নিরূপণে কীভাবে সহায়তা করেছিল তা অদ্ভুতভাবেই চিত্রিত হয়েছে গত 'আগস্ট ২০২১' সংখ্যাটিতে। আমার মানসপটে নেতাজীর যে চিত্র অঙ্কিত হয়ে আছে—তা হলো এক অসীম সাহসী প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর তেজস্বী এক দেশপ্রেমিকের। কিন্তু এই প্রেমিকের জীবন ছিল ত্যাগ, তপস্যা, তিতিক্ষা, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি বিবিধ গুণে বিভূষিত। বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে নেতাজীর জীবনের বিচিত্র দিক উদ্ভাসিত হয়েছে।

নেতাজী সিঙ্গাপুর মিশনের অনাথালয়ের জন্য ৫০,০০০ ডলার দান করেন এবং আরো ৫০,০০০ ডলার সংগ্রহ করে দেন। এমন একটি বজ্রকঠিন হৃদয়ের মানুষের ভিতর যে এমন কোমল একটা হৃদয় লুক্কায়িত ছিল, তা আগে জানতে পারিনি। আমি সমাজশিক্ষার এই সংখ্যার এক একটি পাতার ছবি তুলে মোবাইলে বিভিন্ন গ্রুপে পাঠিয়েছি।

'সমাজশিক্ষা' পত্রিকা যেন একটা বহুতলবিশিষ্ট শপিং মল, যেখান থেকে আমরা আমাদের চাহিদা অনুসারে সবকিছুই পেতে পারি। **—পূর্ণশশী হালদার, রিং রোড, মাতা মঠ, কটক, উড়িষ্যা।**

‘সমাজশিক্ষা’ পত্রিকার গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্র

কলকাতা

১. রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার
গোল পার্ক, কলকাতা–৭০০০২৯

২. শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র সেবাশ্রম
১৪১, গান্ধী কলোনী,
কলকাতা ৭০০ ০৯২

৩. ‘সারদামঙ্গল’ পাঠচক্র
১৩বি, বিধান নগর রোড,
কলকাতা – ৭০০ ০৬৭

৪. সুবীর কুমার হাজরা চৌধুরী
প্রযত্নে – গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ
ভি–২২/৪, বিবেকানন্দ সরণী,
গড়িয়া–৭০০০৮৪

৫. রামকৃষ্ণ সারদা সেবা সংঘ
১৬, পরমহংস সরণী, ইটালগাছা রোড
দমদম, কোলকাতা – ৭০০০৭৯

৬. রুদ্রাণী ট্রাস্ট
স্বস্তিকা ভট্টাচার্য, নিউ আলিপুর
কলকাতা–৭০০০৫৩

হুগলী

১. রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
গুড়াপ, হুগলী, পিন–৭১২৩০৩

২. স্বামী প্রেমাত্মানন্দ মহারাজ
শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম
কুণ্ডুঘাট, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী–৭১২৫০২

৩. শ্রীশ্রীমা সারদা সংঘ
পেয়ারাবাগান রোড, চুঁচুড়া
হুগলী, পিন–৭১২১০৩

৪. শ্রবণ মণ্ডল
৬৩, সি. এস. মুখার্জী স্ট্রীট,
কোন্নগর, হুগলী – ৭১২ ২৩৫

৫. বলাইচক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার এবং সেবাশ্রম
গ্রাম+পোঃ–বলাইচক, হুগলী–৭১২৪১৬

নদীয়া

১. ‘শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবা সঙ্ঘ’
৩০/১, স্ট্রাণ্ড রোড, ঘূর্ণীপাড়া ঘাট,
পোঃ রানাঘাট, নদীয়া–৭৪১২০১

২. শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি
প্রাচীন মায়াপুর, নবদ্বীপ
নদীয়া–৭৪১২০১

হাওড়া

১. স্বামী নিত্যপ্রিয়ানন্দ (গৌতম মহারাজ)
বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১ ২০২

২. রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ
পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া–৭১১২০২

৩. রামকৃষ্ণ মিশন
৪, নস্করপাড়া লেন, কাসুন্দিয়া
হাওড়া –৭১১ ১০১

৪. শ্রীরামকৃষ্ণ–মা সারদা–স্বামী বিবেকানন্দ ভাবাশ্রিত সংঘ, বেলানগর

৫. অরিন বুক স্টল
মোঃ ৯৩৩০৪৫২৭৭১

বর্ধমান

১. প্রধান শিক্ষক
আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়
বিবেকানন্দ সরণি, পশ্চিম বর্ধমান–৭১৩৩০৫

২. স্বামী বিবেকানন্দ বাণী প্রচার সমিতি
৬, বিদ্যাসাগর এ্যাভিনিউ,
‘বি’ জোন, দুর্গাপুর ৭১৩ ২০৫

৩. রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র এবং গীতা সংস্কৃত ভাষা কেন্দ্র,
নতুনগঞ্জ, বর্ধমান–৭১৩১০২

৪. তপন কুমার মণ্ডল
গুসকরা, সঙ্গতিপল্লী
পূর্ব–বর্ধমান, পিন–৭১৩১২৮

৫. শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
ডোমরা, ত্রিলোকচন্দ্রপুর
বর্ধমান, পিন–৭১৩১৪৮

৬. সুমনা ঘোষ
১০৩, সিদ্ধি বিনায়ক অ্যাপার্টমেন্ট
হিল ভিউ পার্ক, চেলিডাঙ্গা,
আসানসোল–৭১৩ ৩০৪

পূর্ব মেদিনীপুর

১. স্বামী অলিপ্তানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক
পূর্ব মেদিনীপুর, পিন–৭২১ ৬৩৬

২. তাম্রলিপ্ত গুচ্ছ সমিতি
দক্ষিণ ধলহরা, পোঃ দঃ নারিকেলদা
পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১ ৬৪৮

৩. অভ্যুদয়, হলদিয়া
গ্রাম+পোঃ – চৈতন্যপুর
পূর্ব মেদিনীপুর–৭২১৬৪৫

৪. স্বামীজী সর্বোদয় সংঘ
বিরুলিয়া, পিন–৭২১৬৫০

পশ্চিম মেদিনীপুর

১. উত্তম কুমার সামন্ত
টাটা স্টিল বিয়ারিং ডিভিশন হাউজিং
কম্প্লেক্স, কোয়ার্টার নং–এফ ৭৪৪,
নিমপুরা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট,
পোঃ রাখাজঙ্গল, খড়্গপুর
পিন–৭২১ ৩০১

২. কইগেড়িয়া রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি
গ্রাম–কইগেড়িয়া, পোঃ–কামালপুর
পশ্চিম মেদিনীপুর–৭২১২১২

উত্তর ২৪ পরগনা

১. চাঁদপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
চাঁদপাড়া বাজার, পিন ঃ ৭৪৩২৪৫

২. বারাসাত বিবেকানন্দ রুরাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট
৫২, হরিনাথ সেন রোড,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

১. শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সংঘ
ভাঙ্গড়, পোঃ + থানা ঃ ভাঙ্গড়
দক্ষিণ ২৪ পরগনা–৭৪৩ ৫০২

২. অরিন্দম চ্যাটার্জী
কলাগাছিয়া, সরিষা
পিন–৭৪৩৩৬৮

৩. মাধবী নস্কর
বারুইপুর, কোলকাতা–৭০০১৪৪

৪. বজ বজ বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্র
৩২জি, এস.এন. ব্যানার্জী রোড
কোলকাতা–৭০০১৩৭

পুরুলিয়া

১. স্বপন ব্যানার্জী
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ
বিবেকানন্দ নগর,
পুরুলিয়া–৭২৩১৪৭

আসাম

১. রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
শিলচর, আসাম

২. রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
করিমগঞ্জ, আসাম

উড়িষ্যা

১. রামকৃষ্ণ মিশন মাতা মঠ
রিং রোড, কটক–৭৫৩০০১

কল্যাণবাণী
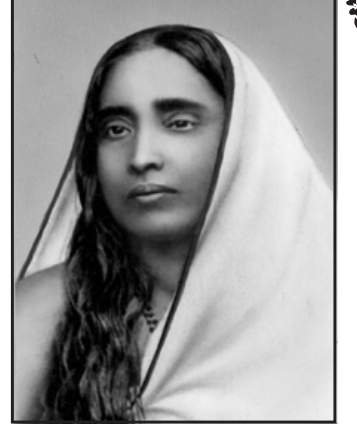
‘এই যুগে শক্তির অবতার ...’

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবী আশ্বাস দিয়াছেন—

ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।

তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।।

—‘এইরূপে যখনই দানবগণের প্রাদুর্ভাবনিবন্ধন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, আমি তখনই আবির্ভূতা হইয়া শত্রুবিনাশ করিব’ *(চণ্ডী, ১১।৫৪-৫৫)।* ...

আধুনিক এই মনোরাজ্যের সংগ্রাম পৌরাণিক দেবদানবের যুদ্ধ অপেক্ষাও ঘোরতর। অতীতের সংঘর্ষ সাধারণত স্থূলজগতের গণ্ডি অতিক্রম করিত না; কিন্তু আধুনিক দ্বন্দ্ব অন্তর্জগতে উদ্ভূত ও দৈনন্দিন জীবনে প্রসারিত হইয়া মানবের মনুষ্যত্বের মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। ... এই যুগে শক্তির অবতার তাই অন্তঃশত্রুর বিজয়ে ব্যাপৃত। বিজয় দুই প্রকারে হইতে পারে—প্রথম, ক্ষমতার প্রয়োগে পাপসহ পাপীর ধ্বংসসাধন; দ্বিতীয়, সদ্‌গুণরাশির চমৎকারিত্বের দ্বারা শত্রুর চিত্ত আকর্ষণপূর্বক অসৎকে সৎ-এ পরিবর্তিত করা। যুদ্ধে অরিবিনাশ অপেক্ষা সত্ত্বগুণের প্রভাবে তাহার মনোজয় করা অধিকতর শক্তির পরিচায়ক। **তাই বর্তমান অবতারে অস্ত্রবাহুল্য, সিংহগর্জন বা সমরকোলাহল নাই—আছে শুধু লজ্জা, বিনয়, সদাচার, পবিত্রতা, কল্যাণস্পৃহা ও ঈশানুভূতি।**

(শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৭, কলকাতা-৩, পৃঃ২-৩)

আমাদের কথা

মানব-আরাধিতা মা দুর্গা

দুর্গাপূজা সমাগত। বাঙালির প্রাণের পূজা, মনের পূজা, আমাদের পূজা—দুর্গোৎসব। কাব্যে বর্ণিতা মা দুর্গা তথা গৌরী, একাধারে জগজ্জননী এবং বাংলার মাতৃকুলের কাছে কন্যাসমা। বৎসরান্তে কন্যার আগমনে যেমন বাপের বাড়ির সকল মানুষ আনন্দে আটখানা হয়ে ওঠে, তেমনি দেবী দুর্গাকে নিকট আত্মীয়ের মতো একান্ত আপন ভেবে অতি আপনজন মনে করে বাঙালি তার সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-বেদনা, প্রাচুর্য-অভাব প্রভৃতি ভাগ করে নেয়। মায়ের সঙ্গে এমনই এক আটপৌরে সম্পর্ক বাঙালির! মা দুর্গা উচ্চাসনে আসীনা হলেও অনায়াসে সাধারণ মানুষের কাছে তিনি হন সহবর্তিনী মা অথবা মেয়ের মতো।

এই দেবীকে মানুষ ভক্তি করে ভয়ে নয়, দেবী দুর্গাকে ভক্তি করে একান্ত নিজের লোক মনে করে। সাধকের কাছে বাংলা-ভাষীদের কাছে তিনি গর্ভধারিণী মায়ের মতো—যাঁকে স্পর্শ করা যায়, যাঁর কাছে আবদার করা যায়। তাই মানসচক্ষে দর্শন করা হয়—রামপ্রসাদের ডাকে সাড়া দিয়ে জগন্মাতা তাঁকে বেড়া বাঁধবার জন্য সাহায্য করছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট-খাবার মা ভবতারিণী হাসিমুখে মা-পাগল ঠাকুরের কাছ থেকে গ্রহণ করছেন।

দেবী দুর্গার পূজার প্রথম প্রচলন হয় বসন্ত ঋতুতে। রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি সর্বপ্রথম মর্ত্যধামে এই পূজার প্রচলন করেন। বসন্ত কালে হয় বলে সর্বপ্রথম এই পূজাকে বাসন্তী পূজা বলে। সুরথ ও সমাধি রাজ্য ও সম্পদ হারিয়ে তাদের দুর্দশার প্রতিকারে উপদেশ পেয়েছিলেন মেধস মুনির কাছে—দেবী দুর্গার আরাধনায় ব্রতী হওয়ার জন্য। তাঁরাই প্রশ্ন করেছিলেন মেধস মুনিকে—**'কা হি সা মহামায়েতি'**—অর্থাৎ এই মহামায়া দুর্গা কে?

উত্তরে মহর্ষি বলেছিলেন—তিনি আদ্যাশক্তি জগতজননী। নিত্যা তিনি। সৃষ্টির এক একটি বীজকে বলা হয় 'ভূত'। এমন অগুন্তি ভূত নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে মহাবিশ্বের। দেবী মহামায়াই হলেন নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্রী। আবার তিনি জগৎ পালনকর্ত্রী জগদ্ধাত্রী এবং অন্নবিধায়িনী অন্নপূর্ণা। সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনিই হন সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারিণী। তখন তিনি আবির্ভূতা হন মহাকালী, রুদ্রাণী বা রণচণ্ডী তথা চামুণ্ডা রূপে।

একটি সুন্দর ভাবনা দিয়েছিলেন ঋষি মেধস। বলেছিলেন দেবী মহামায়া দুর্গা জন্মরহিতা। যুগে যুগে তাঁকে আবির্ভূত হতে দেখে আমাদের পুরাণ-স্মৃতি কাহিনীতে তাঁর জন্মের নানান লোকগাথা দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি অযোনিসম্ভূতা। তিনি প্রকৃতিরূপিণী ব্রহ্ম। নব নব সৃষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী ব্রহ্ম কখনও পুরুষ, আবার কখনো প্রকৃতি বলে পরিচিত। আবার কখনো তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই, নিরাকার ব্রহ্মের কথাও সাধকদের উপলব্ধিসঞ্জাত।

দেবতাদের তেজঃসম্ভূতা দেবী দুর্গা

দেবী দুর্গার আবির্ভাব ঘটেছিল অত্যাচারী বলগর্বী সম্রাট মহিষাসুরের বিনাশের জন্য। ক্রুদ্ধ দেবতাদের শরীরসম্ভূত পর্বতপ্রমাণ তেজঃপুঞ্জ থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন আগুনরঙা, মহাতেজস্বিনী পরমা রূপবতী মহাদেবী। উৎফুল্ল দেবতাগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসমূহ ও বহুমূল্য মণিমাণিক্য ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা করেছিলেন সেই দেবীর অতসীবর্ণা দেহ। সেই সকল অস্ত্রের সাহায্যে ও নিজের তেজ ও রণকৌশলে মহামায়া দেবী দুর্গা বধ করেছিলেন ত্রিভুবনজয়ী ত্রিলোকত্রাস মহাশক্তিশালী মহিষাসুরাদি অসুরগণকে।

সিদ্ধান্ত হলো, সৃষ্টিরক্ষায় পুরুষ অপেক্ষা প্রকৃতির অবদানের পাল্লা ভারী। বীজ-এর উৎস পুরুষ হলেও ধারণকর্ত্রী ও নিজের জীবনরস দিয়ে সেই পুষ্টিসাধিত বীজ থেকেই জন্মদান করেন প্রকৃতি বা মাতৃজাতি প্রাণী-শাবক ও ফলসমূহকে। মাতৃজাতি তাই চরম ও পরম শ্রদ্ধার পাত্রী।

দেবতাদের দেহনিঃসৃত তেজঃপুঞ্জ সমন্বিত দেবী দুর্গা হচ্ছেন আলোকরূপিণী। আলোকের তথা সত্ত্বগুণের

খড়্গাঘাতে অন্ধকার বা তমোগুণের জাজ্বল্য মূর্তি মহিষাসুরকে বিনাশ করেন। সকল অশুভ ও অসত্যের অন্ধকারনাশিনী এই জ্যোতির্ময়ী মহামায়া।

সঙ্ঘশক্তির বিজয় সুনিশ্চিত। 'দশে মিলি করি কাজ / হারি জিতি নাহি লাজ।' সকল দেবতা যখন নিজের কাঁচা আমির রাজত্ব থেকে বেরিয়ে এসে একত্রে সম্মিলিত হয়ে প্রার্থনা করলেন, নিজেদের তেজ ও অস্ত্রসমূহকে একত্রিত করলেন, তখনই ঐ মহাপরাক্রমশালী অসুরদের পরাভূত ও পর্যুদস্ত করা গেল। একসঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালে প্রবল প্রতাপ রাজশক্তিও পালাতে পথ পায় না। ব্রিটিশদের এদেশ থেকে পাততাড়ি গোটানো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সমগ্র জাতির সকলের কাছে উদ্‌যাপিত হয়েছিল জাতীয় দুর্গোৎসব।

অসুরনিধন তথা অধর্মের বিনাশ দেবী দুর্গার আবির্ভাবের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। জাগতিক দৃশ্যমান অসুরগুলি খুব কৌশল করে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে ফেলেছে। তারা এখন বাসা বেঁধেছে মানুষের অন্তর তথা হৃদয়-মাঝে। কবি তাই বলে ওঠেন—'মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।' ক্রোধ, হিংসা, লোভ, অহঙ্কার, ঈর্ষা, আত্মশ্লাঘা ইত্যাদি আসুরিক গুণগুলি বর্তমান মানুষের এখন সহজাত প্রবৃত্তি। এগুলি হৃদয়ের মধ্যে, বুদ্ধির মধ্যে, মনের মধ্যে প্রবল হয়ে মানুষরূপী প্রচ্ছন্ন দেবতাকে অসুর বা দানবরূপে প্রকট করে। অন্তরের মধ্যে অবিরাম চলতে থাকে দৈবী সম্পদ ও আসুরিক সম্পদের সংগ্রাম। দৈবীশক্তির পরাজয় তথা দুর্গাপূজায় সঠিকভাবে আরাধনা না করায় আমরাই হয়ে পড়ছি ঘৃণ্য দানব তথা অসুর। সমগ্র সমাজে ছড়িয়ে পড়েছে অশান্তি ও তাণ্ডব। 'পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার' না হয়ে এই পূজাও হয়ে উঠছে দানব তৈরির কারখানা। এই পূজায় পবিত্রতা উৎপন্ন না হয়ে যত অপবিত্র ও অশুভ ভাবনা ও উৎপাতের প্রাদুর্ভাব ঘটছে।

দেবীশক্তি হলেন সত্য, ন্যায়, প্রেম, প্রীতি, সহমর্মিতা, সহনশীলতা ইত্যাদি দৈবীগুণের প্রেরণারূপ ক্ষমতা। ঐ সকল গুণাবলী থাকলেই সঠিক ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থার সাহস ও ক্ষমতা জন্মায়। অন্তরস্থিত দানবগুলি পরাভূত হয়ে তখন পালাবার পথ খুঁজে পায় না। মানবকল্যাণের, মানব-মঙ্গলের নানান কার্যাবলী দ্বারা সমাজের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়। শুভ এবং মঙ্গল কার্যের জন্য দেবী দুর্গাকে 'শুভদা' বা 'মঙ্গলা' আখ্যা দেওয়া হয়। পবিত্রতাস্বরূপিণী প্রবল জ্যোতিঃপুঞ্জধারিণী দেবী দুর্গার অমলধবল স্পর্শে দূর হয়ে যায় যাবতীয় মলিনতা ও কালিমা। আমরা মায়ের সন্তানেরা নির্মল হৃদয়ের পবিত্র জীবনের অধিকারী হই। মাতৃকৃপা আস্বাদন করে বুঝতে পারি আত্ম-শুদ্ধির, আত্মিক উন্নতির আত্মানন্দের সেই অনির্বচনীয় স্পন্দন। মহামায়ার আরাধনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো সুপ্ত আত্মিক শক্তি জাগরণ ও বিকাশসাধন তথা 'চৈতন্যের জাগরণ'।

রাবণ-বধে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অকালবোধন

দুর্গাপূজা যদি সঠিকভাবে করা যায়, তবে চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। চণ্ডীতে পাওয়া যায়; পরাজিত পর্যুদস্ত আত্মীয়স্বজন তাড়িত রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে উপদেশ দিয়েছিলেন মহামুনি মেধস—মাতৃপূজায় ব্রতী হওয়ার জন্য। মাঘ মাস থেকে আষাঢ় মাস—দেবলোকে এই ছয় মাস দিন হয় বলে দেবতারা জাগ্রত থাকেন—একে বলা হয় উত্তরায়ণ। ঋষিবর এই সময় অর্থাৎ বসন্তকালে মাতৃপূজার আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মাতৃপূজা সার্থকভাবে সুসম্পন্ন করে দেবীর বরে রাজা সুরথ ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর হৃতরাজ্য, অন্যদিকে সংসারের বিষবৎ অভিজ্ঞতায় বীতরাগী বৈশ্য সমাধি মহামায়া জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন সংসার-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির অর্থাৎ মোক্ষলাভের। মা দুর্গার কৃপাকটাক্ষে তিনি অন্তিমে লাভ করেছিলেন তাঁর অভয়চরণ।

দক্ষিণায়ন শ্রাবণ মাস থেকে পৌষ মাস পর্যন্ত। কৃত্তিবাসী রামায়ণে বলা হয়—প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্দেশে রাবণবধের জন্য শ্রীরামচন্দ্র সাগরতটের বালুকাবেলায় দেবী দুর্গার আরাধনার আয়োজন করেছিলেন। দেবতাদের নিদ্রার কাল এই সময়। অকালে দুর্গাপূজার আয়োজন বলে এর আরেক নাম অকালবোধন। শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয় বলে এর আরেক নাম শারদীয়া। বাসন্তীপূজা অপেক্ষা শারদীয়া দুর্গাপূজাই অধিক প্রচলিত।

কন্যারূপে জগন্মাতা

স্বামী দিব্যানন্দ *

ঈশ্বরের অনন্ত ভাব। কেউ তাঁর অনন্ত ভাবের ইতি করতে সমর্থ নয়। রামপ্রসাদ বলেছেন—*'অনন্তরূপিণী কালী তোমার অন্ত কেবা পায়। কিঞ্চিৎ মহিমা জেনে শিব পড়েছেন রাঙ্গা পায়।।'* এই অনন্তরূপিণীকে সাধক কখনো দেবীরূপে, কখনো মাতৃরূপে, কখনো বা কন্যারূপে উপলব্ধি করেছেন। ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে মাতৃরূপেই দেবীর সমধিক প্রকাশ। কিন্তু তিনি বহু সাধকের কাছে ধরা দিয়েছেন, প্রকাশিত হয়েছেন কন্যারূপে। বৈদিক-সাহিত্য থেকে শুরু করে পৌরাণিক-সাহিত্য এবং তার পরবর্তী বহু সাধকের জীবনে জগন্মাতার এই কন্যারূপে প্রকাশিত হবার কথা আমরা জানতে পারি। পরশমণিকে যে ভাবেই ছোঁয়া হোক, তা সবকিছুকে সোনায় রূপান্তরিত করে। তেমনই ঈশ্বরকে যেরূপে, যেভাবেই চিন্তা করা হোক, তা সাধককে ভববন্ধন থেকে মুক্ত করে, তার মানবজন্ম সার্থক করে তোলে। সন্তানের কাছে তার মাতা-পিতা যেমন প্রিয়, মাতা-পিতার কাছে তাদের সন্তান তার থেকেও বেশি প্রিয় হয়। এই জগতে মাতা-পিতার মতো কেউ ভালোবাসতে সমর্থ নয়। সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার এই বাৎসল্যপ্রীতি অত্যন্ত গভীর হয়। যদি এই বাৎসল্যপ্রীতির মোড় ঈশ্বরের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সাধকের বাৎসল্যপ্রেমের টানে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন, এই জগতের যিনি মাতা, তিনি কন্যারূপে ধরা দেন।

বেদ ও পুরাণে—বৈদিক-সাহিত্যে আমরা দেবীর এই কন্যারূপে প্রকাশের কথা পাই 'দুর্গাসূক্তম্' নামক বৈদিক-সূক্তে। এই সূক্তে দেবীকে 'কন্যাকুমারী' বলে সম্বোধন করা হয়েছে—'ওঁ কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারী ধীমহি। তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ।'—ঋক্‌বেদ। এই মন্ত্রে দেবীকে 'কাত্যায়নী' এবং 'কন্যাকুমারী' বলা হয়েছে। 'কাত্যায়নী' শব্দের অর্থ কাত্যায়ন ঋষির কন্যা এবং 'কন্যাকুমারী' শব্দের দ্বারাও কন্যারূপিণী বলে নির্দেশ করা হয়েছে। বেদ সকল শাস্ত্রের বীজস্বরূপ। তাই বেদে যে সকল তত্ত্ব সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হয়েছে, পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সেই সকল বিষয় বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণে, বিশেষ করে দেবীভাগবতম্, দেবীপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রে দেবীর কন্যারূপে প্রকাশিত হবার উপাখ্যানগুলি পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কাত্যায়নীরূপে দেবীর আবির্ভাব—আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে দেবীর কাত্যায়নীরূপে আবির্ভাবের কথা পাই। মহিষাসুরের অত্যাচারে স্বর্গচ্যুত দেবতারা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেন তাঁদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। তাঁর উপদেশ মতো সকল দেবতা, মহাদেব ও ভগবান বিষ্ণুর কাছে জানান তাঁদের বিপদের কথা। দেবতাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করার মানসে, মহাদেব, ভগবান বিষ্ণু ও প্রজাপতি ব্রহ্মা, ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে উপস্থিত হন। দেবতাদের কাছে মহিষাসুরের অত্যাচারের বিবরণ শুনতে শুনতে মহাদেব এবং নারায়ণের মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ।।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত।।

(শ্রীশ্রীচণ্ডী–২/১০–১১)

এই সময় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের তেজ তাঁদের মুখমণ্ডল থেকে নির্গত হয়ে একীভূত হলো এবং উপস্থিত সমস্ত দেবতাদের তেজও ওই তেজমণ্ডলে মিলিত হলো। সকল দেবতাগণের তেজ মিলিত হয়ে জ্বলন্ত পর্বতের ন্যায় এক বিশাল তেজরাশির আবির্ভাব হলো। সেই তেজরাশি ক্রমে এক নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হলো। ইনিই জগন্মাতা দুর্গা। মহিষাসুরবধের নিমিত্ত তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে দেবীর আবির্ভাব হবার কারণে, তাঁকে ঋষি কাত্যায়নের কন্যারূপে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। এই কন্যারূপিণী কাত্যায়নীর উপাসনা করেই দ্বাপরযুগে গোপীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পেয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সেই অপূর্ব মন্ত্রের কথা আমরা জানি, যে মন্ত্রের দ্বারা দেবীকে কাত্যায়নীরূপে পূজা করে ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে

** বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের পূজাবিশেষজ্ঞ প্রবীণ এই সুলেখক বিদগ্ধ সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুরের অধ্যক্ষ, ট্রাস্টি ও গভর্নিং বডির সদস্য।*

পেয়েছিলেন—*'কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবী পতিং মে কুরু তে নমঃ।।'* তবে গোপীরা অবশ্য দেবীকে কন্যারূপে পূজা করেননি, তাঁরা মাতৃরূপেই পূজা করেছিলেন। এই দেবীমাহাত্ম্য বা চণ্ডীতেই দেবীর যশোদার গর্ভে কন্যারূপে আগমনের কথা পাওয়া যায়।

নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী।। (চণ্ডী-১১/৪২)

এই স্থানেও কন্যারূপিণী মহামায়ার আবির্ভাবের কথা আমরা পেলাম। প্রতিটি আবির্ভাবই দেবীর একেকটি অবতারলীলা। ভগবান যেমন যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে দুষ্টের দমন এবং ধর্মের স্থাপন করেন, ঠিক একইভাবে, ভগবতীও যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে দুষ্টের বিনাশ ও ধর্মস্থাপন করে থাকেন। দেবীর শাশ্বত অভয়বাণী—

'ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্।।'

(শ্রীশ্রীচণ্ডী-১১/৫৫)

শ্রীমদ্ভাগবতে যোগমায়ার জন্মলীলা—শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে যশোদার গর্ভে দেবীর জন্মগ্রহণের ঘটনা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। কংসের কারাগারে দেবকী এবং বসুদেব বন্দি আছেন। কংস যখনই জেনেছে যে দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান তার মৃত্যুর কারণ হবে, তখনই সে বসুদেব ও দেবকীকে কারারুদ্ধ করেছে। একটি একটি করে ছটি সন্তানকে নির্দয়ভাবে হত্যা করল কংস। কিন্তু সপ্তমগর্ভ থেকে শুরু হলো দৈবলীলা। ঈশ্বরের অমোঘ ইচ্ছায় সপ্তমগর্ভে আবির্ভূত ভগবান শেষনাগ বা বলদেবকে আকর্ষণ করলেন যোগমায়া এবং স্থাপন করলেন ব্রজধামস্থ রোহিণীদেবীর গর্ভে। তাই বলদেবের আরেকটি নাম হলো সংকর্ষণ। কংস দেখল, দেবকীর সপ্তমগর্ভ নষ্ট হয়ে গেছে। মূর্খ কংস বুঝতে পারল না যে, মৃত্যুকে কেউ ঠেকাতে পারে না। সে ঠিক নিজের পথ করে নেয়। এবার এল বহু অপেক্ষিত সেই কাল, যখন দেবকীর অষ্টম সন্তান তাঁর গর্ভে আসতে চলেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর কথামৃতে বলেছেন—'হরিলীলা সব যোগমায়ার সহায়'। দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হবার আগে ভগবান যোগমায়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

'অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি।।'

(শ্রীমদ্ভাগবতম্-১০/২/৯)

ভগবান বলছেন—'আমি আমার অংশ সকল সহ দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করব এবং তুমি নন্দপত্নী যশোদার গর্ভে আবির্ভূত হবে।' এই স্থানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, চণ্ডীতে দেবী যশোদার গর্ভে জন্ম নেবার কথা বলেছেন, সেই লীলারই বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ভগবান দেবীকে যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হতে বলেই ক্ষান্ত হলেন না। এই কন্যারূপিণী মহামায়ার নামসকল এবং তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন।

কংসকে যোগমায়ার ভবিষ্যদ্বাণী

'অর্চিষ্যন্তি মনুষ্যাণাং সর্বকামবরেশ্বরীম্।
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্বকামবরপ্রদাম্।।
নামধেয়ানি কুর্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ।।
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ।।'

(শ্রীমদ্ভাগবতম্-১০/২/১০-১২)

এই স্থানে একটি বিষয় দ্রষ্টব্য, ভগবান দেবীর বহু নামের মধ্যে একটি নাম উল্লেখ করছেন 'কন্যকা' বলে। কন্যকা এবং কন্যা একই অর্থ। অর্থাৎ 'কন্যা' এই শব্দটিই দেবীর একটি বিশেষ নাম।

এরপর সেই অতি পবিত্র মুহূর্ত সমাগত হলো। শ্রীভগবান দেবকীর পুত্র হয়ে কারাগৃহ আলোকিত করে আবির্ভূত হলেন, আর একই সাথে ব্রজধামে যোগমায়া যশোদার কন্যারূপে আবির্ভূত হলেন। বসুদেব ভগবানের

নির্দেশ অনুসারে কারাগার থেকে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে ব্রজধামের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলেন। ব্রজধামে এসে দেখলেন সকলেই যোগমায়ার প্রভাবে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তখন শ্রীকৃষ্ণকে সেই স্থানে রেখে কন্যারূপিণী যোগমায়াকে নিয়ে তিনি কারাগারে ফিরে এলেন। কংস দেবকীর সন্তানের জন্মগ্রহণের কথা শুনেই কারাগারে দ্রুত উপস্থিত হলো। ক্রুদ্ধ কংসকে দেখে দেবকী বহু মিনতি করে কন্যার প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন কিন্তু কংস কন্যাটিকে বধ করতে বদ্ধপরিকর।

কন্যাটিকে সে দেবকীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিল এবং নবজাত কন্যার পা দুটি ধরে সে পাথরের উপর আছড়ে মারল। সঙ্গে সঙ্গে সেই শিশুকন্যা ঊর্ধ্বে উঠে শূন্যে তাঁর স্বরূপে প্রকাশিত হলেন। তিনি অষ্টভুজা হয়ে দর্শন দিলেন।

তিনি কংসকে বললেন যে, এই কন্যাকে বধ করে তার লাভ হবে না এবং তাকে যিনি বধ করবেন, তিনি ইতিমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই কথা বলে দেবী অদৃশ্য হলেন।

এই আখ্যায়িকার মধ্যে দিয়ে আমরা দেবীর কন্যারূপে আবির্ভাবের একটি অতি অপূর্ব লীলা আস্বাদন করতে পারি। এই রকমই শ্রীমদ্ভাগবত ছাড়াও দেবীপুরাণ, দেবীভাগবত এবং শিবপুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রে দেবীর কন্যারূপে দুটি অতি বিখ্যাত লীলার কথা বর্ণিত আছে। একটি হলো দক্ষকন্যা সতীরূপে দেবীর আবির্ভাব এবং হিমালয়কন্যা পার্বতীরূপে দেবীর আবির্ভাব।

শিবপুরাণে সতীদেবীর উপাখ্যান—শিবপুরাণে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতি দক্ষ দেবীকে কন্যারূপে লাভ করার ইচ্ছায় কঠোর তপস্যা করেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে দর্শন দান করেন। জগন্মাতার দর্শনলাভ করে দক্ষ বহু স্তব-স্তুতি দ্বারা তাঁকে প্রসন্না করেন। দক্ষের স্তুতিতে প্রসন্না হয়ে দেবী তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন। দক্ষ দেবীকে কন্যারূপে পাবার বরদান প্রার্থনা করলে, দেবী প্রসন্না হয়ে দক্ষের কন্যারূপে অবতীর্ণ হবার প্রতিশ্রুতি দেন। দেবীর জন্মের পূর্বে দক্ষ এবং তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে জগদম্বার ধ্যান করতে লাগলেন, ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেবীর স্তুতি করতে লাগলেন। দেবী সন্তুষ্ট হয়ে দক্ষের হৃদয়ে প্রকাশিত হলেন। শুভক্ষণে দক্ষপত্নী গর্ভধারণ করলেন এবং কাল পূর্ণ হলে শুভক্ষণে দক্ষের গৃহ আলো করে সতী জন্মগ্রহণ করলেন। এর পরের ঘটনায় আমরা দেখতে পাই, সতী মহাদেবকে পতিরূপে পাবার জন্য বহু তপস্যা করেন এবং কঠোর তপস্যার ফলস্বরূপ মহাদেবকে পতিরূপে প্রাপ্ত হন। এরপর কোনো এক সময় প্রয়াগ তীর্থে সকল মুনিগণ এক যজ্ঞের আয়োজন করেন। সকল দেবগণের সাথে মহাদেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রজাপতি দক্ষ সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলে, সকলে তাঁকে অভিবাদন করলেও মহাদেব দক্ষকে অভিবাদন করলেন না। যজ্ঞস্থলে মহাদেব দক্ষকে অভিবাদন না করার ফলে, দক্ষ ক্রোধিত হয়ে উঠে মহাদেবকে এবং শিব অনুচরগণকে অভিসম্পাত করেন। অহঙ্কার এবং শিবদ্বেষ দক্ষকে অন্ধ করে ফেলল এবং তিনি শিবহীনযজ্ঞ শুরু করলেন। এই যজ্ঞে ত্রিলোকের সকলকে নিমন্ত্রণ করলেও সতীদেবীকে নিমন্ত্রণ করলেন না দক্ষ। সতীদেবী কিন্তু যজ্ঞস্থলে যাবার জন্য মনস্থ করেন। মহাদেব তাঁকে অনেক বোঝান, কিন্তু সতীদেবী মহাদেবের এই অপমান মেনে নিতে পারেননি। যজ্ঞস্থলে উপস্থিত সতীদেবীকে দেখে দক্ষ তীব্রভাষায় শিবনিন্দা করতে থাকেন। শিবনিন্দা শুনে দেবী দক্ষকে তিরস্কার করেন এবং শিবনিন্দা শ্রবণ করার প্রায়শ্চিত্তরূপে যজ্ঞভূমিতে দেহত্যাগ করেন। সতী দেহত্যাগ করলে মহাদেব তাঁর অংশ থেকে বীরভদ্রকে উৎপন্ন করেন এবং দক্ষকে বধ করার আদেশ দেন। বীরভদ্র মহাদেবের আদেশে দক্ষকে বধ করেন।

পার্বতীদেবীর উপাখ্যান—দক্ষকন্যা সতী দেহত্যাগ করে পুনরায় গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। গিরিরাজ হিমালয়ের বিবাহ হয় মেনকাদেবীর সাথে। তাদেরই সন্তান হয়ে জগন্মাতা আবির্ভূত হয়েছিলেন। দক্ষকন্যা স্বধা-র তিনটি কন্যা ছিল। মেনকা, ধন্যা এবং কলাবতী। এই তিন কন্যার গর্ভেই জগন্মাতা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। **মেনকার গর্ভে দেবী পার্বতীরূপে, ধন্যার গর্ভে সীতারূপে এবং কলাবতীর গর্ভে রাধারূপে জন্মগ্রহণ করেন।** পুরাকালে শ্বেতদ্বীপে ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা করতে বহু সিদ্ধমহর্ষিগণের আগমন হয়। সেই স্থানে স্বধাদেবীর এই তিন কন্যাও উপস্থিত ছিলেন। সেই সময় সিদ্ধঋষি সনৎকুমার সেই স্থানে এলেন। সকলেই তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু এই তিন ভগিনী উঠলেন না। মর্যাদারক্ষার্থে সনৎকুমার তাঁদের পৃথিবীতে নারী হয়ে জন্মাবার শাপ দিলেন। তারপর তাঁদের প্রার্থনায় প্রসন্ন হয়ে বললেন, মেনকার গর্ভে মহামায়া কন্যারূপে জন্ম নেবেন এবং তাঁর কৃপায় মেনকা নিজ পতি-সমেত শিবলোক প্রাপ্ত হবেন। একইভাবে ধন্যা সীতাদেবীর কৃপায় বৈকুণ্ঠ এবং কলাবতী শ্রীরাধার কৃপায় গোলোকধাম প্রাপ্ত হবেন।

তারকাসুরের অত্যাচার থেকে দেবকুলকে রক্ষা করার জন্য হর-পার্বতীর সন্তানের জন্ম অপরিহার্য ছিল। দেবগণের উপদেশে হিমালয় ভগবতীর বহু স্তুতি করেন এবং তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে দেবী কন্যারূপে জন্ম নেবার অঙ্গীকার করেন।

একইভাবে মেনকাদেবীও ভগবতীর আরাধনা করে তাঁকে তুষ্ট করেন। দেবীর বরে তাঁর মৈনাক ইত্যাদি একশত পুত্র লাভ হয় এবং দেবী স্বয়ং মেনকার কন্যারূপে জন্মগ্রহণের বরদান করেন। পার্বতীও দেবী সতীর মতোই কঠোর তপস্যা করে মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করেন। হরগৌরীর তেজসম্ভূত কুমার কার্তিক তারকাসুরকে বধ করে দেবগণকে বিপদ-মুক্ত করেন।

পরবর্তী যুগের সাধকগণের জীবনে কন্যারূপে ঃ রামপ্রসাদের কন্যারূপে—ভক্তের সাথে ভগবানের বহুবিধ লীলার বিলাস যুগে যুগে প্রকটিত হয়েছে। রামপ্রসাদের জীবনে জগন্মাতার কন্যারূপে আবির্ভাবের কথাও আমরা জানতে পারি। কথিত আছে, কোনো এক সময় রামপ্রসাদের ঘরের বেড়া ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল না থাকার কারণে, সেই বেড়া মেরামত করতে পারছিলেন না। একদিন নিজেই বেড়া বাঁধতে বসেছেন। একা একা বেড়া বাঁধতে অসুবিধা হচ্ছিল। তিনি তাঁর কন্যা জগদীশ্বরীকে ডাকলেন তাঁকে বেড়া বাঁধতে সাহায্য করার জন্য। কন্যা পিতাকে বেড়ার ওপাশ থেকে দড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছিল। ছোট মেয়ে একসময় বাবাকে না বলেই অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু কন্যার অবর্তমানেও দড়ি ঠিক ফিরে আসছিল। অনেকক্ষণ পরে ফিরে এসে জগদীশ্বরী দেখল বেড়া বাঁধার কাজ অনেকটা হয়ে গেছে। অবাক হয়ে সে বাবাকে প্রশ্ন করল—দড়ি কে ফিরিয়ে দিল বাবা? প্রসাদ বললেন, কেন মা, তুমিই তো ফিরিয়ে দিচ্ছিলে। কন্যা বলল, সে তো অনেকক্ষণ সেখানে ছিল না! শুনে রামপ্রসাদ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন! তবে কে দড়ি ফিরিয়ে দিল?

রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধায় কন্যারূপী মা জগদীশ্বরীর সাহায্য

স্বয়ং জগদীশ্বরী নিজে এসে কি বেড়া বেঁধে দিয়ে গেলেন? ভক্তিতে হৃদয় ভরে উঠল। রচনা করলেন সঙ্গীত, গেয়ে উঠলেন মনের আবেগে—

'মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন, ভাব শক্তি পাবে মুক্তি বাঁধো দিয়ে ভক্তি-দড়া।।
নয়ন থাকতে দেখলে না মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা, ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে
বেঁধে গেলেন ঘরের বেড়া।।'

শ্রীরামকৃষ্ণের বলা দুজন সাধকের জীবনে কন্যারূপে জগন্মাতা—শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর বলা বহু অমূল্য গল্পের মধ্যে দুজন সাধকের কথা বলেছেন, যেখানে জগন্মাতা কন্যারূপে ভক্তের কাছে ধরা দিয়েছেন। একজন হলেন রণজিৎ রায় এবং অন্যটি একজন ব্রাহ্মণের ঘটনা—যাঁর কন্যার নাম ছিল সর্বমঙ্গলা। শ্রীশ্রীঠাকুর কথামৃতে রণজিৎ রায়ের জীবনের ঘটনাটি বলেছেন। আমরা ঠাকুরের মুখে বলা এই ঘটনাটি কথামৃত থেকেই উদ্ধৃত করলাম।

সাধক রণজিৎ রায়ের কন্যারূপে—১৮৮৫, ১৩ জুলাই, ঠাকুর বলরাম বসুর বাড়িতে এসেছেন। নারাণ, তেজচন্দ্র ইত্যাদি ভক্তেরা বসে আছেন। ঠাকুর তাদের কাছে রণজিৎ রায়ের ঘটনাটি বলছেন। 'রণজিৎ রায় ওখানকার জমিদার ছিল। তপস্যার জোরে তাঁকে কন্যারূপে পেয়েছিল। মেয়েটিকে বড়ই স্নেহ করে। সেই স্নেহের গুণে তিনি আটকে ছিলেন, বাপের কাছ ছাড়া প্রায় হতেন না। একদিন সে জমিদারির কাজ করছে, ভারী ব্যস্ত; মেয়েটি ছেলের স্বভাবে কেবল বলছে, "বাবা, এটা কি; ওটা কি।" বাপ অনেক মিষ্টি করে বললে—"মা, এখন ... বড় কাজ পড়েছে।" মেয়ে কোনমতে যায় না। শেষে বাপ অন্যমনস্ক হয়ে বললে, "তুই এখান থেকে দূর হ।" মা তখন এই ছুতো করে বাড়ি থেকে চলে গেলেন। সেই সময় একজন শাঁখারী রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে ডেকে শাঁখা পরা হলো। দাম দেবার কথায় বললেন, ঘরের অমুক কুলুঙ্গিতে টাকা আছে, লবে। এই বলে সেখান থেকে চলে গেলেন, আর দেখা গেল না। এদিকে শাঁখারী টাকার জন্য ডাকাডাকি করছে। তখন মেয়ে বাড়িতে নাই দেখে সকলে ছুটে এল। রণজিৎ রায় নানাস্থানে লোক পাঠালে সন্ধান করবার জন্য। শাঁখারীর টাকা ঠিক সেই কুলুঙ্গিতে পাওয়া গেল। রণজিৎ রায় কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় লোকজন এসে বললে, যে, দীঘিতে কি দেখা যাচ্ছে। সকলে দীঘির ধারে গিয়ে দেখে যে শাঁখাপরা হাতটি জলের উপরে তুলেছেন। তারপর আর দেখা গেল না। এখনও ভগবতীর পূজা ওই মেলার সময় হয়—বারুণীর দিনে।'

কন্যারূপে সর্বমঙ্গলা—এক গ্রামে একজন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তিনি খুব গরিব ছিলেন। তিনি দেবীর পূজা এবং চণ্ডীপাঠ করে যা পেতেন, তাতেই তাঁর দিন কোনরকমে কেটে যেত। ব্রাহ্মণের একটি মেয়ে ছিল। তার নাম ছিল সর্বমঙ্গলা। একদিন সেই দেশের জমিদার সেই গ্রামে আসেন। মেয়েটি তাঁর চোখে পড়ে। মেয়েটিকে তাঁর খুবই মনে ধরল এবং তিনি তাঁর ছেলের সাথে সর্বমঙ্গলার বিয়ে দিলেন। বিবাহের পর মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। দেখতে দেখতে দুর্গাপূজা এসে গেল। ব্রাহ্মণের খুব ইচ্ছা তিনি মায়ের পূজা করতে চান। তিনি দরিদ্র হলেও সামর্থ্য অনুসারে পূজার আয়োজন হতে লাগল। কিন্তু পূজার মাত্র একদিন আগে ব্রাহ্মণী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, সর্বমঙ্গলাকে যদি আনা যায় তার চেষ্টা করতে। ব্রাহ্মণ গেলেন, কিন্তু সর্বমঙ্গলাকে তার বাড়ির লোক পাঠালেন না। ব্রাহ্মণ রাস্তা দিয়ে ফিরছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন পিছন থেকে কে যেন ডেকে বলছে, বাবা, আমি এসেছি। ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে দেখলেন, এ তো সর্বমঙ্গলা। সর্বমঙ্গলা বলল, তোমায় ভাবতে হবে না, আমি সবাইকে রাজী করিয়ে এসেছি। মেয়ে বাড়িতে এসে মহাআনন্দে থাকতে লাগল। পূজা শুরু হলো। খুব আনন্দের সাথে দু'দিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন মেয়ে জেদ ধরে বলল যে, পাড়ার লোকদের খাওয়াতে হবে। ব্রাহ্মণ নিজের অসামর্থ্যের কথা বললেও মেয়ে নাছোড়। সে সকলকে নিমন্ত্রণ করে এল। পূজার শেষে সকলে উপস্থিত হলে সর্বমঙ্গলা দেবীর প্রসাদ এনে সকলকে পরিবেশন করে খাওয়াতে লাগল। সবাই পেট ভরে খেয়ে ফিরে গেলেন। দশমীর দিন পূজায় বসে ব্রাহ্মণের মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। এমন সময় সর্বমঙ্গলা পূজা দালানে উপস্থিত হলো এবং দেবীর নৈবেদ্য দই-কড়মা খেতে আরম্ভ করল। ব্রাহ্মণ তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'মা তোমার এ কী ব্যবহার?' ব্রাহ্মণী আবার আয়োজন করে দিলেন। সর্বমঙ্গলা আবার খেয়ে ফেললে। ব্রাহ্মণ মহাবিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোর আজ কী হয়েছে? তুই যা এখান থেকে।' সর্বমঙ্গলা মাকে গিয়ে বলল, 'মা, আমি তিন দিন ভাল করে খাইনি। তাই খিদের মুখে নৈবেদ্য খেয়েছি। বাবা আমায় চলে যেতে বললেন। আমি তবে চল্লুম।' ব্রাহ্মণী পিছন ফিরে আর মেয়েকে দেখতে পেলেন না। ব্রাহ্মণ সব শুনে মেয়ের বাড়ি গিয়ে বললেন, 'পূজার সময় তুমি ব্যাঘাত করেছিলে বলেই তোমায় বকেছি। তাতে তুমি রাগ করে চলে এলে মা?' মেয়ে অবাক হয়ে বললে, 'সে কি বাবা! আমি তোমার বাড়ি কখন গেলাম?' ব্রাহ্মণ বুঝলেন, মা দুর্গা স্বয়ং সর্বমঙ্গলার রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। দেবীর কৃপার কথা স্মরণ করে ব্রাহ্মণ আত্মহারা হয়ে গেলেন।

কন্যারূপে সারদা—জগন্মাতা যুগে যুগে আবির্ভূত হয়েছেন এই ধরাধামে। এযুগেও তিনি সারদারূপে, রামচন্দ্র ও শ্যামাসুন্দরীর কন্যারূপে এসেছেন। সকলের যিনি মা, তিনি যাঁদের কন্যা হয়েছেন, তাঁদের মহিমার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। শ্যামাসুন্দরীদেবী পিতৃগৃহে অবস্থানকালে তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। তিনি এল্লাপুকুরের পাড়ে শৌচে যান। এবং অন্ধকারে স্থান নির্ণয় করতে না পেরে, তিনি একটি বেল গাছের নিচে বসে পড়েন। এমন সময় ঝনঝন শব্দ করে বেলগাছের শাখা থেকে একটি বালিকা নেমে এসে শ্যামাসুন্দরীর গলা জড়িয়ে ধরল। তিনি অচৈতন্য হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরলে তিনি অনুভব করলেন, ওই কন্যাটি তাঁর গর্ভে প্রবেশ করেছে। এই সময় রামচন্দ্র কলকাতায় ছিলেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন, এক জ্যোতির্ময়ী বালিকা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বলছে, 'এই আমি তোমার কাছে এলুম'। এর পরেই শ্রীশ্রীমা ১২৬০, ৮ পৌষ শ্যামাসুন্দরীর কোল আলো করে ভূমিষ্ঠ হন। শ্যামাসুন্দরীদেবী পরবর্তিকালে শ্রীশ্রীমাকে বলতেন, 'সারদা তোর মতন জন্মান্তরে আমার যেন মেয়ে হয়।' মা প্রতিবাদ করলে বলতেন, 'তোকেই যেন আবার পাই, মা।'

শ্রীশ্রীমায়ের জীবনে ডাকাত বাবার ঘটনা, এই কন্যারূপে প্রকাশের একটি বিশেষ উদাহরণ। শ্রীশ্রীমা যখন তেলোভেলোর প্রান্তরে ডাকাতের সম্মুখীন হলেন, ডাকাত কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, 'কে গা এ সময়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ?' মা বললেন, 'বাবা, আমার সঙ্গীরা আমাকে ফেলে গেছে, আমি বোধহয় পথ ভুলেছি ...।' সেই সময় সেই ডাকাতের স্ত্রী ওই স্থানে এল। মা তার হাত ধরে বললেন, 'মা, আমি তোমার মেয়ে সারদা, সঙ্গীরা ফেলে যাওয়ায় বিষম বিপদে পড়েছিলুম, ভাগ্যে বাবা ও তুমি এসে পড়লে, নইলে কি করতুম বলতে পারিনে।' এ এক অসাধারণ লীলাচিত্র! যিনি জগতের সকল ভয় নাশ করেন, সেই জগন্মাতা হাত ধরে ডাকাত দম্পতিকে পিতা-মাতা সম্বোধন করছেন। নিজের পরিচয় দিচ্ছেন তাদের কন্যারূপে, আর বলছেন যে তিনি বিপদে ছিলেন, এই মাতা পিতা না এলে তিনি বিপন্মুক্ত হতে পারতেন না! এই পরম সৌভাগ্যবান দম্পতি সারদাকে কন্যারূপে পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন। তাঁরা কন্যার সম্পর্কে জামাই শ্রীরামকৃষ্ণকেও দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে দর্শন করেছিলেন এবং ঠাকুর তাদের যথাযথ যত্ন ও আপ্যায়ন করেছিলেন।

(এর পরবর্তী অংশ ২৮৩ পৃষ্ঠায়)

যে পূজায় অবতার চোখ আঁকেন !

স্বামী অলিপ্তানন্দ *

('লাহাবাবু' কথাটি শুনলেই শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত অনুরাগিদের সর্বপ্রথমেই মনে পড়ে অবতারের আবির্ভাব স্থান কামারপুকুর। সেই লাহাবাবুদের আয়োজিত দুর্গাপূজা নিয়েই বর্তমান রচনা।)

যখন আমরা জয়রামবাটীতে ছিলুম, তখন আমরা প্রতি বছর ৺বিজয়ার দিন বিকালবেলা কামারপুকুর যেতাম প্রতিমা দর্শন ও প্রণাম নিবেদন করার জন্য। প্রথমে কামারপুকুর মঠের ঠাকুর দর্শন করে লাহাবাবুদের ঠাকুরদর্শন করতে যেতাম। Oil therapy নেবার সময় কামারপুকুরে কয়েক দিন থাকতে হয়। সেই সময় শিবপ্রসাদ লাহার সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি যা বলেন তাই লিখছি। একবার ধর্মদাসবাবু মকদ্দমার কাজে চুঁচুড়া যাচ্ছিলেন। তখন-কার সময়ে হাঁটা ছাড়া যাতায়াতের কোনো সুবিধা ছিল না। রাত্রিবাসের জন্যে চটিতে থাকতে হতো। সেবার এক চটিতে রাত্রিবাসের সময় রাত্রে মা দুর্গার স্বপ্নাদেশ পান। মা দেখা দিয়ে ধর্মদাস লাহাবাবুকে বলেন—'তুই নিশ্চয়ই মামলায় জয়ী হবি এবং বাড়ি গিয়ে মা দুর্গার পুজো করবি।' ধর্মদাসবাবু বলেন মাকে, 'এই অল্প সময়ের মধ্যে কি করে তোমার পুজো করব মা?' উত্তরে দেবী বলেন, 'তাঁর কাজ তিনি করিয়ে নেবেন।'

পরের দিন ধর্মদাসবাবু চুঁচুড়ায় গেলেন এবং আশ্চর্য-জনকভাবে মামলায় জিতে আনন্দে তিনি দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা ভুলে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য! বাড়ি ফিরে দেখেন যে, খানাকুল থেকে দুজন প্রতিমা শিল্পী এসেছেন ঠাকুর তৈরি করার জন্য। তখন তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে স্বপ্নের কথা। উনি তখন তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে তোমাদের এখানে পাঠাল? তাঁরা বলেন, একটা মেয়ে এসে বলল—ধর্মদাসবাবু মায়ের পুজো করবেন। তাই আমরা এসেছি প্রতিমা গড়ার জন্যে। এখন সমস্যা দেখা দিল, তিনি নিজে বৈষ্ণব, কি করে তিনি পূজায় বলি দেবেন? তখন তিনি ভাবলেন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যা বলবেন মাথা পেতে নেব। তখন তিনি পালকি করে গুরুগৃহের উদ্দেশে রওনা হন। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধা রমণী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ বাবা?' বললেন, 'গুরুগৃহে যাচ্ছি—মায়ের ইচ্ছা পূজা নেওয়ার, কিন্তু আমি তো বৈষ্ণব, কি করে বলি দেব? সেই জন্য গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছি।' তখন সেই বৃদ্ধা বললেন, 'মা কি কখনও ছেলের রক্ত চাইতে পারে?' তিনিই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাই ধর্মদাসকে গুরুগৃহে যেতে বারণ করেন। কিন্তু ধর্মদাসবাবু গুরুগৃহে পৌঁছে গুরুদেবকে সব কথা বললেন। তখন গুরুদেব বললেন—'মা তো নিজে তোমাকে দেখা দিয়ে তাঁর বিধান জানিয়েছেন। তুমি দ্বিধা কর না, পূজার আয়োজন কর।' গুরুদেবের কথামতো পূজার প্রস্তুতি শুরু হলো।

লাহাবাড়ির দুর্গাপূজা

সম্ভবত উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে এই বাড়ির পূজা শুরু হয়। প্রথম প্রথম চালাঘরে পূজা শুরু হয়। তারপর পাকা দুর্গাদালান হবার পর সেই দালানে মায়ের পূজা হয়ে আসছে।

* *রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক আশ্রমে সেবারত এই বিদগ্ধ সুপণ্ডিত প্রবীণ সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যে একটি সুপরিচিত নাম।*

ধর্মদাস লাহা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতার সুহৃদ। গদাধরের অন্নপ্রাশনে ধর্মদাসবাবু হৃষ্টচিত্তে অনেক কিছুই নিজ ব্যয়ে বন্দোবস্ত করেছিলেন। দুর্গা মন্দিরের সামনে তিনি এক পাঠশালা করেন। সেখানে গ্রামের বালকদের সঙ্গে গদাধরও পড়তে আসতেন। ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু ছিলেন গদাধরের বন্ধু। তাঁরা দুজনে স্যাঙাত বলে সম্বোধন করতেন। কোথাও নিমন্ত্রণ হলে গয়াবিষ্ণুকে নিতে ভুলতেন না। ছোটবেলা থেকেই লাহাবাড়িতে গদাধরের অবাধ যাতায়াত ছিল। যতদিন তিনি কামারপুকুরে ছিলেন, লাহাবাড়ির দুর্গাপুজোয় আসতে ভুলতেন না। তিনি আঁকায় খুব দক্ষ ছিলেন বলে **গদাধরকে বলা হয় মা দুর্গার চোখ আঁকতে। সেই কথামতো তিনি এমন সুন্দর চোখ আঁকলেন সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান।** গ্রামের সকলে বলাবলি করতে থাকেন, মায়ের চোখ এত জীবন্ত হয়েছে যে, মনে হচ্ছে মা দুর্গা স্বয়ং এবার কামারপুকুরে এসেছেন। **পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এ-বাড়ির দুর্গাপূজায় বেশ কয়েকবার পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।** লাহাবাড়ির দুর্গাপুজোর বৈশিষ্ট্য—প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত গ্রামীণ যাত্রার অনুষ্ঠান—যা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় বস্তু ছিল।

এবার লাহাবাড়ির পুজোর রীতিনীতি প্রসঙ্গে আসি। রথের দিন বাজনা-বাদ্য সহকারে একটি ঘট স্থাপন করা হয়। এ-বাড়ির দুর্গাদালানেই ঠাকুর গড়া হয়। প্রতিমা ছিল দেখবার মতো। কী মুখ! উজ্জ্বল টানা টানা চোখ, দেখতে খুবই মোটাসোটা ও ভয়ঙ্করী, কী করে যে তৈরি হতো বিস্ময়ের ব্যাপার। সাধারণ যেরূপ মেড় বা কাঠামো হয় তার থেকে খুব বড়। বিসর্জনের দিন নিশ্চয়ই চালচিত্র খুলে বের করা হতো। দুর্গাদালানটি লম্বায় বড়, চওড়ায় কম। প্রতিমা বসার পর সামনে সর্বতোমণ্ডলের উপর ঘট বসান হতো, তারপর গামলায় ত্রিপাদিকার ওপর তাম্রঘটের ওপর নারায়ণশিলা, তার সামনে কোশাকুশী, তারপর পূজারীজীর আসন, পিছনে প্রদক্ষিণ করার জন্য জায়গা রাখা হতো। প্রচলিত দশভুজা মূর্তি ডাকের সাজে সজ্জিত, তাঁদের সঙ্গে দুপাশে থাকেন জয়া বিজয়া। 'মৎস্যযুক্ত' এর উপরিভাগের ৪১তম পটলের যে শ্লোকটিতে জয়া এবং বিজয়ার প্রসঙ্গ আছে তাতে আমরা পাই ঃ 'জয়া বামে স্থিতা বিদ্যা বিজয়া চাপি দক্ষিণে'—বিদ্যারূপিণী জয়া দেবীর বামভাগে অবস্থান করেন এবং দেবীর দক্ষিণভাগে বিজয়ার অবস্থান। জয়া নামটির অর্থ জয় বা উৎকর্ষ প্রাপ্তি এবং বিজয়া শব্দের অর্থ লক্ষ্মী—শ্রী সম্পদ। তন্ত্র শাস্ত্রের অন্য স্থানে বর্ণিত জয়া ও বিজয়া ভিন্ন দেবতা হতে পারেন। যেহেতু লক্ষ্মী ও সরস্বতী এখানে আছেন, আমরা মায়ের সহচরী হিসাবে এঁদের কল্পনা করতে পারি। কারণ জয়ার হাতে চামর ও বিজয়ার হাতে বরণডালা আছে। তাই এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই সঙ্গত।

এ বাড়ির পূজার বৈশিষ্ট্য হলো, পূজা হয় প্রতিপদাদি কল্পে। প্রতিপদ অর্থাৎ মহালয়ার পরদিন একটি ঘট স্থাপন করা হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ এই ঘটের সামনে করা হয়। ষষ্ঠীতে বোধন, অধিবাস ও আমন্ত্রণ। সপ্তমীর দিন বড় ঘট স্থাপন করা হয়। এটিকে বলে দেবীঘট। সব ঘটই লাহাবাবুদের নিজস্ব পুকুর থেকে জলপূর্ণ করে আনা হয় বাদ্য-ঘণ্টা সহকারে। সপ্তমীর দিন প্রতিমাস্থ দেবতাদের ষোড়শোপচারে পূজা হয় এবং বাহনদের পঞ্চোপচারে পূজা হয়। পূজার পর অন্নভোগ দেওয়া হয়। ভোগের পর ভোগারতি। তারপর জয় দিয়ে শেষ হয়। ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত লাহা পরিবারের সব সদস্য দুর্গামন্দিরে প্রসাদ গ্রহণ করেন। কারও বাড়িতে রান্না হয় না। ষষ্ঠী থেকে অষ্টমী পর্যন্ত নিরামিষ রান্না। নবমীতে হয় মৎস্যমুখ। নবমীর দিন লাহা পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রতিবেশী এবং দর্শনার্থীরাও এ-বাড়ির পুজোয় প্রসাদ গ্রহণ করার সুযোগ পান। সন্ধ্যায় হয় দেবীর আরতি। এইভাবে তিন দিন পূজা হয়। অষ্টমীতে হয় কুমারী পুজো। লাহা পরিবারের পুজোর আরও কিছু কুলাচার আছে। যাঁরা পুরোহিত এবং তন্ত্রধারকের কাজ করেন, তাঁরা পুজোর ঘট স্থাপনের দিন থেকে অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে দুর্গামন্দিরে থাকেন এবং লাহাবাড়ির দেওয়া বস্ত্র পরিধান করে পুজো করেন। পূজারী ও তন্ত্রধারক ও বাড়ির বড়রা প্রতিপদ থেকে অষ্টমী পর্যন্ত তাঁরা নিরামিষ আহার করেন—এক কথায় হবিষ্যান্ন। নবমীর দিন লাহাবাড়ির পুকুর থেকে মাছ দিয়ে পুরোহিত, তন্ত্রধারক এবং গুরুদেবকে মৎস্যমুখ করানো হয়। এরপর এ-পরিবারের সকলে মৎস্যমুখ করেন। প্রতিদিন পূজান্তে স্তবপাঠ, দুর্গানাম জপ, ভোগ ও ভোগারতি সম্পন্ন হয়।

নবমী পূজার পর অন্নভোগ দেওয়া হয়, তারপর হোম করা হয়। দশমীতে দেবীর দশোপচারে পূজা হয় এবং প্রতিমাস্থ দেবতাদের পঞ্চোপচারে পূজা হয়। পূজার পর তিনবার দেবীকে প্রদক্ষিণ করার পর সুতা কেটে গামলার হলুদ জলে দর্পণ বিসর্জন করা হয়। এরপর মেয়েদের সিঁদুর-খেলা চলে।

এই পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভবিষ্যতের কথা ভেবে ধর্মদাস লাহা বেশ কিছু লোককে জমি-জায়গা দান করেন। যেমন ঢাকি, কুমোর, যাঁরা পুজোর জন্য আতপচাল

দেন, পুরোহিত, বিসর্জনের জন্য প্রতিমা বাহক ইত্যাদি। এঁরা সকলেই বংশ পরম্পরায় এ-বাড়ির পুজোর সঙ্গে যুক্ত। বিজয়ার সন্ধ্যার পর দেবীকে চৌকি থেকে নামিয়ে বরণ ও আরতি করা হয়। বিজয়া দশমীর দিন লাহা বাজারের কাছে লাহাবাবুদের নিজস্ব পুকুরে প্রতিমার বিসর্জন হয় বাদ্য-ঘণ্টা সহযোগে। বিসর্জনের পর পরিবারের সদস্যরা শান্তিবারি নেওয়ার পর বেলপাতায় দুর্গানাম লেখেন। তারপর মিষ্টিমুখের পালা।

বর্তমানে কর্মসূত্রে লাহা পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে থাকলেও, পুজোর সময় সকলে পূজা বাড়িতে মিলিত হন এবং প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ঐতিহ্য বজায় রেখে দুর্গাপূজার সকল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত (অখণ্ড)-তে ১৯৬ পৃষ্ঠায় আছে—

'শ্রীরামকৃষ্ণ (ত্রৈলোক্যের প্রতি)—হ্যাঁগা, কাল যাত্রা হয় নাই?

ত্রৈলোক্য—হাঁ, যাত্রার তেমন সুবিধা হয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তা এইবার যা হয়েছে। দেখো যেন অন্যবার এরূপ না হয়! যেমন নিয়ম আছে, সেইরকমই বরাবর হওয়া ভাল।'

—এর থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি যাত্রা দেখতে ভালোবাসতেন। তাই আজও প্রতিপদ থেকে ষষ্ঠী পর্যন্ত এখানে গ্রামীণ যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। আগে লাহাবাবুদের আটচালাতে এই যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হতো, এখন দর্শক বাড়ার জন্য আটচালাতে আর জায়গা সংকুলান হয় না। সে কারণে আটচালার সামনে মঞ্চ তৈরি করে চিরাচরিত ঐতিহ্য বজায় রেখে যাত্রাপালার অনুষ্ঠান হয়। ষষ্ঠীর দিন দেবী বরণের পর একটু রাতে যাত্রা শুরু হয়। এই দিনই পুজো উপলক্ষ্যে শেষ যাত্রানুষ্ঠান। কে জানে, হয়তো আজও সূক্ষ্ম শরীরে শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে আসেন এ-বাড়ির পুজো আর তাঁর প্রিয় যাত্রাপালা দেখতে। এইভাবে প্রতিপদ থেকে দশমী পর্যন্ত চলে দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান। আজও সেই রীতি চলে আসছে।

(২৮০ পৃষ্ঠায় 'কন্যারূপে জগন্মাতা'র শেষাংশ)

আগমনী সঙ্গীতে কন্যারূপে—আমরা দেবীর কন্যারূপের প্রকাশের কথা বেদ ও পুরাণের বিভিন্ন উপাখ্যানে যেমন পাই, তেমন পরবর্তী যুগের বহু সাধকের জীবনেও জগন্মাতার এই কন্যারূপে প্রকাশের কথা পাই। এই বঙ্গদেশের বহু সাধক কন্যারূপে জগদম্বাকে চিন্তা করে তাঁকে কন্যারূপে পেয়েছেন। তাঁদের চিন্তার এবং সাধনার ফলস্বরূপ আমরা বহু শাক্তপদাবলী পাই, যেখানে দেবীকে কন্যারূপে, উমারূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

দুর্গাপূজা বঙ্গদেশের বৃহত্তম উৎসব। এই দুর্গোৎসব বাঙালির আধ্যাত্মিক জীবনকেই শুধু পুষ্ট করেনি, সাথে সাথে জাতির সংস্কৃতির সাথেও গভীরভাবে মিশে গিয়ে বাংলার সংস্কৃতিকে করেছে আরো বেশি সমৃদ্ধ। এই পূজা উপলক্ষ্যে গীত বহু আগমনী গান আমরা পাই—যেখানে দেবী দুর্গাকে কন্যারূপেই আবাহন করা হয়েছে। সাধক কবির হৃদয়ে দেবী দুর্গার এই আগমন গিরিরাজ হিমালয়ের ও মেনকার কন্যারূপেই ফুটে উঠেছে। বছর ঘুরে যখন পূজার সময় আসে, তখন মা মেনকার মনে যেন কন্যাকে কৈলাস থেকে আনার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠে। মাতৃহৃদয় বলে ওঠে—'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরি, উমা নাকি বড় কেঁদেছে।' আবার সাধক কমলাকান্ত লিখছেন—'গিরি প্রাণগৌরি আন আমার। উমা বিধুমুখ না দেখি বারেক এ ঘর লাগে অন্ধকার।' এইভাবে যখন দেবীর পূজার সময় সমাগত হয়, কিছুদিন পরেই যখন অনেক আদরের উমা এসে পৌঁছাবে, তখন সাধক গেয়ে ওঠেন—'এলি কিগো উমা, হর-মনোরমা, কৈলাস-চন্দ্রমা হলি কি উদয়। মা বলে একবার, আয় কোলে আমার, না হেরে সংসার হেরি শূন্যময়।' সুতরাং ভক্ত এই সকল গানের মধ্যে দিয়ে দেবীর ঐশ্বর্য দূরে রেখে বালিকারূপিণী উমার মাধুর্য আস্বাদন করতে চেয়েছে। আবার যখন বিজয়াদশমীর দিন আসে, উমার ফিরে যাবার সময় হয়, মন চায় না তাকে যেতে দিতে। মহাসাধক রামপ্রসাদ লিখছেন—'এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না। বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।' আগমনী গান দেবীকে পেয়েছে কন্যারূপে। সাধকের মনকে করে তুলেছে উমার জননী মেনকার মতো ব্যাকুল। যে ব্যাকুলতায় সাড়া দিয়ে উমা প্রতি বর্ষে আসেন বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে, তার সকল ব্যথা ভুলিয়ে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিতে।

অনুধ্যান

অবতার-সঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা

স্বামী স্মরণানন্দ *

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।।

শ্রীশ্রীমা অবতার-সঙ্গিনী। অবতারপুরুষগণ যখনই আবির্ভূত হন, তখন তাঁদের সঙ্গে অবতার-সঙ্গিনীরাও আসেন। তাঁরা আসেন কিন্তু তাঁদের কোনো বিশেষ ভূমিকা দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীশ্রীমার ক্ষেত্রে বিষয়টি অন্যরকম। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অসুস্থ হয়ে রয়েছেন—তাঁর মহাসমাধির কয়েকদিন আগে মা তাঁকে বলছেন—তুমি তো চলে যাচ্ছ, আমাকেও নিয়ে চল। ঠাকুর বলছেন—না তোমার অনেক কাজ আছে, তোমাকে থাকতে হবে। মা বলছেন—আমি মেয়েমানুষ আমি আর কি কাজ করব। ঠাকুর বলছেন—না তোমার দ্বারা অনেক কাজ হবে। অন্যান্য অবতারদের ক্ষেত্রে অবতার-সঙ্গিনীরা এসেছেন কিন্তু তাঁদেরকে অবতারের কাজ করার জন্য থেকে যেতে হয়নি।

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের মহাসমাধির পর দীর্ঘ ৩৪ বছর এই পৃথিবীতে ছিলেন। কত লোককে কৃপা করেছেন। কত ধরনের, কত রকমের কার্যকলাপ, কত রকমের সমস্যা সব সামলেছেন। এই সঙ্ঘ যখন গড়ে উঠছে তখন কত রকমের সমস্যা দেখা দিত। শেষ পর্যন্ত সমাধান করার জন্য মার কাছেই যেতে হতো। বেশ কয়েকটি এরকম উদাহরণ আছে। মা নিজে যখন বৌদ্ধগয়া গিয়েছেন সেখানে একটি মঠ দেখে—তাদের অবস্থা বেশ ভালো, ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করছেন—আমার ছেলেরা এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়, ঠাকুর তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা কর। তারপর থেকে দেখা যায় মঠের আস্তে আস্তে অনেক ব্যবস্থা হলো, উন্নতি হলো। আরো অনেক রকম ঘটনা আছে। যেমন মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমের বিষয়ে। স্বামীজী চেয়েছিলেন একটি আশ্রম হবে যেখানে কোনো মন্দির, মূর্তি এইসব থাকবে না, সেখানে কেবল অদ্বৈত ভাবেই সাধনা হবে। এইটি নিয়ে সেখানকার সাধুদের মধ্যে একটু দ্বন্দ্ব হয়েছিল। শেষে শ্রীশ্রীমার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বললেন—'আমাদের গুরু যিনি, তিনি তো অদ্বৈত; তোমরা যখন সেই গুরুর শিষ্য, তখন তোমরাও অদ্বৈতবাদী! আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি, তোমরা অবশ্য অদ্বৈতবাদী।' *('অতীতের স্মৃতি'তে উদ্ধৃত স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরী, ৭/৯/১৯০২)* সেখানেই সন্দেহটি দূর হয়ে গেল। তিনি একজন সামান্য মানবীর মতো থাকলেও, তাঁর এই কথা—ঠাকুর তো অদ্বৈতই—এর মধ্যে এক গভীর ভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। আরো অনেক ঘটনার ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় যে তাঁর কথাই শেষ কথা। বেলুড় মঠে একজন কাজের লোক ছিল। কোনো কারণে তাকে সরিয়ে দেওয়া হলে সে মায়ের কাছে যায়। মা সাধুদের বললেন—বাবা, ওকে রেখে দাও। মা বলছেন, মায়ের কথাই শেষ কথা, সে রয়ে গেল। স্বামীজী আমেরিকা যেতে চান, বুঝতে পারছেন না যাবেন, না যাবেন না। মাকে চিঠি লিখলেন। শ্রীশ্রীমা আশীর্বাদ জানিয়ে অনুমতি দিলেন।

স্বামী স্বরূপানন্দজী

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সাধনার দ্বারা শাস্ত্রাদিতে যা আছে সেগুলিকে নিজের জীবনে উপলব্ধি করে তার সত্যতা প্রমাণিত করেছেন। কিন্তু সেগুলিকে তো তুলে ধরতে হবে
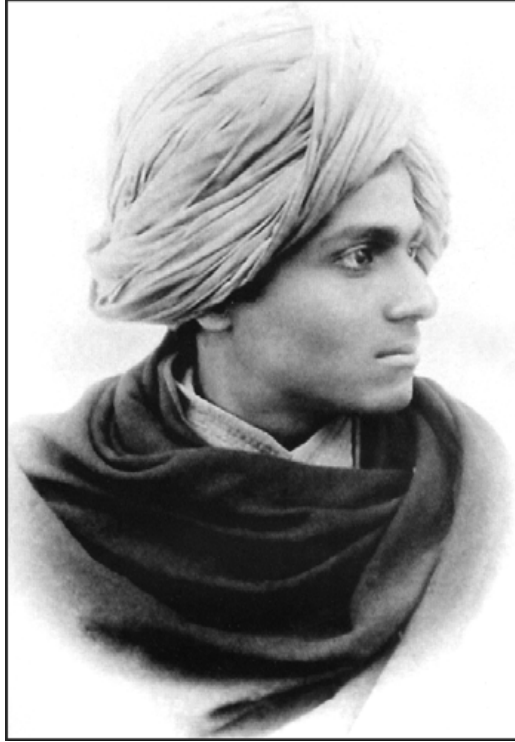
* *সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া।*

সবার সামনে, তা না হলে সবাই বুঝবে কি করে? সেই জন্য স্বামীজীকে এনেছিলেন তাঁর বাণী প্রচারের জন্য আর মাকেও এনেছেন। মা সাধারণ এক গ্রামের মেয়ে, অত্যন্ত সাধারণভাবে থাকতেন, কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায়, সঙ্ঘজননীরূপে সকলকে নিয়েই চলেছেন। তাঁর স্বরূপটি কী সেটি কি আমরা সব সময় বুঝতে পারি? আমরা যেমন দেখি সেরকম কি—একেবারে সাধারণ? সেটিও তিনি মাঝে মাঝে দেখিয়ে দিয়েছেন। একবার কামারপুকুর থেকে মা জয়রামবাটীতে যাচ্ছেন, সঙ্গে শিবুদা (ঠাকুরের ভাইপো), পিছন পিছন হাতে একটা পুঁটুলি নিয়ে যাচ্ছেন। খানিকটা যাবার পর শিবুদা বলছেন—তাহলে তুমি যাও, আমি আর যাব না। অনেক বলার পর মা বলছেন—কেউ কেউ বলে কালী। আর একটি ঘটনা—হরিপ্রেম মহারাজ (স্বামী হরিপ্রেমানন্দ) ছিলেন মায়ের সেবক। তখন মায়ের শরীর খুব খারাপ। জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেছেন। এই সময় মায়ের পদসেবা করতে করতে হরিপ্রেম মহারাজের মনে একটা প্রশ্ন উঠেছে—মা কি সত্যি জগজ্জননী! আর যদি তাই হয়, তাঁর এরকম চেহারা কেন? তখন হঠাৎ দেখছেন যে মায়ের সেই রূপটি পরিবর্তিত হয়ে তাঁর জায়গায় বসে আছেন জগদ্ধাত্রী-মূর্তি, চারিদিক আলোয় আলো। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান হতে দেখলেন মা তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলছেন—ও হরি, কি হলো? মাঝে মাঝে তিনি তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেছেন কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই তিনি একজন সাধারণ রমণীর মতোই থাকতেন।

বেদান্তের কথা আমরা বলি। গীতা-উপনিষদ্ ইত্যাদিতে যা বলা হয়েছে, practical-ভাবে সেগুলি সেটিকে জীবনে আনা যায় কি না, বাস্তবে প্রয়োগ করা যায় কিনা—সেটি একটি প্রশ্ন। বিশেষ করে আজকের যুগে কত পরিবর্তন হচ্ছে, কত কি হচ্ছে। এ প্রশ্ন কেউ করতে পারেন। মা তাঁর নিজের জীবনে তা করে দেখালেন। এই অবস্থায় কীভাবে জীবন যাপন করতে হবে, কীভাবে এই উচ্চ আদর্শগুলিকে জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে ইত্যাদি, তিনি নিজের জীবনে করে দেখিয়েছেন।

কত সহ্য গুণ। নিজেই বলতেন 'শ-ষ-স'—অর্থাৎ ধৈর্যগুণ। সহনশীল হতে হবে। এই জগতে থাকতে গেলে অনেক রকম দুঃখ-কষ্ট আছে, ভালো আছে, মন্দ আছে। কিছুদিন হয়তো ভালো চলল, তারপর হঠাৎ এমন ঘটনা ঘটল, সব অন্ধকার। এই রকম অবস্থায় কীভাবে চলতে হয়, তা মা নিজের সন্তানদের পথ দেখিয়ে গিয়েছেন। নিজেও অনুরূপ অবস্থায় একইরকমভাবে চলেছেন। একজন মহিলার সন্তান মারা গেছে, খুব কাঁদছেন—মাও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদছেন। তিনি তাঁকে চেনেনও না। মার কান্না দেখে সেই মহিলা স্তম্ভিত। ক্রমশ তিনি শান্ত হয়ে গেলেন। এই হচ্ছে সর্বভূতে তিনি আছেন জেনে প্রত্যেক মানুষকে আপন করে নেওয়া। গীতা, উপনিষদ্, সর্বত্র একই কথা বলা হয়েছে—সেই পরব্রহ্মই সর্বভূতে অবস্থান করছেন। কিন্তু সেই সত্য উপলব্ধি করে নিজের জীবনে প্রয়োগ করা যে সম্ভব, তা শ্রীশ্রীমা দেখিয়ে গেছেন। গীতাতে বারবার একথা বলা হয়েছে। ভাগবতে (৩।২৯।২১) বলা হচ্ছে ঃ

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তম্ অবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্।।

ভগবান বলছেন—আমি সবার ভেতরেই আছি। গীতাতে (২।৪৮) বলা হচ্ছে 'সমত্বং যোগ উচ্যতে'। এই সমত্ববুদ্ধি শ্রীশ্রীমার মধ্যে বরাবরই ছিল। এই সমত্ববুদ্ধি আসা বড় কঠিন, সহজ ব্যাপার নয়। মায়ের জীবনে এটি আমরা খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখতে পাই। এর জন্য কোনো সাধনা তাঁকে করতে হয়নি। ঠাকুর তাঁকে সবাইকে দেখাশোনা করার ভার দিয়ে গিয়েছিলেন। তাই তিনি করে গিয়েছেন ঠাকুরের মহাসমাধির পর চৌত্রিশ বছর ধরে।

তাঁর মহাসমাধির পরও কত লোক ভক্তিভরে তাঁর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। এরকম শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও দেখা যায়। ইউরোপে, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ইত্যাদি দেশে তারা মেরীর পূজা করে আবার মায়ের ছবিও পূজা করে। একটা ঘটনা শুনেছিলাম। শ্রীশ্রীমার জন্ম-শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় কাশী সেবাশ্রমের এক সাধু বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলরের সঙ্গে দেখা করার জন্য গিয়েছেন। তিনি তাঁর অফিসে স্লিপ পাঠিয়েছেন। তাঁকে অপেক্ষা করার জন্য বলা হয়েছে। তিনি দেখছেন তাঁর পরে যারা এল তাদের ডাকা হচ্ছে, কিন্তু তাঁকে ডাকা হচ্ছে না। সবাই চলে যাবার পর ভাইস-চ্যান্সেলর তাঁকে ডাকলেন। বললেন—ক্ষমা করবেন, অনেকক্ষণ আপনি বসে আছেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলব বলে সবাই চলে যাবার পর আপনাকে ডাকলাম। আমি কয়েকদিন আগে আপনাদের সেবাশ্রমে গিয়েছিলাম। মায়ের উপর লেখা একটি বই দেখিয়ে বললেন—সেখানে বইয়ের স্টলে বই দেখতে দেখতে এইটি কিনে নিয়ে এলাম। বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি এনার সম্বন্ধে আরও জানতে চাই। আপনি কিভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারেন? সাধুটি বললেন—এঁরই জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান চলছে, তার public meeting-এ আপনাকে preside করার জন্য

আমন্ত্রণ করতে এসেছি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। এরকম দেখা যায়—ঠাকুরকে যেমন শ্রদ্ধা করছে মাকেও তেমনই শ্রদ্ধা করছে।

মায়ের বিষয়ে সব ঘটনাগুলি বইয়ে ছাপা হয়ে গেছে। নতুন করে বলার আর কিছু নেই। যাঁরা মায়ের জীবনী পড়েছেন, মায়ের কথা পড়েছেন তাঁরা সেসব জেনেছেন।

শ্রীশ্রীমা সাধারণভাবে থেকে কীভাবে মানুষের কল্যাণ করেছেন তা দেখে ভক্তরা আসছেন, তাঁর প্রতি আকর্ষণ ক্রমশ বাড়ছে। শুনেছি আমাদের দ্বাদশ প্রেসিডেন্ট ভূতেশানন্দজী মহারাজকে মায়ের কথা বলতে বললে তিনি বলতেন—মায়ের যা কিছু তা সব ছেপে বেরিয়ে গেছে, তবুও মায়ের কথা বলতে ভালো লাগে, কারণ মায়ের কথা বলতে শুনতে আনন্দ হয়। নতুন করে বলার কিছু নেই। মায়ের কথা বললে আনন্দ হয়। মা যেখানে যেখানে ছিলেন সেখানে সেখানে গেলে দেখতে পাবেন, মা কত কষ্ট করে ছিলেন। ওপারে ঘুষুড়িতে একটি বাড়িতে মা ছিলেন। যেখানেই থাকুন তাঁর মধ্যে সব সময়েই একটা ভাব ছিল যে, সবার মধ্যে তিনিই আছেন। জয়রামবাটীতে একজন সাধু একটা বেড়ালকে মারলেন। মা বলছেন—ওটাকে মের না বাবা, ওর মধ্যেও তো আমি আছি। তিনি সর্বভূতের মধ্যে আছেন এই উপলব্ধিটি আমরা চিন্তাও করতে পারি না।

জয়রামবাটীতে আগে একজন মহারাজ থাকতেন—স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী। তিনি মাকে অনেক সেবা করেছেন। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মহারাজ আপনারা মাকে কীভাবে দেখতেন? বললেন কীভাবে আবার দেখব! তিনি মা, এইটুকুই জানতাম, মাকে আমরা মা বলেই জানতাম। উনি হয়তো ভেবেছিলেন আমি কোনো বিশেষ দর্শনাদির বিষয়ে জানতে চেয়েছি। একবার একজন সাধুর বিরুদ্ধে মার কাছে চিঠি গেছে—মা, ওকে বিদায় করে দাও। মা চটেছেন। বিদায় করে দেব কীভাবে? আমি যে মা—কাউকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না। সকলের প্রতি কী সহানুভূতি ভালোবাসা! এরকম দেখা যায় না।

স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী

আমাদের দেশে, ইউরোপে অনেক সাধিকার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁরা সাধন-ভজন করে উপলব্ধি করেছেন, ঐ পর্যন্তই—জগতের সকলের জন্য কিছু করব এ ভাব ছিল না। এই কারণে ঠাকুর তাঁকে রেখে গেছেন। বেদান্তের কথা বইতে আছে, ঠিক আছে, কিন্তু সেগুলি বাস্তবজীবনে কীভাবে প্রতিফলিত হবে, শত কষ্টের মধ্যেও সংসারে থেকে কীভাবে মনটিকে ঈশ্বরের দিকে রাখতে হয়, এইটি মায়ের জীবন দেখলে আমরা বুঝতে পারি। এই জন্য যত কাজই থাক না কেন, মায়ের কাছে নিজেদের অর্পণ করতে হবে। মা, সকলের মা, জগতের মা। সেই উপলব্ধি তাঁর বরাবরই ছিল। সকলে জানত না, কারুকে জানতে দিতেন না। কখনও কখনও কেউ কেউ জেনে যেত। এই কয়েকটি কথা বললাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা তোমাদের মঙ্গল করুন।*

** রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার, কলকাতা-য় ২৭.৬.২০১৪ তারিখে ভক্তদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণ।*

Millions of Swamiji–ও ঠাকুরের এক কণারও সমান নন

শরৎ মহারাজ উদ্বোধনের নিচের ঘরে বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছেন। বিধু রায় সামনে বসে বললেন, 'মহারাজ, স্বামীজী চলে যাওয়ার পর আপনিই মঠ-মিশনকে ধরে রাখলেন।' শরৎ মহারাজ বললেন, 'বলছিস কী? রাজা মহারাজ ছিলেন তা-ই। রাজা মহারাজ সবাইকে এক করে ধরে রাখলেন। নইলে মঠ-মিশন খণ্ড খণ্ড হয়ে যেত। রাজার কাছে আমরা কিছুই নই। যতই ভাবি—সারাজীবন ধরে স্বামীজীকে একটুও বুঝতে পারলাম না। আমরা সবাই হাজার গুণ করলেও, এমনকী রাজা পর্যন্ত—স্বামীজীর এক কণারও সমান নই। আবার millions of Swamiji-ও ঠাকুরের এক কণারও সমান নন। এখন বোঝ, ঠাকুর ও স্বামীজী—এঁরা কারা এসেছিলেন।' *(প্রাচীন সাধুদের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ১৭৭)*

অনুচিন্তন

'শ্রীরামকৃষ্ণের নববেদান্ত'

স্বামী গৌতমানন্দ *

একথা জেনে আমি আনন্দিত যে, ৬৬ বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদের গ্রামীণ মুখপত্র—'সমাজশিক্ষা' তাঁদের এ-বছরের শারদ সংখ্যা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এই অবসরে জীবন-গঠনকারী ও জীবন-সমৃদ্ধকারী যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা, যার অনুসরণে আমরা শুধু জাগতিক জীবনেই সফল নয়, পাশাপাশি চরম আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্তও হতে পারি, যা কিনা মনুষ্যজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য—তা আপনাদের কাছে উপস্থাপিত করতে ইচ্ছুক হয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ধ্যানধারণাগুলিকে আমি 'শ্রীরামকৃষ্ণের নববেদান্ত' নামেই উল্লেখ করব।

সকল ক্ষেত্রেই মানুষ জীবনে পরিপূর্ণতা চায়। সেটি কেবলমাত্র তখনই সম্ভবপর হয়, যখন তার চারটি মৌলিক চাহিদা পূরিত হয়, যথা ঃ ১) জাগতিক আনন্দের প্রতি তার চাহিদা; ২) সেই জাগতিক আনন্দ প্রাপ্তির সাধক ধন-ঐশ্বর্যের প্রতি তার চাহিদা; ৩) পরিবার ও সমাজে শান্তি ও প্রীতির চাহিদা—যা কেবলমাত্র সততা, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থ ধর্মজীবনের মাধ্যমে আসে; এবং ৪) মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি ও নিত্য জীবন ও আনন্দপ্রাপ্তির চাহিদা। পৃথিবীর সকল ধর্মই উপরোক্ত এই চারটি চাহিদার পরিপূর্ণতা দানে প্রতিশ্রুত। আর সেই কারণেই মানুষ ধর্মীয় আচার্যদের কাছে যায়।

শিকাগোয় শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তি

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ, প্রভু যিশুখ্রিস্ট প্রভৃতি অধিকাংশ মুখ্য ধর্মীয় প্রবর্তকদের পরবর্তী প্রজন্মের ধর্মীয় শিক্ষকেরা চিন্তাশীল জনগণকে জীবনের এই চারটি মৌল চাহিদা পূরণে যে তাঁরাও সমর্থ—এ কথায় উদ্বুদ্ধ করতে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছিলেন। সকল প্রকৃত ধর্মই ঈশ্বর উপলব্ধিকেই মনুষ্যজীবনের চরম লক্ষ্য বলে প্রচার করে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের যে বেদান্ত তা স্পষ্টত শিক্ষা দেয় যে—এটি সম্ভবপর হবে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় প্রকারের স্বার্থপর বাসনা ত্যাগের দ্বারা এবং প্রাত্যহিক জীবনে প্রার্থনা, বিশ্বাস, সত্যবাদিতা ও নিঃস্বার্থপরতার অনুশীলনের দ্বারা। এ সকল কিছুই অধ্যাত্মজীবনের উচ্চতর আনন্দপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার দিকে আমাদের চালিত করে অর্থাৎ কিনা ভগবানকে উপলব্ধি করা—যার অর্থ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরের অন্তরে—অনন্ত জীবন, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দের উৎসটিকে উপলব্ধি করা। এই ভগবৎ-অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষাই ঈশ্বরের প্রতি সাধকের ঐকান্তিক প্রার্থনা এবং সাধকের প্রতি তাঁর কৃপা-আশীর্বাদ নিয়ে আসে—যাতে কিনা আপ্লুত হয়ে সে পরিপূর্ণতা লাভ করে। ফলত, সে জাগতিক সকল কামনা-বাসনা অতিক্রম করতে পারে।

ধর্মের অর্থ আসলে এই ঈশ্বর-উপলব্ধি বা ভগবৎ-প্রাপ্তি। ঈশ্বর উপলব্ধির প্রতি স্পষ্টবর্ণিত নির্দিষ্ট ধাপগুলি পরবর্তী প্রজন্মের ধর্মীয় নেতাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হয়ে পড়ে। তৎপরিবর্তে তাঁরা আচার-অনুষ্ঠান, দান-ধ্যান, তীর্থদর্শন, পুণ্যস্নান, উপবাস বা ধর্মের নামে ভোজনোৎসব করাকে শিক্ষা দিতে থাকেন। কিন্তু ধর্মের এই বহিরঙ্গগুলি একনিষ্ঠ ধর্মাকাঙ্ক্ষীদের আশাহত করে। তারা ধর্মে অবিশ্বাস করতে শুরু করে। অনেক সময় তারা জড়বাদী হয়ে ইন্দ্রিয়সুখের প্রতি ধাবিত হয়। আবার এমন সম্ভাবনাও যে তারা নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী প্রভৃতি হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ সমাজে ভোগবাদ

* অন্যতম প্রবীণ সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ মঠ, চেন্নাই-এর অধ্যক্ষ।

ও অনাবশ্যক প্রতিযোগিতার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের কালটি ছিল সারা জগতব্যাপী এমনই এক জড়বাদী প্রবণতার সময়। তারই মধ্যে তিনি দেখালেন যে, ঈশ্বর আছেন এবং সকল একনিষ্ঠ ধর্মাকাঙ্ক্ষী তাঁকে লাভ করতে পারেন। কেবলমাত্র বিশ্বাস নয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা সে নিছক বিশ্বাসের পারেও যেতে পারে। তিনি এছাড়াও এই ঈশ্বরলাভের পন্থা শিক্ষা দিয়ে গেলেন। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ—এই চার যোগের বহু পরীক্ষিত প্রাচীন ধারায় তিনি বাস্তবিকই বহু অকপট সাধককে পথ দেখিয়েছেন ঈশ্বর-উপলব্ধিতে। এর সঙ্গে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর নব পন্থাস্বরূপ তিনি ঈশ্বরের প্রতি শরণাগতি এবং জীবের প্রতি সেবাদৃষ্টির বা সেবাযোগের কথাও যুক্ত করেছেন।

ফলস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ এমন একটি ধর্মজীবন দেখালেন, যা বিজ্ঞানসম্মতভাবে ঈশ্বরের আত্মোপলব্ধি করতে প্রতিশ্রুত এবং যা নিছক ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা বলে না। এটি হলো নববেদান্ত—যা কিনা শুধুমাত্র একজনকে ঈশ্বরবিশ্বাসী হতে না বলে, তাঁকে ঈশ্বর-উপলব্ধির পথগুলি দেখিয়ে দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজজীবনে প্রমাণ করেছিলেন শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা ভাব নিয়ে হিন্দুধর্মসহ ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম প্রভৃতি সকল ধর্মই সত্য। তিনি নিজে এসকল অনুশীলন করে ঈশ্বর উপলব্ধি করেছিলেন এবং স্বীয় অনুভূতি দ্বারা এদের মধ্যেকার সমন্বয় শিক্ষা দিয়েছিলেন।

‘সুরেন্দ্রর পট’

এটি হলো শ্রীরামকৃষ্ণের নববেদান্ত—যা কিনা সকল ধর্মের সমানত্ব অর্থাৎ ধর্মে ধর্মে একতানতার শিক্ষার কথা বলে। আচার-অনুষ্ঠান-বেশভূষা-খাদ্যাভ্যাস-বিবাহপ্রথা-জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি বাহ্যিক দিক দিয়ে যদিও প্রত্যেক ধর্মই ভিন্নরূপে প্রতীয়মান, তবুও সকল ধর্মকেই সত্য বলে গ্রহণ করার কথা এটি বলে। এইভাবে তিনি ধর্মে ধর্মে বৈচিত্রের মাঝেকার ঐক্যতান আবিষ্কার করেছিলেন। এটি হলো ধর্ম সমন্বয়ের মূলসূত্র যা কিনা বর্তমান বিশ্বে ভীষণভাবে আজকের দিনে প্রয়োজন। এই সূত্রটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর অতিমানবিক আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসমূহের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং তিনি কার্যত হয়ে উঠেছেন ধর্মসমন্বয়ের এক বার্তাবাহী আচার্য। আর্নল্ড টয়েনবির মতো প্রখ্যাত ঐতিহাসিকেরা এ কথা স্বীকার করেন যে, মানবতার আত্মহননের থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলো শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত এই পথটি।

আমাদের সকলের মনে আছে সেপ্টেম্বর এগারো ২০০১-এর কথা এবং ধর্মীয় ফেনাটিসিজিমের ফলে নিউইয়র্ক শহরে যে বিপর্যয় ঘটেছিল। ওটি শুধুমাত্র আমেরিকার নয়, গোটা বিশ্বের ইতিহাসকেই নাড়া দিয়ে গেছে। ওই ধরনের গোঁড়ামি, একদেশদর্শিতা ও ধর্মান্ধতার একমাত্র প্রতিবিধান হলো শ্রীরামকৃষ্ণের অ্যান্টিডোট। আমার বেশ মনে পড়ে যে ২০০১, ২০০৯, ২০১২ এবং ২০১৪-তে যুক্তরাষ্ট্রে আমার সফরকালে ফরাসি, আমেরিকান প্রভৃতি বহু বিদেশীরা উৎসাহী ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই ধর্মীয় সমন্বয়ের শিক্ষার বিষয়ে। ইন্ডিয়ানাপোলিস-এ আন্তর্জাতিক ইউনিটারিয়ান চার্চ অফ কলম্বাসে আমাকে এই ধর্মসমন্বয়ের উপর দু-দুবার বলতে বলা হয়। আমার বক্তৃতা শুনে সেখানে উপস্থিত রাব্বি যিনি ছিলেন, তিনি বলেন—এসকল কথাই তিনি তার পরবর্তী রবিবাসরীয় বক্তৃতায় বলবেন।

ইউরোপ, আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্তের অনেক দেশেই আমাদের সাধুদের এই ধর্মসমন্বয়ের উপর বলতে আমন্ত্রণ করা হয়। নেলসন ম্যান্ডেলা বহু ধর্মমতের দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় এই ধর্মে ধর্মে সমন্বয়ের কথাই প্রচার করেছিলেন।

যে সকল সুহৃদ অনুরাগিবৃন্দ আয়োজন করেছিলেন ১৮৯৩-এর ধর্মমহাসভা—যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ বক্তা ছিলেন—তাঁরা আজও অস্ট্রেলিয়া, সানফ্রান্সিসকো প্রভৃতি জায়গায় অনুরূপ মহাসভার আয়োজন করে চলেছেন, যেখানে কিনা এখনো বক্তারূপে আমাদের মিশনের সন্ন্যাসী-স্বামীরা যোগদান করেন। এটি দেখায় শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা আধুনিক জগতের জনমানসে কতখানি। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার সকল বিষয় সময়ে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে, বৈদিক সনাতন ধর্মের আবারও জাগরণ ঘটবে এবং সারা বিশ্বজুড়ে সকল সত্যকারের ধর্মাকাঙ্ক্ষীরা তাতে যোগদান করবেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশ্বজনীন ধর্মীয় আদর্শটি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর চিন্তাশীল মানুষের ধর্ম হয়ে উঠতে চলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে

এই ধর্মসমন্বয়ের উপর একটি হাতে আঁকা ছবি দেখে আনন্দিত হন এবং সুরেন মিত্রের দ্বারা অনুরূপ একটি চিত্র করান। সেই ছবি সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি ছিল—'ভবিষ্যৎ ধর্মগুলির অনুসরণীয় এই হল নবধারা।' একই মানসিক উদারতায় শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মকে তার জাতপাত, লিঙ্গবৈষম্য, জাতিভেদ প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতাগুলো থেকে মুক্ত করেছিলেন। তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বর-সেবার সবথেকে বাস্তবোচিত ধর্মটির প্রবর্তন করেন। সেটি কী ছিল? তার নিহিতার্থ হলো—জাতি-বর্ণ-ধর্ম-মত নির্বিশেষে সকলের মধ্যে কেবলমাত্র ঈশ্বরই বিরাজ করে আমাদের সেবা গ্রহণ করছেন—এই ভাবে সকলকে সেবা করা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই বার্তা জগত-হিতকর সকল কার্যকে আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গরূপে দেখবার বিষয়ে ভারতীয় এবং বিশ্বব্যাপী মানবতার ভাবধারায় আমূল পরিবর্তন এনেছে।

১৯৯০-এর দশকে আমি মরিশাস-এ দেখেছিলাম ১০,০০০ আসনবিশিষ্ট এক বিরাট প্রেক্ষাগৃহ স্বামী বিবেকানন্দের নামে উৎসর্গীকৃত হতে। এটিকে বলা হয়—'স্বামী বিবেকানন্দ হল ফর ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল কনফারেন্সেস'। হলটির সামনে স্বামীজীর একটি মূর্তি রয়েছে, সঙ্গে খোদাই করা এই বার্তা যে—'জাতি, বর্ণ, ধর্ম, লিঙ্গ, মত নির্বিশেষে যে কোনো দেশের দরিদ্র ও অভাবী মানুষকে সেবা করাই হতে পারে বিশ্বজনীন ধর্ম'। এটি হলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নববেদান্ত—যা কিনা সকল মানুষের মন অধিগ্রহণ করছে।
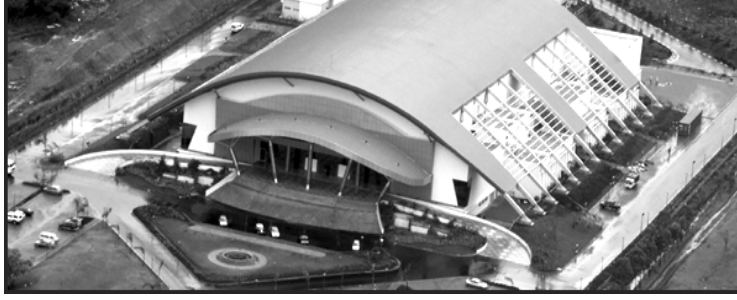
ইন্টারন্যাশনাল কালচারাল কনফারেন্সেস হল

স্বামী বিবেকানন্দ পূর্বাভাস করে গেছিলেন যে, অচিরেই ভারতবর্ষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের হয়ে উঠছে। এদেশ জেগে উঠছে। পৃথিবীর কোনো শক্তিই একে থামাতে পারবে না। ভারতবর্ষ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণরূপ যে শক্তি বেলুড় মঠকে কেন্দ্র করে উত্থিত—তা সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করে সকল মানুষের জীবনে শান্তি ও ঐক্যসাধন করবে। শ্রীরামকৃষ্ণের এই প্রচণ্ড প্রভাবটিকে আপনারা দেখুন। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত মানুষের মাঝে ভগবানের সেবা করার যে শিক্ষা—তার প্রতি নিজেদের সঁপে দিতে বহু শত যুবমানুষ—কী মহিলা কী পুরুষ, কী গৃহী কী সংসারত্যাগী—উভয়ই আমি সমগ্র ভারতবর্ষে দেখেছি। **বেশ প্রতিভাশীল, অবস্থাসম্পন্ন, খাঁটি যুব-নারী ও পুরুষ ঈশ্বরজ্ঞানে মানুষকে সেবা করতে ও ভগবানলাভে নিজেদেরকে উৎসর্গীকৃত করতে উদ্যোগী। তাঁরা সারদা মিশন ও রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করছেন**। ভোগবাদী ও সুখান্বেষী এই জড়বাদী সমাজেই এই ঘটনা ঘটে চলেছে। এটি হলো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নববেদান্তের কার্যকরী ফল।

আমরা যেন সকলে এই নতুন বৈদান্তিক ভাবান্দোলনের অংশ হয়ে উঠে ঈশ্বর-বুদ্ধিতে মানবসেবার মাধ্যমে ঈশ্বর-উপলব্ধির সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছেই প্রার্থনা করি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী মহারাজ আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন—এটি তাঁদের কাছে আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। জয় রামকৃষ্ণ। ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সাধুজীবনের মূল ভিত্তিই হলো—চরিত্র

তুমি আর কটা দিন বাইরে কাটিয়েছ, ক-জন সাধুই-বা দেখেছ? বাইরের সাধুদের জীবনযাপন সম্বন্ধে কতটুকুই-বা জান? আমি সারাজীবন প্রায় বাইরেই কাটিয়েছি। আমাদের সঙ্ঘের সাধুদের ঐশ্বর্য হলো চরিত্রবল। আর সাধুজীবনের মূল ভিত্তিই হলো—চরিত্র। বাইরে যারা থাকে, তারা ইচ্ছেমতো খাওয়াদাওয়া, ঘোরাফেরা ইত্যাদি যখন যেভাবে খুশি করতে পারে। তাতে একটু অসাবধান হলেই স্বেচ্ছাচারিতা আসতে পারে এবং আসেও। সঙ্ঘে থাকলে, সঙ্ঘের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মগুলি রুটিনমতো করলে, নিয়মশৃঙ্খলা নিষ্ঠা সহকারে পালন করলে অষ্টাঙ্গ যোগের যম-নিয়ম-আসন—এই তিনটি প্রধান সাধন অনায়াসে আপনা থেকেই অভ্যাস হয়ে যায়। বাইরে থাকলে এসব বহু চেষ্টা করে করতে হয়। *(প্রাচীন সাধুদের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ৪২৮)*

মানুষের সম্ভাবনার দ্বার যেখানে উন্মোচিত

স্বামী বাগীশানন্দ *

আজ আমরা রহড়া আশ্রমের প্লাটিনাম জুবিলী অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছি। এই আশ্রম গঠনের ইতিহাস আমাদের সঙ্ঘের একটি আদর্শ তথা মন্ত্রের রূপায়ণের ইতিহাস। যেটি নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ।

সালটা ১৯৪৩, বাংলার জনজীবনে নেমে এল মৃত্যুর করাল ছায়া। ভয়াল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে মানুষ অসহায়ভাবে মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে। তার সঙ্গে মহামারীর প্রকোপ ও বিধ্বংসী বন্যা শত শত–হাজার হাজার মূল্যবান জীবনকে পৃথিবীর বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আর্ত মানুষের কান্নায় তখন আকাশ–বাতাস ভারী হয়ে আছে। একদিকে পরাধীন ভারত, অন্যদিকে নির্বিকার ব্রিটিশ প্রশাসন। সেই নির্দয় অন্ধকারে আলোর প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়েছিলেন একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। মানুষের তপ্ত অশ্রু তাঁর হৃদয়কে শুধু ভিজিয়ে দেয়নি, তা থেকে উৎসারিত করেছিল সেবা ও ভালোবাসার নির্মল প্রস্রবণ। তিনি স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ। ভগবানের দোহাই দিয়ে যেসব দুর্ভিক্ষ–পীড়িত বালকদের রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেই নেই–জগতের বাসিন্দাদের পরম স্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন মহৎপ্রাণ স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ।

কলকাতা থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে রহড়া গ্রাম। সেখানে তৎকালীন সংবাদপত্র 'বসুমতী' পত্রিকার ছাপাখানা ও গোডাউন ছিল। সেই পত্রিকার প্রকাশক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর পুত্র ও কন্যা সন্তানকে চিরতরে হারিয়ে তখন গভীর শোকে আচ্ছন্ন। তিনি সেই ছাপাখানা সংলগ্ন কিছুটা জমি, একতলা বাড়িসহ সম্পত্তি জনকল্যাণে দান করলেন। সেখানেই ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর আত্মপ্রকাশ করেছিল রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া—যা সমকালে জনমানসে বিপুল সমর্থন ও শ্রদ্ধা আকর্ষণে সফল হয়েছিল।

'টাকায় কিছুই হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়। চরিত্র বাধাবিঘ্নস্বরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে।' স্বামী বিবেকানন্দের এই বাণীকে সম্বল করে পৃথিবীর মাটিতে পথ হেঁটেছিলেন স্বামী পুণ্যানন্দজী মহারাজ।
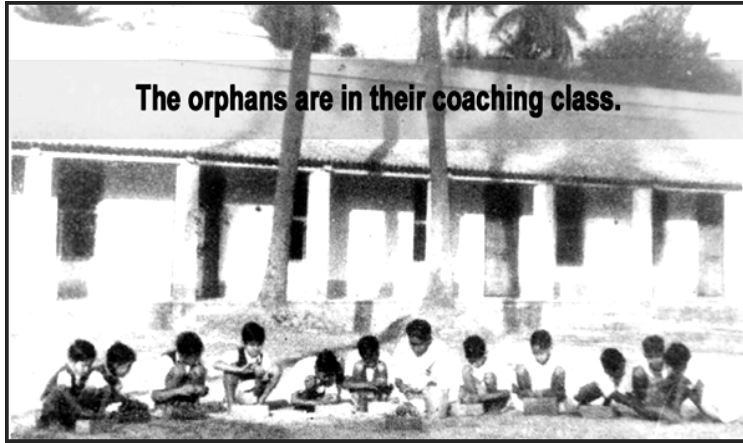
বালকাশ্রমের গোড়ার দিন

ভালোবাসায় কোমল অথচ আত্মবিশ্বাসে দৃঢ় স্বামী পুণ্যানন্দজীর বিপুল কর্মকাণ্ড থেকে জন্ম নিয়েছিল অনন্য সাফল্য। তাঁর নিরলস পরিশ্রম, ঐকান্তিক প্রার্থনায় রহড়া বালকাশ্রমের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতম হয়েছিল। তখনকার এই কর্মে সংযুক্ত হয়েছিলেন আরও অনেক নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং অনলস কর্মিবৃন্দ।

স্বামী পুণ্যানন্দজী পূত জীবনের সংস্পর্শে এসে অনেক অনাথ বালকের জীবন আলোকিত হয়েছে। জীবন থেকেই জীবনের শিক্ষা আসে। যদি সেই বালকবৃন্দ কিছু শিক্ষালাভ করে থাকে এবং তাদের কাছ থেকে বৃহত্তর সমাজ যদি কিছু পেয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, তার জন্য অনেকখানি দান সেই মহাপ্রাণের—স্বামী পুণ্যানন্দজীর।

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের সেই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছিল অনেক পরিবার। বিষ্ণুপদ নামের একটি বালকের জন্যও থাবা উঁচিয়ে ছিল মৃত্যু। কিন্তু তার ললাট লিখন ছিল ভিন্ন। নিশ্চিত মৃত্যুকে পরাভূত করে, সেই অনাথ বালকটি

* *অন্যতম সঙ্ঘ–সহাধ্যক্ষ এই প্রবীণ বিদগ্ধ সন্ন্যাসী গত ২০২১–এর মার্চে ব্রহ্মলীন হয়েছেন।*

পরবর্তিকালে বিলেতের রয়েল কলেজ থেকে পাশ করে প্রখ্যাত ডাক্তার হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম এমন শত-সহস্র ছাত্রকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দিয়ে, মানুষের সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মোচিত করে দিয়েছে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে যে ৩৭টি অনাথ বালককে নিয়ে রহড়া বালকাশ্রম তার যাত্রা শুরু করে, ডাঃ বিষ্ণুপদ হালদার তাঁদেরই একজন।

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১ নভেম্বর ঘাটশিলার বাড়িতে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকান্তরিত হন। পুত্র তারাদাসের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত বিভূতিভূষণের সহধর্মিণী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় বারাকপুরে বাড়িতে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর প্রবল আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হয়ে পুত্র তারাদাসকে রহড়া বালকাশ্রমে ভর্তি করে দেন। পরবর্তীকালে উচ্চ-শিক্ষিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশিষ্ট আধিকারিক হয়েছিলেন তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও তাঁর সাহিত্য-কীর্তি সর্বজনবিদিত। রহড়া বালকাশ্রমের এমন অনেক ছাত্র জীবনের পাদপ্রদীপের আলোয় দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছেন। সেই আলো শুধুমাত্র তাঁদের ব্যক্তিজীবনকে ঔজ্জ্বল্য দেয়নি, একই সঙ্গে তা শিক্ষা ও সেবার আদর্শকে সমুজ্জ্বল করেছে।

স্বামী পুণ্যানন্দজী

নানা সামাজিক, আর্থিক, এমনকী রাজনৈতিক আঘাতকে অতিক্রম করে রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম তার অভিযাত্রাকে অব্যাহত রেখে অগ্রসর হয়ে চলেছে। ৭৫ বৎসরে পদার্পণ করে তা বয়সের ভারে ন্যুব্জ নয়। পরন্তু স্বপ্ন-দিশারী রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম প্রাণময়তা, চলমানতায় আগামী-অগ্রগামী।

বর্তমানে প্রায় ৬০০ অনাথ বালক এই আশ্রমে শিক্ষা তথা স্বনির্ভরতা লাভ করে। আর্থিক অনগ্রসরতা তাদের জীবনে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি, কারণ রহড়া আশ্রম নিরন্তর তাদের পাশে দাঁড়িয়ে, তাদের সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে। বালকাশ্রমের ছাত্ররা বুদ্ধিমান, কঠোর পরিশ্রমী এবং জীবন-সচেতন। উপযুক্ত সহযোগিতা লাভ করে এইসব ছাত্ররা প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে, যা ভারতবর্ষকে মানবসম্পদে ধনী করবে। রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের আশ্রমিকবৃন্দ সেই মহৎ কাজে নিজেদের ব্রতী করেছেন।

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া যে শিক্ষানীতি অনুসরণ করে তার মৌল প্রেরণা ও আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বাণী ভারতের যুবশক্তিকে ত্যাগ, বীর্যে, শৌর্যে উদ্বুদ্ধ করে এসেছে। আজকের অবক্ষয়ী সমাজে সে বাণীর মূল্য অধিকতর সত্যতায় অনুভূত হচ্ছে। দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, জনসেবা ও মহত্ত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়া সেই বাণীর মূলমন্ত্র।

রহড়া বালকাশ্রমে নানা শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ড সাধিত হয়। একটি ডিগ্রি কলেজ, একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, জুনিয়ার হাইস্কুল, জুনিয়ার বেসিক স্কুল, একটি নন-ফরম্যাল জুনিয়ার স্কুল, নৈশ বিদ্যালয়, একটি আবাসিক কলেজ অব এডুকেশন, প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেন্টার ও উচ্চমাধ্যমিক ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, ছাত্রাবাস পরিচালনাসহ বহু কল্যাণমূলক কর্মের আয়োজন বালকাশ্রমে রয়েছে। কয়েক হাজার ছাত্র এই উন্নত শিক্ষা-পরিষেবা নিয়মিত লাভ করে থাকে। এছাড়া গ্রন্থাগার, ডিস্পেনসারি, গ্রাম পুনর্গঠন, গদাধর অভ্যুদয় প্রকল্প, ত্রাণকার্য প্রভৃতি নানা জনকল্যাণমূলক কর্মের বিপুল ব্যবস্থাপনা এখানে রয়েছে। বালকাশ্রমে অনুষ্ঠিত নানা আধ্যাত্মিক কর্মসূচীও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া-র শ্রীবৃদ্ধির পশ্চাতে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের আশীর্বাদ। আর বহু সন্ন্যাসী, শিক্ষক, কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীর নিরলস পরিশ্রম ও সাধনা এবং ঐকান্তিক প্রার্থনা। এই আশ্রম তার অতীতের আদর্শ ও ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে আরো অগ্রসর হোক ও মানুষের কল্যাণ সাধন করুক এই প্রার্থনা।*

** ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯, রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়ার প্লাটিনাম জুবিলীতে প্রদত্ত ভাষণের সুনির্বাচিত অংশ।*

সাধনা

কর্মযোগের অন্তরায় ও তার সমাধান

স্বামী শিবময়ানন্দ *

আমরা সকলেই আমাদের গুরু নির্দিষ্ট পথ পেয়েছি। What are the obstacles in your spiritual path—we all individually, each one of you know, who have normal thinking. যা হোক, We shall be talking about generalities. তোমাদের কি মনে হয়? আমাদের আধ্যাত্মিক পথে বাধাটা কি?

তোমরা বলতে পার, পরিবেশের প্রভাব আমাদের মনের মধ্যে পড়ছে, মনটাকে টেনে রাখতে চাইলেও মাঝে মাঝে পরিবেশ মনটাকে টেনে বাইরে নিয়ে আসছে, অথবা সাধন-ভজনটা খুব কম হচ্ছে।

সমাজের মধ্যে যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে, তাতে আমাদের মনটা বাইরের দিকে টানছে। কাজেই আমাদের goal-এর পথে, লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার গতিটা শিথিল করে দিচ্ছে, গতিটা মন্দীভূত করে দিচ্ছে। Our striving towards spiritual goal is being retarded by the external glamour of present day life.

এছাড়া প্রশ্ন ওঠে, If we read of the first direct disciples, they were all insisting on the spiritual life mainly. Not about the other external comfort and other things.

বাইরের যে সমস্ত চাকচিক্য, glamour in outside circumstances, you say that is responsible for আমাদের spiritual সে endeavour-টা মন্দীভূত হয়েছে তার জন্য। কিন্তু আমাদের striving-টায় যদি সেরকম জোর থাকত, তাহলে externalities-টা যেমনই হোক আমাদের আটকাতে পারত না, পিছিয়ে রাখতে পারত না। প্রত্যেকে আমরা নিজের দিকে চেয়েই তো বলি। আমি অন্যের চিন্তা পাবো কি করে! আমি আমার যা সমস্যা সেটার দিকে চেয়েই বলবো তো। আমার যেটা মনে হচ্ছে—the main obstacle is the zeal, somehow we have lost the zeal or we are losing. Not that each one of you have lost, but some of us have lost the zeal. মানে আমাদের আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য যে জোর নিয়ে আমরা বেরিয়ে এসেছিলাম বাড়ি থেকে, যে আমরা সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভগবানকে ডাকব, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করব বা ঈশ্বরলাভ করব—এই যে জোরটা ছিল, সেই জোরটা শিথিল হচ্ছে, সেই শিথিল হওয়ার কারণটা কি—সেটা আমরা পরে বিচার করব। কিন্তু main obstacle হচ্ছে যে zeal-টা আমাদের আছে, সেই জোরটা কমেছে। আমরা বাড়ি থেকে বেরোবার সময় একটা resolution নিয়ে বেরিয়েছি, যে কোনও ভাবেই, যেরকমভাবেই হোক। Resolution নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি যে, আমরা ঈশ্বরলাভ করব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করব বা শ্রীরামকৃষ্ণের পথে সঙ্ঘের জীবনশৈলী অনুসরণ করে। মোট কথা ঈশ্বরলাভ করব যে কোনোভাবেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করব, আমরা ধ্যান-রাজযোগের লক্ষ্য চিত্তবৃত্তিনিরোধ করে মুক্ত হয়ে যাব। এই চিন্তা নিয়ে আমরা এসেছি বাড়ি থেকে। সেটা আমাদের যে রকম উৎসাহ নিয়ে অগ্রসর হওয়ার কথা, সেই উৎসাহটাতে একটা ভাঁটা পড়েছে। যদি ভাঁটা পড়ে থাকে, যার যার ভাঁটা পড়েছে, যারা যারা এগিয়ে যাচ্ছে না—সেখানে আমরা সেটা বিশেষ করে বলেছি। কাজেই with this resolution we left our hearth and home, resolution has become bit weak. যাদের আমরা পিছিয়ে যাচ্ছে বলছি, তাদের resolution has become weak. অথবা ঐ zeal-টা, সেই উৎসাহটা—সেটা আমাদের একটু কমেছে। এখন বলি কেন সেটা হয়েছে। আমি যদি বলি, সেটা হওয়ার কারণ বাইরের যে চাকচিক্য সেটা প্রবল হয়েছে, কিন্তু সেটাই তো প্রথমে নয়। তুমি যখন প্রথম এসে যোগ দিয়েছিলে, when we came here and we were striving to reach the goal, striving in this spiritual path তখন what happened? Possibly we did not get that spiritual delight. যে spiritual delight-টা, যাকে বলে আধ্যাত্মিক রস, যেটুকু পাওয়ার কথা সেই রসটুকু আমরা পাইনি বা যেই পরিমাণ পাওয়ার কথা ছিল সেই পরিমাণ পাইনি। তার ফলে

* *অন্যতম সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ এই প্রবীণ প্রাজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্রহ্মলীন সন্ন্যাসী 'Simple living'-এর মূর্ত বিগ্রহ।*

হয়েছে কি—we have gravitated towards our normal life. আমরা সাধারণত gravitate করছিলাম কোন দিকে? towards world—জগতের দিকে। জগতের দিকে মানে কি? সোজাসুজি আমরা বলছি জগতের দিকে আমরা তো যাই না। আমরা কাম-কাঞ্চন ত্যাগ করেছি। কিন্তু সেটা subtle form-এ may enter into our life. In what subtle form will it enter? প্রথমে দেখবে যে আমরা সেই আধ্যাত্মিক রসটা যখন পাইনি, আমরা সাধন-ভজন চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা সাধন-ভজন ছেড়ে দিয়ে যে করছি তা নয়। তবে সাধন-ভজনের মধ্যে সেটা একটু প্রাণহীন হচ্ছে, খানিকটা mechanical হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে আছে—'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।' অর্থাৎ সেই মন্ত্র বলে যাচ্ছি, সেই ডাকছি বটে—কিন্তু সেই জায়গায় প্রাণের যোগটা থাকছে না। এই হচ্ছে কারণটা। প্রাণের যোগ থাকছে না যখন, তখন আমরা কি করছি? আমরা সাধারণত করি কি? আমরা সাধারণ কাজকর্ম করি। আমাদের জীবনের মধ্যে কাজকর্ম সবই আছে লক্ষ্য করে দেখবে। আমাদের কাজকর্ম বাঁধা আছে। সকালে উঠে, সন্ধ্যেবেলায় ভগবানের নাম করি, ভজন করি—সেগুলো আছে। আর তাছাড়া অধিকাংশ সময় আমরা কাজ করি। আমরা বলি, কাজকর্ম যখন আমরা করি তখন তা বন্ধন সৃষ্টি করে। কারণ কর্ম যখন আমরা ফল পাওয়ার জন্য করি, তখন তা আমাদের সুখ এবং দুঃখ সৃষ্টি করে। কর্মফল সুখ এবং দুঃখ সৃষ্টি করে তো? সেইটা যাতে না করে সেজন্য আমরা বলি ফলটা দেব আমাদের ভগবানকে। ইষ্টদেবকে আমাদের কর্মের ফলটা দেব। ইষ্টদেবকে আমরা ফলটা দেওয়ার জন্য বলি, বিশেষ করে এই যে কাজকর্মরূপ পূজার শেষে যেমন আমরা বলি শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু। এইটে আমরা বলি বটে! কিন্তু মুখে যত বলি কাজে তত করা খুব সহজ নয়তো! আমি কাজটা করছি—কাজটাকে যখন করে যাচ্ছি হাততালি পাবো। কারণ আমাদের সাধুরা যখন কাজ করে তারা whole timers and more or less তাদের তো অন্য কোনও distraction নেই। কাজেই quality of work compared to outsiders is better. So often you get success and you get importance, you get clapping. So, that has drawn us. You are at the centre of your working field. Centre of importance মানে যেখানে তুমি কাজ করছ, সেখানে you have some importance—because you are a wholetimer, because you work well, because you work honestly. So you get some clapping and appreciation from outsiders. এই যে appreciation পেতে আরম্ভ করছ, প্রশংসা পাচ্ছ—প্রশংসার মনোভাব আছে তো? —মহারাজ আসছেন, মহারাজ আছেন—বলতে বলতেই you get importance—এইখানেই আমাদের খানিকটা pull চলে যায়। তার remedy হচ্ছে কি? এটা অবশ্যই আমরা বলি—যে কাজ আমরা করব, যেহেতু আমরা এই কাজটা ইষ্টদেবকে দেব—কাজটা যত ভালো করে পারি, তত ভালো করে করব। এইটা আমরা বলি। To the best of our ability, we try to perform our work. কেননা, এটা যদি আমার ইষ্টদেবকে দিতে হয় তাহলে এটা তো খুব খারাপ করে করলে চলবে না, সেইটে মাথায় থাকবে। কিন্তু এইটা করা কঠিন। তোমরা কথামৃতের মধ্যেও দেখবে, নিজেরা পড়তে গিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতাও দেখবে যে আমরা বলি বটে আমরা ঠাকুরের কাজ করছি, কিন্তু দেখি আসলে আমাদের কাজ করছি। ঠাকুরের কাজ করছি মুখে বলি কিন্তু কাজ হয়ে যায় আমাদের। কেন আমাদের হয়ে যায়? যেই তোমাদের হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফল পাবে। কারণ ঠাকুরের কথাটা বিশেষ করে মনে আসে না। এইটের জন্য কি করবে তুমি? এইটার remedy হচ্ছে খুব ভালো করে প্রার্থনা করা। ঠাকুরের প্রতি তোমাদের টান আছে, প্রথমে তোমরা ঠাকুরের আকর্ষণে এসেছ এবং ঠাকুরও তোমাদের টেনেছেন। কাজেই তাঁর কাছে তোমরা যদি খুব প্রার্থনা কর, if we are very much prayerful and we sincerely pray—'ঠাকুর! আমরা দেখছি, আমরা

প্রার্থনারত সাধু

বলছি বটে যে তোমার কাজ করছি, কিন্তু আসলে আমার কাজ হয়ে যায়। এই কাজটা যেন না হয়'—এই কথাটা বুঝে যদি sincerely ঠাকুরকে প্রার্থনা কর—ঠাকুর শুনবেন। এই কথাটা আমাদের সবাই বলে যে—তুমি যখন আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করবে যে, আমি বলছি বটে যে তোমার কাজ করছি কিন্তু আমার কাজ হয়ে যাচ্ছে। যাতে **আমার কাজ না হয়ে তোমারই কাজ হয়**—এই prayer তোমাদের মধ্যে থাকতে হবে। এই কথাটা বিশেষ করে আমার মনে হচ্ছে। কর্মযোগের যে রহস্য সে কি তোমরা জানো না? সে তো আমরা সকলেই জানি। কর্মযোগের রহস্য হচ্ছে ঃ কর্ম একটা করা যায়—যা সাধারণভাবে আমরা করি। কর্মযোগ করার একটা উপায় হচ্ছে, ঈশ্বরকে আশ্রয় করে করা।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-৩।৯)

ভজনানন্দ স্বামী বলেন—এই দুনিয়াতে বৃহত্তর উদ্দেশ্যে যদি তুমি তোমার সেবা দাও—that is যজ্ঞ। বৃহত্তম জিনিস বলতে বুঝি ভগবান। স্বামীজী ভগবান বুদ্ধকে লক্ষ্য করে বলেছেন—'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়'। একটা higher goal-কে higher ideal করে নিলেন বহুর সুখের জন্য। মনে কর একটা শ্রমিক সে কাজ করছে, সে এই attitude-টা আনতে পারে—আমি যে এই অংশটার কাজ করছি—it will serve so many people in the society. This portion of my work will go to serve so many people in the society. So I am serving the society. এই যে বহুজনহিতায় যখন মনে হলো, কাজেই I shall do my work to the best of my ability. —এইটা যখন ভাবল It will become perfect. Whether he believes in God or not, higher একটা ideal—এই যে যজ্ঞার্থাৎ হলো কিনা! ভজনানন্দ স্বামী বলেন যে—দেখ আমরা সারা দুনিয়া থেকে কি নিচ্ছি? ছেলেবেলা থেকে তুমি মায়ের দুধ খাচ্ছ, আকাশের থেকে তুমি নিঃশ্বাস নিচ্ছ, জল খাচ্ছ, আলো নিচ্ছ, বাতাস নিচ্ছ—এগুলো সব বিনা পয়সায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি কত লোকের service পেয়ে আজ এই পর্যায়ে এসেছ। How many people have served you? তোমার মা, বাবা, ভাই, বোন, শিক্ষক ... আরও কত লোক তোমাকে serve করে they have brought you to the present state. কাজেই is it not your duty to return in equal measure? ঠিক এরকম একটা কথা বোধহয় তোমরা আইনস্টাইনের কথার মধ্যে পাবে—you must return it in equal measure. এটাকে ঐ সামাজিক দিক থেকে চিন্তা কর। আর আমরা বলি—ভগবান সবকিছুর মধ্যে, সকলের মধ্যে আছে, কাজেই আমরা ভগবানের উদ্দেশে কাজ করব। ভগবানের উদ্দেশে যখন তুমি কাজ করবে কাজটা তোমার best of the ability হবে। কিন্তু যেহেতু আমরা, we gravitate towards our original habit, সেইজন্য ভগবানের কাছে খুব প্রার্থনা করতে হবে। প্রার্থনাপর হয়ে যদি আমরা না করি তবে তো আমাদের কাজটা কর্মযোগ হবে না, কর্মভোগ হবে। যদি তুমি কর্মযোগ করতে পার, যে portion-টা তুমি কর্মযোগ করতে পারলে that portion of your chitta (চিত্ত) become suddha (শুদ্ধ)—চিত্তশুদ্ধি হবে তো! চিত্তশুদ্ধি একটু একটু করে হয়। প্রভু মহারাজ (বীরেশ্বরানন্দজী) খুব চমৎকার করে বলেছেন—যেহেতু you cannot think of God while working, work requires your entire attention. কিন্তু work করার আগের থেকে তুমি ভেবে নাও this work actually is of God. ঠাকুরের এই সংসারের মধ্যে এসেছি। কাজেই think of God first and after the work is over, think of God. Between these thoughts of God sandwich the work. এই idea-টা মহারাজের ছিল। কাজেই মাঝে মাঝে ভগবানকে চিন্তা করে ঐ চিন্তাগুলোকে sandwich করা মানে, ভগবানকে যখন বেশি করে চিন্তা করতে থাকবে তখন এই sandwiching-টা প্রতি মুহূর্তে হবে। তুমি মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করবে না, তুমি কাজটারই ১৬ আনা (ষোলো আনা) চিন্তা করবে। কিন্তু আগে যদি বুঝে নাও this work belongs to God

স্বামী ভজনানন্দজী

তাহলে এটা তোমার ভুল হবে না। শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। You must pray, you must pray sincerely with your heart and soul. সেখানে কেঁদে চোখের জলে প্রার্থনা করতে হবে। Your prayer should be sincere, you must try hard. সমস্ত sincerely করতে হবে। আচ্ছা, মনে কর কেউ publication department-এ কাজ করছে, কেউ হয়তো হসপিটালে কাজ করছে, ডিস্পেনসারিতে কাজ করছে—এই সব নানান কাজের ক্ষেত্রে—of course there are fixed time. When you do not have sufficient time for your meditation or your spiritual life, spiritual life মানে বলছি spiritual life in the prayer hall or in the shrine—সেটা হয় না। তোমার spiritual life তখন—it is more in the field হয়ে যায়। কিন্তু you must compensate, try to compensate when you get time. স্বামীজী বলেছেন—

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।'

You are serving from the very beginning, you are seeing nothing but it is only God everywhere. স্বামীজীরও উপলব্ধি হয়েছিল। ঠাকুর স্বামীজীকে বলেছিলেন ঘটিটা ঈশ্বর, বাটিটা ঈশ্বর। He touched and he found that everything was simply through and through permeated with God. স্বামীজীর এই অবস্থা তিন চার মাস চলেছিল। তারপর থেকে he could not deny Advaita (অদ্বৈত)। এটাকে যদি তোমরা ভালো করে ভেবে দেখ, you have some idea of Swagatabheda (স্বগতভেদ), তোমরা দেখতে পাচ্ছ সব জায়গায় শুদ্ধচৈতন্য রয়েছে। এই যে সামনের মানুষগুলোকে যদি শুদ্ধচৈতন্য দেখতে পাই। স্বামীজী ওখানে দেখছেন—A vehicle is coming with speed, but he is not afraid. He was seeing that the carriage was full of শুদ্ধচৈতন্য and he was also full of শুদ্ধচৈতন্য। He was not at all afraid when he was passing through a road. He was eating also, তিনি খাচ্ছেন যখন ভাত-টাত কিছু দেখতে পাচ্ছেন না—শুদ্ধচৈতন্যই আছে। একটি মহিলা, বলছি বটে, চেহারাটা মহিলা—কিন্তু শুদ্ধচৈতন্যে ভরপুর। তিনি খাবার দিচ্ছেন—শুদ্ধচৈতন্য আর শুদ্ধচৈতন্য খাচ্ছে। একটা শ্লোক আছে, মজার কথা—একটা লোক কুকুরের উপরে বসে খাচ্ছে, তা সেই দেখে আরেকটা লোক হাসছে। তখন সেই প্রথম লোকটা বলছে ঃ

বিষ্ণূপরি স্থিত বিষ্ণুঃ,
বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে
কথং হসসি রে বিষ্ণু
বিষ্ণুঃ সর্বময়ং জগৎ ।।

কুকুরের উপরে বসে সে কুকুরটাকেই বিষ্ণু মনে করছে। বাস্তবিক সেটাই তো আসল দৃষ্টি। যে কলাটা খাচ্ছে সেটাও বিষ্ণু আর যে হাসছে সেও বিষ্ণু ... বিষ্ণুঃ সর্বময়ং জগৎ। এই দৃষ্টিটা তো আমাদের হচ্ছে না। এটা যদি আমরা করতে চাই—তার জন্য আমাদের প্রার্থনাপর হতে হয়। ঠাকুরের কথামৃতের মধ্যেই আছে—you cover your eyes while meditating, you find your *Ishta* here, whenever you open your eyes God vanishes? Is it fact? তখন God সর্বত্র হয়ে যান। চোখ খুললে কি তিনি নেই আর চোখ বুজলে তিনি আছেন? ঠাকুর বলতেন—আমি ... ছাড়া কাউকে দেখি না। ঐ লেটো মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে—তিনিই বসে আছেন। That is the ultimate reality you are striving for that reality. First you see your reality here and the same type you have been told by your Guru. স্বামীজী বলে দিচ্ছেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগত্।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ।।

These are statements by better persons, not like me and you. They have seen it. কাজেই সেটা যদি আমরা দেখতে না পারি that is our weakness. If I can not see, that is my weakness, that is owing to my ignorance. But those who are perfect beings, they feel that God is everywhere, God is immanent, and God is transcendental also. আমরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে দেখব বটে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের মধ্যেটা যখন শান্ত হবে। তখন বাইরে really we shall start, now we have listened, that is our indirect knowledge. We have heard it from the scriptures, from our seniors, from our Gurus. Book knowledge মানেই হচ্ছে scriptures. That will become real. Today's imagination will be tomorrow's realisation. এখানে তুমি দেখতে পাবে,

gradually your mind will become calm and quiet and you will see the bottom. The water in your mind will become pure and you will see the buttom clearly, like Harkipouri (হর কী পৌড়ী)-র জল। Sometimes heavy pressure of work etc. takes us and we do not get that time. মনে কর আয়লা হলো, বা কোথাও বন্যা হলো এবং you are sent for the relief work. সেখানে you do not get time, এমনকী তোমরা খাওয়া দাওয়ার সময়ও পাও না। সেখানে তোমাদের কিছু compensate করতে হবে। Unless you compensate for this loss of your inner life, you must have to see God here first—সেটা time দিয়ে তোমায় compensate করতে হবে। You must think again and again that what you are striving for, is the costliest thing in this universe. তোমরা সবচেয়ে দামি জিনিসটার জন্য চেষ্টা করছ—এটা তো তোমরা বুঝতে পারছ। এটা আমাদের কারোর কোনও সন্দেহ নেই। You are trying for the costliest thing. গীতার সপ্তম অধ্যায়ের মধ্যে আছে—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।

(গীতা-৭।৩)

Among thousands, one will really strive. কাজেই thousands যারা, not one thousand—thousands—এর মধ্যে one is striving sincerely for reaching the Goal. Those who are striving sincerely, among these thousands, one will reach the Goal. কাজেই thousand into thousand, তার পরেও plural চলতে থাকবে। So this is a very, very costliest thing. গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে শ্লোক আছে, যেটা বলে it is a costliest thing—

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।।
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।

(গীতা-৬।২২-৩)

এর অর্থ হলো—যং লব্ধ্বা অর্থাৎ attaining which, যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ—when you achieve this, then there is nothing greater than this. You will not feel that there is anything greater than that and when you attain to that, no amount of dukhha (দুঃখ), however great, will touch you. The next phase is—তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্—you will not have any contact with dukkha (দুঃখ)—that is called Yoga. That Yoga—you must strive to become অনির্বিণ্ণচেতসা, without any despair—এইটা বলেছে। জ্ঞানযোগের সেই গল্পটা তোমরা শুনেছ : একজন অনেকদিন ধরে তপস্যা করছিল। নারদ যাচ্ছিলেন সেখান দিয়ে। আরেকটা লোক তেঁতুল গাছতলায় ছিল, সে নাচছিল। He was dancing and singing. সে জিজ্ঞাসা করল—'নারদ-ঠাকুর কোথায় যাচ্ছ?' নারদ উত্তর দিলেন, 'আমি যাচ্ছি বৈকুণ্ঠে'। সে বলল—'জিজ্ঞাসা করে আসবেন—আমার কতদিন পর মুক্তি হবে?' সেই লোকটা যার তপস্যা করে করে গায়ে বল্মীক বা উই-এর ঢিবি হয়ে গেছে, তাকে গিয়ে নারদ বললেন, আরও তিন জন্ম লাগবে। লোকটা প্রচণ্ড হতাশ হয়ে গেল—'আরো তিন জন্ম।!' আর এই লোকটাকে বলেছে তেঁতুল গাছে যতগুলো পাতা আছে, ততগুলো জন্ম তোমার লাগবে। ও তো আনন্দে আটখানা, he started dancing all the more. Because he is thinking that I shall require the limited number of birth. এই গল্পে যেটা emphasis হচ্ছে সেটা হলো, this man was ready to struggle for all these years, all these lives (তেঁতুলগাছের পাতাগুলির সমসংখ্যক). So immediately God manifested there and said—'my boy! you are liberated here and now.' কেন না ঐ লোকটা অত তপস্যা করার জন্য ready, কাজেই সে তপস্যার ফল তো তখনই পেয়ে গেল। সে আনন্দে নাচছে, তাই ভগবান প্রসন্ন। So you must have immense patience, immense perseverance—কারণ you are trying for the costliest thing. রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আছে, তাতে গল্প আছে—ভক্তমালের গল্প। Sanatan, one of the six disciples, great Goswamies of our Srichaitanya. Sanatan was there and meditating and counting and doing Japa.

'নদীতীরে বৃন্দাবন সনাতন একমনে
জপিছেন নাম'

Then a Brahmin from Bardhaman went there. He had a dream, vision—কাশীতে বিশ্বনাথ বলে দিয়েছেন—

'যাও যমুনার তীর		সনাতন গোস্বামীর
ধরো দুটি পায়।
তাঁরে পিতা বলি মেনো	তাঁরি কাছে আছে জেনো
ধনের উপায়।'

সনাতনের কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণ এই কথা বলায় সনাতন ভাবছে, তার কাছে কী-ই বা আছে, সবই তো ফেলে দিয়ে এসেছেন। যদিও সনাতন মন্ত্রী ছিলেন—'সহসা বিস্মৃতি ছুটে'—all of a sudden he remembered that he had one touchstone, a philosopher's stone (পরশমণি)। He had found a philosopher's stone and kept it there if somebody needs it. সে নদীর মধ্যে পাথরটি পুঁতে রেখেছিল। কবিতায় আছে—

সহসা বিস্মৃতি ছুটে		সাধু ফুকারিয়া উঠে,
ঠিক বটে ঠিক।
একদিন নদীতটে		কুড়ায়ে পেয়েছি বটে
পরশমাণিক।
যদি কভু লাগে দানে*	সেই ভেবে এইখানে
পুঁতেছি বালুতে—
নিয়ে যাও হে ঠাকুর		দুঃখ তব হবে দূর
ছুঁতে নাহি ছুঁতে।

ব্রাহ্মণ সেখানে গেল, easily he got that. তার লোহার যে মাদুলিটি ছিল সেটি সোনা হয়ে গেল—পাথরটি ছোঁয়াতে। We all Indians have this kind of thought, others have not ... সঙ্গে সঙ্গে he then started thinking. His thoughts went to another direction. সেটা নিয়ে (পাথরটা) সে দৌড়ে পালিয়ে গেল না। Have taking the philosopher's stone in his hand he started thinking ... ঐ thinking-এর ফলটা কী হলো? This Brahmin went to Sanatan in the evening, fell at his feet and told—'যে ধনে হইয়া ধনী/মণিরে মান না মণি', you are ignoring this very, immensely, costly philosopher's stone. How? Possibly you must have something greater value with you. অর্থাৎ he did not consider the (মণি) Moni at all valuable, ভুলেই গেছে যে কোথায় ফেলেছে। তারপর মনে হয়েছে। Why? Because he had got something much more valuable. That valuable thing—you are trying to achieve. কাজেই তোমাদের তো সেটার জন্য পরিশ্রম করতে হবে, দাম দিতে হবে। If you strive for the costliest thing, you must be ready to pay the price. তা থাকতে হবে না? এই যে এটা কষ্টকর বলে মনে হচ্ছে, আমরা একটু চেষ্টা করে পাইনি বলে অন্যদিকে gravitate করে যাচ্ছি অন্যদিকে, জগতের দিকে—তা তো চলবে না। Again and again gravitate করে যাবে, কিন্তু again you shall stand up and again you shall try. কিছুতেই এটা ছাড়া চলবে না। এইটে হলেই আমাদের হবে। সেইটের নাম হচ্ছে patience, perseverance—ধরে থাকবে এবং একজন আরেকজনকে দেখে সেটা চেষ্টা করবে। তাহলে কর্মযোগের মধ্যে, obstacles you find in Karmayoga, that is, you cannot work for only God, it becomes our own work. So you think of God again and again. Do it as best as you can. But offer and go on praying. This will become your habit. Swami Bhuteshanandaji used to say, initially suppose a man has started with Karmayoga. His Karmayoga will be the Karmayoga of class-1. And one who has been trying for this Karmayoga for 15 years—his Karmayoga will be Karmayoga of class-10. So there will be differences in Karmayoga. He will be able to do it much more better. But this person has only started. কাজেই এইগুলো কর্মযোগের মধ্যে। আমরা যেকোনো যোগেই যাই, it will be better and better. Ultimately when your mind will become completely purified then your Karmayoga is performed. Through Karmayoga you become pure, your mind, intellect becomes completely free, pure.

কর্মযোগ করতে করতে আমাদের কর্মের গুণগত মান উন্নত হবে। এই গুণগত মানোন্নয়নে কর্মের মধ্যে শুদ্ধতা বা পবিত্রতা প্রবেশ করবে। ঐ শুদ্ধ ও পবিত্র কর্ম আমাদের অন্তঃকরণকে পবিত্র করবে। যত বেশি কর্মযোগ-এর প্রতি আমাদের প্রবৃত্তি আসবে, আমরা ধীরে ধীরে ভগবানের দিকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হব। আমাদের জীবন সার্থক হবে।**

[যদি কভু লাগে দানে—দানে অর্থাৎ donation, if some one needs it]*

*** বেলুড় মঠে অপেক্ষাকৃত তরুণ সন্ন্যাসিবৃন্দের বিশেষ প্রশিক্ষণে পূজনীয় মহারাজের আলোচনার রেকর্ডিং-এর লিখিতরূপ।*

ভাবরাজ্য

পরিবেশ সচেতনতা ও প্রাকৃতিক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি

স্বামী ভজনানন্দ *

ভারতবর্ষের প্রধান বিচারালয় (Supreme Court of India) ১৯৯১ সালের ২২ নভেম্বর, এক যুগান্তকারী রায় দান করেছেন। এটিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের আবশ্যিক পাঠ্যবিষয় হিসাবে যেন পরিবেশ বিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিবেশ বিদ্যার উদ্দেশ্য দুই প্রকার—(ক) প্রাকৃতিক সম্পদ ও সংস্থানগুলি এবং জীববৈচিত্রের সুরক্ষা; এবং (খ) বায়ু, জল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদকে দূষণমুক্তকরণ।

পরিবেশ বিদ্যার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো ছাত্রদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং জনসাধারণকে পরিবেশের সঙ্গে একটি সুস্থ ও সুদৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার শিক্ষা দেওয়া। মানবসমাজ কেবলমাত্র খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতির জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে না—প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ দ্রব্যাদি যেমন পাথর, মৃত্তিকা, কাঠ প্রভৃতির জন্যও মানুষ প্রকৃতির দ্বারস্থ হয়। প্রকৃতির ওপর এই নির্ভরতা কীভাবে বজায় রাখা যায় এবং কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে মানবপ্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়—সম্ভবত সেই ব্যাপারেই পরিবেশ বিদ্যা শিক্ষা দান করে।

'ভারসাম্য-সমন্বিত উন্নয়ন' (Sustainable development) কথাটি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। এই শব্দটির অর্থ কি? এটির অর্থ প্রাকৃতিক সম্পদকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ না করে, দীর্ঘকাল ধরে কীভাবে মানবপ্রয়োজনে কাজে লাগানো যায়। প্রাকৃতিক সম্পদকে এইভাবে কাজে লাগানোর ধারণাটি খ্রিস্ট-ইহুদী ভাবনা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ইহুদী-খ্রিস্টানদের বাইবেলের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে—সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করবার পর ভগবান মানুষকে সকল সৃষ্টবস্তুর উপর 'একাধিপত্য' দান করেছিলেন, অর্থাৎ মানবসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সাধনের জন্যই প্রাকৃতিক বস্তুর সৃষ্টি।

ইহুদী-খ্রিস্ট ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়, এই ভাবনাটি ভারতীয় (হিন্দু) **'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'** অর্থাৎ সর্বভূতে (চেতন ও অচেতন পদার্থে) ঈশ্বর বিরাজমান—ধারণাটিকে সমর্থন করে। বৈদিক ঋষিগণ সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন এই মন্ত্রোচ্চারণ করে—**'নমো ব্রহ্মণে, নমো অস্ত্বগ্নয়ে, নমঃ পৃথিব্যৈ, নমঃ ওষধীভ্যঃ। নমো বাচে, নমো বাচস্পতয়ে, নমো বিষ্ণবে, বৃহতে করোমি।'** অর্থাৎ—ব্রহ্মকে নমস্কার, অগ্নিতে অবস্থিত ভগবানকে নমস্কার, পৃথিবীকে নমস্কার, সকল বৃক্ষ-লতাদিকে নমস্কার। বাক্‌কে নমস্কার, বাগ্‌দেবতাকে নমস্কার, সর্বভূতান্তরাত্মাকে নমস্কার, আমার মধ্যে সর্বদা জাগ্রত দিব্যচেতনাকে নমস্কার।

প্রাচীন ভারতের ঋষিরা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে 'ভগবান' বা ঈশ্বর বলে মানতেন। এইভাবে মিত্রকে বলা হয় সূর্য-দেবতা এবং বরুণকে বলা হয় বৃষ্টি-দেবতা, বায়ুকে বলা হয় পবন-দেবতা, প্রভৃতি। প্রাচীন মুনিগণ আরও জানতেন যে, এই সকল দেবতাগণই ছিলেন সেই পরব্রহ্ম তথা পরমাত্মার বৈচিত্রময় প্রকাশ। এই ধারণাটিকে বেদে উল্লিখিত হয়েছে—**'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'**। —সত্য একই, মুনিগণ নানান নামে ডেকে থাকেন। (ঋক্‌ বেদে বিবেকানন্দ কথিত অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে।)

পরিবেশ সচেতনতা নানান প্রকারের হয়ে থাকে। বাস্তুবিজ্ঞানী এবং পরিবেশবিজ্ঞানীরা পরিবেশ সংরক্ষণার্থে যথেষ্ট আগ্রহী, বিশেষত বনসম্পদ রক্ষণে প্রযত্নশীল।

বনসম্পদকে ধ্বংস করে যথেচ্ছভাবে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য বন্যা তথা প্লাবনের সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে হিমালয়ে বাসিন্দাদের রুজিরোজগারে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭০-এর দশকে চণ্ডীপ্রসাদ ভাট, বহুগুণা এবং অন্যান্য সমাজ-সচেতন রাজনৈতিক নেতাগণ 'চিপ্‌কো' (Chipco) আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান উত্তরাখণ্ডের অন্তর্বর্তী ভাগীরথী উপত্যকায় অরণ্য নিধনের প্রতিরোধ করা।

পরিবেশ সচেতনতার একটি বৌদ্ধিক মাত্রাও আছে। জেমস লক-এর প্রচারিত 'গাইয়া অনুসিদ্ধান্ত' (Gaia hypothesis)-টি 'পরিবেশ নারীবাদ' তত্ত্বটিতে পর্যবসিত হয়েছে। জন পাসমোর তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থ 'প্রকৃতির প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা' (Man's Responsibility for

* *বিদগ্ধ প্রাজ্ঞ সুপণ্ডিত অতি-প্রবীণ অন্তর্মুখী সন্ন্যাসী, অন্যতম সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠে সাধনরত।*

Nature) গ্রন্থে পরিবেশ নারীবাদ তত্ত্বটি বাতিল করেছেন। তাঁর মতানুসারে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন হলো ব্যাবহারিক নৈতিকতা, (Applied Ethics)। এটি প্রকৃতিকে ভোগ্যবস্তুরূপে কাজে লাগানোরূপ ইহুদী–খ্রিস্টান ভাবনার ওপরে ভিত্তি করে সৃষ্ট। নরওয়ের বাসিন্দা আর্নি ন্যাস প্রস্তাবিত গভীর বাস্তুবিদ্যা (Deep Ecology) পরবর্তিকালে বাস্তুশাস্ত্র (ecosophy) নামে পরিচিত হয়েছিল। যেটি স্পিনোজার সর্বেশ্বরবাদ (Pantheism) এবং বৈদান্তিক জীবাত্মা তথা পরমাত্মা রূপে বিকশিত হয়েছিল।

যেহেতু পরিবেশ সচেতনতার কেবল ভৌতিক ধারণাগুলির ব্যাবহারিক প্রয়োজনীয়তা আছে বলে স্বীকার করা হয়; বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ে কেবলমাত্র পরিবেশ সচেতনতার ভৌতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ সচেতনতার একটি বোধাতীত (আধ্যাত্মিক) রহস্যবাদ দৃষ্টিভঙ্গিও আছে। এটিকে বলা হয় প্রাকৃতিক অতীন্দ্রিয়বাদ (Nature mysticism)। রিচার্ড জেফারিস, ডাব্লু এইচ হাডসন, থোরেউ, রহস্যবাদ ডোনাল্ড কালরস পিয়াত্তি এবং আরো অনেকে এই বিষয়ে কলম ধরেছেন। তবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদী পাশ্চাত্য লেখক মহান্ ইংরাজ কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং আমেরিকান সংরক্ষণবাদী জন মুইর।

উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তকে ইংরাজী বিষয়ের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের বিখ্যাত কবিতা 'ড্যাফোডিল' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যদিও খুব কম লোকেই এই রহস্যবাদের অর্থ বুঝতে পেরেছে এবং শিক্ষা দিতে পেরেছে। শৈশবের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থই একমাত্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর রচিত পদ্যের ছন্দগুলি বারবার উচ্চারণ করা যায়।

Heaven lies about us in our infancy.
Shades of prison-house close
Upon the growing boy ...
('শৈশবে আমাদের ঘিরে থাকে স্বর্গীয় অনুভূতি
বন্ধ হতে থাকে কারাগারের দরজা,
বাড়তে থাকা শিশুটি ভেতরে থেকে যায়।')

নিজের শৈশবের স্মৃতি হাতড়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলছেন ঃ

There was a time when meadow,
grove and stream,
The earth and every common sight,
To me did seem
Apparelled in celestial light,
The glory and freshness of a dream.

('এমন একটি সময় ছিল যখন তৃণভূমি,
উপবন এবং জলপ্রবাহ,
এই পৃথিবী এবং প্রতিটি সাধারণ দৃশ্য
আমার কাছে মনে হতো
দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত
স্বপ্নের মতো তার মহিমা ও সতেজতা।')

জন মুইরের উৎসাহ এবং উন্মাদনায় বনসংরক্ষণের বিষয়টি প্রায় সকল দেশে অগ্রাধিকার পেয়ে সংরক্ষিত অরণ্য (Reserved Forest) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে দৈত্যকায় সেগুন ও লাল কাঠ (Redwood)–এর মধ্যেই বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন। যখন ঝড় ওঠে, জন মুইর তবুও এক দিব্য অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে গাছগুলিকে বাতাসের বিরুদ্ধে শক্ত করে ধরে থাকতেন। মুইর তুলনা করতেন যে জীয়াসমাইট উপত্যকা এবং পর্বতশৃঙ্গগুলি একটি গির্জা বা প্রার্থনাগৃহকে বেষ্টন করে আছে।

প্রাচ্য দেশে 'জেন' বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রাকৃতিক রহস্যবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায়। চীন প্রদেশে 'তাও'–ধর্ম ও 'মহাযান' বৌদ্ধ ধর্মের সম্মিলিত পরিণতি হলো 'জেন' চিন্তাধারা। 'জেন' ভাবনায় 'জ্ঞানালোক' কোনো মানুষের জীবনযাত্রাকে পরিবর্তন করে না; এটি কেবল তার জ্ঞান ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে দেয়। 'উপলব্ধিবান হবার আগে কাঠ কেটে জল আনয়ন করতে হতো, উপলব্ধির পরেও কাঠ কেটে জল আনয়ন করতে হয়।'

আমরা প্রাকৃতিক রহস্যবাদ বা অতীন্দ্রিয়বাদের বা ভাবরাজ্যের উচ্চতর প্রকারের নিদর্শনসমূহ উপনিষদের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাই। উদাহরণস্বরূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হচ্ছে ঃ **'পৃথিবী যেন ধ্যানমগ্ন, অন্তরিক্ষ যেন ধ্যাননিরত, দ্যুলোক যেন ধ্যানস্তিমিত, জল যেন ধ্যানস্তব্ধ, পর্বতসমূহ যেন ধ্যান–নিমগ্ন।'** (ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়ন্তীবান্তরিক্ষ; ধ্যাতীব দ্যৌঃ, ধ্যায়ন্তীব–আপো, ধ্যায়ন্তীব পর্বতো। —*ছান্দোগ্য–৭.৬.১*)

অতীন্দ্রিয় বা ভাবরাজ্যে তন্ময় হয়ে গিয়ে আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শৈশব অবস্থায়। একদিন সকালে বালক গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যাবস্থার নাম) টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের আলপথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছেন। আকাশে একখানা জলভরা কালো মেঘ উঠেছে। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে। এমন সময় একঝাঁক সাদা দুধের মতো বক ঐ কালো মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগল। এই অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্যটি বালকের হৃদয়ে এক অপূর্ব তন্ময়ত্ব সৃষ্টি করেছিল। তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য

হয়ে সমাধিস্থ হয়ে গেলেন এবং মাটির ওপর পড়ে গেলেন।

উপরোক্ত ঘটনাটি নিঃসংশয়ে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি বা ভাবরাজ্যের এক অতি উচ্চ অবস্থার জাজ্বল্য প্রমাণ। সাধারণ শিশুদের মধ্যে এই ধরনের ঘটনা লক্ষ্য করা যায় না। একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণ এই 'প্রাকৃতিক রহস্যবাদ' বা ভাবরাজ্যের বিষয়গুলি উচ্চ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিবান হবার সাধনায় প্রয়োগ করেছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ হৃষীকেশের এক সাধুর কথা উল্লেখ করেছেন—'সাধুটি খুব সকালে উঠে পড়ে একটি পাহাড়ি ঝরনার সামনে গিয়ে দাঁড়াতো। তন্ময় হয়ে একদৃষ্টে সারা দিন ধরে ঝরনার দিকে তাকিয়ে থাকত, আর ভগবানকে বলতো, ''ও ভগবান কি আশ্চর্য তোমার সৃষ্টি!'' সাধুটি আর কোনো সাধন-জপ-তপ কিছু করত না, কেবল ঐ একই কথা বারবার বলতো, আর ঝরনার দিকে তাকিয়ে থাকত। রাত্রি অর্থাৎ অন্ধকার হলে নিজের কুটিরে ফিরে আসত।' *(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, অখণ্ড, পৃঃ৭২৫)*

অন্যান্য সাধকদের মতো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেবলমাত্র জপ-ধ্যান-এর মধ্যে নিজেকে সঙ্কুচিত করেননি, বরং প্রাকৃতিক রহস্যবাদ বা ভাবরাজ্যকে ভগবদনুভূতির বা ভগবান লাভের মাইলফলক হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

অতীন্দ্রিয়বাদ বা প্রাকৃতিক রহস্যবাদ বা ভাবরাজ্যের আংশিক প্রকাশ কবি এবং সাহিত্যিকদের রচনায় দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজস্ব উপলব্ধি বর্ণনা করেছেন—'একদিন আমি ঊষার বৈচিত্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যক্ষ করছি। বৃক্ষরাজির অন্তরাল থেকে সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অকস্মাৎ আমি অনুভব করলাম এক প্রাচীন কুয়াশা যেন আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন করল—ঊষার আলো সমগ্র জগতের সম্মুখে এক অন্তর্নিহিত জ্যোতি ও আনন্দের অনুভূতিতে উদ্ভাসিত হলো। সাধারণ স্থানগুলির সকল বস্তু থেকে অদৃশ্য পর্দাটি বিদূরিত হলো, আমার মনের মধ্যে তাদের চূড়ান্ত গুরুত্ব উদ্বেলিত হলো, একেই সৌন্দর্য সংজ্ঞা দেওয়া হয়।' রবি ঠাকুরের সৌন্দর্যের এই দৃষ্টিভঙ্গি চিরকাল দীপ্যমান ছিল।

ভাবরাজ্য বা নৈসর্গিক চেতনাকে নিজের সৃষ্ট রচনার মধ্যে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন বাঙালি সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। নৈসর্গিক চেতনার সেরা প্রকাশ হলো বিভূতিবাবু রচিত 'আরণ্যক' উপন্যাসটি।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, অতীন্দ্রিয়বাদ বা ভাবরাজ্য-এর অর্থ মনের চিত্তপ্রসন্নতা বা এক শিল্পীর প্রকৃতির প্রতি সৌন্দর্য চেতনা নয়, প্রাকৃতিক রহস্যবাদ নিছক শিল্পমাত্র নয়, অথচ সত্যিকারের অর্ধ-অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যা সাধারণের মধ্যে কদাচিৎ দেখা যায়। একজন অনুভূতিবান ব্যক্তিই কেবল অতীন্দ্রিয়বাদকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করার ঝুঁকি না নিয়ে বর্তমান রচনাটির লেখক তার কিশোর বয়সের প্রাকৃতিক রহস্যবাদ বা ভাবরাজ্যের কিছু উপলব্ধির কথা বর্ণনা করছে।

'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির ঊর্ধ্বে এক নতুন চেতনার অনুভূতিতে সমৃদ্ধ হয়েছিলাম যখন আমার বয়স মাত্র ১৬ (ষোলো)। এই অনুভূতি তখনই ঘটত যখন আমি নির্জনে, উন্মুক্ত আকাশের নিচে, বাগানে থাকতাম, এমনকী বাসে করে ভ্রমণ করার সময়ও ঘটত। অকস্মাৎ আমার সম্মুখের প্রকৃতি যেন, চৈতন্য সত্তায় সঞ্জীবিত হয়ে আমার সামনে স্পন্দিত হতে থাকে; যেন আমি একটি নাটক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে থাকি, আর ঐ অভিনয় তথা নাটকের আমি নিজেও একটি চরিত্র। এটি এমন এক **বর্তমানের** সচেতন অবস্থা যার মধ্যে অতীত এবং ভবিষ্যতের ভাবনা লেশমাত্র ছিল না। বাহ্য বিষয়বস্তু এবং অন্তঃকরণের বিষয়সমূহের মধ্যে কোনো ফারাক ছিল না। কেবলমাত্র সম্পূর্ণ বা পরিণত অস্তিত্বের সচেতনতা বিরাজমান। কখনো মাসে একবার, কখনো দুবার; কখনো সপ্তাহে দুবার বা তিনবারও এই অনুভূতি হতো। প্রত্যেকবারই এই অনুভূতি কখনো ১৫ মিনিট, আধঘণ্টা, এক ঘণ্টা, এমনকী দু'ঘণ্টা পর্যন্তও থাকত।

'কলেজে পড়ার শেষের দিকে আমি একটি বিশাল ৩০০ একর-বিশিষ্ট আবাসিক মহাবিদ্যালয়ে থাকতাম। বিশাল প্রান্তর, একটি পর্বত ও বড় দীঘি সমন্বিত ছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। আমি এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের এক প্রান্তে নীরবে নিশ্চুপ হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো সময় অতিবাহিত করতাম—এক ঘণ্টা, দু'ঘণ্টা কোথা দিয়ে যে কেটে যেত, বুঝতে পারতাম না। দিনের আলো চলে গেলে হোস্টেলে ফিরে আসতাম। কোনো কোনো দিন হোস্টেলের ঘরের দরজা খুলতাম। আমার ঘরটি ছিল জলাশয়ের কাছে। সূর্যের সোনালী রশ্মি জলের ওপর প্রতিফলিত হয়ে এক অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্যের সূচনা করতো, আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করতাম। আমার দুচোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ত, আমার সমগ্র অন্তরাত্মা এক অনির্বচনীয় আনন্দে প্লাবিত হয়ে যেত।'

বর্তমান লেখকের উপরোক্ত অতীন্দ্রিয় অনুভূতির বর্ণনার মূল কারণ হলো, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বা ভাবরাজ্যের ঘটনা আর অন্য কোনোভাবে বর্ণনা করা যায় না। তিনি চান যে তাঁর এই উপলব্ধি যারা গোলমালে পড়ে একঘেয়েমির শিকার হয়ে জাগতিক গোলোকধাঁধায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছে; তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ুক, অন্তত কিছু মানুষের মধ্যে জীবনের মহিমা, তাৎপর্য ও সৌন্দর্যের চেতনা গড়ে উঠুক।*

**(মূল ইংরাজী থেকে ভাষান্তর করেছে সমাজশিক্ষা দপ্তর)*

রামকৃষ্ণ মিশন ও শ্রীশ্রীমা

স্বামী বিমলাত্মানন্দ *

১২৫ (১৮৯৭-২০২২) বছর হয়ে গেল রামকৃষ্ণ মিশনের। অবিচ্ছিন্ন। মূল দু'জন—ব্রহ্ম ও শক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা। দৈবী মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে গড়া মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—মায়ের কাজ। অর্থাৎ **রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ তাঁদের সৃষ্টি। ভগবানের তৈরি, ঈশ্বরের তৈরি। তাই তাঁদের কৃপায় চলছে এই সঙ্ঘ**। এই সঙ্ঘের দুটি রূপ—রামকৃষ্ণ মঠ—১৩৬ বছর। রামকৃষ্ণ মিশনের বয়স এগার বছর কম—১২৫ বছর।

আমরা সবাই জানি—মঠ বা মিশন যাই বলি না কেন—**স্বামী বিবেকানন্দ তার বাস্তব রূপকার**। সেই সঙ্গে তাঁদের গুরুভাইরা এবং তাঁদের সময়ে যেসব সাধু ও ব্রহ্মচারিরা ছিলেন, তাঁরা যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন মঠ ও মিশনকে এগিয়ে যেতে। জেনারেশনের পর জেনারেশন-এর হাতে মঠ ও মিশনের পতাকা চারিদিকে উড়ছে। কোনো ছেদ নেই।

যখন এই রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাস গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ি, বুঝতে চেষ্টা করি, তখন একটা জিনিস লক্ষ্য করি—মঠ ও মিশনের একেবারে গোড়া থেকে অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত—সবকিছুতে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি শ্রীশ্রীমায়ের অনবদ্য নীরব অথচ সুচিন্তিত অবদান বা ভূমিকা রয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের এই অবদান-রহস্য ভেদ করতেই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। ছোট ছোট ঘটনা পড়ি মাত্র—তলিয়ে দেখি না। এই সবেতে রয়েছে রহস্য।

' "আমি সকলের মা"—এবারটি খেয়ে নাও'

রামকৃষ্ণ মিশনের জন্ম তো দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর কাছে। দু'শক্তির মিলন হলো আবার—তখন তাঁরা পূর্ণ বয়স্ক-বয়স্কা। দক্ষিণেশ্বরে আনন্দের হাট। সাধনা শেষ, তাবড় তাবড় পণ্ডিতদের স্বীকৃতি, কেশব সেনের সংবাদপত্রের দৌলতে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে আসর জমিয়ে জাঁকিয়ে বসছেন—মঠ মিশন তৈরিতে মন-প্রাণ ঢেলে দিচ্ছেন। কয়েক হাত উত্তরে শ্রীশ্রীমা অতি ছোট নহবতে তৈরি মাল-মশলা সরবরাহ করছেন—ভিত গড়া হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনের।

শ্রীরামকৃষ্ণ যুবা ও গৃহীদের নিজের মনের মতো আকার দিচ্ছেন। এঁরাই হবেন মঠ-মিশনের ধারক-বাহক। আর অলক্ষ্যে, নীরবে, সুপরিকল্পিতভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে সঙ্ঘের পালনকর্ত্রী, রক্ষাকর্ত্রী, অভয়দাত্রীরূপে ধীরে ধীরে তৈরি করছেন। তখন কিন্তু কেউ বুঝতে পারেননি। পরে প্রকাশ পেয়েছে।

শ্রীশ্রীমাকে দুটি ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যখন যুবা-ভক্তদের জীবনশৈলীর ট্রেনিং দিচ্ছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের কড়া নজর চারদিকে। বিশেষ করে খাবার-দাবারের উপর। প্রত্যেকের কাছে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কিন্তু সরাসরি শ্রীশ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করছেন না—পাছে শ্রীশ্রীমা রেগে যান। আর শ্রীশ্রীমা একবার রেগে গেলে কারুর সাধ্য নেই তাঁকে ঠেকাতে। শ্রীরামকৃষ্ণ তা জানতেন। তিনি তো কুশলী। যখন জানলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দিষ্ট করা খাবারের চেয়ে শ্রীশ্রীমা বেশি দিচ্ছেন, তখন অনুযোগের সুরে শ্রীরামকৃষ্ণ অভিযোগ করলেন। বলামাত্রই শ্রীশ্রীমা ফোঁস করে উঠলেন ঃ দুটি খেয়েছে বলে অত খোঁটা কেন? ওদের ভবিষ্যৎ আমি দেখব। অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ চুপসে গেলেন—কিন্তু পুরো মাত্রায় নিশ্চিন্ত হলেন। ভবিষ্যতের মঠ-মিশনের ভার তাঁর শক্তি স্বেচ্ছায় স্বাগ্রহে নিয়েছেন।
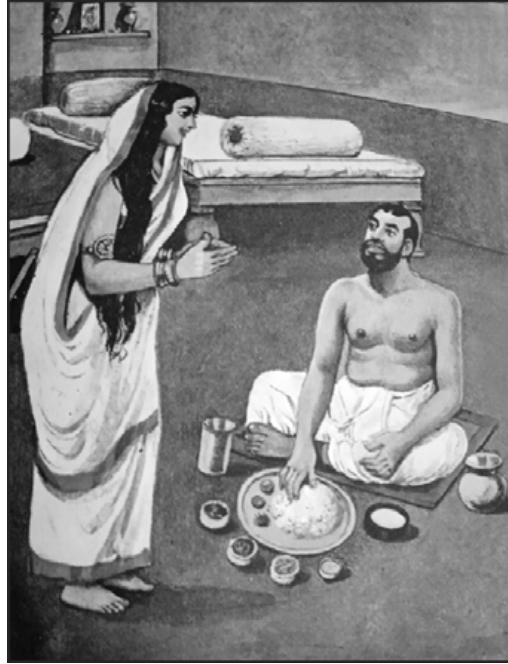
** প্রবীণ এই সুলেখক সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ট্রাস্টি ও গভর্নিং বডির সদস্য, যোগোদ্যান মঠের অধ্যক্ষ।*

আবার যখন শ্রীরামকৃষ্ণের খাবারের থালা শ্রীশ্রীমাকে 'মা' বলা ডাকে অম্লানবদনে, বিন্দুমাত্র দ্বিরুক্তি না করে এক অসচ্চরিত্র মেয়ের হাতে তুলে দেন—তখন শ্রীরামকৃষ্ণ বাইরে ছদ্ম বিরক্তি প্রকাশ করলেও মনে মনে বড্ড খুশি হয়েছিলেন। কারণ, শ্রীশ্রীমা ভালো-মন্দ, চরিত্রবান-চরিত্রহীনা, জাতপাতহীন—সব রকম ভক্তদের ভার নিয়েছেন।

আরেকটা দিক লক্ষ্য করার বিষয়।

নহবতে শ্রীশ্রীমা ভক্তসেবা ও সাধুসেবা করতেন। ভক্তসেবা বলতে যেসব ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দুপুরের আগে আসতেন এবং ত্যাগী যুবকরা আসতেন ও রাতে থাকতেন—তাঁদের রান্না করতেন শ্রীশ্রীমা। ঠাকুরের রান্না তো ছিলই। এসব রান্না শ্রীশ্রীমাই সামলাতেন, কখনও কখনও মেয়েভক্তেরা সাহায্য করতেন। খরচপাতি জোগাতেন গৃহী ভক্তেরা।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য মা কালীর ভোগ ইত্যাদি বরাদ্দ ছিল—তা আসত। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ভক্তেরাই দিতেন—ফল, মিষ্টি থেকে জামা কাপড় ইত্যাদিও ভক্তেরাই জোগাতেন। এই যে দুটি ঘটনা—আজকের দিনে সমাজের চারদিক তাকিয়ে দেখলে এর বাস্তবতা বোঝা যায়। কারণ, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী-ভক্তেরা শ্রীশ্রীমায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল। তিনি তো কথা দিয়েছেন। আমি ওদের 'ভবিষ্যৎ' দেখব। মঠ-মিশনেতে সব ধরনের ভক্তদের অবাধ প্রবেশ। ভক্তসেবা, সাধুসেবা—যা এখনো হয়, সবই তো ভক্তদের অর্থে। এ-বিষয়ে শ্রীশ্রীমা-ই আমাদের পথপ্রদর্শক। শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবস্থা। রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাকার্যের অঙ্গ—সাধু-গৃহীর যৌথ প্রচেষ্টা। স্বামীজীও তাই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠাতে দু'দলকে যুক্ত করেছিলেন।

এবার শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকে কেন্দ্র করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বীজটি বেশ ভালোরকমের দানা বেঁধেছিল শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে। শ্রীশ্রীমারও এখানে অগ্রণী ভূমিকা। দু'স্থানেই তিনি ঠাকুরের সেবা ছাড়া, সব রকম ভক্তদের সেবা করতেন। তিনি ছিলেন একমাত্র ভরসা ও প্রেরণার স্থল। তাঁর কাজ অন্তরাল থেকে—নীরব অথচ বাস্তব। বিশেষ করে যুবা-ভক্তেরা ঠাকুরের অসুখের বাড়াবাড়ি হলে তিনি তাঁদের সাহস জুগিয়েছিলেন। একেবারে পাকা ব্যবস্থা হলো—এগারজন যুবা-ভক্তদের গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষ মালা দিয়ে আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত মঠ-মিশনের। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ নবীন সন্ন্যাসিদের ভিক্ষা করতে পাঠালেন। প্রথম ভিক্ষা তাঁরা করলেন শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। শ্রীশ্রীমাও তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করলেন ষোল আনায়। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শক্তি শ্রীশ্রীমাকে সকলের চালিকাশক্তিরূপে বসিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। আগেই তো ষোড়শীপূজা করে তাঁকে দেবীরূপে অভিষিক্তা করে মঠ-মিশনের অন্যতম 'মাতৃশক্তি'র জাগরণের কাজটি সুসম্পন্ন করেছিলেন। ভবিষ্যতে শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে নারী-শক্তির অভ্যুদয় হবে অর্থাৎ শ্রীসারদা মঠ হবে—ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাস তাই বলে।

শ্রীশ্রীমা ঠাকুরকে বলেছিলেন—'তোমার ইষ্টপথে সাহায্য করতে এসেছি।' **শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জগৎ-কল্যাণের ইষ্টপথ রূপ 'মহাব্রত' স্বামীজীর কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তা শ্রীশ্রীমাও অন্তরে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। শ্রীশ্রীমাও সেই মহাব্রতের দায় পূর্ণতার জন্য যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি তাঁর নীরব সক্রিয় ভূমিকাটিও দেখার মতন।**

বরানগর মঠ থেকে শশী মহারাজ ছাড়া আর সব রামকৃষ্ণ-শিষ্যেরা যে-যার মতো চারদিকে বেরিয়ে পড়লেন সাধন-ভজন-তপস্যায়। সে-সময়ও শ্রীশ্রীমার প্রত্যেকের প্রতি ছিল প্রখর দৃষ্টি। বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ পেতেন, গৃহীভক্তদের কাছ থেকে জয়রামবাটীতে ও কলকাতায়। বিশেষ করে রাখাল মহারাজ—রাজা মহারাজের শরীর যাতে ভালো থাকে চিঠির মাধ্যমে জানতেন। রামকৃষ্ণ শিষ্যদের এই পরিব্রাজক জীবনের প্রতি শ্রীশ্রীমায়েরও মাতৃসুলভ পূর্ণ সমর্থন ছিল।

বোধগয়া থেকে আর সব তীর্থস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শ্রীশ্রীমায়ের কাতর প্রার্থনা—যেন ছেলেদের স্থায়ী-ঠাঁই হয়। তাই স্বামীজী যখন আমেরিকা পাড়ি দেবার আশীর্বাদ চাইলেন—ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মতিতে শ্রীশ্রীমাও প্রাণভরে দিগ্বিজয়ের আশীর্বাদ করলেন। তিনি জানতেন—এবার ভবিষ্যতের মঠ-মিশনের স্থায়ী রূপ হতে চলেছে। এর পরের ঘটনা আমাদের জানা। শ্রীশ্রীমা এখানে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন বলেই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করা স্বামীজীর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

স্বামীজী আমেরিকা থেকে গুরুভাইদের চিঠি লিখেছিলেন মানুষের মাঝে নরনারায়ণ সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়তে। কিন্তু তাঁরা ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। শ্রীশ্রীমা তখন কলকাতায়। গুরুভাইদের কেউ তাঁকে পড়ে শোনালেন স্বামীজীর চিঠি। পূর্ণ সমর্থন জানালেন শ্রীশ্রীমা। বলতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর তাঁর সব ছেলেদের কাজে শ্রীশ্রীমা-ই একমাত্র সহায়কারিণী—অন্য কেউ নয়।

আমেরিকাতে একটি বক্তৃতায় স্বামীজী তা উল্লেখ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিবজ্ঞানে জীবসেবা বা কর্মযোগে সাধারণ মানুষের উন্নতি, নিষ্কাম কর্মযোগেতে শ্রীশ্রীমার সুস্পষ্ট নির্দেশ—যারা এটা মানবে, তারা থাকবে। না হলে তারা চলে যাবে। তিনি আবার হেলা-ফেলা ব্রহ্মচারী পছন্দ করতেন না—কর্মে পটু, দক্ষ ব্রহ্মচারী চাই এই কর্মযোগেতে।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার পূর্বে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে স্বামীজীর আশীর্বাদ-প্রার্থনার সংলাপ ইতিহাস প্রসিদ্ধ। রামকৃষ্ণ-মহাব্রতের বাস্তবায়নে শ্রীশ্রীমায়ের অমোঘ আশীর্বাদ রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র পাথেয়। বোধহয় তিনি আনন্দের আবেগ চেপে রেখে ঠাকুরের কাছে নিশ্চয় প্রার্থনা করেছিলেন—যেন যুগ যুগ ধরে রামকৃষ্ণ মিশন জগতের মানুষের কল্যাণ-ব্রতে নিয়োজিত থাকে।

শ্রীশ্রীমা স্বামীজীকে প্রাণভরা ভালোবাসায় ভরা দুটি আশীর্বাদ করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার ঠিক একমাস পূর্বে।

মায়ের আশীর্বাদ ঃ 'ঠাকুর তোমার মাধ্যমে এইসব মহৎ ও বৃহৎ কাজগুলি করাচ্ছেন। তুমি তাঁর চিহ্নিত শিষ্য ও সন্তান।'

এখানেই স্বামীজী ভাবাবেগে উদ্বেলিত—শীঘ্র হচ্ছে না আফসোস তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল। তারপরেই মায়ের দ্বিতীয় আশীর্বাদ ঃ 'তার জন্য তুমি কোন ভাবনা করো না। তুমি যা করছ আর যা করবে তা চিরকাল টিকে থাকবে। এই কাজের জন্যেই তোমার জন্ম। জগতের মানুষ তোমাকে লোকগুরু হিসাবে মানবে। তুমি নিশ্চিত জেনো, ঠাকুর তোমার আকাঙ্ক্ষা অচিরেই পূর্ণ করবেন। অল্পদিনের মধ্যেই দেখতে পাবে, তোমার চিন্তা, তোমার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নিচ্ছে।'

ত্রাণসেবার প্রথম বীজ বপন—গরম খিচুড়ি ঠাণ্ডা করা

শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে এক লাফে সাগর পার হয়ে সাহেব-মেমদের মানুষ করে জগতের মণি হয়ে ফিরে এলেন আর শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে রামকৃষ্ণ মিশন শত শত বছর যে মানুষের সেবাকাজ চলবে—একথা স্বামীজী মনে-প্রাণে অনুভব করেছিলেন। ১২৫ বছর আগে রামকৃষ্ণ মিশনের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ তা ক্রমশ বহুতর থেকে বহুতর বিস্তৃতি লাভ হচ্ছে, পুষ্টি সাধন হচ্ছে, পরিধি বাড়ছে। ঐ সময় থেকে দেশ-বিদেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘজননীরূপে মঠ-মিশনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইলেন। আমরা সবাই শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করে সেবাকাজে ঘুরছি। প্রায় তেইশ বছর ব্রহ্মময়ী শ্রীশ্রীমায়ের মুখের কথাই ছিল মঠ-মিশনের নির্দেশ।

ত্রাণসেবা কাজের বীজটি শ্রীশ্রীমাই প্রথম পুঁতেছিলেন জয়রামবাটীতে ১৮৬৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময়। মায়ের বয়স তখন মাত্র এগার বছর। গরম গরম খিচুড়ি খেতে না-পারা লোকগুলির খাওয়ার কষ্ট দেখে শ্রীশ্রীমা তাঁর ছোট দুটি হাতে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে খিচুড়ির গরম কমাতে লাগলেন—যাতে মানুষদের খেতে কষ্ট না হয়। এটি ছিল শ্রীশ্রীমায়ের সহজাত সেবা—কেউ বলে দেয়নি। **শ্রীরামকৃষ্ণ এর চার বছর পরে (১৮৬৮) দেওঘরে ত্রাণসেবা কাজ করেছিলেন। দু'জনেই ত্রাণসেবার পথ প্রদর্শক।**

স্বামীজীর 'গ্যাঞ্জেস' অখণ্ডানন্দজী যে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম ত্রাণসেবার কাজ ১৮৯৪ সালে রাজপুতানায় এবং ১৮৯৭ সালে মহুলা ও সারগাছিতে আরম্ভ করে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন—শ্রীশ্রীমা সব জানতেন, খবর রাখতেন। অখণ্ডানন্দজীর শরীর খারাপ হলে, ডেকে এনে বলরাম মন্দিরে চিকিৎসা করেছিলেন।

তারপরেই কলকাতায় প্লেগসেবা। স্বামীজীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—সদ্য প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের জমি বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে ত্রাণসেবা করা। শ্রীশ্রীমায়ের কানে গেল এ-কথা। এখানে শ্রীশ্রীমার ভূমিকা লক্ষ্য করার মতো—তিনি বর্তমান-ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন। স্বামীজীর মতো লোকের আবেগকে কয়েকটি কথায় থামিয়ে দিলেন। শ্রীশ্রীমা বললেন ঃ বেলুড় মঠ তো আমার নামে উৎসর্গ করেছ। বিক্রি করার তোমার বিন্দুমাত্র অধিকারই নেই। আর বেলুড় মঠ মাত্র একটা ত্রাণসেবা করবে? শ্রীশ্রীমা জানতেন, রামকৃষ্ণ মিশনকে আরও হাজার হাজার ত্রাণসেবা করতে হবে। আজ ১২৫ বছর রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণসেবার Statistics একই কথাই বলে। *(পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য)*

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য, শক্তি ও লক্ষ্য

স্বামী বলভদ্রানন্দ *

রামকৃষ্ণ মিশনের ১২৫ বছর পূর্তি হলো গত ১ মে ২০২২ তারিখে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে স্বামীজী বলরাম বসুর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তের উপস্থিতিতে 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরের মিটিং হয়েছিল ৫ মে ১৮৯৭ তারিখে। দ্বিতীয় এই মিটিং-য়েই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য, আদর্শ, কার্যধারা এবং কারা কারা এর পরিচালন-মণ্ডলীতে থাকবে—ঠিক করে দিয়েছিলেন।

'রামকৃষ্ণ মিশন' ছাড়াও আমরা 'রামকৃষ্ণ মঠ' নাম-টাও শুনে থাকি। আমাদের দেশের বহু মানুষই জানেন না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ এবং সারদাদেবীর প্রত্যক্ষ ইচ্ছায়, প্রেরণায়, সাধনায় এবং অংশগ্রহণে যে-সঙ্ঘ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে গড়ে উঠেছিল, সেটি আসলে দুটি সংস্থা ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। এই যুগ্ম সংস্থাকে আমরা একসাথে বলি 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ'। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন—এই দুটি সংস্থা আলাদা। তবে তারা কার্যত খুব আলাদা নয়। আলাদা শুধু ভেতরের গঠনে এবং ভারতে প্রচলিত আইন অনুসারে। ভেতরের গঠনে কি পার্থক্য? 'রামকৃষ্ণ মঠ' শুধুই সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিদের সংস্থা। আর 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর সদস্য সন্ন্যাসিরা হতে পারেন, গৃহীরাও হতে পারেন। আর আইনের দিক থেকে কি পার্থক্য? আইন-অনুসারে 'রামকৃষ্ণ মঠ' একটি রেজিস্টার্ড ট্রাস্ট ও 'রামকৃষ্ণ মিশন' একটি রেজিস্টার্ড সোসাইটি। কিন্তু কাজের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বোধই হয় না। কারণ, 'রামকৃষ্ণ মঠ'-এর সন্ন্যাসিরাই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিটি কেন্দ্র চালায়।

মঠ-মিশন উভয়ের জন্যই বেলুড় মঠে দুটি কেন্দ্রীয় পরিচালক-মণ্ডলী আছে—বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রগুলিকে এই দুটি পরিচালক-মণ্ডলীই পরিচালনা করে। রামকৃষ্ণ মঠ-এর কেন্দ্রীয় বা সর্বোচ্চ পরিচালক-মণ্ডলীকে বলা হয় 'বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ' আর রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বোচ্চ পরিচালক-মণ্ডলীকে বলা হয় 'গভর্নিং বডি'। কিন্তু এক্ষেত্রেও দুটি আলাদা আলাদা পরিচালক-মণ্ডলী হলেও, কার্যত একটিই কেন্দ্রীয় পরিচালক-মণ্ডলী বলা যেতে পারে। কারণ, যে কয়েকজন সন্ন্যাসী (বর্তমানে ১৯ জন) 'বোর্ড অফ ট্রাস্টিজ'-এ ট্রাস্টি হিসেবে থাকেন, সেই সন্ন্যাসিরাই 'গভর্নিং বডি'রও সভ্য হন এবং এই দুটি 'বোর্ড' বা 'বডি'তেই সন্ন্যাসিরাই শুধু থাকেন।

এই দুটি ভাগ করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে ঃ 'রামকৃষ্ণ মঠ' শুধু ঠাকুর-সেবা, পূজা-পাঠ, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি নিয়ে থাকবে আর 'রামকৃষ্ণ মিশন' দায়িত্ব নেবে সেবাকর্মগুলির। কিন্তু মানুষের প্রয়োজনের কথা ভেবে, মঠ-কেন্দ্রগুলিও কিছু কিছু সেবাকাজ করে থাকে এবং মিশন কেন্দ্রগুলিও অনেক সময় সেবাকাজ ছাড়াও ধর্মপ্রচার, পূজা প্রভৃতি করে। উদাহরণস্বরূপ, কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান একটি মঠ অর্থাৎ এটি রামকৃষ্ণ মঠের একটি শাখা, রামকৃষ্ণ মিশনের নয়। কিন্তু এই কেন্দ্র বহু দিন ধরেই বেশ ভালো একটি ডিস্পেনসারী চালাচ্ছেন, কোচিং সেন্টার প্রভৃতি চালাচ্ছেন। আবার 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার' একটি 'মিশন' কেন্দ্র কিন্তু এটিও বক্তৃতা ও পুস্তক প্রকাশের মাধ্যমে ভাবপ্রচার করে চলেছে এবং এই প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছর সাড়ম্বরে সরস্বতী পূজা হয়।

অনেকেরই একটা ভুল ধারণা আছে যে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, বিশেষত 'রামকৃষ্ণ মিশন' শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর স্বামীজীর চিন্তা থেকে এসেছে এবং তিনিই এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। তা নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের যখন সব সাধনা শেষ হয়ে গেল, তখন জগজ্জননী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, এই অবতারে তাঁকে কী কী করতে হবে। তার মধ্যে একটি হলো ঃ তাঁর জীবনে তিনি যেসব উদার ধর্মভাব উপলব্ধি করেছেন, এমন একটি নতুন ধর্মসম্প্রদায় তাঁকে প্রতিষ্ঠা করে যেতে হবে, যার মাধ্যমে সেই সব উদার ও মহৎ ভাবগুলো জগতে প্রচারিত হয়ে চলবে। অর্থাৎ যত মত তত পথ, সব ধর্মই মানুষকে সেই এক ভগবানের দিকেই নিয়ে

** সহ-সাধারণ সম্পাদক, ট্রাস্টি, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, সুবক্তা, সুলেখক ও প্রাবন্ধিক।*

যায়, মানুষকে ভগবান মনে করে সেবা অর্থাৎ শিবজ্ঞানে জীবসেবা—প্রভৃতি যে ভাবগুলি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের বৈশিষ্ট্য, সেই ভাবগুলো জাগ্রত থাকবে ঐ ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে। এই ধর্মসম্প্রদায়ই রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শরীর যাওয়ার আগে কাশীপুরে দিনের পর দিন নরেন্দ্রনাথকে আলাদা করে ডেকে ভবিষ্যতের ঐ সঙ্ঘের কথা বলে গেছিলেন। কোন ধরনের হবে সেই সঙ্ঘ, স্বামীজী এবং অন্য সন্ন্যাসী-গুরুভাইয়েরা কীভাবে চলবেন সেই সঙ্ঘকে বাস্তবায়ন করতে, সব তিনি শুধুমাত্র স্বামীজীকেই বলে গেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন এবং অন্য গুরুভাইয়েরাও বুঝতেন ঃ স্বামীজীই তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তাঁদের সকলের নেতা। কারণ তিনি শুধু প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যেই সেরা নন—ত্যাগ-বৈরাগ্য-ভক্তিতে এবং সবাইকে ভালো-বাসার শক্তিতেও তিনি সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই কাশীপুরেই ঠাকুরের শিষ্যদের মধ্যে একজন (বুড়োগোপাল দা, পরে সন্ন্যাস নিয়ে নাম হয়েছিল স্বামী অদ্বৈতানন্দ) ঠাকুরকে একদিন বললেন ঃ মকরসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের জন্য কোলকাতায় অনেক সন্ন্যাসী এসেছেন, তাদের তিনি গেরুয়াবস্ত্র, রুদ্রাক্ষের মালা ও চন্দন দান করতে চান। ঠাকুর নরেন্দ্র-রাখাল প্রভৃতিদের দেখিয়ে বললেন ঃ এদের মতো সাধু কোথাও পাওয়া যাবে না। এঁদেরকে ওসব দিলেই তাঁর যথেষ্ট পুণ্য হবে। বুড়োগোপালদা সেই অনুযায়ী কয়েকটি গেরুয়া বস্ত্র ও রুদ্রাক্ষের মালা এনে ঠাকুরকে দিলেন। তার মধ্যে থেকে ঠাকুর এগারোটি বস্ত্র ও মালা বেছে নিলেন এবং তখন তাঁর কাছে যেসব যুবক ভক্তরা ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেককে নিজে হাতে করে একটি গেরুয়া কাপড় ও একটি রুদ্রাক্ষের মালা দিলেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একাদশ প্রেসিডেন্ট, পণ্ডিত ও উপলব্ধিমান সন্ন্যাসী স্বামী গম্ভীরানন্দজী তাঁর 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করে লিখেছেন ঃ **'শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ইহাই আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত বলিতে পারা যায়।'** সেদিন ঠাকুরের কাছে যাঁরা গেরুয়া কাপড় পেয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই ভবিষ্যতে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন ঃ নরেন্দ্রনাথ, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন্দ্র, তারক, শরৎ, শশী, লাটু, কালী এবং বুড়োগোপাল নিজে। শ্রীরামকৃষ্ণের ষোল-জন সন্ন্যাসী-শিষ্যের মধ্যে মাত্র পাঁচজন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁরা হলেন ঃ ভবিষ্যতের অখণ্ডানন্দজী, বিজ্ঞানানন্দজী, সুবোধানন্দজী, ত্রিগুণাতীতানন্দজী ও তুরীয়ানন্দজী। এই ঘটনাটি মকরসংক্রান্তির সময় হয়েছিল বলে এটিকে ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসের কোনো একদিনের ঘটনা বলে প্রথম থেকেই সকলের জানা ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে এই তারিখটি নির্দিষ্টভাবে জানা গেছে। **তারিখটি ছিল ১২ জানুয়ারি ১৮৮৬।** তাৎপর্যপূর্ণভাবে যুগাবতারের হাতে তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট সঙ্ঘের স্থাপনা হয়েছে তাঁর প্রিয় শিষ্য, নয়নের মণি, ভাবী সঙ্ঘের প্রধান স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিবসে।

ঠাকুর তাঁর ত্যাগী সন্তানদের গেরুয়া বস্ত্র প্রদান করছেন

দেহত্যাগের কয়েক-দিন আগে থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতি সন্ধ্যায় নরেন্দ্রনাথকে নিজের কাছে ডেকে দরজা বন্ধ করে দুই-তিন ঘণ্টা ধরে ভবিষ্যতে তাঁকে কী করতে হবে, সে সম্বন্ধে নানা উপদেশ দিতেন। তারপর মহাসমাধির যখন আর মাত্র তিন-চার দিন বাকি আছে, তখন তিনি একদিন নরেন্দ্রনাথকে ডেকে তাঁর মধ্যে শক্তিসঞ্চার করলেন। নরেন্দ্রনাথ বাহ্যসংজ্ঞা হারালেন। বোধহয় সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তারপর যখন বাহ্যসংজ্ঞা ফিরল, তখন ঠাকুর তাঁকে বললেন ঃ **'আজ যথাসর্বস্ব তোকে দিয়ে ফকির হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের কাজ করবি। কাজ শেষ হলে ফিরে যাবি।'** দেহত্যাগের যখন দুদিন মাত্র বাকি, ঠাকুর আবার ডাকলেন নরেন্দ্রনাথকে। তাঁর ভাবী সন্ন্যাসী-শিষ্যদের সামনেই ঠাকুর স্পষ্টভাবে নরেন্দ্রনাথকে বললেন, তাঁর অবর্তমানে তাঁদের দায়িত্ব নিতে। বললেন ঃ 'দেখ নরেন, তোর হাতে এদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি। কারণ তুই সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী। এদের খুব ভালবেসে, যাতে আর ঘরে ফিরে না গিয়ে একস্থানে থেকে খুব সাধনভজনে মন দেয়, তার ব্যবস্থা করবি।' এইভাবে **স্পষ্টভাবে ঠাকুর সঙ্ঘ গড়ে দিয়ে গেলেন, সঙ্ঘনেতাকেও**

নির্দিষ্ট করে দিয়ে গেলেন এবং তা তিনি করলেন সঙ্ঘনেতা ও তাঁর রত্ন–সদৃশ সহকারীদের সামনে।

শুধু তাই নয়। পিতার অবর্তমানে দায়িত্বশীল মাতাকেই তো একাধারে পিতা ও মাতা হয়ে উঠতে হয় পিতৃহীন সন্তানদের কাছে। দেহত্যাগের আগে শ্রীরামকৃষ্ণ, তাঁর শিষ্য–সন্তানদেরও অগোচরে, তাঁর সহধর্মিণী সারদাদেবীকে সেই ভূমিকায় প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। সারদাদেবীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই ছিল **'গণ্ডিভাঙা মাতৃত্ব'** এবং ভগবতীর সাক্ষাৎ অবতাররূপে **অসীম আধ্যাত্মিক শক্তি**। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষাগুণে তাঁর অবর্তমানে ভবিষ্যৎ সঙ্ঘের কাছে সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণের মতোই আধ্যাত্মিক–শক্তির কেন্দ্র–রূপে বিরাজ করেছেন, আবার মাতৃরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকেও ছাপিয়ে গিয়ে ঐ ঘর–ছাড়া ত্যাগিদের সুখে ও সংগ্রামে সর্বদা স্নেহসিক্ত করে রেখেছেন। নিরন্তর আশীর্বাদ বর্ষণ করেছেন তাঁদের প্রতি এবং প্রার্থনা করে চলেছেন এই সঙ্ঘের জন্য। সেই জন্যই, স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে এসে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে বলরাম মন্দিরে যে সভায় 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সভার সূচনাতেই মাকে 'সঙ্ঘজননী', 'আদ্যাশক্তি', 'সঙ্ঘের রক্ষাকর্ত্রী ও পালয়িত্রী'রূপে ঘোষণা করে শুভ কাজের প্রারম্ভে যেন মঙ্গলাচরণ করেছিলেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর ১৮৮৬–র অক্টোবর মাসে বরানগর মঠের প্রতিষ্ঠা হয়। ত্যাগী শিষ্যরা এইবার একে একে ঘর ছেড়ে এখানে এসে বাস করতে শুরু করলেন। ত্যাগ–তপস্যা–শাস্ত্রপাঠ এবং অপরিসীম দারিদ্র্য ও কৃচ্ছ্রতায় অতিবাহিত হয়ে চলে তাঁদের জীবন। জগন্মাতা যে–সঙ্ঘের স্থাপনা করতে ঠাকুরকে নির্দেশ করেছিলেন এবং ত্যাগী–শিষ্যদের অন্তরগুলিকে একসূত্রে গেঁথে এবং তাঁদের অধিকাংশের হাতে গৈরিক বস্ত্র তুলে দিয়ে ঠাকুর যে–সঙ্ঘের প্রতীকী সূচনা করে গেছিলেন, **বরানগর মঠ সেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম চোখে–দেখতে–পাওয়া বাস্তব রূপ**। ১৮৮৬–র ডিসেম্বরে ত্যাগী–যুবকরা আঁটপুরে গেলেন প্রেমানন্দজী মহারাজের (তখন বাবুরাম) বাড়িতে। প্রতিদিন ধুনি জ্বালিয়ে শীতের খোলা আকাশের নিচে এই যুবকরা দীর্ঘ সময় ধ্যান ও সৎপ্রসঙ্গে কাটাতেন। দিন–তারিখ–বার–নক্ষত্রের হুঁশ থাকত না তাঁদের। এক রাতে ধ্যানের শেষে নেতা নরেন্দ্রনাথ উদ্দীপনাময় ভাষায় যিশুখ্রিস্টের অপূর্ব ত্যাগ–বৈরাগ্যপূত জীবনের কথা বলে তাঁদের বৈরাগ্যকে আরও উদ্দীপিত করে দিলেন। ধুনির পবিত্র আগুনকে সাক্ষী রেখে তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন ঃ তাঁরাও যিশুখ্রিস্টের শিষ্যদের মতো পরিপূর্ণ ত্যাগের জীবন বেছে নিয়ে দেশে দেশে শ্রীরামকৃষ্ণের উদার, পবিত্র, ঈশ্বরনির্ভর জীবনের বাণী ছড়িয়ে দেবেন। পরে জানা গেল, সেটি ক্রিসমাস ঈভের রাত, ২৪ ডিসেম্বর—যিশুখ্রিস্টের আবির্ভাবের পূর্ব–রজনী। তাঁদের মনে হলো, শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী সম্প্রদায়ের সাধুরা যেমন বিরজাহোম করে সন্ন্যাসের সঙ্কল্প, গেরুয়া বস্ত্র ও সন্ন্যাস–নাম গ্রহণ করেন—অবিলম্বে তাদের তা করা উচিত। এই অদ্ভুত সমাপতন (coincidence) যেন তাঁর প্রতিই ইঙ্গিত। বরানগর মঠে ফিরে এসেই তাঁরা বিরজাহোম করে সন্ন্যাস নিলেন। তাঁদের নতুন নাম হয় ঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, প্রভৃতি। স্বামীজী তখন 'বিবিদিষানন্দ' নামটি নিয়েছিলেন। ১৮৯১ সালের এপ্রিল মাস থেকে তিনি চিঠিপত্রে 'বিবেকানন্দ' নামটি লিখতে শুরু করেন। তখনও খেতড়ি রাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়নি। কাজেই, অনেকে যে বলে থাকেন, খেতড়ির রাজা তাঁকে এই নাম দিয়েছিলেন, সেটি ভুল।

প্রথম রামকৃষ্ণ মঠ—বরানগর মঠ

এই বরানগর মঠ–ই প্রথম 'রামকৃষ্ণ মঠ'। এখানে মঠ ১৮৮৬–র অক্টোবর থেকে প্রায় পাঁচ বছর ছিল।

রামকৃষ্ণ মঠ যখন বরানগরে প্রায় ৪ বছর ধরে স্থাপিত হয়েছে, তখনই (১৮৯০–এর জুলাইয়ে) স্বামীজী শেষ বারের মতো পরিব্রাজক হয়ে বেরিয়ে পড়েন। এটিই ছিল তাঁর পরিব্রাজক জীবনের দীর্ঘতম অধ্যায়। তাঁর জীবনের এই অংশটি 'বিবেকানন্দের ভারত পরিক্রমা' নামে অভিহিত হয়। এরপরে তিনি শিকাগো থেকে শুরু

করে সমগ্র আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ডেও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ-রূপে কোলকাতায় ফিরে এলেন ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। মঠ তখন আলমবাজারে। বছর পাঁচেক আগে ১৮৯১-র নভেম্বর মাসে মঠ বরানগর থেকে আলমবাজারে উঠে এসেছিল। আগেই বলা হয়েছে, ১৮৯৭-র ১ মে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ **'রামকৃষ্ণ মঠ' প্রতিষ্ঠার প্রায় এগারো বছর পরে রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনা।** এতদিন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ বলতে শুধু মঠই ছিল। সে যেন এতদিন আপন খেয়ালে ত্যাগ-তপস্যা-তিতিক্ষা ও স্বাধ্যায়কে অবলম্বন করে সন্ন্যাসিদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনেই ব্যস্ত। 'রামকৃষ্ণ মিশন' প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজী এবার রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সামনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতি স্থাপন করলেন; শুধু নিজের আধ্যাত্মিক কল্যাণই নয়, অপরের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধনও এই সঙ্ঘের সন্ন্যাসিদের জন্য আবশ্যিক কর্তব্য বলে নির্ধারিত হলো।

বলরাম মন্দির

অনেকে মনে করে থাকেন, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করে স্বামীজী যে তার মধ্যে মানুষের সেবাকে জুড়ে দিয়েছেন, এটি স্বামীজী পাশ্চাত্যে গিয়ে খ্রিস্টান মিশনারী সম্প্রদায় থেকে শিখেছেন। তা নয়। হিন্দুধর্মে দান বা সেবার কথা বারবার বলা হয়েছে। হিন্দুধর্মে সেবার ভাবটি বিরাট ব্যাপক। আমরা মনে করি, আমার ব্যক্তিগত জীবনটার জন্য আমি যাদের কাছে ঋণী, তাদের মধ্যে আছেঃ মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণী, আমার পূর্বপুরুষ, দেবতারা এবং মহাপুরুষগণ। এঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার ঋণ হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। তাই প্রত্যেকের সেবা করে প্রত্যেকের ঋণ শোধ করার জন্য আমাদের সবসময় চেষ্টা করতে হবে। হিন্দুধর্মে 'পঞ্চ মহাযজ্ঞ' অবশ্য কর্তব্য বলে উল্লেখিত। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ মানে ঋষি-সেবা, দেব-সেবা, পিতৃপুরুষদের সেবা, মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর সেবা। উপনিষদে বলা হয়েছেঃ শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। শ্রদ্ধার সাথে অপরের সেবা করতে বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দেওঘরে এবং রানাঘাটের কাছে কলাইঘাটায় মথুরবাবুকে দিয়ে জোর করে দরিদ্র মানুষের সেবা করিয়েছেন। স্বামীজী ও শ্রীশ্রীমাও ছোটবেলা থেকেই পরদুঃখকাতর ও সেবাপরায়ণ। বালক স্বামীজী বাড়িতে ভিখারি কেউ এলেই হাতের কাছে যা পেতেন তা-ই দিয়ে দিতেন। বালিকা শ্রীশ্রীমাও তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সেবা-পরায়ণতা। তখন জয়রামবাটী অঞ্চলে প্রায়ই দুর্ভিক্ষ হতো। মায়ের পিতৃদেব নিজের ধানের গোলা থেকে ধান নিয়ে চাল করে হাঁড়ি হাঁড়ি খিচুড়ি রাঁধতে বলতেন দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রামবাসীর জন্য। মায়ের মা তাই করতেন এবং যে-ই আসত তাকেই খেতে দিতেন। আমাদের বালিকা মা—কেউ তাঁকে বলে দেয়নি—ছোট্ট দুটি হাতে পাখা নিয়ে হাওয়া করে পাতে দেওয়া গরম খিচুড়ি ঠাণ্ডা করে দিতেন—যাতে ক্ষুধার্ত মানুষগুলির খেতে সুবিধে হয়। হিন্দুধর্মের মধ্যেই যে গভীর ও ব্যাপক সেবার আদর্শ আছে, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর মধ্যে সে সেবার স্পৃহা সহজাত ছিল, সেটিই শ্রীরামকৃষ্ণ একটি যুগধর্ম হিসেবে উচ্চারণ করেছিলেন নরেন্দ্রনাথের সামনে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' বলে। **মানুষকে দুঃখী মানুষ ভেবে দয়া নয়, সাক্ষাৎ শিব বা ভগবান মনে করে সেবা করা এবং নিজেকে ধন্য বোধ করা।** শ্রীরামকৃষ্ণের এই সেবামন্ত্রকেই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধর্ম রূপে রূপায়িত করেছেন। এটি অন্য ধর্ম বা দেশ থেকে ধার করা নয়। রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবার আদর্শ চরিত্রবৈশিষ্ট্যে সবার থেকে স্বতন্ত্র।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাণ হলো এই সেবা। পরাধীন ভারতে ইংরেজ রাজশক্তির মদতে হিন্দুধর্মের উপরে খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব যখন খোলাখুলি প্রচারিত হতো, তখন যেসব হিন্দুরা নিজেদের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাঁদের প্রাণে লাগলেও খ্রিস্টধর্মের এই প্রচারের বিরুদ্ধে তাঁরা কোনো জুৎসই জবাব খুঁজে পেতেন না। সেটা হলোঃ 'আমাদের ধর্মে charity বা সেবা আছে, তোমাদের ধর্মে কই? তোমরা কোথায় সেবা কর?' রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা তাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত সেই জুৎসই উত্তর জুগিয়ে দিয়েছিল। প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর

'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষে'র 'মহান সেবাব্রতিগণ' অধ্যায়ে দেখিয়েছেন ঃ রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা সারা ভারতবর্ষে কী আলোড়ন, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল সর্বসাধারণের মধ্যে, বিশেষত, যুব সমাজের মধ্যে। স্বামীজী বলে গেছেন ঃ এবার একটা নতুন রাস্তা করে দিলাম। এবার কাজ করে, সেবা করে মানুষ ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবে।

স্বামীজী বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের ভূয়সী প্রশংসা করে নিম্নলিখিত ভাবের কথা বলেছেন ঃ বুদ্ধের আগে যে ধর্ম ছিল (অর্থাৎ হিন্দুধর্ম ছিল), তা 'ভগবান ভগবান' খুব করত, কিন্তু ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যে মানুষ তার দিকে তাকাত না। কিন্তু বুদ্ধদেব ঠিক বিপরীতটি করলেন। তিনি ভগবান বলে কিছু আছে, এটা পরিষ্কার করে বললেন না। কিন্তু মানুষের দিকে করুণা-ভরা হৃদয় নিয়ে তাকালেন, মানুষের সেবার জন্য হাত বাড়ালেন। **যে-ধর্ম ভগবানের কথা বলে না, বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করে না—সেই নাস্তিক মতবাদ ভারতে বেশিদিন চলে না। কিন্তু বুদ্ধের মতবাদ নাস্তিক মতবাদ হওয়া সত্ত্বেও শুধু এই মানবমুখীনতার জন্য এত দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। ঐ মানবমুখীনতাই বৌদ্ধধর্মের শক্তি**। সেই স্বামীজীই আবার বৌদ্ধধর্মের দুর্বলতা হিসেবে নির্দেশ করেছেন এইটিকে যে, বৌদ্ধধর্ম নির্দিষ্ট করে ইতিবাচক কোনো শেষ লক্ষ্যের কথা বলেননি। সত্য, ব্রহ্ম বা ভগবানই আমাদের পরম ও শেষ লক্ষ্য—এরকম কোনো কথা বলেননি। তাই বৌদ্ধধর্মকে তার জন্মভূমি ভারত অস্বীকার করেছে। ভারতের থেকে গিয়ে ভারতের বাইরে এই ধর্ম বিস্তৃত হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ অনুযায়ী স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য সেবা ও ধর্মের যে রূপটিকে আচরণীয় বলে নির্দেশ করেছেন, তার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের শক্তির দিকটি আছে কিন্তু দুর্বলতাটি নেই। আমরা মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকি, আবার ভগবানের দিকেও তাকিয়ে থাকি। কারণ আমরা জানি, মানুষই ভগবান। আমরা মানুষের সেবার মাধ্যমে ভগবানের সেবা ও উপাসনা করি, আবার সরাসরি ভগবানের পূজা ও সেবাও করি। **যুগপৎ মানুষ ও ভগবান, এই উভয়েরই সেবা-পূজা করে বলে রামকৃষ্ণ মিশনের শক্তি অপ্রতিরোধ্য।**

আর একটি কথা। এই রামকৃষ্ণ মিশন ত্যাগী ও গৃহীর মিলিত সংস্থা। রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ যেগুলি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসিরা প্রতিদিন যে-কাঠামোয় জীবনযাপন করেন, ধ্যান-জপ, পূজা জ্ঞানে কাজ (Work is worship) এবং শিবজ্ঞানে জীবের সেবার মাধ্যমে—তা **শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী বা রামকৃষ্ণ-ভাবানুসারী সাধু-ব্রহ্মচারিদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, সেগুলি প্রতিটি গৃহীদের জন্যও অবশ্য পালনীয় যুগধর্ম বা কর্তব্য।**

রামকৃষ্ণ মিশনের আরেকটি শক্তি—সর্বধর্ম সহিষ্ণুতা ও সর্বধর্ম গ্রহীষ্ণুতা। **'আমরা শুধু সব ধর্মকে সহ্যই করি না, সব ধর্মকেই আমরা সত্য বলে গ্রহণ করি।'**—স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় প্রথম দিনের ভাষণে এটি বলেছিলেন। এই ভাব রামকৃষ্ণের আর একটি শক্তি। স্বামীজী বলেছেন ঃ এটি একটি non-sectarian sect, অ-সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়। 'রামকৃষ্ণ মিশন' ও 'রামকৃষ্ণ মঠ'রূপী 'সম্প্রদায়ের' মধ্যে সম্প্রদায়ের শক্তিটি আছে, কিন্তু সম্প্রদায়ের দুর্বলতা বা বিষটি নেই। যে-কোনো সম্প্রদায়ের শক্তি হচ্ছে ঃ নিষ্ঠা, দৃঢ়তা। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ঠাকুর-মা-স্বামীজীকে খুঁটি হিসেবে ধরে ঘুরপাক খায়। এঁরা তিনজন চিরন্তন সত্যের প্রতীক। সেই চিরন্তনকে ধরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সব সাধনা ও কর্ম। এদের নিষ্ঠার ভাণ্ডার তাই সবসময় পরিপূর্ণ। আর সম্প্রদায়ের দুর্বলতা কি, দোষ কি? সম্প্রদায়ের দোষ হলো গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, 'আমরাই শ্রেষ্ঠ, আমরা একাই থাকব'রূপ ভয়ঙ্কর অনুদারতা। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন-রূপ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য হলো সর্বধর্ম-সমভাব। অসাম্প্রদায়িকতাই এই সম্প্রদায়ের লক্ষণ। প্রবল নিষ্ঠা ও অসাম্প্রদায়িকতার এই যুগপৎ উপস্থিতি 'রামকৃষ্ণ মঠ' ও 'রামকৃষ্ণ মিশন'কে অপ্রতিরোধ্য করেছে।

সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারিরা যাতে স্বামীজী-প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শটি জীবনে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে পারে, তার জন্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ তাদের কাছে ফর্মুলার মতো করে একটি উপদেশ দিয়েছিলেন, প্রতিদিন সেটি মেনে চলার জন্য। 'Meditate, meditate and meditate and serve his creatures' ভগবানের ধ্যান-জপ করে চল আর তাঁর সৃষ্ট মানুষ ও প্রাণীদের সেবা করে চল। আগেই বলেছি, এই আদর্শ গৃহীদেরও। প্রতিটি গৃহীও যদি রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ মেনে চলে, তবে ভারতবর্ষ স্বামীজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষ হয়ে উঠবে। ভারতবর্ষকে সামনে রেখে পৃথিবীতেও আসবে একটি আদর্শ সভ্যতা। সেটিই শ্রীরামকৃষ্ণের 'মিশন'। সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের শক্তি দিয়ে, স্বপ্ন দিয়ে, সাধনা দিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন-রূপ 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' নির্মাণ করে গেছেন জগতের কল্যাণের জন্য।

চরিতানুধ্যান

শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার মণি মাণিক্য!

স্বামী সুপর্ণানন্দ *

তাঁর সাধন জীবনের ঘটনাগুলিই স্বর্ণোজ্জ্বল। সে অন্তর্জীবনের যতটুকু লীলাপ্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে তারই কিছু হীরকখণ্ড তুলে আনা। সেখান থেকেই তিনি তাঁর বিস্তার অনন্যতা এবং সর্বজনীন আদর্শের রূপরেখা দিয়ে গেছেন। স্বামীজী বলতেই পারেন ঠাকুরের জীবনের কথা লিখতে তিনি ভয় পান। তাঁকে কোনোভাবেই কেউ প্রকাশ করতে পারেন না। আর আমাদের কথা কি? দুঃসাহসিক কাজ। লেখার অর্থ চর্বিত চর্বণ, বলা—মানে উচ্ছিষ্টের মতন। অন্যদের লেখা এবং বলা কথাই বলা বা লেখা। ঠাকুরের খ্যাতি অর্জনের মতো কী-ই বা ছিল? প্রায়-নিরক্ষর এবং গ্রাম্য ভিখিরি বামুন। কিন্তু শরীর যাওয়ার মাত্র ৬ বছরের মধ্যেই সাগরপারে এই পরমহংসের পাখার বজ্র নির্ঘোষ শোনা গেল। পৃথিবী কেঁপে উঠল তাঁর নামে। বৃহৎবর্ণময় দীপ্তির বিস্ময় তিনি। তিনি নিজের মধ্যে বিশ্বের বহুবিচিত্র সাধনার ধারাকে আহরণ করেছিলেন। যা পেলেন তাই আমাদের কাছে অমৃতস্বরূপ—তা দিলেন অকাতরে, ফলে খণ্ড বিচ্ছিন্ন জগতকে অখণ্ডরূপে দেখার বাসনা জাগ্রত হয়েছে বিশ্ববাসীর মনে। এটি পরম লাভ। তার পূর্ণ ফল পাবে অনাগত ভবিষ্যৎ। আমাদের বড় গর্ব এই যে, তিনি আমাদেরও সাধনার ধন, পরমধন, আমাদের ইষ্ট। সেজন্যেই তো বলতে হচ্ছে তাঁর কথা। ইষ্টকথা। কেন? ইষ্টকথা শুনলে অনিষ্ট নাশ হয় যে!

তাঁর অবদান ঃ স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকেই তিনি আমাদের দিয়েছেন। এতবড় দানের তুলনা নেই। এ দান না পেলে সব নিয়েও আমরা নিঃস্ব থাকতাম। আর বিবেকানন্দ আমাদের দিলেন এক নতুন পৃথিবী—যা রামকৃষ্ণের ছাঁচে গড়া পৃথিবী। আমরা তাঁর জীবন নিয়ে, ভাব, আদর্শ নিয়ে বহু আলোচনা করেছি। আমরা তাঁর জীবনী ধরে ধরে তেমন কিছু আলোচনা করি না। সেই অসামান্য জীবনের কতটুকুই বা লেখনীরূপে প্রকাশিত হয়েছে? যা হয়েছে, তার সামান্যই এখন আমরা তুলে ধরব।

তাঁর জন্ম, অজ হলেও, মাতৃগর্ভে চন্দ্রমণির পুত্ররূপে ১৮৩৬ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি, পিতা ক্ষুদিরাম। সকলের নয়নের মণি। তাঁর কামারপুকুর নববৃন্দাবন হয়ে উঠেছে। ১৮৫৩ সালে দাদা রামকুমারের সঙ্গে (১৭ বছর) কলকাতায় এলেন। ১৮৫৫-তে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা। রামকুমার পূজক, পরে গদাধর। ১৮৫৫-১৮৮৫ আগস্ট পর্যন্ত ৩০ বছর দক্ষিণেশ্বরে থাকা। ১৮৮৫ সেপ্টেম্বরে শ্যামপুকুরে, ১৮৮৫ ডিসেম্বরে কাশীপুরে এবং ১৬ আগস্ট, ১৮৮৬ মহাপ্রয়াণ।

❑ নরেন্দ্রের প্রথম দর্শন ১৮৮১ নভেম্বর, ১৮ বছর বয়স; একসঙ্গে থাকা ১৬ আগস্ট, ১৮৮৬ পর্যন্ত মাত্র ৪ বছর ৯ মাস। গুরু শিষ্যের সম্মিলিত জীবনধারার ব্যাপ্তি মাত্র ২৩ বছর, অর্থাৎ এঁরা পৃথিবীতে একসময়ে ছিলেন ১৮৮৬ পর্যন্ত (১৮৬৩-১৮৮৬)। নরেন্দ্রনাথ একা ছিলেন ১৮৮৬ থেকে ১৯০২, মাত্র ১৬ বছর। এই ১৬ বছরই ঠাকুরের কাজে তিনি নিযুক্ত ছিলেন।

ঠাকুরের সাধনা ঃ প্রথম পর্ব ঃ ১৮৫৫-১৮৫৯ ঃ দক্ষিণেশ্বরে ১২ বছর ঃ ১৮৫৫-১৮৬৭। সাধনার প্রকৃতি ছিল—রাগানুরাগভক্তি এবং দিব্যোন্মাদভাব। এই সাধনা শাস্ত্রনির্দেশ মেনে হয়নি। মনই ছিল তাঁর গুরু; অষ্টপাশ ক্রম—ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, মান, কুল, শীল, জাতি, অভিমান—এসব থেকে মুক্ত হওয়া। এভাবে একমাত্র ব্যাকুলতা সহায়ে সব দর্শনাদি হয় এবং তাঁর বাহ্যপূজাও ত্যাগ হয়।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ ১৮৫৯-১৮৬২ ঃ এই সময়ে শেষ দু-বছরে গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নির্দেশে গোকুলব্রত থেকে আরম্ভ করে ৬৪ প্রকার তন্ত্র সাধনার অনুষ্ঠান।

তৃতীয় পর্ব ঃ ১৮৬৩-১৮৬৬ (চার বছর) ঃ (১) রামায়েত সাধুর থেকে রামমন্ত্র নিয়ে ভারতে বৈষ্ণবসম্মত তন্ত্রোক্ত সাধনায় (৬৪ প্রকার) সিদ্ধ হন। (২) আচার্য তোতাপুরীজীর কাছ থেকে সন্ন্যাস নিয়ে তিনদিনে নির্বিকল্প সমাধিমগ্ন হন। (৩) সুফি গোবিন্দ রায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে ইসলাম ধর্মের সাধনা করেন। হজরত মোহাম্মদজীর দর্শন লাভ করেন। (৪) শ্রীশ্রী মাকে ফলহারিণী কালীপূজার দিন দেবীজ্ঞানে ষোড়শী পূজা করেন। এখানেই সাধন-যজ্ঞ পূর্ণ হয়।

* *সুবক্তা সুসাহিত্যিক সুপণ্ডিত এই বিদগ্ধ প্রবীণ সন্ন্যাসী এখন গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশনের সর্বাধিনায়ক।*

খ্রিস্টের দর্শনের জন্য সাধনা করতে হয়নি। বিস্ময়কর সে খ্রিস্টদর্শন। সবার মতোই বুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরের অবতাররূপে পূজা, শ্রদ্ধা করতেন, জৈন তীর্থঙ্কর, শিখগুরু নানক, গুরু গোবিন্দ সিংহদের শ্রদ্ধা করতেন। এঁদের কাউকেও ঈশ্বরাবতার বলে নির্দেশ করেননি।

তাঁর শিক্ষাগত মান নিয়ে আমার মতো অনেক পণ্ডিত-মূর্খের আলোচনা শুনেছি। কিন্তু যে অর্থে বৈদিক ঋষিরা শিক্ষিত, সেই অর্থে তিনিও শিক্ষিত। অসামান্য শ্রুতিধর, মেধাবী। শাস্ত্র আলোচনা শুনে সব মনে রাখতেন। ঈশ্বরভাবে বেঁহুশ থাকেন। তাহলে কি হবে? 'মা' তাই ব্যবস্থা করলেন ঃ ভাবমুখে থাক। একেবারে নূতন কথা। দীর্ঘ শাস্ত্র-ঐতিহ্যের বাইরে একথাটি সংযোজিত হয়ে আমাদের জগৎ-জীবনকে আন্দোলিত করল।

প্রথম পর্বে, প্রথম চার বছরের সাধনার ধারা আমাদের একটু তো জানা দরকার! কেন? (ক) ঠিক ঠিক শাস্ত্র নির্দেশ মেনে তাঁর এ সাধনা হয়নি। মনই ছিল গুরু। (খ) অষ্টপাশ ত্যাগ হচ্ছে কিভাবে? আবার সর্বজীবে শিবজ্ঞান হয়েছে কিনা তার পরীক্ষা করছেন ঃ

- কাঙালি ভোজনের পর উচ্ছিষ্ট খাওয়া, ঘৃণা ত্যাগ হলো কিনা তা পরীক্ষা করছেন অন্যের বিষ্ঠা জিভে দিয়ে। মনের পুরানো সংস্কার নাশ হয়েছে কিনা তার পরীক্ষা করছেন আর দেখছেন নূতন সংস্কার এসেছে কিনা। দেখলেন, এসেছে। এ যুগের গতিশীল মানুষের ক'জন এভাবে নূতন সংস্কারের আগমন পরীক্ষা করতে পারেন? পারেন না বলেই তাদের সব আন্দোলন নষ্ট হয়েছে। তিনি পেরেছিলেন, পারিয়েছিলেন তাঁর শিষ্যদের দিয়ে—তাই তাঁর ভাবাদর্শ উজ্জ্বল। তৃষিত পৃথিবীর কাছে বারিস্বরূপ।
- তাঁর ছিল ব্যাকুলতার বাঁধভাঙারূপ—কান্নার মাধ্যমে প্রকাশিত। বেঁচে থাকাও অসহ্য ছিল। মায়ের হাতের খড়্গ নিয়ে দেহ শেষ করতে উদ্যত। আর তখনই আগল ভেঙে গেল। পার্থক্য দূর হলো—মাকে পেয়ে। দেখলেন—অনন্ত, অসীম চেতনা সমুদ্রে ডুবে আছেন। মায়ের মূর্তি জেগে উঠল। এ মূর্তি হাসছেন, কথা কইছেন, ঘুরছেন সঙ্গে সঙ্গে, শিক্ষা দিচ্ছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন। সব পদার্থ, তাঁর ধ্যানে, তখন গলিত রুপোর তরঙ্গে ভাসছে।
- এত সব যে হচ্ছে তার অর্থ তাঁর জানা নেই। কেন? গুরু নেই যে! সেজন্য মাকেই বলছেন—বুঝিয়ে দে মা, শিখিয়ে দে। মায়ের কাছে অসহায় বালক। মাও শেখাচ্ছেন, এটা কর্। এটা করিসনি। সঙ্গে ফিরছেন। সবই সৃষ্টিছাড়া। কী আনন্দ! বিপুল সুদূর ব্যাকুল ডাকে সাড়া দিয়েছে, ধরা দিয়েছে। একটা ঘোরের মধ্যে প্রাত্যহিক জগতে বিচরণ করছেন। রোস্ রোস্ আগে নিবেদন করি। না। তা হবে না। মায়ের আবদার মানতে হচ্ছে। নিজেই খাচ্ছেন। মাকেও খেতে বলছেন। মা-ছেলের একত্ববোধ যে! এ মাধুর্যের ইতিহাস, কোনো শাস্ত্রে নেই। এ মাধুর্য স্বর্গীয় এবং রামপ্রসাদের বেড়াবাঁধার মাধুর্যকে অনেক গুণ ছাড়িয়ে গেছে।

মা কালীর খড়্গ নিয়ে নিজের দেহ নাশ করতে উদ্যত

- সুতরাং সাধারণ মানুষ যারা চারপাশে ছিল, ভাবলে বায়ুগ্রস্ত, পাগল। কামারপুকুরের মায়ের কাছে পাঠানো হলো। তখন বয়স ২২ বছর। বিয়ের ব্যবস্থা হলো। বিয়ে হলো তাঁরই আগ্রহে। এমনটাও তো কোথায় হয়নি। সত্যিই পাগলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে সারদার। একথা যারা বলে তারা আজ হয়তো আপনাদের, আমার কৃপার পাত্র। কিন্তু ভাবতে হবে তাদের পরিস্থিতিতে পড়লে আমরাই বা কী ভাবতাম।
- ঠাকুর চলে এলেন কলকাতায়। শ্রীমা পিত্রালয়ে জয়রামবাটীতে। দক্ষিণেশ্বরে আবার তিনি দিব্যজগতে, সর্বদাই মাতৃদর্শন, ছয় বছর নিদ্রাহীন। কী রকম? পাতা পড়ে না। জোর করে দু-পাতা জড়ো করলেও চোখ বন্ধ করা যায় না। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চোখে আঙুল ঢুকিয়েও পলক পড়ছে

না। 'মা তোকে ডাকার এই ফল দিলি !! বিষম ব্যাধি ...। যা হবার হোক গে মা, শরীর যায় তো যাক্, তুই থাক।' ব্যাকুল প্রার্থনা ছেলের; মাকে শুনতেই হলো। অভিনব সাধনা অপেক্ষা করছে এবার।

- এখন প্রশ্ন ঃ ১২ বছরের মধ্যে এই চার বছরই যোগসিদ্ধি, ঈশ্বর লাভ সব হলো। পরের ৮ বছর শাস্ত্রীয় পদ্ধতি মেনে সাধন করার কী দরকার ছিল? ছিল। শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথাবলম্বন করে—যুগ যুগ ধরে কত সাধক কত উপলব্ধি করেছেন। সে সবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল। মন তার প্রতারণা করেনি। এ-ভাবনা থেকে মা সব মুক্ত করে দিলেন। এবং গুরুরাও সব একে একে এসে জুটলেন। তাঁদের সাধনারও অসম্পূর্ণতা দূর করলেন এবং নিজেও পরীক্ষায় সফল হলেন। বড় রোমাঞ্চকর সে সাধনা, পৃথিবীর কোনো অবতার, সাধকের জীবনে যা হয়নি।

তোতাপুরীর কাছে বেদান্ত সাধন

শেষ ৮ বছরের সাধনা। ভৈরবী ব্রাহ্মণী যখন এলেন তখন দিব্যোন্মাদ অবস্থা। তিনি বুঝলেন, এসব মহাভাবের লক্ষণ, রাধারানী বা চৈতন্যদেবের হয়েছিল। গুরু তাঁকে পরম্পরাগত শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনপথে নিয়ে গেলেন। তন্ত্রসাধনার স্থান হয়েছিল বেলতলায়। পঞ্চমুণ্ডির আসন হলো। বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত ৬৪টি কলা তন্ত্রে যত সাধন আছে সব কটি করেছেন। কী কঠিন এবং রোমাঞ্চকর সে সব আচার ! সুন্দরী যুবতীর পূজা, তার কোলে বসে সমাধিস্থ, মড়ার খুলিতে মাছ রেঁধে ভোগ দিয়ে তা খাওয়া, কাঁচা নরমাংস চণ্ডিকামূর্তি ধরে খাওয়া, আনন্দাসনে নর-নারীর সম্ভোগানন্দ দর্শন করে সমাধিস্থ হওয়া। শিব-শক্তির বিলাস দেখা এবং সিদ্ধ হওয়া। বীরভাবের পূজা, সবেতেই সিদ্ধি সর্বত্র এই মাতৃভাবের উদয় এবং সমাধিস্থ হওয়া।

এমনটি যে একজন্মে কারুর জীবনে হতে পারে তা অবিশ্বাস্য। তিনি হাজার হাজার বছরের বহুসাধকের, সিদ্ধের এবং অবতারের সাধনা এই ১২ বছরে শেষ করেন।

➤ **বাৎসল্য, মধুরভাবের সাধনা ঃ** জটাধারীর (১৮৬৩-৬৪) রামলালা রয়ে গেলেন তাঁর কাছে, দাস্যভাব—হনুমানের সাধনা। দিনরাত 'রঘুবীর' বলে হাঁক দিবেন। পিছনে কাপড়ের লেজ জড়িয়ে বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছেন লম্বা লম্বা পা ফেলে। কারোর দিকে দৃষ্টি নেই মেরুদণ্ডের শেষ ভাগ বেড়ে গেল। ঠিক ল্যাজের মতন। দুঃখিনী সীতার দর্শন পেলেন। পায়ের কাছে হনুমান এসে বসল এবং জানিয়ে দিল। বলছেন, প্রথমেই সীতাকে দেখেছিলাম। তাই দুঃখেই কাটল জীবন।

➤ **মধুরভাবের সাধনের** সময় মেয়ের বেশ পরে থাকতেন, ঘাঘরা, কাচুলি, বারাণসী শাড়ি। কৃষ্ণবিরহে শরীরের লোমকূপ দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত বের হতো। শ্রীমতী রাধারানী কৃপা করে দেখা দিয়ে দেহে বিলীন হন। সব আশ্চর্য সাধনা, সিদ্ধি তাঁর।

➤ **ইসলাম সাধন ঃ** গোবিন্দ রায়ের কাছে দীক্ষা নিয়ে আল্লা মন্ত্র জপ করতেন, ত্রিসন্ধ্যা। নমাজ পড়তেন। তিনদিনেই মোহাম্মদের দর্শন পান। হিন্দু সংস্কার মুছে গিয়েছিল মন থেকে।

➤ **খ্রিস্টধর্ম সাধন ঃ** যদু মল্লিকের বাগানবাড়িতে (দক্ষিণেশ্বরের কাছেই) বৈঠকখানায় মা মেরীর কোলে যিশুকে দেখে অভিভূত হন। খ্রিস্টের অঙ্গ থেকে জ্যোতি এসে তাঁর শরীরে প্রবেশ করে। তিনদিন এভাবেই মুগ্ধ ছিলেন। মাকেও মন্দিরে দেখতে যাননি। তিনদিন পরে পঞ্চবটীতে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন এক সুন্দর গৌরবর্ণ দেবমানব তাঁর কাছে এসে আলিঙ্গন করে শরীরে লীন হয়ে গেলেন। ঠাকুর বুঝলেন, ঈশামসি যিশু।

➤ **বেদান্ত সাধন ঃ** মন্দিরে মায়ের আদেশ নিয়ে এসে গুরু তোতাপুরীজীর নির্দেশে সাধন হলো। সন্ন্যাস নিতে হবে। গুরুপদে তোতাপুরীজীকে বরণ করলেন। বিরজা হোম হলো। আহুতি শেষ হলো। কৌপীন কাষায় পরিধান। সম্ভবত নাম হয় এসময়ই শ্রীরামকৃষ্ণ—সারদানন্দেরও মত তাই। নামরূপের বাইরে যাবার সাধন। মায়ের রূপ এল মনে।

বারংবার তাই হচ্ছে, জ্ঞানখড়্গ দিয়ে কেটে দিলেন মাকে, গুরুর নির্দেশে। সমাধিস্থ হলেন—তিনদিন তালাবদ্ধ হয়ে থাকলেন। শেষে ওঁকার ধ্বনিতে জাগ্রত হন। এবার ষোড়শীপূজাতে নিজ স্ত্রীকে শাস্ত্রমতে ফলহারিণী কালীরূপে পূজা এবং জপমালাসহ ফল সমর্পণ। এরপর থেকে আর সাধনা নেই।

ফল কী? (১) সর্বদেবদেবী স্বরূপ হলেন ঃ এ সব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর প্রত্যেকধর্মের উপাস্য দেবী অথবা দেবতা তাঁর দেহে বিলীন হন। যেহেতু তিনি সব ধর্মের সাধনা করেছিলেন, তাই সব ধর্মের উপাস্য দেবদেবী তাঁর স্বরূপের মধ্যে অন্তর্লীন ছিলেন। অতএব যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের উপাসনা করেন তিনি তাঁরই মধ্যে সকল দেবদেবীর উপাসনা করেন।

(২) **অবতার বরিষ্ঠ ঃ** অন্যেরা অর্থাৎ পূর্বজরা যুগোপযোগী ধর্মস্থাপনের ব্যবস্থা করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অখণ্ড জগৎ প্রতিষ্ঠার পথ করে দিয়েছেন। জগতের সংহতিকে আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই একত্ব ভাব আধ্যাত্মিকতাকে অবলম্বন করে কেমন করে আসে, তা দেখে আমরা বিস্মিত। বিস্মিত যে এছাড়া অন্য কোনো পথও নেই। সকলেই অখণ্ড জগৎ চান, শান্তি চান। কিন্তু কোন্ ভাব দিয়ে চেষ্টা চলছে? আমাদের এই বড় প্রয়োজনকে সবার কাছে পৌঁছাবার বড় দায়িত্ব রয়েছে।

(৩) **সব ধর্মের সাধন করে তাদের ধর্মের বৈধতা সম্পাদন**ও করলেন। সবাইকে নিয়ে চলতে হবে। সবাইকে সম্মান দিতে হবে। কেউ বড় নয়, কেউ আবার ছোট নয়।

(৪) **ভবিষ্যতের মানুষের জন্য দেশকালোত্তীর্ণ ধর্মীয় তত্ত্বের আলোক বিকিরণ করলেন ঃ** শিবজ্ঞানে জীব সেবা প্রচলন করলেন। জগৎ সমস্যার সমাধানের একমাত্র দিশারী তিনি। তাঁকে যত জানব ততই মঙ্গল। সেজন্য বলি, তাঁকে জানতে মাত্র একটা বই পড়ুন বারেবারে। বইটির নাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। খুব বড় বই, বড় মানুষটিকে সব দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হলে Volume-তো বাড়বেই। কিন্তু 'বড়' বলেই বাতিল হয়ে যাবে?

যত মত তত পথ ঃ (১) যে ধর্মীয় পরিবেশে যে জন্মেছে সেই পরিবেশেই সে অনায়াসে ঈশ্বর লাভ করবে। দরকার ব্যাকুলতা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা। তাহলেই নিজ নিজ ধর্ম ঠিক ধর্ম। (২) দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-অদ্বৈত পরস্পর বিরোধী নয়। (৩) অদ্বৈতই শেষ কথা। (৪) মন-বুদ্ধি সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা যায়। তখন নিত্য লীলা দুই সত্য। (৫) বিষয়বুদ্ধিযুক্ত মানুষের জন্য দ্বৈতভাব।

রামকৃষ্ণ মিশনই যত মত তত পথ উদার মত প্রচারের জন্য একটি সম্প্রদায়-বর্জিত সম্প্রদায় হয়ে উঠছে; এটাই স্বাভাবিক। সে পথে যারা চলে, তারা একটি সম্প্রদায়-বর্জিত হলেও একটি দল। কারণ তারাও একা; অন্যেরা তো তা বলে না। অসংখ্য মানুষ এই দলে আসবে, ধর্মলাভ করতে। ঠাকুরের যোগাবস্থার মূর্তি নিজেই তা পূজা করেন। সবাই পূজা করবেন—ঘরে ঘরে প্রতি ঘরেই তিনিই পূজ্য হবেন। সে ব্যবস্থাও তিনি করছেন; আমরা সবাই উপলক্ষ্য মাত্র।

সংক্ষেপে বলি **তিনটি উপদেশ ঃ** (১) **ভাবমুখে থাকা,** আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, (২) ধর্মরাজ্যে, **যত মত তত পথ** আর, (৩) ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ঃ **শিবজ্ঞানে জীবসেবা।** এই আমাদের জন্য নিদান তাঁর। ভাবমুখে থাকার অর্থ সমাধিতে মনেরও নাশ হয়। 'আমি' জ্ঞান লোপ পায়। যখন ভাবের উপশম হচ্ছে তখন 'আমি' বোধের উদয় হয়ে মনের আবির্ভাব হয়। এই মন নিয়ে জগৎকে দেখা মানে কি? জগৎ স্থূলভাবে নয়, সূক্ষ্মভাবে আছে। এক বিরাট আমি আছে। সগুণ-নির্গুণের মাঝে এই বিরাট আমিই ভাবমুখ। এই আমি ভাবটি আছে বলেই মনে অনন্তভাবের উদয় হচ্ছে। যিনি ব্রহ্ম তিনি শক্তিরূপে জগতে বিরাজিত।

ধর্মরাজ্যে সব মতকে সম্মান দেওয়া প্রয়োজন। কেন না, সব ধর্মই সত্যান্বেষণে রত। চরম সত্যেরই বিভিন্ন প্রকাশ। Lower Truth বা নিম্নতর সত্যরূপে তাদের মূল্য অপরিসীম। আর ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন জীবনে শিবজ্ঞানে জীব সেবার মাধ্যমে সর্বজনীন ধর্মের রূপটি পরিষ্কার হয়। সব ধর্মকে সত্য বলা হলো, আবার প্রতিটি ধর্মের অনুগামীদের শিবরূপে সেবা করলে বিশ্বে শান্তি কল্যাণ সৌন্দর্য সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

'স্ত্রীকে ভগবানের কন্যারূপে দেখবে। তাকে সম্মান করবে। তার ইচ্ছে পূরণ করবে এবং সদা সুখী করবার চেষ্টা করবে।' —রামকৃষ্ণানন্দ

‘কথামৃতের টান’

স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দ *

পৃথিবীর ধর্মীয় পুস্তক সকলের মধ্যে শ্রীম–কথিত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ (যার ইংরেজি অনুবাদ ‘The Gospel of Sri Ramakrishna’ by M) গ্রন্থ সারা বিশ্ব জুড়ে অতি পরিচিত। এর ভাষান্তরও হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়। বহু অধ্যাত্ম–পিপাসু ব্যক্তি তা নিত্য পাঠ করে থাকেন, তাই এই গ্রন্থের চাহিদাও প্রচুর। এই গ্রন্থের আকর্ষণ কীরূপ হতে পারে এবং তা জীবনের গতিপথ কীভাবে পরিবর্তন করে দিতে পারে, সেইরূপ দু–একটি ঘটনা এখানে উপস্থাপনার প্রচেষ্টা করা যাচ্ছে।

প্রথম ঘটনা ঃ স্থান—বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণ। সকালবেলা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো। বললেন তিনি বেলুড় মঠে বিদেশীদের জন্য নির্দিষ্ট যে অতিথি নিবাস সেখানে রয়েছেন, কয়েকদিন বেলুড় মঠের এই পবিত্র পরিবেশে থাকবেন। কথা বলতে বলতে জানা গেল যে, তাঁর আসল বাসস্থান ইংল্যাণ্ডে। বর্তমানে থাকেন জার্মানির বার্লিন শহরে। পেশায় গিটার বাজানোর শিক্ষক। আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা এবং স্বামীজীর সম্পর্কে আসার ঘটনা। আসল কারণ হলো, তাঁর সংসার–জীবনের তিক্ত ঘটনাপ্রবাহ। এরকম অবস্থায় তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কোথায় যাবেন, কোথায় থাকবেন কোনো ঠিক নেই। ঘুরতে ঘুরতে চলে গিয়েছিলেন জার্মানিতে, একটি মাথা গোঁজার ব্যবস্থাও করেছিলেন। বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান এক অস্থির মানসিকতা নিয়ে। একদিন, এরূপ মানসিক অবস্থাতেই ঢুকে পড়লেন একটি বড় বইয়ের দোকানে। নানা প্রকার বইয়ের সম্ভার চারিদিকে। এটা ওটা ওল্টাতে ওল্টাতে হাতে পড়ল—The Gospel of Sri Ramakrishna by M (বাংলায় ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’, শ্রীম কথিত)। এই বইটিও ওল্টাতে লাগলেন। বইয়ের বিষয় ভীষণ ভালো লেগে গেল! এত ভালো লেগে গেল যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বইটি হাতে নিয়ে দোকানে কাউন্টারে গিয়ে দোকানের মালিকের সঙ্গে দেখা করলেন। অনুরোধ জানালেন এই বলে যে, তিনি বইটি বাড়িতে নিয়ে যেতে চান ধার হিসেবে, পড়া শেষ হলে আবার ফেরৎ দিয়ে যাবেন। দোকানের মালিক কিন্তু তাঁকে বইটি বাড়ি নিয়ে যাবার অনুমতি দেননি। তবে, একটি অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন। বললেন—‘আপনি বইটি বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবেন না। কিন্তু এই দোকান আজ যতক্ষণ পর্যন্ত খোলা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি দোকানে বসে নিশ্চিন্তে বইটি পড়তে পারেন। দোকান বন্ধ হবার সময় তা আবার যথাস্থানে রেখে দেবেন।’ ভদ্রলোক তাতেই রাজী। কথা বলতে বলতে খুব আবেগপ্রবণ ও উত্তেজিত হয়ে বললেন—‘জানেন, সে দিনে দোকান খোলা ছিল সেই সময় থেকে ১৮ ঘণ্টা এবং এই ১৮ ঘণ্টা একটানা আমি এই বইটি পড়েছি! কোথাও যাইনি। বর্তমানে এই বইটি আমার নিত্যসঙ্গী ও নিত্যপাঠ্য।’ কী অদ্ভুত আকর্ষণই না রয়েছে এই ‘The Gospel of Sri Ramakrishna’ বা ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ গ্রন্থের; আর তা এই ব্যক্তির জীবনে দিয়েছে কি অপূর্ব শান্তির পরশ!

জার্মানিতে একটি বইয়ের দোকান

দ্বিতীয় ঘটনা ঃ এটি এক সাধুর জীবনের ঘটনা। বর্তমানে এই সন্ন্যাসী বিদেশে আমাদের একটি কেন্দ্রে সেবারত। এঁর সঙ্গেও দেখা হয়েছিল একদিন সকালবেলা, বেলুড় মঠ প্রাঙ্গণে, স্বামীজীর মন্দিরের সামনে। এসেছেন সুদূর আমেরিকা থেকে। তখন তিনি ব্রহ্মচারীরূপে সঙ্ঘে যোগদান করবেন—এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার আগে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ–সঙ্ঘের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ দর্শন

** সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের প্রধান সেবক এই বিদগ্ধ সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ মঠ–এর অন্যতম ট্রাস্টি, অধুনা বেলুড় মঠের ‘ম্যানেজার’ পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।*

করে যাচ্ছেন। তাঁকে মঠ থেকে ধুতি-পাঞ্জাবি, ব্রহ্মচারিদের যেমন পোশাক হয়, তা দেওয়া হয়েছে। তিনি সেগুলি পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর ঘটনাও অতীব চিত্তাকর্ষক। কীভাবে তিনি আকৃষ্ট হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবধারার প্রতি? তিনি এবং একজন ভারতীয় যুবক আমেরিকার একটি শহরে চাকরি করতেন, অবশ্য দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠানে। তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে ঐ শহরে একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। ঘরের ভাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি যা খরচ সব দু'জনে অর্ধেক অর্ধেক দিতেন। ঘরের একদিকে থাকেন তিনি ও আর এক দিকে ভারতীয় যুবক। দু'জনেরই ব্যবহারের জন্য একই রকম আসবাবপত্র। ঘরের দুই প্রান্তে অন্য সব আসবাবপত্রের মধ্যে ছিল দুটি cupboard—যার মধ্যে অনেক রকমের জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা থাকত। এই আমেরিকান ছেলেটি লক্ষ্য করত যে, ভারতীয় ছেলেটি রোজ নিয়ম করে একটি বই cupboard থেকে বার করে পড়ে এবং যথাস্থানে রেখে দেয়। সে দু-এক বার অনুরোধ জানিয়েছে ভারতীয় ছেলেটির কাছে কি বই পড়ে জানার জন্য। কিন্তু সে কখনও তার অনুরোধে সাড়া দেয়নি। তাই এই আমেরিকান ছেলের খুব আকর্ষণ হয় ওই বইটি দেখার জন্য। এমতাবস্থায় মজার ব্যাপার হলো, ভারতীয় ছেলেটি যখন বেরিয়ে যায় তার অফিসে, তখন এই আমেরিকান ছেলেটি তার cupboard-টি খুলে ওই বইটি রোজ পড়তে শুরু করে। বেশ ভালোও লাগতে থাকে। বইটি ছিল 'The Gospel of Sri Ramakrishna'। সে রোজ বইটি পড়তে থাকে আর পড়তে পড়তে এমন আকর্ষণ জন্মায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি যে, সে খুঁজতে থাকে এঁদের জীবনাদর্শে পরিচালিত হচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান আমেরিকায় কোথায় কোথায় রয়েছে? সেরকম জায়গা খুঁজে পেল সে। দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, সে ত্যাগের জীবন গ্রহণ করবে। সেই মতো চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে আমাদের একটি কেন্দ্রে গিয়ে যোগদান করল এবং এখন সে বেলুড় মঠের একজন সন্ন্যাসী হিসাবে বিদেশে একটি কেন্দ্রে সেবারত। এই ক্ষেত্রেও জীবনের গতিকে পরিবর্তন সাধন করল 'The Gospel of Sri Ramakrishna'। কী অদ্ভুত প্রভাব এই গ্রন্থের!

তৃতীয় ঘটনা ঃ একজন বৈষ্ণব-সাধকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তিনি বেশ বয়স্ক মানুষ ছিলেন। পরিবার পরিজন সবাই ছিলেন। তিনি দিন কাটাতেন একটানা ঈশ্বরচিন্তা, নামগুণগান ও ভক্তিগ্রন্থাদি পাঠে। কখনো কখনো দেখেছি বসে আছেন। কোলের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি ছবি রাখা রয়েছে এবং একদৃষ্টে দেখছেন সেই ছবি। আমি জানতে চেয়েছি যে এর কোনো অর্থ আছে কিনা। উত্তরে বলেছেন—'শ্রীশ্রীঠাকুরের এই যে বাহ্যিক-রূপটি দেখছো, এর মধ্যে জগতের সব শ্রেষ্ঠ গুণাবলী অবস্থিত রয়েছে। তুমি শুধু তাকিয়ে থাকো তাঁর দিকে, তাহলেই জানবে যে তাঁর থেকে সেই সব গুণাবলী তোমার মধ্যে প্রবেশ করছে।' আবার দেখতাম, নিবিষ্টচিত্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পড়ছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠের সম্বন্ধে তিনি বলতেন—'যে ব্যক্তি এই বই পড়ে, তার বই পড়ার সাথে সাথে জপও হয়ে যায়। কেমন করে জান? অধ্যায়গুলিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুরু হবার আগে প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রীম লিখেছেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ'। কাজেই যখনই তুমি একটি অধ্যায় পড় ও যত বারই তুমি 'শ্রীরামকৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ কর, তত বারই তাঁর নাম জপ হতে থাকে। অতএব এই গ্রন্থ পাঠে একসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা পাঠ ও তাঁর নাম জপ হয়ে থাকে।' এই কারণেই গভীর আকর্ষণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত গ্রন্থের প্রতি।

চতুর্থ ঘটনা ঃ এখন যে ঘটনাটির উপস্থাপনা করা হচ্ছে, তা কিন্তু উপরোক্ত শ্রেণীর কোনো ঘটনা নয়। সেটি আমাদের উপহার দিয়েছেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক চারুচন্দ্র চক্রবর্তী ('জরাসন্ধ' ছদ্মনামে যিনি পরিচিত) তাঁর লিখিত 'লৌহকপাট' গ্রন্থে *(অখণ্ড সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, পৃঃ৩৭৩-৭৯)*। অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী একটি ঘটনা। তিনি যেহেতু সরকারের 'কারা বিভাগে' কর্মরত ছিলেন, তাই জেলবন্দী নর-নারীদের নিয়ে তাঁর সামনেই ঘটত বহু ঘটনা। সেই রকম একটি ঘটনা তিনি ধরে রেখেছেন এই গ্রন্থে, যার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' গ্রন্থের আকর্ষণ ও শান্তিদায়ী পরশ। তাঁর লেখনী-নিঃসৃত কথাগুলিই এখানে তুলে ধরা হলো ঃ

'সোমবার সাপ্তাহিক জেল-টহলের দীর্ঘ প্রোগ্রাম ঘাড়ে নিয়ে সদলবলে শুরু করেছি পরিক্রমা। এক ওয়ার্ড থেকে আরেক ওয়ার্ড ঘুরছি, আর শুনে চলেছি কয়েদি বাহিনীর হরেক রকম অভিযোগ। ...

ছোকরা-ব্যারাক শেষ করে ফিমেল ওয়ার্ড অর্থাৎ জেনানা ফাটকের গেটের সামনে গিয়ে প্রসেশন থেমে গেল। ... উপর মহলের অফিসারদের নিয়ে ঢুকে পড়লাম। ...

সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে মেয়ে-কয়েদীর দল। আজও তারা একই সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। ...

লাইনের শেষে অনেকটা যেন তাচ্ছিল্যভরে দাঁড়িয়ে আছে একটি তরুণী। ... দেখে হঠাৎ মনে হবে, দয়া মায়া

স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে গড়া সংসারের যে একটা কোমল দিক আছে, তার দেখা সে পায়নি; পেলেও তার সবটুকু স্নিগ্ধতা কে যেন ওর ভিতর থেকে নিংড়ে নিয়ে গেছে। যেন একটি পালিশহীন পাথরের মূর্তি। কৌতূহলহীন শূন্য দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ...

জিজ্ঞাসা করলাম, কি তোমার নাম? ...

নিতান্ত অবহেলাভরে হাতের টিকিটখানা বাড়িয়ে ধরে বলল, পড়ে দেখুন না? শুধু নাম কেন, আরো অনেক কিছু পাবেন। ...

চোখ বুলিয়ে দেখলাম—নাম জ্ঞানদা মল্লিক। ঘরে আগুন দেবার অপরাধে চার বছরের জেল দিয়েছেন সেন্সর জজ্। ...

টিকিটখানা ফিরিয়ে দিতেই একটা বাঁকা হাসির রেখা ফুটে উঠল ওর পাতলা ঠোঁটের কোণে। তার সঙ্গে শ্লেষ মিশিয়ে বলল, আর কিছু জানতে চাইলেন না? কেন আগুন দিয়েছিলাম? কাকে পুড়িয়ে মেরেছি? ...

জেলের মধ্যে মহিলা বন্দিরা

দিনের পর দিন নানা রকম অভিযোগ আসতে লাগল জ্ঞানদার নামে। কাউকে মানে না। কাজকর্ম তার খুশিমতো করে, বেশির ভাগই করে না। বলতে গেলে শুনিয়ে দেয় কড়া কথা। মেট্রনকে যখন তখন অপমান করে বসে। সহবন্দিনীরা বোঝাতে এলে নিঃশব্দে চলে যায় সেখান থেকে, নয়তো ঝাঁজিয়ে ওঠে—নিজের চরকায় তেল দাও গে। ...

একদিন বোঝাতে চেষ্টা করলাম, আর পাঁচজন যেমন চলছে, তেমনি করে চলবার চেষ্টা করো। ... কথার মাঝখানেই এল অসহিষ্ণু জবাব—উঃ, আর কত বক্তৃতা করবেন? ওসব রেখে শাস্তি-টাস্তি যা দেবার দিয়ে দিন। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

এর পরেই আর-একটা কি গুরুতর অপরাধে বেশ কিছুদিনের জন্য তাকে সেল্-এ বন্ধ করতে হলো, আমাদের শাস্ত্রে যাকে বলে solitary confinement।

পরের সপ্তাহে অন্য সব মেয়েদের 'ফাইল'-পরিদর্শন শেষ করে জ্ঞানদার ছোট্ট নির্জন ঘরটির সামনে গিয়ে যখন থামলাম, জেলের নিয়মমতো তৎক্ষণাৎ তার উঠে দাঁড়াবার কথা। সে ধার দিয়েও গেল না! যেমন ছিল তেমনি বসে রইল দেওয়ালে হেলান দিয়ে। একবার তুলেই নামিয়ে নিল রুক্ষ চোখ দুটো, কপালে দেখা দিল বিরক্তির কুঞ্চন। ...

—জানতে চাইলাম, বই-টই পড়বে? ...

—বেশ, দিতে পারেন, নিতান্ত উদাসীন সুরে বলল জ্ঞানদা।

—কি বই পড়বে?

—কি বই আবার! গল্প-টল্প থাকলে দেবেন পাঠিয়ে। আপনাদের ঐ ধর্মের কথা আর পঞ্চাশ গণ্ডা উপদেশ আমার ভালো লাগে না।

—খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলাম একখণ্ড শ্রীম-কথিত কথামৃত। কি মনে হলো, ঐখানাই দিলাম পাঠিয়ে।

সপ্তাহান্তে আবার যখন গেলাম ওদের ওয়ার্ডে, আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই কলকণ্ঠে বলে উঠলো জ্ঞানদা, খু-ব বই পাঠিয়েছিলেন যা হোক! ঐ বুঝি আপনার গল্পের বই? সেদিনই তো বললাম, ও-সব ধম্মের বুলি আমার সহ্য হয় না। ও ছাই আমি খুলিওনি। ঐ পড়ে আছে, নিয়ে যেতে পারেন। দিতে চান তো একটা নবেল-টবেল দেবেন। ...

কথামৃতের পক্ষেই ওকালতি শুরু করলাম। বললাম, নাম দেখেই ভয় পাচ্ছ কেন? ওটাও গল্পের বই। অনেক মজার মজার কথা আছে। পড়েই দেখো না একবার। ...

দিন পনেরো পরে আবার যখন দেখা হলো ওর সঙ্গে, মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে নিতে ভুলে গেলাম। কোনোও সোনার কাঠির মায়াস্পর্শে যেন রাতারাতি বদলে গেছে জ্ঞানদা। সে উগ্রতা নেই, তার জায়গায় এসেছে একটি কোমল শ্রী। সে লজ্জাহীন প্রগল্‌ভতা নেই, দু-চোখভরা লাজনম্র মধুর সঙ্কোচ। ... মৃদু হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, দরজাটা একটু খুলতে বলুন না? মোটা মোটা গরাদে-দেওয়া ভারী দরজাটা খুলে দেওয়া হলো। ...

মাথা নত করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল জ্ঞানদা। গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করল আমার পায়ের কাছটিতে। অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে যেন আপন মনে বলল, ''আজ ভারী ভালো লাগছে মনটা!'' কপালের উপর থেকে রুক্ষ চুলগুলো সরিয়ে আমার মুখের দিকে আয়ত চোখ মেলে জিজ্ঞাসা করল, ''আচ্ছা, এসব কি সত্যি? এমনি ছিলেন ঠাকুর? এমনি আত্মভোলা সরল সদাশিব! এমন সুন্দর কথা সত্যিই বলে গেছেন তিনি?'' ...

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যাবার পর বললাম, বইটা তাহলে ভালো লেগেছে তোমার?

এ কথার আর উত্তর এল না, শুধু চোখ দুটো বুজে এল, মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ল একটি তৃপ্তিময় মৃদু হাসি। কয়েক মুহূর্ত তেমনি তন্ময় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ফিরে গেল তার সেলের মধ্যে।

কয়েকদিন পরে আবার এক রিপোর্ট এল জ্ঞানদা মল্লিকের নামে। গিরিবালাকে ডেকে পাঠিয়ে জানতে চাইলাম, কি ব্যাপার? বলল, পনেরো দিন পেরিয়ে গেছে বলে কেরানীবাবু বইটা ফেরত চেয়েছিলেন। হুকুম শোনা দূরে থাক, উল্টে দশ কথা শুনিয়ে দিয়ে বলেছে, ইচ্ছে হয় রিপোর্ট করুন গে। আমার যা বলার আমি বড় সাহেবের কাছেই বলব। ...

পরের সপ্তাহে দেখা হলো ওর সেলের দরজায়। যেতেই বলে উঠল, আপনার ঐ কেরানীবাবুটিকে একটু ধমক দেবেন তো! যখন তখন বলে পাঠায়, ঐটুকু বই শেষ করতে কদিন লাগে? শুনুন কথা! ঐ বই যে কোনোদিন শেষ হয় না, সে কথা ওকে বোঝা-ই কেমন করে?

ঐ জেলের মেয়াদ আমার শেষ হয়ে এসেছিল। আবার কোথায় গিয়ে ছাউনি ফেলতে হবে, সেই প্রতীক্ষায় দিন গুনছিলাম। হঠাৎ এল সেই অমোঘ আদেশ। শেষবারের মতো যখন ঢুকলাম জেনানা ফাটকের গেটে, তার অনেক আগেই জ্ঞানদার সেলের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল! কিন্তু সেই নিরালা ছোট্ট কুঠরির মায়া ছাড়তে চায়নি। মেট্রনকে বলে-কয়ে ইচ্ছা করেই বেছে নিয়েছিল নির্জন-বাস। আমাকে দেখে বেরিয়ে এসে প্রণাম করল সেইদিনকার মতো। শুধু মাটিতে মাথা ঠেকানো নয়, কম্পমান কোমল হাতে তুলে নিল পায়ের ধুলো। উঠে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল থমথম করছে মুখ, চোখ দুটো ফুলো-ফুলো। তার কোণে শুকিয়ে আছে জলের রেখা, বোধহয় মুছতে ভুলে গেছে। হঠাৎ বলে উঠল অশ্রুরুদ্ধ করুণ কণ্ঠে, **এবার যে ওরা আমার কথামৃত কেড়ে নিয়ে যাবে!**

সঙ্গে সঙ্গে ঝরঝর করে ঝরে পড়ল চোখের জল। যতদূর সম্ভব সহজ সুরেই বললাম, নিলেই বা! তার জায়গায় দুখানা নতুন বই পেয়ে যাচ্ছ তুমি! সেগুলো তোমার। কোনোদিন কেউ ফেরত চাইবে না।

—সত্যি! সিক্ত চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল জ্ঞানদার। তারপর বলল, অনেক দয়া করেছেন, অনেক স্নেহ পেয়েছি আপনার কাছে। শেষবারের মতো আর একটা জিনিস চাইব। ... দেবেন তো?

—কি জিনিস বল? ...

জ্ঞানদা এগিয়ে এল আমার একান্ত কাছটিতে। ফিসফিস করে বলল, **একখানা ঠাকুরের ছবি।**

তখনকার জেলের আইনে কয়েদীর পক্ষে কোনও ছবি বা ফটোগ্রাফ রাখা নিষিদ্ধ। আইন রক্ষার ভার কাঁধে নিয়ে নিজের হাতে তা লঙ্ঘন করি কেমন করে? কিন্তু এদিকে যে দুটি সজল চোখ আমার পানে চেয়ে অধীর প্রতীক্ষায় উন্মুখ, তাদের সে কথা বোঝানো যায় না। তার প্রয়োজনও হলো না। হঠাৎ কখন আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, দেব।

পরদিন জ্ঞানদার কোনও এক কল্পিত আত্মীয়ের তরফ থেকে দু-খণ্ড কথামৃত ওর নামে জমা দেওয়া হলো। তার মধ্যে লুকানো রইল একখানা ঠাকুরের ছবি। ...

অকস্মাৎ একদিন মনে হলো, **নিজের পাশে ঐ স্থানটি ঠাকুরই ওকে দিয়েছেন। এই হতভাগিনী মেয়েটা, সংসারে কারো কাছে যে আশ্রয় পায়নি, তিনি তাকে কাছে টেনে নিয়েছেন। তাঁরই ''কথামৃতের'' সঞ্জীবনী ধারায় ও নতুন করে বেঁচে উঠল।** দৈবক্রমে সে অমৃত আমিই এনে ওর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। আমি তার বাহক। ... এ আমার গৌরব!'

উপসংহার ঃ উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলি থেকে খুব অনুমান করা যায় যে, কেবলমাত্র 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থ গভীরভাবে ও ভক্তিভরে অধ্যয়ন করার মাধ্যমেই শ্রীঠাকুরের পূত জীবন ও পবিত্র চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসার ফলে মনুষ্যজীবন একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। এগুলি তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। এই লেখা সমাপ্ত করার ইচ্ছা স্বামীজীর জীবনের (তখন তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত) একটি অনুভূতির কথা দিয়ে। ঘটনাটি তাঁর প্রামাণ্য জীবনী 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' *(১ম খণ্ড, পৃঃ১০৪-০৫)* স্বামী গম্ভীরানন্দজী তুলে ধরেছেন এইভাবে—'নরেন্দ্রনাথ এখন সত্যই অনুভব করিতেছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ও অপর অনেকের জীবনধারা ক্রমেই পরিবর্তিত হইতেছে ... শ্রীযুক্ত শরৎ ও শশী (স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) নরেন্দ্রভবনে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে ... নিজ অনুভূতিরও সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা কীর্তনের পর তিনি সন্ধ্যাকালে তাঁহাদিগকে লইয়া হেদুয়ায় বেড়াইতে গেলেন এবং কিন্নরবিনিন্দিত কণ্ঠে গান ধরিলেন ঃ ''প্রেমধন বিলায় গোরা রায় ...।।'' গীত সাঙ্গ হইলে নরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, ''সত্যসত্যই বিলাইতেছেন! প্রেম বল, ভক্তি বল, মুক্তি বল, গোরা রায় যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে তাহাই বিলাইতেছেন। কি অদ্ভুত শক্তি! ... দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন।'' '

উদ্যানবাটী—অতীত ও বর্তমান

সংকলক ঃ স্বামী পরেশাত্মানন্দ *

‘শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর কাশীপুর বাগান সদ্য সদ্য ছেড়ে দেওয়া হবে ঠিক হয়। তখন স্বামীজী ব্যাকুল হয়ে বলেছিলেন, ‘‘অন্তত সাতটা দিন যাক, মা এখন শোকাচ্ছন্ন, তাঁকে কী করে যেতে বলা যায়!’’ স্বামীজীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। গাড়ি করে বলরাম বসুর বাড়িতে যাত্রাকালে বাকি ভাড়ার জন্য দারোয়ান মায়ের গাড়ি আটকে ছিল। তখন স্বামীজী অন্তরে শেলবিদ্ধ যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন।’ *{প্রাচীন সাধুদের কথা (২য় খণ্ড)—স্বামী চেতনানন্দ, পৃঃ৮২}*

স্বামীজী তাঁর গুরুভাইদের একটি চিঠিতে লিখেছিলেন—— ‘মঠের নাম কি হইবে একটা স্থির তোমরাই কর। ... টাকা সাত সপ্তাহের মধ্যে পৌঁছিবে; জমির তো কোন খবর নাই। এ বিষয়ে কাশীপুরের কেষ্টগোপালের বাগানটা নিলে ভাল হয় না? পরে বড় কার্য ক্রমে হবে। যদি মত হয় এ বিষয় কাহাকেও——মঠস্থ বা বাহিরের——না বলিয়া চুপি চুপি অনুসন্ধান করিও। দুই কান হইলেই কাজ খারাপ হয়। যদি ১৫।১৬ হাজারের ভিতর হয় তো তৎক্ষণাৎ কিনিবে (যদি ভাল বোঝ)। যদি কিছু বেশি হয় তো বায়না করিয়া ঐ সাত সপ্তাহ অপেক্ষা করিও। আমার মতে আপাতত ওটা লওয়াই ভাল। বাকি ধীরে ধীরে হবে। ও বাগানের সহিত আমাদের সমস্ত association (স্মৃতি জড়িত)। বাস্তবিক এটাই আমাদের প্রথম মঠ। অতি গোপনে——‘‘ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ সংস্কারাঃ প্রাঞ্জনা ইব’’—— (ফল দেখেই কাজের বিচার সম্ভব হয়; যেমন ফল দেখে পূর্ব সংস্কারের অনুমান করা হয়)। ...

ন্কাশীপুরের বাগানের অবশ্য জমির দাম বেড়ে গেছে; কিন্তু কড়ি তেমনি কমে গেছে। যা হয় একটা করো ও শীঘ্র করো। গয়ং গচ্ছ করতে করতে যত কাজ মাটি হয়। ওটাও তো নিতেই হবে, আজ না হয় কাল——আর যত বড়ই গঙ্গাতীরে মঠ হউক না। অন্য লোক দিয়ে কথা পাড়ালে আরও ভাল হয়। আমাদের কেনা টের পেলে লম্বা দর হাঁকবে। চেপে কাজ করে চল। অভীঃ, ঠাকুর সহায়। ভয় কি? সকলকে আমার ভালবাসা দিবে।’ *(পত্রাবলী——স্বামী বিবেকানন্দ)*

স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়——‘ওটি (কাশীপুর উদ্যানবাটী) ছিল ঘোষেদের বাগানবাড়ি, মালিকের নাম গোপাললাল ঘোষ। উত্তরপাড়ার রানী কাত্যায়নীর জামাই। রানী কাত্যায়নী লালাবাবুর সহধর্মিণী। পরে ওদের কাছ থেকে অন্য একজন কিনে নেয়। সেই ভদ্রলোকও পরে গরিব হয়ে যাওয়ায় বাগানবাড়িটি এক-জনকে লিজ দেয়। সে ছিল ইহুদী। শূকর মাংস বিক্রির কারখানা করেছিল। একবার আমাদের মঠ থেকে ঠাকুরের উৎসবের সময় সাধুরা ঠাকুরের ফোটো সাজিয়ে শোভাযাত্রা করে কীর্তন করতে করতে কাশীপুরে আসে। ঠাকুর যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরে ঠাকুরের ফোটোটি রেখে যায়। শোনা যায়, শূকর মাংস বিক্রেতা ইহুদী ঠাকুরের ঘরটিকে সংরক্ষণ করেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইহুদীটি রান্না শূকর মাংস ভ্যাকুয়াম টিনে প্যাক করে নানা স্থানে চালান দিত। এ থেকে সে প্রচুর অর্থ রোজগার করে। ঠাকুরের শতবার্ষিকী উৎসবে ঐ জায়গাটি নেওয়ার কথা হয়, কিন্তু উদ্যোগ-উদ্যমের কমতি পড়ায়, জায়গাটা হাতছাড়া হয়ে যায়। ইহুদীর লিজ শেষ হলে,

কাশীপুর উদ্যানবাটী

---

* *প্রয়াত সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজজীর প্রধান সেবক এই সুবক্তা বিদগ্ধ সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুরে সেবারত।*

সিউড়ির এক ''রামকৃষ্ণ আশ্রম'' প্রায় লক্ষ টাকা দিয়ে সমস্ত বাগানবাড়িটি খরিদ করে রাখে।' *(স্বামী শঙ্করানন্দের গল্পকথা, রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বামুনমুড়া)*

স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ তাঁর *History of Ramakrishna Math and Mission* গ্রন্থে লিখেছেন—'The year 1946 saw the happy realisation of a dream of Swami Vivekananda. Half of the land of the garden-house at Cossipore together with the historic building in which the Master had passed his last months and trained his apostles, and which, in Swamiji's opinion, was really the first monastery of the Order, was purchased in August, 1946. The other half, consisting of vacant land, was also secured in April, 1949. So the garden-house at 90 Cossipore Road was reinstated in its **pristine** glory, and it soon began to draw numbers of devoted pilgrims.'

স্বামী সাধনানন্দ

পুনরায় স্বামী শঙ্করানন্দজীর স্মৃতিকথা থেকে পাওয়া যায়—'ঠাকুরের ইচ্ছায় স্থানটি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের অধিকারে এল। কাশীপুর উদ্যানবাটীর প্রথম Incharge বিনয় (**স্বামী জিতাত্মানন্দ**)। বিনয়ের স্বভাবটি মকরন্দসদৃশ। সাধু এবং ভক্তদের সেবা করিয়ে যথেষ্ট আনন্দ পেত। ভাগ্যবান। ১৯৪৯ সালে সাধু সম্মেলনে একদিন মাত্র যোগদান করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। Blood pressure-জনিত stroke। দু-তিন দিন বেঁহুশ হয়ে পড়েছিল; তারপর শরীর যায়। এরপর মোহন্ত হয় হরসুন্দর (**স্বামী সাধনানন্দ**)।

'বহুকালের পুরানো দোতলা বাড়ি, জীর্ণাবস্থা। বাসের অযোগ্য। তাই কেবল দোতলায় হলঘরে ঠাকুরকে রেখে ওরা সব পাশেই একচালা ঘর করে বাস করত। বর্ষাকালে ঘরের মধ্যে জল পড়তো, ঝুরঝুর করে চুন বালি খসে পড়তো, কখনো কখনো বড় চাঁই সিলিং থেকে খসে পড়তো। নানা জায়গায় কড়িকাঠে শালবল্লার চাড়া দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হতো। দু-চার বছর আগে সাধুরা মেরামত করার প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এলো। যেখানে যেমনটি আছে, কিছু মাত্র অদল-বদল না করে মেরামত করা হবে। নতুন কড়িকাঠ, বর্গা, জানালা, দরজা, সমস্ত বাড়িটি নতুন ইট বালি সিমেন্ট গাঁথনি হবে। বাড়ির খুঁটিনাটি প্লান, এস্টিমেট করা হলো। প্রায় লক্ষ টাকা খরচ হবে। ঠাকুরের একজন ভক্ত কন্ট্রাক্টর, নাম ঋষিকেশ মিত্র সমস্ত খরচ দিল। নিজের লোক দিয়ে মালপত্র জোগাড় করে এক বছরের মধ্যে বাড়ির মেরামত সমাপ্ত করল। সুয্যি, ঋষি তত্ত্বাবধান করত। ওই সময় ঠাকুরকে রাখার জন্য এবং পূজার আরতি করার জন্য অস্থায়ীভাবে উঁচু ভিত করে কয়েকটি ঘর নির্মাণ করা হলো, টিনের চাল, টিনের নিচে চটের সিলিং, গৃহগুলিকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য। ১৯৫৫ সালে ১ জানুয়ারি, কল্পতরু উৎসব-এর দিনে ঠাকুরকে আবার দোতলা হলঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি ঠাকুরকে তাঁর জায়গায় বসিয়ে আসি।'

স্বামী সাধনানন্দজীর সময় বর্তমান যেখানে প্রধান ফটক, সেখানে বড় কাঠের একটি গেট ছিল, তার পাশে একটা ছোট কাঠের গেট ছিল—যার মধ্যে দিয়ে মঠে একজন একজন করে প্রবেশ করতে পারতো। মঠের উত্তর দক্ষিণ এবং পূর্ব দিকে ছোট ছোট কয়েকটি কাঠের গেট ছিল। প্রধান ফটকের দিকে ইটের প্রাচীর ছিল, কিন্তু বেশি উঁচু ছিল না। মঠের উত্তরদিকেও কম উচ্চতার ইটের প্রাচীর ছিল। বাকি দিকগুলিতে টিন ও তার-কাঁটার বেড়া ছিল। কল্পতরু স্থানটি চিহ্নিত বা ঘেরা ছিল না। সেখানে কোনো আমগাছ ছিল না। শ্রীশ্রীঠাকুরের পদার্পণের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের সময় এইগুলি করা হয়। বর্তমানে যেখানে কল্পতরু উৎসবের মঞ্চ তৈরি হয়, সেখানে বড় বড় ৫-৬টি টিন ও এসবেস্টস-এর চাল দেওয়া ঘর ছিল। পূজনীয় সাধনানন্দজী মহারাজ একটি ঘরে, একটি ঘরে পূজারি মহারাজ, অন্য ঘরগুলি লাইব্রেরি, অফিসঘর ও অন্যান্য কর্মচারিদের থাকার ব্যবস্থা ছিল।

মঠের উত্তরদিকের উত্তর-পশ্চিম কোণায় একটি পাকা
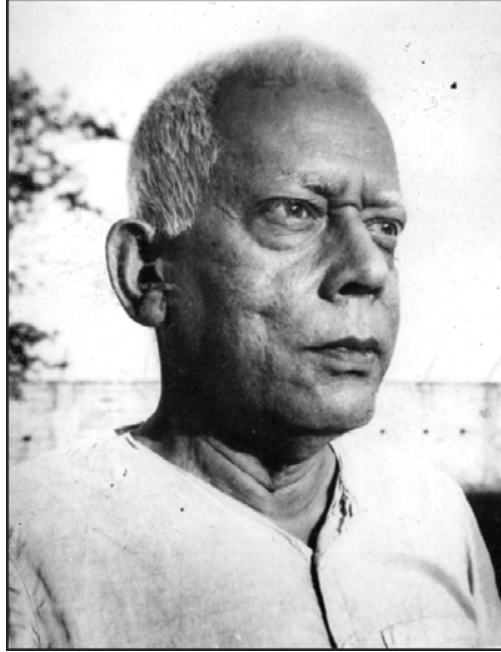
লম্বা-চওড়া আস্তাবল ছিল। মন্দিরের উত্তরদিকে একটা উঁচু ভিত ছিল, যেখানে ভাঙাচোরা ও ছোট ছোট গাছ ভর্তি ছিল। সাধনানন্দজী বলতেন—ওই জায়গায় শ্রীশ্রীমায়ের রান্না ও ভাঁড়ার-ঘর ছিল। স্বামীজীর ধ্যানঘরের পিছনে পুকুরের ধারে গোশালা ও খাটা পায়খানা ছিল। গোশালার দিকের বর্তমান গেটের ডানদিকে ঘরটি এখনো আছে, যেটি সেই সময় উৎসবের ভাঁড়ার-ঘর হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এখন যেটি মিটার ঘর, সেটিতে স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর শিষ্য স্বামী দেবানন্দজী থাকতেন। ঘরটি এত ছোট তাতে একজন মানুষের থাকার পক্ষে কম বলেই মনে হয়। পূজনীয় দেবানন্দ মহারাজ সানন্দে থাকতেন এবং বলতেন এটা তাঁর কুঠিয়া। মন্দিরের চারধারে প্রাঙ্গণে পিচের রাস্তা ছিল না, জমিটি এত নিচু ছিল তিন-চারটে সিঁড়ির ধাপ উঠে মন্দিরে প্রবেশ করতে হতো। মন্দিরের সামনের পুকুরের কেবল সামনের দিক বাঁধানো ছিল।

১৯৬৫ সালে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, তখন তিনি সাধারণ সম্পাদক, বর্তমান সাধু নিবাসের ভিত পূজা করেন। সাধনানন্দজীর সময় এই বাড়িটি তৈরি সম্পন্ন হয়। স্বামী সাধনানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য ছিলেন এবং জাপক ছিলেন। বিনয় মহারাজের পর থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এই আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন।

স্বামী যোগস্থানন্দ

সেই সময় অনেক স্বেচ্ছা-সেবকদের তিনি আশ্রম-এর কাজের জন্য তৈরি করেছিলেন, তাদের মধ্যে কয়েকজন করোনার আগে পর্যন্ত আশ্রম-এর সেবা দিয়ে গিয়েছেন। ১৯৭৯ নভেম্বর মাসে সাধনানন্দজী কাশীপুরে দেহত্যাগ করেন।

স্বামী সাধনানন্দজীর পরে **স্বামী যোগস্থানন্দজী** মহারাজ কাশীপুরের অধ্যক্ষ হিসেবে আসেন। তাঁর সময় আশ্রম-এর প্রাচীর উঁচু করা হয় ও অসম্পূর্ণ অংশের প্রাচীর সম্পূর্ণ করা হয়। এই কাজ করতে গিয়ে তাঁকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করেন। আশ্রমের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল বজায় রেখে এবং স্বামী সাধনানন্দজীর পরম্পরা বজায় রেখে তিনি আশ্রম পরিচালনা করেন।

স্বামী যোগস্থানন্দজীর পরে **স্বামী বাগীশানন্দজী** মহারাজ অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নেন। তিনি কাছাকাছি দুই বছর এখানে ছিলেন। এই সময় বড় পুকুর সংস্কার করাকালীন ঐতিহাসিক খেজুর গাছ পাওয়া যায়, যা এখন সংরক্ষণ করে রাখা আছে।

স্বামী বাগীশানন্দজীর পরে **স্বামী পুরাণানন্দজী** মহারাজ আশ্রমের দায়িত্ব নেন। এই সময় শ্রীশ্রীমায়ের রান্নাঘর, স্বামীজীর ধ্যানঘর, সাধু নিবাসের দোতলার কিছু অংশ, স্টাফ কোয়ার্টার, কল্পতরু স্থান সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন হয়। স্বামী পুরাণানন্দজী এখান থেকে বারাসাত-এর অধ্যক্ষ হিসেবে যান, তাঁর জায়গায় আসেন **স্বামী নির্জরানন্দজী** মহারাজ।

স্বামী নির্জরানন্দজী মহারাজ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর শিষ্য ছিলেন। তিনি অনেক দিন এই আশ্রমের অধ্যক্ষ হিসেবে ছিলেন। মহারাজ তাঁর প্রজ্ঞা এবং সাধুত্ব দ্বারা আশ্রমটি সাধ্যমতো পরিচালনা করেন। এই সময় কল্পতরু উৎসব-এর দর্শনার্থীদের দর্শন করে নামার জন্য মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত লোহার সিঁড়িটি তৈরি হয় এবং কল্পতরু উৎসবের দর্শনার্থীদের দর্শনের সুবিধার কথা চিন্তা করে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়।

স্বামী নির্জরানন্দজী মহারাজকে বার্ধক্যজনিত কারণে কাশীপুর থেকে বেলুড় মঠের আরোগ্য ভবনে স্থানান্তরিত করা হয়। তার জায়গায় আসেন **স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী** মহারাজ।

স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজীর সময় আশ্রমটি একটু নতুন রূপ ধারণ করে—এই সময় আশ্রমের বর্তমান প্রধান ফটক, ওয়াশরুম, দুটি পুকুরের ভূমিক্ষয় রোধের জন্য পাড় বাঁধানো, মন্দিরের ভেঙে যাওয়া কাঠের ছাজাগুলির পরিবর্তন, ভক্তদের খাবার জন্য ডাইনিং হল, রান্নাঘর নবরূপে তৈরি হয়। এই সময় আশ্রমের বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। পূজনীয় মহারাজ আশ্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে খুব কঠোর মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। আশ্রমের আধ্যাত্মিক দিকটা বজায় রাখতে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কল্পতরু উৎসবে দর্শনার্থীদের দর্শনের সুবিধার জন্য তাঁর সময়ে কিছু নতুন

পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়—যার সুফল বর্তমান ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজীর পরে **স্বামী বাগীশানন্দজী** পুনরায় আশ্রম-এর দায়িত্বে আসেন। তিনি ২০২১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত (১২ মার্চ) এই আশ্রমের অধ্যক্ষ পদে বৃত ছিলেন। এই সময় সাধুনিবাসের দোতলা ও তিনতলার কিছু অংশও নির্মিত হয়। কল্পতরু উৎসব-এর জন্য একটি নতুন ওয়াশরুম তৈরি হয়। আরো কিছু কিছু আশ্রমের বিভিন্ন প্রান্তের বাড়িগুলির পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্থানীয় বস্তি অঞ্চলের শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য পুষ্টিকর খাবার এবং পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়, যা আজও চলে আসছে করোনার সময় বাদ দিয়ে। স্বামী বাগীশানন্দজী মহারাজ এখানে অবস্থানকালীন দীক্ষাগুরু ও পরবর্তীতে সঙ্ঘের সহাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হন এবং বহুজনকে তিনি দীক্ষাদান করে ধর্মপথে এগিয়ে যাওয়ার সাহায্য করেন। এই সময়ে আশ্রম-এর ভক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যেহেতু উনি দীক্ষাগুরু হিসেবে এখানে অবস্থান করতেন।

স্বামী দেবানন্দ

স্বামী বাগীশানন্দজীর পরে **স্বামী শিবময়ানন্দজী** মহারাজ কাশীপুরের অধ্যক্ষ হিসেবে আসেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ ছিলেন, ৭ এপ্রিল, ২০২১ সালে তিনি কাশীপুরে আসেন এবং ১১ জুন, ২০২১ করোনায় আক্রান্ত হয়ে সেবা প্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। যদিও তাঁর অবস্থান স্বল্প সময়ের, তবুও তাঁর সাধুজীবন, মরমী হৃদয় এবং পাণ্ডিত্য আশ্রম-এর সাধু, ভক্ত এবং স্বেচ্ছাসেবকের কাজের অনুপ্রেরণার ছিল।

পুরানো কাশীপুর উদ্যানবাটী

স্বামী শিবময়ানন্দজীর পরে **স্বামী দিব্যানন্দজী** মহারাজ আশ্রম-এর বর্তমান অধ্যক্ষ। কাশীপুর উদ্যানবাটীতে স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজ, স্বামী কৈলাসানন্দজী মহারাজ, স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ, স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ, স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ, স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, স্বামী বাগীশানন্দজী মহারাজ অনেক ধর্মপিপাসু ভক্তজনকে দীক্ষাদান করেছেন। স্বামী দিব্যানন্দজী মহারাজ দীক্ষাগুরু হিসেবে এই আশ্রমের দীক্ষাদান করছেন।

কাশীপুর উদ্যানবাটীতে উল্লিখিত অধ্যক্ষ মহারাজ এবং সেই সময় যারা সাধু-ব্রহ্মচারী, কর্মী-স্বেচ্ছাসেবক এবং ভক্ত ঠাকুরের সেবার কাজ করেছেন তারা সকলেই ধন্য। স্বামীজী বলতেন, সঙ্ঘ মানে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর, যে সেই অঙ্গের সেবা করবে, সেই ধন্য হবে।

কাশীপুরে বর্তমানে প্রতি বৎসর ১ থেকে ৩ জানুয়ারি কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষাধিক মানুষ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর, মা, স্বামীজীর তিথি-পূজা উৎসবে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন কীর্তন ও প্রসাদ ধারণের ব্যবস্থা থাকে। শিব চতুর্দশীর দিন সারারাত চার প্রহর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মাঝে মাঝে ভক্ত সম্মেলন, যুব সম্মেলন, জপযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীমা বলতেন—'কাশীপুর তাঁর (ঠাকুরের) অন্ত্যলীলার স্থান, এখানে ধ্যান করলে সিদ্ধ হয়।'

কাশীপুর উদ্যানবাটীটি আজ মহা তীর্থস্থান।

এগিয়ে পড়

স্বামী শিবদানন্দ *

আমরা ছোটবেলায় গুরুজনদের প্রায়ই বলতে শুনতাম— **'চরৈবেতি, চরৈবেতি'**। এগিয়ে পড়, থেমে থেকো না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে ঠাকুর বলছেন ঃ এগিয়ে পড়। সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের মূলকথা ঃ তুমি এগিয়ে চল। তুমি যেখানে আছ, সেখান থেকেই শুরু কর। থেমে থেকো না, এগিয়ে চল যতক্ষণ না লক্ষ্যে পৌঁছাতে পার। থেমে না থেকে এগিয়ে যাওয়াকেই স্বামীজী বলছেন ঃ 'Stop not till the goal is reached.' কি সেই লক্ষ্য? এই লক্ষ্য আমাদের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। প্রত্যেক নর-নারী, প্রত্যেক বালক-বালিকা—সে যে-কাজই করুক না কেন, সে যে-অবস্থাতেই থাকুক না কেন—সর্বাবস্থায় লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে।

আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে 'হওয়া'। লক্ষ্যে পৌঁছানোর উপায় হচ্ছে বেদান্ত। এই বেদান্তে কি আছে? বেদান্তে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। কেন আমি ঈশ্বরকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ধরব? অন্য কিছুকে ধরব না কেন? কারণ ঈশ্বরকে জীবনের লক্ষ্য হিসাবে ধরব আনন্দের জন্য। ব্রহ্মকে বলা হয় সচ্চিদানন্দ, আর জগজ্জননীকে বলা হয় আনন্দময়ী। তিনি আনন্দময়। সব আনন্দ তাঁর কাছ থেকে আসছে। আমরা সবাই আনন্দ চাই। আনন্দের জন্যই তো আমরা সবকিছু করি। বেদান্তের এইসব মহান তত্ত্ব কেবল অরণ্যে বা গিরিগুহায় আবদ্ধ রাখলে হবে না— বিচারালয়ে, ভজনালয়ে, দরিদ্রের কুটিরে, মৎস্যজীবীর গৃহে ও ছাত্রের অধ্যয়নাগারে—সর্বত্র এইসব তত্ত্ব আলোচনা করতে হবে এবং বাস্তবজীবনে কাজে পরিণত করার অভ্যাস করতে হবে।

কিভাবে এই তত্ত্ব জীবনে বাস্তবায়িত করবে? জেলে যদি নিজেকে আত্মা বলে চিন্তা করে, তবে সে একজন ভালো মৎস্যজীবী হবে, ছাত্র যদি নিজেকে আত্মা বলে চিন্তা করে, তবে সে একজন ভালো বিদ্যার্থী হবে। একইভাবে যে যে-পেশায় আছে, সে যদি নিজেকে আত্মা বলে চিন্তা করে, তাহলে সে সেই পেশায় মহৎ হবে। আমি নিজেকে আত্মা ভাবলে, আমার মনের ক্ষুদ্রতা, দুর্বলতা, ইন্দ্রিয়ের বশ, দেহের বশ—এই সকল ভাব আসবে না। আসলে আমি ক্ষুদ্র বা দুর্বল নই—দেহ, মন, ইন্দ্রিয় সবকিছুর ঊর্ধ্বে। বিশ্বসংসারে এমন কোনো শক্তি নেই—যা আমার অগ্রগতিকে বাধা দেয়।

একজন ছাত্র এই তত্ত্বের প্রয়োগ করে কীভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার একটা দৃষ্টান্ত দেখব। একজন যুবক খুব গরিব ঘরের ছাত্র, দুবেলা দুমুঠো খাবার ঠিকমতো জুটতো না। খুব কষ্ট করে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ঠিক এই সময় তার স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডলের মাধ্যমে। সে বিবেকানন্দ যুব-মহামণ্ডলের বিভিন্ন আলোচনা-সভায় যোগদান করত এবং সেখান থেকে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী বুঝবার চেষ্টা করত। স্বামী বিবেকানন্দের একটি বাণীতে তার মন আকৃষ্ট হলো। কি সেই বাণী? বাণীটি হলো ঃ 'তুমি যাহা চিন্তা করিবে, তাহাই হইয়া যাইবে।'[১] এই বাণীটি তার মনের মধ্যে আলোড়ন তুলল। কি সেই আলোড়ন? আমার নিজের জীবন নিজের হাতে। আমার যা হতে ইচ্ছা আমি তা-ই হতে পারি। দারিদ্র্যের কাছে মাথা নত না করে উচ্চমাধ্যমিকে সে ভর্তি হয়ে ভালো ফল করার সংগ্রাম শুরু করল। উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফলও হলো। এখন হতে এই বাণীর অন্তর্নিহিত অর্থ তার জীবনে কার্যকর হতে শুরু করল। এই বাণী তার জীবনে না এলে, হয়তো দারিদ্র্যের কাছে মাথা নত করে সে কোথায় তলিয়ে যেত। প্রত্যেকটা চিন্তার পেছনে, প্রত্যেকটা কার্যের পেছনে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী তাকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা জোগাত। এই প্রেরণায় বি.এসসি-তেও সে ভালো ফল করল। তার যারা অন্যান্য সহপাঠী ছিল, তারা সবাই আরো উচ্চতর শিক্ষায় চলে গেল কিন্তু তার আর এগিয়ে যাওয়া হলো না, কারণ পরিবারের মুখে তাকে অন্ন তুলে দিতে হবে।

আবার এখান থেকে তার জীবনে আর একটা নতুন অধ্যায় শুরু হলো। কি সেই অধ্যায়? সে একটা নতুন জীবনকাহিনী। প্রথমে প্রাথমিক স্কুলে চাকরি দিয়ে সে তার জীবন শুরু করল। বেশ কয়েক বছর পড়ানোর পর তার

** সুলেখক এই সন্ন্যাসী রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচারে সেবারত।*

মনে প্রশ্ন জাগল, এই প্রাথমিক স্কুলেই কি তার জীবন কেটে যাবে?—না এখানে থেমে থাকলে হবে না, আরো এগিয়ে যেতে হবে। সে Miscellaneous services-এর মাধ্যমে Labour department-এ চাকরি পেল। এই চাকরি চলাকালীন W.B.C.S.-এর জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে লাগল। যথাসময়ে W.B.C.S. পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং এই পরীক্ষায় সফল হয়ে সে Food department-এ চাকরিতে যোগদান করল। এর মধ্যে সে ঠাকুর-মা-স্বামীজীর জীবন ও বাণী অধ্যয়ন করে অনুভব করেছে—চাকরিটাই জীবনের সবকিছু নয়। এর পরেও আর একটা জীবন আছে। কি সেই জীবন? —সেই জীবন হচ্ছে ধর্মজীবন। ধর্মকে জীবনের মূলকেন্দ্রে রেখে জাগতিক উন্নয়ন করতে হবে। ধর্মকে বাদ দিয়ে উন্নয়ন করতে গেলে মানসিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। মানসিক বিপর্যয় যাতে না আসে সেই জন্য আধ্যাত্মিক অনুশীলন দরকার। আর মানসিক বিপর্যয় এলেও আধ্যাত্মিক অনুশীলনই মানসিক বিপর্যয় থেকে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করবে। এই অধ্যাত্ম-ভাবনায় ভাবিত হয়ে সে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করে। এটাই হচ্ছে ভারতীয় শিক্ষা। একদিকে জাগতিক উন্নতি আর সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক চর্চা ও চর্যার মাধ্যমে নিজ চেতনার জাগরণ।

বাস্তবজীবনে এই পথে চলার জন্য একটি আদর্শকে অনুসরণ করতে হয়। আমরা সকলেই জানি, আদর্শকে অনুসরণ করে চলতে আমরা কত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হই। বাধা-বিপত্তিতে ভয় না পেয়ে, এগিয়ে চলতে গিয়ে জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট আসবে। দুঃখ-কষ্টতে ভয় না পেয়ে এগিয়ে চলার দৃষ্টান্ত হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন। জীবনে শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তিনি নৈতিক মান বজায় রেখে, ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম জীবনের সবকিছু জেনে চলতেন। এরকমই একটি ঘটনা হলো ঃ বিদ্যালয়ের শিক্ষক একদিন নরেন্দ্রের ভূগোলের পাঠ ভুল হয়েছে মনে করে অযথা তাকে শাস্তি দেন। প্রতিবাদ করে নরেন্দ্র বারবার বলতে থাকে ঃ 'আমার ভুল হয়নি, আমি ঠিকই বলেছি।'[২]

নচিকেতা

নরেন্দ্র প্রতিবাদ করায় শিক্ষকের ক্রোধ বৃদ্ধি পাওয়ায়, তিনি নরেন্দ্রকে নির্দয়ভাবে বেত্রাঘাত করেন। নরেন্দ্রনাথ গৃহে ফিরে সাশ্রুলোচনে মায়ের কাছে এই ঘটনা বললে স্নেহময়ী ভুবনেশ্বরী দেবী সন্তানের বেদনায় আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করে বিগলিত কণ্ঠে বলেন, 'বাছা, যদি তোমার ভুল না হয়ে থাকে, তবে এতে কি আসে যায়? ফল যাই হোক না কেন, সর্বদা যা সত্য বলে মনে করবে, তাই করে যাবে। অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় বা অপ্রীতিকর ফল সহ্য করতে হবে, কিন্তু তবু সত্য কখনো ছাড়বে না।' মানুষের সাধারণত স্বভাব হচ্ছে, সাময়িকভাবে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনাকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া। এটাই সাধারণত বেশিরভাগ সময় আমরা সমাজজীবনে দেখে থাকি। সুস্থ জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে এটা প্রকৃত পথ নয়। মিথ্যার আশ্রয় নিতে নিতে সত্যের কথাই মানুষ ভুলে যাবে। সেই জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে, কখনোই যেন আমরা মিথ্যার সাহায্যে বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে সাময়িক আনন্দের স্বাদ গ্রহণ না করি। সেই জন্য ভুবনেশ্বরী দেবী সন্তানকে বলছেন ঃ 'অনেক সময় হয়তো এর জন্য অন্যায় বা অপ্রীতিকর ফল সহ্য করতে হবে, কিন্তু তবু সত্য কখনো ছাড়বে না।'

সত্য কখনো চাপা থাকে না। সত্য একসময় প্রকাশ পাবেই, সে আজ হোক বা কাল হোক। তাই আমরা দেখতে পাই, শিক্ষক মহাশয় পরে নিজ ভুল বুঝতে পারেন এবং সে ভুল তিনি স্বীকার করেন। ভুবনেশ্বরী দেবী নরেন্দ্রনাথকে আরো বলেন ঃ 'আজীবন পবিত্র থাকিও, নিজের মর্যাদা রক্ষা করিও, এবং কখনও অপরের মর্যাদা লঙ্ঘন করিও না। খুব শান্ত হইবে, কিন্তু আবশ্যক হইলে হৃদয় দৃঢ় করিবে।' জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথে অনেক বাধা-বিপত্তি আসবে, এছাড়াও অনেক রকম প্রলোভনের কাছে নিজেকে অসহায় বোধ হবে, তখন বালক নরেন্দ্রনাথের জীবনের এই ঘটনা আমাদের স্মরণ করতে হবে। কঠোপনিষদে বালক নচিকেতার মধ্যেও এইজাতীয় আত্মশ্রদ্ধা দেখা যায়। তিনি বলেছিলেন ঃ

'অনেকের মধ্যে আমি প্রথম শ্রেণীর, বা অনেকের মধ্যে আমি মধ্যম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; অধম আমি কখনই নই।'[৩]

আদর্শকে অবলম্বন করে জাগতিক উন্নতি করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে, আমি অধম কখনোই নই। হয় আমি উত্তম, না হয় মধ্যম। এইভাবে আত্মসচেতনতা বাড়াতে থাকলে আমাদের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের উন্নতি হবে।

উভয় দিকের উন্নতি কীভাবে সম্ভব সে-বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি সুন্দর গল্প বলতেন ঃ '(একজন) কাঠুরে কাঠ কাটতে গিছিল;—ব্রহ্মচারী বললে, এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দনগাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে, তিনি এগিয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দনগাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। এগিয়ে গিয়ে দেখে রুপার খনি। আবার কিছুদিন পরে এগিয়ে গিয়ে দেখে, সোনার খনি। তারপর কেবল হীরা, মাণিক। এই সব লয়ে একেবারে আণ্ডিল হয়ে গেল।'[৪] এই গল্পে আমরা দেখতে পাচ্ছি, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত এগিয়ে যেতে বলছেন। এখানেও জাগতিক উন্নতি দিয়ে জীবনে পথ চলা। একের পর এক মূল্যবান বস্তু লাভ—যা দিয়ে জাগতিক ভোগসুখ লাভ করা যায়। তারপর সব শেষে—এই সব নিয়ে সে একেবারে 'আণ্ডিল হয়ে গেল'।

বৈদিক শাস্ত্রে দুটি দিক আছে—প্রবৃত্তি অর্থাৎ জাগতিক উন্নতি। এই 'আমি আমার'—যা কিছু এই আমি-কে টাকাকড়ি, ক্ষমতা, নাম-যশ দ্বারা সবসময় সমৃদ্ধ করছে—এগুলি সব প্রবৃত্তির লক্ষণ। এই প্রবৃত্তির প্রকৃতি হচ্ছে সবকিছু আঁকড়ে ধরা। মানুষমাত্রেরই স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা ও সমাজব্যবস্থার উন্নতি করে একটি জনকল্যাণমুখী সমাজ গড়ে তোলা যায়। সামাজিক উন্নয়ন শুধুমাত্র নিজের মধুর আমি-কে কেন্দ্র করে হতে থাকলে সে-সমাজে অবক্ষয় দেখা দেয়।

শুধু আমার উন্নতি নয়। আমার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অর্থাৎ আমার চারপাশে যারা আছে তাদের উন্নয়ন দরকার—যাকে আমরা মূল্যবোধমুখী জীবন বলি, তা অর্জন করা সম্ভব নিবৃত্তির মাধ্যমে। আর এরকম জীবন তৈরি হয় মানুষের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতার জাগরণ থেকে। আর তখনই নীতি এবং ধর্ম আরম্ভ হয়। নিবৃত্তিই সকল নীতি ও ধর্মের মূলভিত্তি। মানুষের মধ্যে নিবৃত্তির ধারণা না থাকলে শুধুমাত্র প্রবৃত্তির মাধ্যমে নিরাপত্তা ও জনকল্যাণমুখী আইন করলে মানুষ প্রকৃতপক্ষে অন্য সব সমস্যারই সমাধান করে ফেলে কিন্তু তখন নিজেরাই নিজেদের কাছে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এটি বর্তমান মানবজীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরা দেখতে পাই, মানুষের মধ্যে অর্থ, ক্ষমতা, ভোগসুখ থাকা সত্ত্বেও তারা মানসিক অশান্তিতে ভুগছে। এই অশান্তি থেকে মুক্তিলাভ করতে আমাদের প্রয়োজন এমন একটি জীবনদর্শন—যা জাগতিক কর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে গড়ে উঠবে। তাই আমরা দেখতে পেলাম কাঠুরিয়া একের পর এক এগিয়ে গিয়ে চন্দনের গাছ থেকে শুরু করে সোনার খনি পর্যন্ত লাভ করল অর্থাৎ অভ্যুদয় বা জাগতিক উন্নতি হলো। সব শেষে হীরা-মাণিক্যের আণ্ডিল—অর্থাৎ নিবৃত্তি। এখানেই প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষা শেষ—ভোগের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। কিন্তু মন তো থেমে থাকতে চায় না—কিছু না কিছু একটা নিয়ে থাকতে চায়। আর এই অবস্থাতেই মন বহির্জগৎ থেকে অন্তর্জগতে প্রবেশ করবে। আর অন্তর্জগতের অধিকতর গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে শান্তিলাভ—অর্থাৎ মানুষ তখন তার অন্তরস্থ সদাজাগ্রত দেবসত্তার সংস্পর্শ লাভ করে।

তথ্যসূচী ঃ ১) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—৫ম খণ্ড, পৃঃ২০। ২) যুগনায়ক বিবেকানন্দ—১ম খণ্ড, পৃঃ২২। ৩) তদেব, পৃঃ৪৭। ৪) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—অখণ্ড, পৃঃ৫৬।

এক মাতাল নৌকায় গঙ্গা পার হচ্ছে। মাঝ নদীতে উঠল ঝড় ও তুফান—নৌকা ডোবে ডোবে। মাতাল সকলকে শুনিয়ে কাতরস্বরে মানত করছে, 'মাগো, রক্ষা করো মা। পারে পৌঁছেই তোমায় ষোলো আনার পুজো দেব।' নৌকা বেঁচে গেল। পারে গিয়েই মাতাল মানিব্যাগ থেকে একটি টাকা বের করে সর্বসমক্ষে বলছে, 'এই দেখো মা-গঙ্গে, ষোলো আনা (এক টাকা) তোমায় দিচ্ছি।' এই বলে টাকাটি ছেড়ে দিল জলে, আর অন্য হাতে জলের নিচে সেটিকে 'মাগো, প্রসাদ দাও' বলে ধরে নিল। —স্বামী অম্বিকানন্দ *(প্রাচীন সাধুদের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ১১৯)*

'খাই-দাই আর মজা লুটি'

স্বামী ঋতানন্দ *

শিরোনামের কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় একটি ভাব। মূল কথাগুলি হলো ঃ

এই সংসার মজার কুটি,
আমি খাই-দাই আর মজা লুটি।
জনক রাজা মহাতেজা, তার কিসের ছিল ত্রুটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে,
খেয়েছিল দুধের বাটি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে এই অংশটুকু পাঁচবার এবং বহুস্থানে এটির আংশিক উল্লেখ আছে। উপরিউক্ত ভাবটিকে আত্মস্থ করেই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'আমার কি ভাব জানো? আমি খাই-দাই থাকি, আর সব মা জানে।' *(অখণ্ড কথামৃত, পৃঃ ১০৩)* যাহোক, অনন্ত ভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এবং উপদেশের বিশেষ উচ্চাবস্থার প্রকাশক এক ভাবপূর্ণ অবস্থার কথা এটি। তাঁর জীবন একের পর এক ভাবের অসীম বৈচিত্র্যে ভরপুর। প্রত্যেকটি ভাবই ধর্ম ও আধ্যাত্মিক জীবনের এক একটি গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটক। দেখা গেছে, সেরকম অনেক ভাবই সনাতন ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থে কিংবা মহামুনি ও ঋষি বা আধ্যাত্মিক পুরুষের জীবনে ইতোপূর্বে উল্লেখিত রয়েছে, অথবা শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ-জীবনে নতুন ভাবের অভিনব প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং জগৎকে এক অভূতপূর্ব মতাদর্শ বা দর্শনের হদিশ দিয়েছেন।

বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাচীন ভারতবর্ষের 'ঋষি-আদর্শ'-এর পুনর্জীবন ঘটিয়েছেন। ঋষিরা সকলেই সন্ন্যাসী ছিলেন না, গৃহী ছিলেন কিন্তু সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করার মতো উচ্চাবস্থা লাভ করে তাঁরা সদাসর্বদা আনন্দময় থাকতেন। বর্তমান সভ্যতায় শ্রীরামকৃষ্ণের বহু অবদানের মধ্যে এটি অন্যতম। সাধন অবস্থার বহুবিধ উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ অসংখ্যবার নিজ-অবস্থার কথা বর্ণনা করেন। সেগুলি তাঁর জীবনে ঈশ্বরলাভের পর যে বিচিত্র ভূমি ও ভাবে তিনি বিচরণ করতেন, সেসব অবস্থার বর্ণনা। তাঁর জীবনের প্রথম, মাঝের এবং শেষ কথাটি হলো 'ঈশ্বরলাভ'। যে যা করতে চায় এবং করতে পারবে—তিনি বোধ করতেন, সেটি যেন ঈশ্বরলাভ কাজটি সম্পন্ন করে তারপর করে, এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। তাঁর জীবনকথা পর্যালোচনায় প্রথমেই যেটা সকলের নজরে আসে, তা হলো 'জো-সো করে' ভগবান লাভ করে নিতে হবে। তারপর বাকি যা কিছু। তাঁর আলাপ-আলোচনা ও কথোপকথনের মধ্যে এটা অতি সুস্পষ্টভাবে তিনি প্রকাশ করেন যে, মানবজীবনের প্রাথমিক কর্তব্য ঈশ্বরলাভ এবং সেটি যেন খুবই সহজ ও সরল। সে কারণে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অবস্থার বিভিন্ন উল্লেখে সেহেন শ্রীরামকৃষ্ণকে স্মরণে রেখে আমরা যেন তাঁর উপদেশ ও বাণীর অবধারণে অগ্রসর হই।

সঙ্গীত শ্রবণরত শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্যামপুকুরবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারমশায়ের সঙ্গে নিভৃতে একদিন (৩০.১০.১৮৮৫) কথা কইছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আচ্ছা, এরা যে সব একাসনে চুপ করে বসে আছে, আর আমায় দেখে—কথা নাই, গান নাই; এতে কি দেখে?

মাস্টারমশাই লিখছেন, ঠাকুর কি ইঙ্গিত করছেন যে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি অবতীর্ণ—তাই এত লোকের আকর্ষণ, তাই ভক্তরা অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। সরাসরি সেরকম কথা না বলে মাস্টারমশাই নিজে থেকে

** সুবক্তা সুলেখক রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে বিশেষজ্ঞ এই প্রবীণ সন্ন্যাসী বেলুড় মঠে সেবারত।*

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের কয়েকটি ভাবের উল্লেখ করে ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

মাস্টার উত্তর করলেন——আজ্ঞে, এরা সব আপনার কথা অনেক আগে শুনেছে, আর দেখে——যা কখনও ওরা দেখতে পায় না——সদানন্দ বালকস্বভাব, নিরহংকার, ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা! সেদিন ঈশান মুখুজ্জের বাড়ি আপনি গিছিলেন; সেই বাহিরের ঘরে পায়চারি কচ্ছিলেন; আমরাও ছিলাম, একজন আপনাকে এসে বললে, এমন 'সদানন্দ পুরুষ' কোথাও দেখি নাই। *(পৃঃ ১০৯৯)*

মাস্টারমশাই শুধু কথামৃতকার নন, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অন্যতম ব্যাখ্যাকার, বিশ্লেষক ও চিন্তক। শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শনের আঙ্গিনায় বিভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠার খোরাক তিনি রেখে গেছেন। শ্রীম-র কিছু দৃষ্টিভঙ্গি, বক্তব্য, কথা ও সিদ্ধান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকে প্রকাশ করেছে দার্শনিকতার নিরিখে নতুন গতি ও মাত্রায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আগমনের আগে দুজন ঈশ্বরাবতারের জীবন ও বাণীর সঙ্গে মাস্টারমশাই গভীরভাবে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁরা হলেন ঃ যিশুখ্রিস্ট এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। এঁদের জীবন ও বাণী মাস্টারমশাইকে ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরার পক্ষে অত্যন্ত কার্যকরী ও ফলপ্রসূ হয়েছে। মাস্টারমশাইয়ের উত্তরের মধ্যে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের কয়েকটি বিশিষ্টতা। প্রথম, তিনি বলছেন, যা কখনও ভক্তরা অন্যত্র দেখতে পায় না। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিরুপম। কি দেখতে পায় না? তাঁর মতো সদানন্দ বালকস্বভাব, নিরহংকার এবং তাঁর ন্যায় ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা কোনো মহাপুরুষকে। কথাগুলির মধ্যে শুধু বিশিষ্টতা নয়, নিহিত আছে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন ও দর্শনের একটি অতি নিগূঢ় দার্শনিক ভাব ও তাঁর ব্যঞ্জনা প্রকাশক অভিব্যক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানীদের বলতেন, ভয়তরাসে। বলতেন, কেউ আম খেয়ে মুখ পুঁছে ফেলে, আবার কেউ আম কেটে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে খায়। পাঁচিলের ভেতর আনন্দ-কলরব শুনে কেউ মই বেয়ে ভিতরে প্রবেশ করে সেই আনন্দে মশগুল হয়ে পড়ে, আবার কেউ সেই আনন্দ উপভোগ করে, বাইরে এসে অন্যকে জানায়। কেউ কুয়ো খুঁড়ে ঝুড়ি-কোদাল কুয়োর মধ্যে ফেলে দেয়, আবার কেউ ঝুড়ি-কোদাল অন্যের কাজে লাগবে বলে তুলে রাখে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনায় জ্ঞানের পর আছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানী পাকা ঘুঁটি কাঁচিয়ে খেলে; আগে বাসা পাকড়ে শহর দেখতে বের হয়। এ অবস্থাকে শ্রীরামকৃষ্ণ কথায় কথায় পুনরুক্তি করেন। বলেন, কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, আবার কেউ দুধ খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে। কাঠে আগুন আছে জানার নাম জ্ঞান, আর সেই কাঠে আগুন জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে যে খেয়েছে, সে বিজ্ঞানী—— অর্থাৎ তাঁরা জ্ঞান লাভের পরেও লোকসংগ্রহে কর্ম করে জগৎকল্যাণে ব্যাপৃত থাকেন।

উপরিউক্ত বিজ্ঞানী অবস্থাটি সকলের হয় না। শুধুমাত্র ঈশ্বরাবতার, অবতারের লীলাসঙ্গিনী, নিত্যসিদ্ধ, ঈশ্বরকোটি ইত্যাদির জীবনে দেখা যায়। এঁদের বলা হয় আধিকারিক পুরুষ। বিশেষ অধিকার নিয়ে তাঁরা জ্ঞানলাভের পরেও দেহ রাখতে পারেন বা তাঁদের দেহটি থাকে। অন্যথায় জীবকোটিদের জ্ঞানলাভের পর বা সমাধিলাভের একুশ দিনের মধ্যে শরীরপাত হয়ে যায়। জ্ঞানলাভের পরে শরীর থাকার ব্যাপারটি সিদ্ধের নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার আওতার বিষয় নয়। সেটি যেন দৈব উদ্দেশ্য সাধনে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও অনুগ্রহ নির্ভর। বেদান্তবাদীদের মতে, অজ্ঞান নিরাকৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞানের কার্য দেহটির স্থিতির কোনো আশ্রয় না থাকার কারণে দেহপাত ঘটে। কিন্তু বিশেষ অধিকারীর ক্ষেত্রে ভগবৎ ইচ্ছায় আপাত আমিত্বের অনুপ্রবেশ তাঁদের দেহ-মনে ঘটে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, শঙ্করাচার্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন; নারদ-প্রহ্লাদের মধ্যে 'ভক্তির আমি' ছিল। নারদাদি বাহাদুরি কাঠ, নিজে ভেসে যেতে পারেন আবার অন্যকেও পার করে দিতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তসাধনের চরম অনুভূতি নির্বিকল্প সমাধি লাভের পর জড়ভাবে অবস্থান করছিলেন। জগন্মাতা অনুভব করলেন, জগৎকল্যাণে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহটি রাখার প্রয়োজন আছে। তিনবার জগন্মাতা তাঁকে ভাবমুখে থাকার আদেশ করলেন। ভাবমুখে থাকা অর্থ ভাবস্থ না হয়ে থাকা। দ্বৈত ও অদ্বৈত অবস্থার মেলভূমিতে মনকে রেখে অদ্বৈতানুভব করতে সক্ষম হওয়া, আবার মানুষের কল্যাণে দ্বৈতভূমিতে মনকে নামিয়ে রাখার ক্ষমতাকে বলা হয় ভাবমুখে থাকা। সেই যে দ্বৈতভূমিতে মনকে নামিয়ে রাখা, তা সাধারণ জীবের মন যে জাগতিক বিষয়ে বিচরণ করে, তা নয়। জ্ঞানলাভের পর জগৎ হিতে মনকে ঈশ্বরেচ্ছায় নিচে নামিয়ে রাখার অবস্থা শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় 'ভাবমুখ'। এই হলো বিজ্ঞানী অবস্থা। অপরপক্ষে, শ্রীমা সারদাদেবীকে জগৎকল্যাণে ভারার্পণ করে ভাবমুখে থাকার অবস্থাটিতে অবস্থান করতে, শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমাকে দর্শন দিয়ে 'একে (রাধুদি) আশ্রয় করে থাকো' বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাধুদির জন্মের পর থেকে শ্রীমায়ের বাকি মর্ত্যজীবনের কুড়ি বছর তিনি রাধুদিকে আশ্রয় করে মনকে

সাধারণভূমিতে রেখে জগদ্ধিত কার্যটি সংসাধন করেছিলেন।

মাস্টারমশাইয়ের শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 'সদানন্দ বালকস্বভাব' কথাটি আলোচ্য শিরোনামটির বহিঃপ্রকাশ বাক্য। আমাদের দেখা জগতের সাধারণ বালকদের বাহ্য ভাবালম্বনে নিজভাব ও স্বভাবের একটি আন্তর গুহ্য অবস্থার বর্ণনা রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্ত কথাটির মধ্যে। কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখতে হবে, সাহিত্যে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের মধ্যে সর্বাংশে সাদৃশ্য থাকে না। কোনো কোনো দিকের বাহ্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করে উপমান ও উপমেয়র মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা হয়। সাধারণ বালকচরিত্রের সারল্য, উদারতা, নিরহংকারিত্ব, কোনো জিনিসে আঁট বা আসক্তি না থাকা, কোনো গুণের বশ না হওয়া, লজ্জা, ঘৃণা, সংকোচ ইত্যাদি না থাকলেও জ্ঞানলাভের পর যে বালকভাবের অবস্থা, তা সাধারণ অজ্ঞান-বালকাবস্থা নয়, সেটি পরমহংস অবস্থা।

শ্রীরামকৃষ্ণের বালকস্বভাব মাতৃভাব সঞ্জাত। তিনি জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন, 'কি জান, আমার ভাব—সন্তানভাব, মাতৃভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব, এতে কোন বিপদ নাই।' *(পৃঃ ১১৮২)* শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাব দু-ভাবে তাঁর জীবনে প্রকাশিত হয়েছে। এক, তিনি জগদম্বার বালক, জগদম্বা তাঁর মা। বলছেন, মাতৃভাব শুদ্ধভাব ইত্যাদি। অপরটি হলো শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অন্যতম বিশ্লেষক শ্রীমা সারদাদেবীর ঠাকুরের জীবন থেকে একটি অতুলনীয় আবিষ্কার। তিনি জানিয়েছেন, 'জানো তো বাবা, জগতের সকলের উপর ঠাকুরের মাতৃভাব ছিল। সেই মাতৃভাব বিকাশের জন্যই তিনি এবার আমায় রেখে গেছেন।' এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ জগতের সকলের মা, এবং জগতের সকলে তাঁর সন্তান। সমগ্র লীলাপ্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণকে জগদম্বার বালকরূপেই দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় ভাবটি শ্রীমায়ের এক অনুপম মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ। যদিও স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানদের কয়েকজন মাত্র ঠাকুরকে 'মা' বলে মনে করতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিক জগতের শুদ্ধ-পবিত্র রাজপথে সকলকে চালিত করেছেন। তাই তাঁর জীবনে অতি প্রিয় এবং সরল-সহজ নির্ভয় পথ মাতৃভাব ও বালকস্বভাবের প্রতি তাঁর চির অনুরাগ ও সহজাত আকর্ষণ দেখা গেছে। নিজ জীবন ও ভাবের অনুপ্রেরণায় 'বালকস্বভাব'-এর উল্লেখ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে পর্যাপ্ত বিস্তৃত। বিভিন্ন সময়ে বলা তাঁর বিচিত্র ভঙ্গিমার কিছু উদ্ধার আলোচ্য বিষয়টিকে সহজ করে তুলবে। তিনি বলছেন, 'ঈশ্বরলাভ যে হয়েছে, তার লক্ষণ আছে। বালকবৎ, জড়বৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ হয়ে যায়; যেমন শুকদেবাদি। চৈতন্যদেব কখন বালকবৎ, কখন উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করিতেন। হাসে, কাঁদে, নাচে, গায়। পুরীধামে যখন ছিলেন, তখন অনেক সময় জড় সমাধিতে থাকতেন।' *(অ.ক. পৃঃ ৪১)*

'যার ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তাঁর বালকের স্বভাব হয়। সে ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই।' *(অ.ক. পৃঃ ৫৪৩)* '...হয়তো বাহ্যে করতে করতে কুল খাচ্ছে, বালকের মতো।' *(অ.ক. পৃঃ ৪৮২)*

'কখনও বা বালকবৎ—পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা। সরল-উদার, অহংকার নাই, কোন জিনিসে আসক্তি নাই, কোন গুণের বশ নয়, সদা আনন্দময়।' *(অ.ক. পৃঃ ২৭৯)*

'পরমহংস অবস্থায় বালক হয়ে যায়। পাঁচ বছরের বালকের স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান নাই।' *(অ.ক. পৃঃ ৫৩৪)*

লক্ষণীয়, উপরি-উক্ত বালক অবস্থার বর্ণনায় অব্যর্থভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ উল্লেখ করেছেন যে, সে অবস্থা ঈশ্বরদর্শনের পর হয়ে থাকে। এরকম অবস্থায় থাকতে শ্রীরামকৃষ্ণকে অহরহ দেখা গেছে।

সদানন্দ বালকস্বভাব

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

আমার দেখা 'প্রভু মহারাজ'

স্বামী বিপাশানন্দ *

প্রথম বেলুড় মঠ দর্শন ঃ মহাত্মাদের দর্শন বিশেষত আধ্যাত্মিক গুরুদের সর্বদা স্বর্গীয় আশীর্বাদের মতো। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীকে প্রথম দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করি আমি ১৯৬২-র নভেম্বর মাসে, বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে। তিনি তৎকালীন সময়ে মঠে সাধারণ সম্পাদকের পদে আসীন। আমি ও আমার পাঁচ স্বেচ্ছাসেবী বন্ধু, পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী মাধবানন্দজীর কাছে দীক্ষালাভের অভিপ্রায়ে বেলুড় মঠে গেছিলাম। আমরা দেখলাম, সন্ধ্যারতির শেষে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তাঁর অফিসের বাইরে একটি কাঠের বেঞ্চে অভয়ানন্দজী মহারাজ ও অন্যান্য কিছু সন্ন্যাসিদের নিয়ে বসে আছেন। আমাদের পুনার আশ্রমটি সেইসময়ে মঠ ও মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। পুনা আশ্রমের সচিব শ্রী পি.এম. বোদাস সহযোগে মঠের অতিথি নিবাসে অবস্থান করছিলাম আমরা ৩ নভেম্বরের সকাল থেকে। সেইদিন সন্ধ্যারতির শেষে শ্রীবোদাস আমাদের সাথে সাধারণ সম্পাদক মহারাজ বীরেশ্বরানন্দজী ও মঠ ম্যানেজার মহারাজ অভয়ানন্দজীর সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে যান। তৎকালীন মঠ-মিশনের প্রধান অফিস ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের সম্মুখবর্তী বাড়িটিতে।

আমার আজও স্মরণে আছে, শ্রদ্ধেয় মহারাজের চারিদিকে যেন আধ্যাত্মিকতার একটা জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। বাহ্যিকভাবে সেটি সকলের দৃষ্টিতে না এলেও, তাঁর শিশুসুলভ সরলতার মধ্যে দিয়ে সেটি বারবার অনুভূত হচ্ছিল। তাঁর গায়ের বর্ণ ছিল সুগৌর এবং তিনি ছিলেন সাধারণ আকৃতির। তাঁর চশমাটি চোখের মাপের তুলনায় একটু বড় আকারের বলে আমার মনে হয়েছিল। অন্যান্য মহারাজদের তুলনায় তাঁর কথাবার্তা আমার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় লাগছিল। তিনি আমাদের দিকে মাঝে মাঝেই হাসিমুখে তাকাচ্ছিলেন। হতে পারে সেটা আমাদের অপরিণত বয়সের চপলতার জন্য। আমরা ভক্তিপূর্ণ চিত্তে তাঁদের সকলকে প্রণাম করলাম। দীক্ষার পরে মহারাজের সঙ্গে আবার দেখা করলাম। চলে যাবার পূর্বে উনি আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন আর সেটাই ছিল তাঁর আশীর্বাদ—আমি বিশেষভাবে সেটা মনের মধ্যে অনুভব করেছিলাম।

১৯৬৩ সালে আমি সঙ্ঘে যোগদান করি আমার মন্ত্রদাতা নবম সঙ্ঘগুরুর আশীর্বাদ নিয়ে। আমি গুরুদেবকে সেবা করার অনুমতি চাইলে তিনি বলেন যে, মঠে যোগদান করে শ্রীশ্রীঠাকুরের যে কোনো সেবাকার্য করলে সেটাই গুরুসেবা বলে গণ্য হবে। এবং আমার গুরুদেব স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে বলেন এবং স্বামীজী আমাকে কনখল আশ্রমে গিয়ে সঙ্ঘে যোগদান করতে বলেন। ১৯৬৪ সালে কনখলেই বীরেশ্বরানন্দজীর সঙ্গে আবার দেখা হয়। স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী তখন কার্যকরী সম্পাদক, আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজের কথা আমার মনে আছে কিনা ? আমি সম্মতি জানিয়ে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলে তাঁকে জানালাম যে, আমার নবজন্ম হয়েছে সঙ্ঘে যোগদানের পর। তিনি আমাকে একটি প্রাত্যহিক সময়সূচী তৈরি করতে বললেন যার ভেতরে জপ-ধ্যান, শাস্ত্র-অধ্যয়ন, ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য সিদ্ধ সাধকদের জীবনী পাঠ, হাসপাতালের কাজকর্ম জীবন ও বাণী সবই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। 'হাসপাতালের রোগী'দের সেবা করাকে গুরু মহারাজের সেবার সমতুল্য মনে করা যে প্রকৃত যোগের লক্ষণ, সে-বিষয়ে তিনি উপদেশ দিলেন। তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে আমি তাঁর কক্ষত্যাগ করলাম।
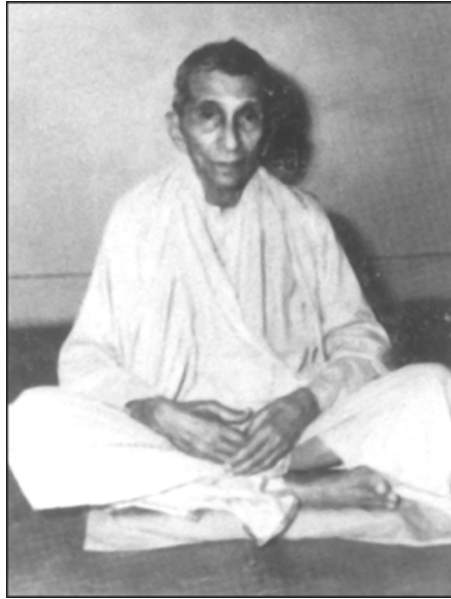
স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী

কয়েকমাস পরে মাইগ্রেনের তীব্র যন্ত্রণা আমাকে মাঝে মাঝেই কাবু করে ফেলতে লাগল। ডাক্তারের পরামর্শমতো,

* *কিষানপুর আশ্রমের ভূতপূর্ব সম্পাদক এই অতি প্রবীণ সন্ন্যাসী বেলুড় মঠে সাধনরত।*

কনখল আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর মারফৎ, প্রভু মহারাজের কাছে স্থান পরিবর্তনের আর্জি জানালাম। মহারাজ পত্রে অনুমতি দিয়ে বৃন্দাবন আশ্রমে স্বামী কৃপানন্দজীর উপদেশ মতো আমায় চলতে বললেন এবং স্বামী সারদেশানন্দজীর মতো বরিষ্ঠ সন্ন্যাসীদের সঙ্গ করতে বললেন।

মহারাজের দিগ্‌দর্শন নবীন সঙ্ঘ–সদস্যদের প্রতি ঃ আমি ব্রহ্মচারিদের প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করি ১৯৬৮–তে। পূজনীয় বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ নবীন ব্রহ্মচারিদের সাথে সাক্ষাতের সময় রেখেছিলেন প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পরে। দুজন করে ব্রহ্মচারিদের অনুমতি ছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করার আধ্যাত্মিক উপদেশলাভের জন্য। আমার পালা এল তাঁকে সাক্ষাৎ করার এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণামের পর তিনি আমার সকাল ও সন্ধ্যার আধ্যাত্মিক অনুশীলনের খোঁজ নিলেন। যখন আমার হৃদয়ে যন্ত্রণার কথা তাঁকে জানালাম, তিনি সমস্ত কিছু শ্রীগুরুমহারাজের পায়ে অর্পণ করার কথা বললেন আর উপদেশ দিলেন ঐকান্তিক প্রার্থনা করতে। তিনি জানালেন যে, আমার গুরুদেবও তাঁর নিজের গুরুর সেবা করার সৌভাগ্যলাভ করেননি এবং প্রতিদিনের কর্মফল শ্রীশ্রীঠাকুরকে উৎসর্গ করাই হচ্ছে প্রকৃত সেবাকার্য ঠাকুরের।

প্রশিক্ষণ শিবিরের পাঠ সময়মতো আমি শেষ করতে পারিনি, কারণ মাস ছয়েক পরে আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ি। সেবা প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসার জন্য আমাকে পাঠানো হয় এবং তারপরে রাঁচী সেবাশ্রমে। প্রশিক্ষণ শিবিরে আমার অসমাপ্ত পাঠের কথা ভেবে আমি খুবই মর্মাহত হয়ে পড়েছিলাম। আমার এই যাত্রায় সঙ্গী ছিলেন এক ব্রহ্মচারী—যিনি একবছর আগে রাঁচী থেকে প্রশিক্ষণ শিবিরে এসেছিলেন। সেবাশ্রমে ছয়মাস কাল আমি একটি ঘরে অতিবাহিত করি সন্ন্যাসিদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায়। অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি, বৃন্দাবন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী কৃপানন্দজী আমার সাথে দেখা করতে আসেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, বেলুড় মঠে বার্ষিক সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি গিয়েছিলেন। সেখান থেকে আমার স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে তাঁর রাঁচীতে আগমন। ভক্তিভরা হৃদয়ে তাঁকে প্রণাম জানাতে, তিনি আমায় অনেক সান্ত্বনা দিলেন। অনেক স্নেহজ্ঞাপন করে তিনি তারপর বিদায় নিলেন।

পূজনীয় মহারাজের মাতৃহৃদয় ঃ সঙ্ঘের প্রবীণ সদস্যদের জন্যে মহারাজের হৃদয়ে ছিল গভীর শ্রদ্ধা আর নবীন সদস্যদের জন্য ছিল অফুরন্ত স্নেহ ভালোবাসা। হৃদয় ও মস্তিষ্কের এক অপূর্ব সমন্বয় বিচ্ছুরিত হতো তাঁর প্রতিটি আচরণে। সর্বদা তিনি একাত্মবোধে স্থিত ছিলেন, কারণ তাঁর সকল শিক্ষা তিনি আহরণ করেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ সন্তানদের থেকে। তিনি নিজে ছিলেন সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমার সন্তান। তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পদ সকল সঙ্ঘবাসীদের মধ্যে অকাতরে বিলিয়ে দিতেন, নবীন যোগদানকারীরা তার থেকে বাদ যেতো না।

ডিসেম্বর মাসের একটি সকালে হঠাৎ করে একটি গলার আওয়াজ কানে এল, যেন আমায় কেউ ডাকছে। আমি দেখলাম আমাদের পূজ্যপাদ সঙ্ঘগুরু, হরলাল মহারাজ ও স্বামী বেদান্তানন্দজী মহারাজ ‘মহাবীর’ বলে আমার নাম ধরে ডাকছেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আনন্দ ও বিস্ময়ভরা চিত্তে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পূজ্যপাদ মহারাজের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলাম। তিনি আমার কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করায় তাঁকে জানালাম যে, শারীরিক কুশলে থাকলেও প্রশিক্ষণ শিবিরের অসমাপ্ত পাঠ ও বেলুড় মঠের পুণ্য আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে মন সর্বদাই বিষণ্ণ থাকে। তিনি আমাকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই আমি পুনরায় প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগদান করতে পারি। এরপর তিনি শ্রদ্ধেয় হরলাল মহারাজকে নির্দেশ দিলেন যে, তাঁর রাঁচীতে অবস্থানকালীন সময়ে প্রতিদিন যেন আমায় ফল–মিষ্টি পাঠানো হয়। আনন্দিত চিত্তে আমি তাঁদের সকলের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমার প্রিয় শ্রদ্ধেয় দুর্গাদাস মহারাজকে পুরো ঘটনাটি নিবেদন করলাম। যিনি প্রতিদিন আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। তিনি বললেন যে, আমি একজন কৃপাপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী, যে কথায় আমি পূর্ণ সম্মতি জানালাম।

পাটনায় থাকাকালীন পূজনীয় মহারাজকে দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছিল আর একবার। ১৯৭০ সালে কালীপূজার পর তিনি ভক্তদের দীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে সেখানে পদার্পণ করেন। সেই উপলক্ষ্যে সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ, স্বামী প্রমেয়ানন্দজী ও হরলাল মহারাজের পূত সান্নিধ্য আমি লাভ করি। মহারাজজীর সেবাকার্যে হরলাল মহারাজকে সহায়তা করার সুযোগ পাই। আমার মনে আছে, একদিন আমি সমস্ত আশ্রম আবাসিকদের জন্য শ্রীখণ্ড মিষ্টান্ন প্রস্তুত করি। সন্ধ্যাবেলায় মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বলেন যে, ‘তোমার শ্রীখণ্ডে শ্রী–এর অভাব ছিল। জাফরানের জন্য মিষ্টিটি উপাদেয় হলেও কেশরের কোনো গন্ধ পাওয়া যায়নি’। আমি তাঁকে জানালাম যে, ‘কেশর’ আমি খুঁজে পাইনি বাজারে। তিনি পাটনা আশ্রমে চারদিন থেকে, দুইদিন ধরে দীক্ষাদান করেন। এই চারদিন ভক্তদের কাছে উৎসবের মতো পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল।

১৯৭২–এর এপ্রিলে প্রশিক্ষণ শিবিরে পুনরায় যোগদান করে ১৯৭৪–এ আমি চৈতন্যদীক্ষা লাভ করি এবং শ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজীর কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা লাভ করি

১৯৭৬-এ। দিল্লী আশ্রমে মহারাজকে দেখার সৌভাগ্য আমি দুইবার লাভ করি। দীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি এসেছিলেন একবার এবং শ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের ছবি অডিটোরিয়ামে উদ্বোধন করতে আর একবার। স্বামী বুধানন্দের শ্রীমা-সম্পর্কিত বই উদ্বোধন করতেও তিনি এসেছিলেন। সেই সময়ে একমাত্র প্রণাম করা ছাড়া অন্য কোনো রকম সেবা করার সুযোগ আমি পাইনি। দূর থেকে দেখতাম তিনি ভক্তদের সঙ্গে আলাপ করছেন। ভক্তদের সান্নিধ্য তিনি পছন্দ করতেন। আজও মনে পড়ে দিল্লীর ভক্তদের সঙ্গে তাঁর পবিত্র উজ্জ্বল হাস্যমুখ আর অন্তরে তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করি।

মহারাজের মনে ছিল অদম্য শক্তি, স্বামীজীর ভাব যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার কাজে এবং মিশনের সেবামূলক কাজের প্রচার ও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি প্রায়ই ভক্ত ও যুব সম্মেলনের আয়োজন করতেন। সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের ১৯৭৯-র দিল্লী সফরকালে আমি স্বামী বুধানন্দজী মহারাজের কাছে শুনি যে, ১৯২৬-এর মতো এক মহা সম্মেলনের আয়োজন হতে চলেছে বেলুড় মঠে—যেখানে স্বামী বুধানন্দজীকে প্রথম দিনের উদ্বোধনী ভাষণ দিতে হবে। ১৯৮০ সালে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ২৩-২৯ তারিখ সময়কালে দ্বিতীয় সম্মেলনটি হয়, যেখানে ১২,০০০ যোগদানকারী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, পৃথিবীর সমস্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের শাখা কেন্দ্রের সদস্য এবং তখনো পর্যন্ত অন্তর্ভুক্তি হয়নি যে কেন্দ্রগুলি সেখানকার সদস্যরাও ৭ দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা সকলেই দিব্যত্রয়ীর বাণী এবং মঠ-মিশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা শ্রবণ করেন। শ্রদ্ধেয় মহারাজ সেই সম্মেলনে বলেন যে, 'সঙ্ঘ' শব্দটির সংজ্ঞা প্রশস্তভাবে ধরলে, সাধারণভাবে সঙ্ঘের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসিদের সঙ্গে ভক্তদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি প্রথমবার ঘোষণা করেন যে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ শুধু সাধু-ব্রহ্মচারী দীক্ষিত ভক্তদের নয়। অগণিত নারী পুরুষ যাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীশ্রীমা-স্বামীজীর ভাবধারায় তথা সনাতন বৈদিক ভাবধারায় বিশ্বাসী, সকলেই এই সঙ্ঘের সদস্য—তাঁদের বিপুল সংখ্যা নিয়েই সঙ্ঘ গঠিত। এই ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায় তাঁর হৃদয়ের প্রসারতা।

মহারাজের মনে ঐকান্তিক বাসনা ছিল স্বামীজীর আদর্শে জাতীয় শিক্ষানীতির গঠন ও উন্নতি। বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতেন এই কাজের জন্য। এই কাজে যুব সমাজের প্রত্যক্ষ সহায়তা তিনি আশা করতেন যে, সঙ্ঘ পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা অন্ততপক্ষে একটি বছর দুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ানোর কাজে সাহায্য করবে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে। এ বিষয়ে মহারাজ সমগ্র দেশব্যাপী যুব সম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ করার পক্ষে ছিলেন এবং প্রায়ই তিনি সেই সব সন্ন্যাসিদের সঙ্গে এ-বিষয়ে আলাপচারিতা করতেন—যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতেন।

যখন ভারত সরকার ১২ জানুয়ারিকে 'যুবদিবস' হিসেবে ঘোষণা করল ১৯৮৫-তে, তিনি অকল্পনীয় আনন্দ লাভ করেছিলেন। সমস্ত শাখাকেন্দ্রগুলিতে তিনি নির্দেশবার্তা পাঠিয়েছিলেন যাতে ওই দিনটি যুব সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালিত হয়। সেই বছরটিকে রাষ্ট্র সঙ্ঘও 'আন্তর্জাতিক যুব বর্ষ' হিসেবে মর্যাদা দেয়।

তাঁর অন্যান্য চিন্তা ভাবনার মধ্যে ছিল অশিক্ষিত মানুষ, বিশেষত স্কুল ছুট ছেলেমেয়েদের মূলস্রোতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা। নানারকম হস্তশিল্প যেমন, জামা-কাপড়, আচার ইত্যাদি তৈরি, কৃষি ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য সার সংরক্ষণ ইত্যাদির জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি নেওয়ার জন্য তিনি মিশনের প্রতিটি শাখাকেন্দ্রে যথাযথ নির্দেশ দেন। উন্নয়নের পথে এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

আমি তাঁকে শেষবারের জন্য দেখি মুম্বাই আশ্রমের হীরক জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠানে, যেখানে তিনি সমুদ্রমুখী ওরলী আশ্রমের উদ্বোধন করেন। সেটা ছিল ১৯৮৪-র ডিসেম্বর মাস। একদিন তিনি খবর পাঠালেন আমাকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে বলে। আমি তাঁর সাথে সকাল ১১টা নাগাদ দেখা করি এবং তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করেন যে, সাকওয়ার গ্রামীণ কাজটি আমি দেখাশোনা করছি কিনা। আমি সম্মতি জানাতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, সরকারি সাহায্য আমরা পাই কিনা? আমি তাঁকে জানালাম যে, মূলত বড় শিল্প সংস্থার অর্থানুকূল্যেই খরচা চালানো হয়। তিনি প্রীত হয়ে সে বিষয়ে সবিস্তারে খোঁজখবর নিলেন—যেটি আমি তাঁকে বর্ণনা করে জানালাম। তাঁর ইচ্ছা ছিল যাতে দরিদ্র গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে আরো নজর দেওয়া হয় এবং প্রতি রবিবার, স্বাস্থ্য শিবির খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়াও তাঁর পরামর্শ ছিল কৃষিপণ্য মেলার আয়োজন করা, ছেলেমেয়েদের সেলাই স্কুল খোলা, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেয়েদের সেলাই মেশিন দেওয়া ইত্যাদি।

এটি ছিল আমার জন্য শেষবারের মতো তাঁর সান্নিধ্যলাভ করা। যখনই আমি তাঁকে স্মরণ করি, মনে পড়ে তাঁর মাতৃহৃদয় ও স্বামীজীর কর্মশক্তির অপরূপ সম্মিলন। তাঁর কাছে সশ্রদ্ধ প্রার্থনা জানাই, যাতে তিনি সকলকে আশীর্বাদ করেন তাঁর শক্তিতে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে যেতে।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ।*

* মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন পাণ্ডুয়া রাধারানী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি দেবলীনা দাশ।

সমাজ পরিবর্তন ও যুবশক্তি

প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা *

জগতের সবকিছুর মতনই সমাজব্যবস্থাও পরিবর্তনশীল। আমাদের মনের ভাবনা-চিন্তাও সমাজের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে। আমরা সকলেই বহিঃপ্রকৃতি ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাবপুষ্ট। যখন যেমন প্রাকৃতিক আবহাওয়া, তখন তেমনি পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া, উৎসব-অনুষ্ঠান। আমাদের এসবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এগিয়ে যেতে বা জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। অর্থাৎ যখন সামাজিক চাল-চলন, পরিবেশের প্রভাব আমাদের উপর পড়ছে, এবং আমরা তাকে এড়িয়ে যেতে পারছি না, তখন তাকে জীবনের ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই চলতে চেষ্টা করি। কারণ, এর বাইরে যাবার আমাদের শক্তি নেই। যদি বর্তমানকে মানিয়ে না নিয়ে চলি, তবে আমাদের গতি রুদ্ধ হবে। একটি ছড়ার একটি লাইন উদ্ধৃত করে বলতে পারি, 'নইলে রইলে'। আনন্দবাজার পত্রিকার একটি চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন দেখি,—(আনন্দবাজার পত্রিকা)—'পড়তে হয়, না হলে পিছিয়ে পড়তে হয়।' 'পিছিয়ে পড়তে হয়'—দুটি অর্থ, এক সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিছিয়ে যেতে হয়, দুই,—পরে গিয়ে পড়ে নিতে হয়। এরকমই এই পরিবর্তিত সমাজের সঙ্গে কিছুটা সমঝোতা করে না চললে, যুগের থেকে পিছিয়ে যেতে হবে এবং অন্যান্যদের থেকে—সে নিজ পরিবারের সদস্যই হোক, বা বন্ধুবান্ধব, সকলেরই অমনোযোগ, অনাদর বা উপেক্ষার পাত্র হয়ে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি হবে।

উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা যায়, ঊনবিংশ শতকের মধ্য ভাগ থেকে ধরলে কলকাতার সমাজের যে ধর্মীয় ভাবধারায় পরিবর্তন দেখা গেল, যার ফলে সনাতন হিন্দুধর্মীয় সমাজকে, প্রচলিত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সঙ্কীর্ণতাকে সমালোচনা করে যে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচলন হলো, যাতে সাকার প্রতিমা-পূজা, উপাসনাকে বাতিল করে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার যে খোলা-মেলা, উদার ভাব নিয়ে আসা হলো, তাতে কলকাতার অভিজাত শিক্ষিত যুবসমাজ বিশেষভাবে প্রভাবিত হলো, তাকে বিনা বিচারে গ্রহণ করে এই নতুন ভাবকে ধর্মজীবনের অঙ্গ করে ফেলতে দ্বিধা করল না। শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ দত্ত, পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দই এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তবে পরবর্তিকালে গুরুকৃপায় তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের মূল দার্শনিক তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করে জগতের অশেষ কল্যাণসাধনে ব্রতী হয়েছিলেন।

বেলগাঁও-এ স্বামীজী

এমন পরিবর্তন কালের প্রবাহে আসবেই সমাজের যে-কোনো ক্ষেত্র অবলম্বনেই। এখন প্রশ্ন, এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে নিজের নিজের ভাব, চরিত্র বা বলা যায় নিজ পরিবারের শিক্ষা-সংস্কার, সবই কি পালটে ফেলতে হবে? সেটা কি কাম্য? বা সে কাজ কি সর্বদা সুফলদায়ক হবে? তাতে কি ব্যক্তিজীবন বা ব্যষ্টিজীবনের স্বাতন্ত্র্য বা স্বকীয়তাকে নষ্ট করে ফেলা হবে না! জনসাধারণের মতে মত দিয়ে, গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে গিয়ে, সকলের মতন বা অপরের মতন জীবনকে গড়ে নিয়ে এক দাসত্বের জীবনকে বরণ করে নেওয়া হবে না! বাহ্যপ্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখলে যেমন দেখি, সব আমগাছ একই ধরনের হয় বা একই শ্রেণীর বা প্রজাতির বৃক্ষ হওয়ায় তাদের পাতা, কলি, ফল—সব একই ধরনের হয় ও আমাদের তাদের আমগাছ বলে চিনতে

* *সুবক্তা সুলেখিকা এই বিদগ্ধ সন্ন্যাসিনী এখন রামকৃষ্ণ সারদা মিশন বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষা।*

সুবিধা হয়। কিন্তু মানুষের বেলায় তো সেই চেনাই সব নয়। তাই প্রকৃতির অঙ্গ বলে ও তার আদলে মানুষকে ভাবলে চলে না, তাতে ভ্রমজ্ঞান হয়। কারণ প্রত্যেক মানুষেরই নিজ-স্বভাব, চিন্তাধারা ও কর্মজগৎ আছে। মানুষকে সমাজে পরিচিত হতে হয় এই সব দিয়েই। যদিও সে যে সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বাস করে, তাঁর কতকগুলি নির্ধারিত রীতি-নীতির কাছে তার দায়বদ্ধতা থাকে, এবং সেগুলি মান্য করেই আমরা বড় হয়ে উঠি। এই পথটিকেই যদি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করে, আমরা জীবনের পথে হাঁটি, তবে তাকে **সমাজতন্ত্রবাদ** নাম দেওয়া যেতে পারে। এর বিপরীতে রয়েছে **ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ** বা **individualism**। স্বামীজী বলেছেন, এই চরম দুটি পথের কোনোটিই এককভাবে জীবনে গ্রহণীয় নয়; এদের মধ্যে একটিকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রহণে জীবনে সফলতা আসে না এবং তা শুভও নয়। তাঁর মতে, সমাজের কতগুলি চিরাচরিত বা সাময়িক নিয়ম বা জীবনধারার কাছে, বা সেই শিক্ষার শাসনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্যষ্টির সমষ্টির কাছে সম্পূর্ণভাবে মাথা অবনত করে রাখা মানবজীবনের অগ্রগতির অন্তরায় এবং এর ফলে মানব-মনের যে যান্ত্রিক পরিণতি, তা মানবজীবনে এক বিপর্যয়কে ডেকে আনবে। এই পরিণতি কখনোই কাম্য হতে পারে না। স্বামীজী আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন, তাঁর অপূর্ব লিখনশৈলীতে, **'এতে মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নেই, হৃদয়ের বিকাশ নেই, প্রাণের স্পন্দন নেই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নেই ... যন্ত্রে কি ইচ্ছাশক্তির বিকাশ থাকে, তার তুলনায় একটি সচেতন কীটও ভাল সে নিয়মকে অতিক্রম করতে চায়।'** (এস মানুষ হও)। আরও বলেছেন, **'নিয়ম মেনে চলতে পারলেই যদি ভাল হয়, তবে বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্মিক কে? তবে প্রস্তরখণ্ডকে, গরু-মহিষকেও ধার্মিক বলতে হবে।'** তাই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চাই, তবে তা একটি জাতির বা সমাজের সভ্যতা, সংস্কৃতি ঐতিহ্যের ধারাকে কিছুটা স্বীকার করেই নতুন নতুন উদ্ভাবনীর অভ্যুদয়ের পথে ইচ্ছা শক্তির বিকাশ ঘটাবে প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে, নব নব শুভ জীবনচর্যায় অভ্যস্ত হবে, তবেই নিজের ও সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ সাধিত হবে। মানবের কল্যাণ পথ এই ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে কেন্দ্র করেই। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'একাকী গায়কের নহে তো গান, গাহিতে হবে দুই জনে।' তাই সমাজের যে-কোনো পরিবর্তনকেই অবাধে গ্রহণ না করে, যাকে আজকের পরিভাষায় বলা যেতে পারে এক ধরনের fashion, তা পোশাক-পরিচ্ছদ, বস্তুব্যবহারে বা জীবনমাত্রার এক বিশেষ ধরনে, —যে-কোনো ক্ষেত্রই হোক না কেন, তাকে যুক্তি-বিচার-সহ গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ তার কতটা গ্রহণ জীবনের পক্ষে শ্রেয় আর কতটা গ্রহণে মনের বা শরীরের অবনতি ঘটবে বা উভয়ের পক্ষেই অস্বাস্থ্যকর হবে, এই বিচারশীলতা থাকতে হবে। যেহেতু যৌবনেই মানুষের আবেগ, ইচ্ছাশক্তি, গ্রহণশক্তি ও শ্রমশক্তি—সবই বেশি মাত্রায় থাকে, তাই পরিবর্তনের প্রভাব তাদের উপরেই বেশি পড়ে, এবং তাদের ক্রিয়াশীল করে তোলে, তাই তাদের প্রকৃত শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের দিকেই গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং শৈশবের শিক্ষার ভিতের ওপরেই তা গড়ে উঠতে পারবে। স্বামীজীর মতে, নঞর্থকভাবে নয়, সদর্থক বা positive শিক্ষা চাই, যাতে সে প্রকৃত বিবেকবান, বিচারশীল, নিজ দেশ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নিজ মনুষ্যজীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে পারে। তিনি লিখেছেন, **'জগতের সব ধন-সম্পদের চেয়ে মানুষই বেশি মূল্যবান।'** তাই তাঁর আহ্বান—**'এস মানুষ হও।'**

স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই শিক্ষা, জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শিশু কিশোর সন্তানদের মধ্যে কতকগুলি শুভ ধারণার জন্ম দেবে—যা ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে সমাজ-জীবনকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করবে, তার ফলে পরিণত বয়সে যে-কোনো সামাজিক পরিবর্তন, তা সে শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবনচর্যা, যে-কোনো ক্ষেত্রেই আসুক না কেন, তার ভালো-মন্দ বিচার করে গ্রহণ ও বর্জনে সক্ষম হবে। স্বামীজী যিনি যুবসমাজের icon-রূপে বিশ্বে পরিচিত, যিনি ব্যক্তি ও জাতির একই সঙ্গে হিতসাধনের বাস্তবসম্মত পথটি প্রদর্শন করে গেছেন, তাঁকে অনুসরণ করে, তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বনে আমরা কতকগুলি বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে পারি এইভাবে—

১) মানবজীবনকে ভালোবাসতে হবে; তার গুরুত্ব, বা মূল্য, তার মর্যাদা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা জন্মাতে হবে।

২) স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগাতে হবে, অবশ্যই তা মৌলিক চিন্তা ও শুভপথে, যাতে বিবেক ও বিচারশীলতার প্রকাশ ঘটবে।

৩) এই শিক্ষা ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করবে অবশ্যই অর্থনৈতিকভাবে এবং মানসিকভাবেও। একেই স্বামীজী man-making education বলেছেন,

যাতে চরিত্র গঠিত হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, মনের শক্তি বাড়ে। স্বামীজীর মতে মানব-মনের অনন্তশক্তি। এ বিষয়ে আমরা অজ্ঞ থাকি বলে নিজেকে দুর্বল ভাবি ও দুঃখ পাই। তাই শিক্ষা আমাদের আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান করবে।

৪) অর্থকরী বিদ্যার প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকৃত, কিন্তু শুধুমাত্র এই বিদ্যায় মানব-মনের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। সমাজ-সংসারে প্রতিযোগিতা বাড়ে, বিচ্ছিন্নতার জন্ম হয়, মান-যশ-প্রতিপত্তির মোহে মানুষ স্বধর্ম বা মানবিকতার চর্চা থেকে বিমুখ হয়, তাতে মনুষ্যত্বই প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। কবির ভাষায় **'মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।'** স্বামীজী বলেছেন, আমাদের মধ্যে পশুভাব, মানুষভাব ও দেবভাব—এই তিনটিই বর্তমান। তাঁর মতে, প্রকৃতশিক্ষা আমাদের মধ্যে যে পশুভাব তাকে অর্থাৎ হিংসা, বিদ্বেষ, নির্মম স্বার্থপরতা, জিঘাংসা—প্রভৃতিকে অতিক্রম করতে এবং মনুষ্যত্ব বিকাশে—অর্থাৎ দয়া, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, পরার্থপরতা, ভালোবাসা, সত্যানুরাগ—প্রভৃতি দেবভাবসঞ্জাত গুণগুলির বিকাশে সহায়তা করে। ইতিহাসে এমন সব গুণ সমন্বিত মানুষকেই 'মহামানব' বা দেবমানব আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এঁদের জীবনচর্যা আমাদের শিক্ষার অঙ্গীভূত করতে হবে।

৫) এই শিক্ষায় নিজ দেশ, জাতি, ধর্ম—এ সব সম্বন্ধে গৌরববোধ, শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঞ্চার হবে মনে। স্বামীজী বলেছেন, শ্রদ্ধা ও প্রীতির অভাবেই একটি জাতির অধঃপতন হয়, সে সম্মিলিতভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। নিজ-দেশের গৌরবময় ইতিহাসের পঠন-পাঠন, জ্ঞান লাভ চাই। শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যায় পারদর্শিতা কতকগুলি সাম্মানিক degree এনে দিতে পারে, তাতে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সুবিধা হতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে মন ও চরিত্রের উন্নতিকারী কতকগুলি মৌলিক মানবিক গুণেরও বিকাশ সাধন চাই—যেমন মননশীলতা, পরিস্থিতি বুঝে প্রতিক্রিয়া, উদার ভাব, সহযোগিতা, পরার্থপরতা, নিজ-সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, সেগুলি তাকে বিশেষ একটি ধর্মসাধনেরও সহায়ক হয়ে শান্তি ও আনন্দ দেবে। মানবধর্মের মূল কথাই হলো আত্মানুশীলন, এবং এটিই তাকে পশুজীবন থেকে পৃথক করে রাখে। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' প্রবন্ধে বলেছেন, মানবসভ্যতার অর্থই হলো মানবাত্মার ক্রমবিকাশ স্থূল থেকে সূক্ষ্ম অনুভূতিতে, এবং এই আত্মার ধর্ম স্থূলভোগ নয়, ত্যাগের অনুপ্রেরণা; প্রেম ও উদারতায় এর প্রকাশ। স্বামীজীর মতে 'Expansion is life, Contraction is death'। এই উদার নৈতিকতাই সকল প্রকার ধর্মসাধনার মূলকথা। প্রত্যেক বিশেষ ধর্মসাধনার কতকগুলি সম্প্রদায়গত আচার অনুষ্ঠান থাকেই, কিন্তু মূল আদর্শ প্রত্যেকটিরই ঈশ্বরপ্রীতি, সমদর্শিতা, সহনশীলতা, ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুশীলন, এবং এসব গুণগুলি শিক্ষার মাধ্যমেই সমাজে অনুপ্রবিষ্ট

যন্ত্রনির্ভর দৈনন্দিন জীবন

করতে হবে। স্বামীজী তাই এই ধর্মকে শিক্ষার সারবস্তু বলে মনে করেছেন, যা একটি পরিশীলিত লোভহীন, ক্ষোভহীন সংযমী মনের জন্ম দিতে সক্ষম হবে। এরই প্রেক্ষিতে একটি পরিণত বয়সের ছেলে বা মেয়ে সামাজিক যে-কোনো ধরনের পরিবর্তনকে বিচার করে গ্রহণ ও বর্জনে সমর্থ হবে। এই আদর্শ শিক্ষাই জীবনের মূলকেন্দ্রে প্রোথিত হলে, সে আর পথভ্রষ্ট হবে না, এটিই হবে তার জীবনপরিক্রমার 'axis', যেমন পৃথিবী তার 'axis' ওপর স্থিত হয়েই অনন্তকাল ধরে সূর্যকে একভাবে পরিক্রমণ করে যাচ্ছে, পথভ্রষ্ট হচ্ছে না।

এখন আমরা যে-সমাজ ব্যবস্থা বা যে-যুগে বাস করছি, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপন সবই বিজ্ঞানের নব-নব আবিষ্কারের দ্বারা প্রভাবিত ও স্থিরীকৃত হচ্ছে। যখন প্রথম কৃত্রিম বিদ্যুৎ বা electricity আবিষ্কৃত হলো, তখন তার সুফল আমাদের জীবনযাত্রাকে অনেকটাই সহজ ও সুখকর করেছিল অবশ্যই। তবুও সেসব বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আমাদের

খোলা-মেলা, সহজ সরল মাধুর্যময় গ্রামীণ জীবনযাত্রা থেকে সরিয়ে এনে ধরাবাঁধা নগরায়নের বেড়াজালে বেঁধে ফেলল। রবীন্দ্রনাথ জীবনের এই যন্ত্রনির্ভরতায় কিছুটা বিরক্ত বোধ করেই লিখেছিলেন, **'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।'** আজকের দিনে বিজ্ঞানের আরও অগ্রগতিতে সামাজিক পরিকাঠামো বা তার infrastructure-এ এক আমূল পরিবর্তন এসেছে, আজ আমরা এক তীব্র গতির যুগে বাস করছি; অতি সূক্ষ্মতম microchips-এর আবিষ্কার electronic জগতে এক আমূল পরিবর্তন এনে সমগ্র বিশ্বকে এখন মুহূর্তের মধ্যে আমাদের ঘরের ভেতর হাজির করে দিয়েছে। একজন বৈজ্ঞানিক বলেছেন, 'The world is becoming smaller now'। এটি একই সঙ্গে আনন্দসংবাদ আবার বিপদসঙ্কেতও বটে। যেমন গত দু-আড়াই বছর ধরে যে করোনা মহামারীর কবলে দেশবাসী পড়েছিল, তাতে বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা রুদ্ধ হওয়ায়, কী নিদারুণভাবেই না প্রতিটি পরিবারকে একাকিত্বের দুর্বিষহ যাতনা ভোগ করতে হয়েছে, তবুও তার মধ্যেই radio, T.V., mobile phone, computer, laptop ইত্যাদি electronic যন্ত্রের মাধ্যমে আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সংযোগ রাখা, স্কুল-কলেজে শিক্ষাব্যবস্থা 'online' পদ্ধতিতে চালু রাখা, কতকাংশে সম্ভব হয়েছিল, যার এতটুকুও সম্ভাবনা কল্পনাতেও ছিল না সাম্প্রতিক অতীতেও এদেশে।

কিন্তু এই সুবিধার হাত ধরেই বিপর্যয় এসে উপস্থিত হচ্ছে আমাদের জীবনযাত্রায়, আমাদের মননে চিন্তনে। যন্ত্রের অত্যধিক ব্যবহার আমাদের মনগুলিকে যান্ত্রিক করে ফেলেছে, আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, স্মৃতিশক্তিকে অনেকাংশই ব্যাহত করছে, তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে রুদ্ধ করে যন্ত্রনির্ভর করে তুলছে। যন্ত্র অকেজো হলেই আমরা অসহায় বোধ করছি। এসব যন্ত্র এখন শিশু থেকে কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রায় সকলেরই অবসর যাপন, বিনোদনের মাধ্যম হয়ে পড়েছে এবং এর ফলেও একজন অন্যজনের কাছ থেকে সরে আসছে ও স্বার্থপর হয়ে পড়ছে। সুতরাং এককালে করোনার স্পর্শ বাঁচানোর বিচ্ছিন্নতাকে কাটাতে গিয়ে আর এক প্রকার বিচ্ছিন্নতার ফাঁদে আমরা আবদ্ধ হয়ে পড়ছি। এর থেকে মুক্তিলাভ করতে প্রয়োজন একটি বিচারশীল, শিক্ষিত মন ও চাহিদার স্থূলতা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ।

জগতের পরিবর্তন—কী জড়জগতে বা কী মনোজগতে, সাময়িক বা আপেক্ষিক বা ভালো-মন্দ যাই হোক, তাকে না মান্য করে উপায় নেই। কাল প্রবহমান ও বলবান। এই যে কালান্তর বা রূপান্তর, এর সঙ্গে আমাদের জীবনের ছন্দকে কিছুটা মিলিয়ে নিতেই হবে, ভালো-মন্দের, গ্রহণ-বর্জনের পৃথকীকরণ সহ। কঠোপনিষদে যমরাজ সত্যানুসন্ধিৎসু নচিকেতাকে শ্রেয় ও প্রেয়-র বিচার-সহ সত্যলাভে অগ্রসর হতে বলেছেন। যৌবনের অপরিমিত আবেগ, শক্তি ও কর্মস্পৃহাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করা না যায়, প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে মনকে শ্রদ্ধাশীল ও নীতিপরায়ণ না করা যায়, তবে এই দুর্লভ মনুষ্যজীবনের অপচয়কে রোধ করা যাবে না, সমাজকেও কল্যাণপথে, শুভপথে পরিচালিত করা যাবে না। তাই এই সব পরিবর্তনে 'সব গেল গেল' এই রব না তুলে, এর মধ্যে থেকেই মানবসত্তার উন্নতি—ঐহিক অভ্যুদয় ও আত্মকল্যাণ,—উভয় দিকের পথটিকে খুঁজে নিতে হবে। এটিই সহজ সত্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, **'সত্যেরে লও সহজে'**।

সেপ্টেম্বর (পূজা) সংখ্যা ২০২২-র ক্যুইজ ও ধাঁধার সমাধান

ক্যুইজ-এর সমাধান ঃ ১.ক) আলতাপাতা ২.খ) শ্রী ৩.গ) অতসী ৪.গ) মহেশ্বর ৫.খ) সপ্তমী ৬.গ) মা সারদা ৭.গ) কৃষ্ণপক্ষ ৮.ক) কুষ্মাণ্ড ৯.গ) স্বামী অখণ্ডানন্দ ১০.খ) পঞ্চগব্য ১১.খ) অভেদানন্দ ১২.গ) দার্জিলিং ১৩.ক) স্বামী অভেদানন্দ ১৪.গ) মহুলা (সারগাছি) ১৫.খ) স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৬.খ) কাশ্মীরের ডাল লেক ১৭.ক) কন্দমূল ১৮.গ) বৈশাখ মাসে ১৯.খ) মাঘ থেকে চৈত্র ২০.খ) ৬০ কাঠা ২১.ক) ফোডার ২২.গ) অ্যামাইনো অ্যাসিড ২৩.খ) লণ্ডন ২৪.খ) (ভা) জ্ঞানে মগ্ন দেশ ২৫.খ) দুঃখ প্রাপ্যা।

ধাঁধার সমাধান ঃ ১) নাড়ু ২) তিল ৩) মোচা ৪) স্বস্তিক ৫) সহস্রধারা ৬) শাবল ৭) ঘি ৮) ডাল ৯) পরমান্ন ১০) কাশ ১১) চামুণ্ডা ১২) খিচুড়ি ১৩) বেতার ১৪) মহিষমর্দিনী ১৫) স্বামী অখণ্ডানন্দ ১৬) গান্ধীজী ১৭) নৈবেদ্য ১৮) লক্ষ্মী ১৯) আতা ২০) নবপত্রিকা ২১) আলু ২২) দেওয়াল ঘড়ি ২৩) গো-পালন ২৪) খবর।

মর্ত্য-কৈলাস-যাত্রার দৈবী মাধুর্য !

প্রব্রাজিকা দিব্যমাতা *

১৯৭৫–এর জুলাই চলেছি শ্রীশ্রীঅমরনাথদর্শনে। এ পথ শুধু চলনমাত্র নয়। দেবদর্শনে যাওয়ার পথ—এ কথাও বুঝি বলা চলে না। পথই দেবালয়। **মর্ত্যকৈলাস অমরনাথ যাত্রাপথের প্রতিটি ধূলিকণাই সমুদ্ভাসিত স্বমহিমায়, শিবমহিমায়। একদিকে যেমন প্রকৃতিদেবীর মন ভুলানো মধুর গম্ভীর অপরূপ রূপ, অপরদিকে অন্তরের অন্তঃস্থলে তেমনই স্বত–ই অনুভূত হয় সর্বরূপাতীত সেই পরমের অনির্বচনীয় আভাস। আর তারই সঙ্গে ক্ষণপ্রভার চকিত চমকের মতো মাঝে মাঝে দেখা যায় মানবমহিমার চিত্তচমৎকারী প্রকাশ।**

এ পথের প্রতিটি বাঁকে, প্রতি পদক্ষেপে নিত্যনতুন বিত্তের সঞ্চয়ে পূর্ণ হয় হৃদ্‌ভাণ্ডার, মনের মণিকোঠায় নিভৃতে সযতনে রাখা তেমনই এক অমল রতনের কথা আজ স্মরণ করি।

চন্দনবাড়ি- পিশুটাপ- শেষনাগ হয়ে চলেছি মহাগুণাসের পথে। অমরনাথ যাত্রাপথে সর্বোচ্চ স্থান মহাগুণাস টাপ। এ পথের একেবারে প্রথম দিকে পথের পাশে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কিছু ফুল চোখে পড়েছিল। প্রধানত হলুদ ও বেগুনী রঙের ফুল। যেন দেবাদিদেবের জন্য রঙিন কার্পেটের আসন পাতা। প্রকৃতির আপন হাতে বোনা সে আসন।

অমরনাথের পথে তীর্থযাত্রীরা

তারপরই আরম্ভ তুষাররাজ্য। কাশ্মীরে সে বছরের তুষারপাত নাকি হার মানিয়েছে বিগত বিশ–পঁচিশ বৎসরের রেকর্ডকে, বলেছেন আবহবিদ্‌রা, এমন কথা শুনে এসেছি পহলগামেই। এ কয়দিনে বরফ দেখেছি দূর পর্বতগাত্রে, পর্বতশিখরে, দেখেছি রাস্তার ধারে, একেবারে হাতের নাগালে। কিন্তু এখন? উপরে–নিচে, আশেপাশে যেদিকে চোখ ফেরাই শুধুই বরফ আর বরফ, যেন **তুষারসমুদ্রের মাঝে হেঁটে চলা, সাদায় সাদা চারদিক। জগতে এত শুভ্রতাও আছে!!! আরেকটি রঙও অবশ্য রয়েছে—নীল। মাথার উপর ঝক্‌ঝক্ করছে নির্মল নির্মেঘ সুনীল নভোমণ্ডল। 'সু–নীল' শব্দটি অর্থময় প্রাণময় হয়ে উঠেছে। আকাশভরা নীলকান্তমণির মতো এমন স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল রঙ আর কোথাও কখনও দেখিনি।**

চারদিক নীরব নিথর। আমরা রওনা হয়েছিলাম গুরুপূর্ণিমায় অমরনাথজীর দর্শন উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ পূর্ণিমার মূলযাত্রারম্ভের বেশ পূর্বে। তার উপর অতিরিক্ত তুষারপাতের জন্য সাময়িকভাবে যাত্রা স্থগিত ছিল সরকারী নির্দেশে। ফলে যাত্রীসংখ্যা অত্যন্ত কম। বলতে গেলে, আমরা কয়েকজনই মাত্র যাত্রী আর রয়েছেন সাধু–সন্ন্যাসিরা এবং কাশ্মীরেরই অধিবাসী কয়েকজন। নীরবতা ভঙ্গের পক্ষে দুজনই যথেষ্ট, আমাদের সকলেরই প্রাত্যহিক জীবনের অতো অভিজ্ঞতা অথচ ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকজন মানুষ থাকলেও বিন্দুমাত্র শব্দ কোথাও নেই। অমরনাথজীর জয়ধ্বনি দিতেও বোধহয় ভুলে গিয়েছেন সব্বাই। ধ্যানমৌন সুগম্ভীর প্রশান্ত অপার্থিব এক পরিবেশ জগতের মাঝেই অথচ জগদতীত এক স্থান!! এই তো স্বর্গ। দেবলোকের অনবদ্য সে ছবিকে ভাবে–ভাষায়, রঙে–তুলিতে, ছেনি–বাটালিতে ফুটিয়ে তোলার সাধ্য কার? শুধু চেয়ে থাকা। শুধু দেখা অপলকে হৃদয়মনভরে অনির্বচনীয় অনুভব! 'শ্রীশ্রীঠাকুরের অতুলনীয় উপমাটির কথাই মনে পড়ে—'কেমন ঘি, না যেমন ঘি'। দুধ কেমন? না, ধোবো, ধোবো, বড় জোর বলা যায় এইটুকু। কিন্তু তাতে দুধের স্বাদ–বর্ণ–গন্ধ, তার পুষ্টিগুণ, কিছু কি বোঝা যায়?

অরূপের অপরূপ রূপে বিভোর হয়ে আপনমনে চলতে

** অধ্যক্ষা, বেলগাছিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘের এই বর্ষীয়ান সন্ন্যাসিনী সমাজশিক্ষার শুভাকাঙ্ক্ষিণী।*

চলতে হঠাৎ দেখি সামনে সর্বত্রই নরম বরফ। দলের প্রায় সকলে চলেছেন অশ্বারোহণে। পদব্রজে যাত্রী মাত্র দু'জন। হাঁটাপথে যিনি আমার সঙ্গী ছিলেন তিনিও এগিয়ে গেছেন। বুঝতে পারছি পথ ছেড়ে বিপথে চলে এসেছি আনমনে।

অশ্বপৃষ্ঠে নয়, ডাণ্ডীতে নয়,—পায়ে হেঁটেই যাব তাঁর কাছে,—এ সঙ্কল্প দীর্ঘকালের। তবু কাশ্মীর সরকারের নির্দেশমতো সঙ্গে নিতে হয়েছে অশ্বরক্ষকসহ একটি অশ্ব। অশ্বরক্ষকটি কাশ্মীরি মুসলমান। নাম—বসির। বয়সে তরুণ। ঘোড়ায় উঠছি না —এটা তার একেবারেই অপছন্দ। সবসময় সঙ্গে থাকে ছায়ার মতো। হাসিমুখে সাহায্যের হাতটি বাড়িয়ে দেয় দরকারমতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন বসিরও সঙ্গে নেই। এক সহযাত্রীর ঘোড়া শেষনাগে অসুস্থ হয়ে পড়ায় আজ তাঁকে নিয়ে চলেছে বসির।

ধারে কাছে কেউ নেই। কেউ আসবেন এমন সম্ভাবনাই বা কোথায়? অগত্যা এদিক-ওদিক দেখে একটু পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টাই করছি। অসতর্ক মুহূর্তে পা পড়ল একেবারে নরম তুষারের গদিতে। সঙ্গে সঙ্গে কেডস্ শুদ্ধ পা ডুবল ঠাণ্ডা কনকনে নরম বরফে। জোর করে তাকে টেনে তুলবার প্রয়াসী হতেই বিপদ বাড়ল। আরও একটু গভীরে প্রবেশ করলেন শ্রীচরণ। এভাবে বেশিক্ষণ 'নট নড়ন-চড়ন' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যে যাবে না, তা বেশ বুঝছি। কিন্তু করবই বা কি? নড়াচড়া করলেই তো বাড়ছে ঝঞ্ঝাট। মনে মনে শেষ প্রণাম জানাচ্ছি অমরনাথজীকে। সহসা কানে এল একটি কণ্ঠস্বর, 'মাঈজী। ভয় পেয়ো না। চুপচাপ থাকো। এক্ষুনি পৌঁছে যাচ্ছি তোমার কাছে।'

মাঈজী? আমাকেই বলছে কি? কে বলছে? কোনো-রকমে ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে দেখি—কেউ একজন এদিকেই আসছেন। হাত তুলে সাহস জোগাচ্ছেন। অনতিকাল পরেই আগমন এক অপরিচিত ব্যক্তির। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায়, কল্পনাতীত সহায়তায় কোনওক্রমে উদ্ধার তো পাওয়া গেল। তারপরেই অভিভাবকের সুরে ধমক—কেন এমন অসতর্ক হয়ে চলা? পা ফেলবার আগে কেন লাঠি ঠুকে ভালো করে দেখে নিই না?

তুষারলিঙ্গ অমরনাথজী

না, এখানেই ইতি নয়। বাকি পথটুকু রইলেন আমার সঙ্গে। পরিচয়ে জানলাম, বসিরের মতো ইনিও ধর্মবিশ্বাসে মুসলমান। কাশ্মীরেরই অধিবাসী। **হিন্দুতীর্থ অমরনাথের পথে চোখে পড়েছিল সর্বত্রই ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রাধান্য এবং সর্বদাই সহৃদয় তাদের আচরণ। দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর একত্র সহাবস্থান!! অথচ কোথাও বিদ্বেষের বহ্নিশিখার চিহ্নমাত্র চোখে পড়েনি বরং দুধে-মধুতে মিশে থাকার উপমাটিই মনে পড়ছে বারবার।**

হঠাৎ পাওয়া এ বন্ধুটির নাম—কাদের। পড়াশুনা অতি সামান্যই। ছোটখাটো কাজ করেন P.W.D. বিভাগে। P.W.D. বিভাগের কাজেই চলেছেন পঞ্চতরণী। কর্মসূত্রে অমরনাথ যাত্রার পূর্বে এবং পরে এ পথে প্রায়ই যাতায়াত করতে হয় তাঁকে। ঐ বিভাগের এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মীর তল্পিতল্পা নিয়ে চলেছেন পঞ্চতরণী। তাঁর 'সাহেব' আসবেন দিন কয়েক পরে। আসন্ন শ্রাবণী পূর্ণিমায় দেবদর্শনে আসবেন তীর্থযাত্রীরা। তাঁদের যাত্রাপথের দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন যাঁরা, তিনি তাদেরই একজন।

একে তো আমার অনভ্যস্ত পায়ে ধীর লয়ে চলা। তার উপর এমন অপূর্ব স্থান। গতি আপনিই স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। এভাবে চললে উনি হয়তো সময়মতো পৌঁছতে পারবেন না। কাজের ক্ষতি হবে, 'ভাই, আপনি বরং এগিয়ে যান, অল্প তো পথ বাকি। আমি ঠিক পৌঁছে যাব ধীরে ধীরে'—এসব কথা বলতেই আবার মৃদু ধমক। অগত্যা চলি চুপচাপ।

তুষারপাত এবারে অত্যন্ত বেশি হওয়ায় শাপে বরই হয়েছে দেখছি। তুষারভূমির উপর দিয়ে দিব্যি চলে আসা গেল। চড়াই-উৎরাই-এর কষ্ট টেরই পেলাম না বিশেষ। শেষ হলো তুষাররাজ্য। এবার মামুলি পাহাড়ি পথ। কোথাও বা রুক্ষ পার্বত্য পথ। কোথাও পথের উপর দিয়ে সবেগে বয়ে চলেছে জলধারা। কোথাও আবার মাটি পাথরকুচিভরা পথ। মনে পড়ে কাদা-খোলামকুচিভরা বর্ষাকালের বাংলাদেশের গ্রামের পথকে। কোথাও বা পথের পাশে মাঝে মাঝে বাহারি ঘাসফুল উঁকি দিচ্ছে।

পৌঁছলাম পঞ্চতরণী। প্রসঙ্গত, শিব যখন মেতেছিলেন তাণ্ডব নৃত্যে, খুলে যায় তাঁর বিপুল জটাভার। সে জটা বেয়ে পঞ্চধারায় অবতরণ করেন জননী গঙ্গা শোভাময়ী এই উপত্যকায়। রঙবেরঙের ফুলে ভরা উঁচু-নিচু প্রান্তরটির মধ্যে বয়ে চলেছে ছোট ছোট পাঁচটি জলধারা। যেন দেবাদিদেবের পূজার আয়োজন। জলপূর্ণ মঙ্গলকলস আর পুষ্পসম্ভার নিয়ে অপেক্ষা প্রকৃতিদেবীর।

মনে পড়ল স্বামীজীর কথা। অমরনাথযাত্রা তাঁর মর্ত্যজীবনের শেষ তীর্থযাত্রা। দেশে-বিদেশে অক্লান্ত অমানুষিক পরিশ্রমে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় উৎসর্গিত সে দেবতনু তখন রোগজীর্ণ, অশক্ত। সে যুগে পথকষ্টও ছিল অনেক অনেক বেশি। প্রচণ্ড শৈত্য, অকল্পনীয় পথক্লেশাদি সবকিছু শান্তচিত্তে সহ্য করে তীর্থযাত্রীর পালনীয় সমস্ত কৃত্যাদি তিনি যথাযথভাবে মেনে চলেছিলেন সারাটি পথ। ভগ্নস্বাস্থ্য শ্রান্ত শরীর। তবু তীর্থকৃত্য মেনে সিক্ত বসনে পরপর পাঁচটি ধারায় স্নান করেছিলেন পঞ্চতরণীতে। ছাপার অক্ষরে ঐ ঘটনার কথা পড়া ছিল। কিন্তু পঞ্চতরণী পৌঁছে প্রথমে মনে হলো—'অসম্ভব'—অবিশ্বাস্য এমন ঘটনা। পরক্ষণেই মন বলে, এক কপর্দকও সঙ্গে না নিয়ে যিনি সম্রাটের সম্মানে অর্ধপৃথিবী পরিক্রমণ করে আসতে পারেন, রবাহূত হয়েও যিনি লাভ করেন রাজরাজেশ্বরের মর্যাদা, আজও যাঁর চিত্রপট দেখলে, এমনকী ছাপার অক্ষরে যাঁর কথা পড়লে তড়িৎ শিহরণ জাগে সর্বজনচিত্তে, যাঁর অশরীরী বাণী আজও প্রেরণা জোগায় বিশ্ববাসীকে, বিশ্বজয়ী সেই বীর সন্ন্যাসীর পক্ষেই এমনটি সম্ভব। অন্য কারও পক্ষে সত্যিই অসম্ভব।

নাঃ—পাঁচটি ধারা দূরে থাক, একটি ধারাতেও স্নান হলো না। তবে মাতৃপরশ একটু মিলল। পা পিছলে পড়ে ভিজল জুতো-মোজা-কাপড় এবং হাত-পা-চুল। পথের সাথী 'কাদেরের' আবার ধমক অসতর্কতার জন্য। তবে সে-ই আবার সাদরে সযতনে নিয়ে গেল কাছেই তাদেরই অস্থায়ী অফিস ঘরে। ছোট্ট ঘর। অগ্নিকুণ্ড ঘিরে বসে আছে জনা চারেক লোক। চেহারা বলে দেয় সবাই কাশ্মীরের অধিবাসী। তাদের সরিয়ে অগ্নিকুণ্ডের পাশটিতে আমায় বসিয়ে কাদের বলে ওঠে—'হাত-পা-জামা-কাপড় একটু গরম করে নাও, চা খাও, তারপর তোমাদের ডেরায় দিয়ে আসব'। ইতিমধ্যে ওর জানা হয়ে গেছে, পঞ্চতরণীতে P.W.D.-র একটি কুটিরে আমাদের আজকের যাত্রাবিরতি।

কনকনে ঠাণ্ডার মাঝে উষ্ণতার আরাম ভালোই লাগল। কিন্তু ভিজে মোজা ও কেডস্ জোড়াটি একটু আগুনের তাপে শুকিয়ে নেব ভেবে যেই রেখেছি অগ্নিকুণ্ডের কাছাকাছি, অমনি আরেক বিপত্তি। একসঙ্গে সব্বাই চিৎকার করে উঠল—**'এ কি কাণ্ড? আগুন কতো পবিত্র। জুতো-মোজা রাখছ তার কাছে।'** আমি তো মহা অপ্রস্তুত। তাড়াতাড়ি সেগুলি সরিয়ে নিই। মাপ চাই কৃতকর্মের জন্য। কথায় বলে—**সাধুর রাগ জলের দাগ। এদের ক্ষেত্রে সে প্রবাদবাক্য যে কত সত্যি, মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি সেদিন। গৈরিকবসন নেই অঙ্গে। গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী নন, দেবদর্শনে ব্যাকুল তীর্থযাত্রীও নন, অথচ কী উদারতার-প্রীতির-প্রসন্নতার অমল আলো! উজ্জ্বল এঁদের হৃদয়মন্দির।**

শুনেছি পারসিকরা অগ্নি উপাসক। প্রাচীনকালেও প্রতি হিন্দুগৃহে পূজিত হতেন অগ্নিদেব। কিন্তু এরা? ধর্মে মুসলমান। লেখাপড়াও তেমন জানে না। **কী শ্রদ্ধার চোখেই না দেখে আগুনকে! আগুনই প্রাণ এই প্রচণ্ড শৈত্যের দেশে।** তাই বুঝি অন্তর থেকে উৎসারিত এ শ্রদ্ধা। আর ভারতবর্ষের প্রাণ যে অদ্বৈততত্ত্ব, যে একত্ব অনুভব তারই প্রকাশ নয় কি—অপরিচিত, ভিন্ন রাজ্যবাসী জনের প্রতি এমন আন্তরিকতায়!
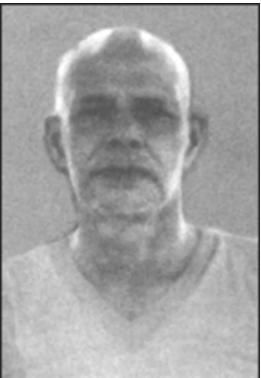
অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেউ উপবাসী থাকে না

কারো কারো মনে প্রশ্ন জাগে—'প্রার্থনা কি পূর্ণ হয়?' প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া, না হওয়া বিষয়ে সন্দেহ তো দূরের কথা, তিনি যে প্রার্থনা না করতেই তা পূর্ণ করে দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেউ উপবাসী থাকে না। তাঁর দর্শন-প্রার্থনা যিনিই করবেন তিনিই যে তাঁকে লাভ করবেন, এ অপেক্ষা নিশ্চিত সত্য আর কিছুই নেই। ভক্ত জানেন—সূর্যের উদয় এবং অস্তও অনিশ্চিত হতে পারে, কিন্তু ভগবানকে পাওয়া কখনও সন্দেহের বিষয় নয়। তাঁকে পাওয়ার প্রার্থনা কখনও নিষ্ফল হতে পারে না। —**স্বামী জগদানন্দ** *(প্রাচীন সাধুদের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ৫২১)*

পরিক্রমা

শ্রীশ্রীরামনাম সঙ্কীর্তনের ইতিকথা

ব্রহ্মচারী নির্মোহচৈতন্য *

আজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দেড়শো-র বেশি শাখাকেন্দ্রে এবং এর ভাবধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত বহু কেন্দ্রে প্রতি একাদশী তিথিতে 'রামনাম সঙ্কীর্তন' বা 'নাম-রামায়ণম্' অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে গাওয়া হয়ে থাকে। ১৯১০ সালে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ এটির সঙ্কলন করেন এবং মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলিতে এই গানের প্রচলন শুরু করেন। এই সঙ্কীর্তনের সঙ্কলন কী করে হলো? এটি কীভাবে প্রচারিত হলো? এটির রচয়িতা কে? এটির বর্তমান স্বরূপ কবে এবং কীভাবে নির্ধারিত হলো? এই প্রবন্ধে আমরা যথাসম্ভব এই তথ্যগুলি প্রদান করার চেষ্টা করব।

রাম-সীতা-লক্ষ্মণের সাথে ভক্ত হনুমান

ব্যাঙ্গালোরে প্রথমবার শ্রবণ ঃ কাহিনীর শুরু ১৯০৯ সালের প্রারম্ভে। ঐ বছরের শুরুতে বর্তমান কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালোর নগরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। উক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবার জন্য রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ ব্যাঙ্গালোরে যাত্রা করলেন। ২০ জানুয়ারি আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিনে মহারাজের সভাপতিত্বে একটি বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় মহীশূর মহারাজার দেওয়ান বাহাদুর এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী বক্তৃতা দেওয়ার পর তিনি ইংরাজীতে দু-চারটি সময়োপযোগী সারগর্ভ কথা বলে আশ্রমের দ্বার উদ্ঘাটন করলেন। ব্যাঙ্গালোরে তাঁকে দর্শন করে সকলে মুগ্ধ হলো এবং তাঁর সংস্পর্শে এসে ও উপদেশ শুনে কৃতার্থ বোধ করল।[১]

আশ্রম প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্গালোরে মুচি সম্প্রদায় ও অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতির কতিপয় ভক্ত প্রতি রবিবার মঠে এসে বড় হলঘরে সমবেতভাবে প্রার্থনা ও উপাসনা করত এবং পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে রামনাম সঙ্কীর্তন করে মহারাজের পাদ-বন্দনা করত। মহারাজ তাদেরকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হতেন। তাদের প্রতি তাঁর উদার এবং সস্নেহ ব্যবহার দেখে অনেক ব্রাহ্মণ ভক্তের অন্তর হতে সংস্কারগত হেয় জ্ঞান, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ দূর হয়েছিল।[২]

ব্যাঙ্গালোরে রামনাম সঙ্কীর্তন শুনে মহারাজ মুগ্ধ হন। বাংলাদেশেও (অখণ্ড বাংলা) যাতে এটি প্রবর্তিত হয়, সেই বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। একসময়ে স্বামীজী বাংলার ঘরে ঘরে ত্যাগ, ভক্তি ও জ্ঞানের আদর্শমূর্তি শ্রীমহাবীরের পূজা প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। এই সূত্রে রামনাম সঙ্কীর্তনের সাথে মহাবীরের পূজা প্রচলন করার ইচ্ছা মহারাজের মনে উদিত হলো। তিনি সেটি সংগ্রহ করে অম্বিকানন্দকে সুরসংযোগ করতে বললেন। পরে আরও কয়েকদিন সেখানে অতিবাহিত করে মহারাজ মাদ্রাজ মঠে প্রত্যাগমন করলেন।[৩]

পুরীতে স্বর-সংযোজন ঃ ১৯০৯ সালের মে মাসে মহারাজ মাদ্রাজ হতে পুরীধামে ফিরে শশীনিকেতনে অবস্থান করতে লাগলেন। দক্ষিণদেশ হতে যে রামনাম সঙ্কীর্তন সংগৃহীত হয়েছিল তাতে প্রার্থনা ও স্তব সন্নিবেশ করা হলো। স্বামী অম্বিকানন্দ সুর-তান-লয় সংযোগ করলে শশীনিকেতনের সুবিস্তৃত হলঘরে মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সমবেত হয়ে মহারাজের সামনে সর্বপ্রথম সেটি গাইলেন। পরে একদিন শ্রীমন্দিরেও রামনাম সঙ্কীর্তন হলো। পুরীধামের গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ধর্মপ্রাণ ভক্তেরা এটি শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন।[৪]

** বেলুড় মঠে সেবারত এই তরুণ ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসু হিসাবে সাধুমহলে সুপরিচিত।*

বেলুড় মঠে প্রথম প্রস্তুতি ঃ ১৯১০ সালে 'মহারাজ' পুরী থেকে বেলুড় মঠে ফিরলেন। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখছেন, 'দক্ষিণদেশ হতে নাম-রামায়ণ সংগ্রহ করে মহারাজ বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেছেন (১৯১০)। মঠে এই প্রথমবার সুরসংযোগে গীত হবে, তার আয়োজন হয়েছে। বিকেলবেলা, অঙ্গনটি লোকে পরিপূর্ণ। গিরিশবাবু ও মাস্টার মহাশয় উপস্থিত আছেন।'[৫] সাধু-ব্রহ্মচারিগণ এই সময়ে বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে হারমোনিয়ামাদি বাদ্যসহ সুর-তান-লয় সংযোগে রামনাম সঙ্কীর্তন করেছিলেন। অনেক ভক্ত দর্শনার্থী নরনারী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পরমানন্দে এই নূতন কীর্তন গান শুনেছিলেন।[৬] শ্রীবলরাম বসুর পুত্র রামকৃষ্ণ বসুর ডায়েরী থেকে জানা যায়, ঐ দিনটি ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি, ১৯১০ সালের ১৩ মার্চ। 'গিরিশবাবু, মাস্টারমশাই, পুলিনবাবু, পূর্ণবাবু, শ্যাম ও আরও অনেকে এসেছে। মহারাজের সাথে রামনাম সঙ্কীর্তনে অনেকে যোগ দেয়। ... খুব আনন্দের স্রোত চলে।'[৭]

'নারদীয় ভক্তিসূত্রে' আছে—**'স কীর্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবতি অনুভাবয়তি চ ভক্তান্'**—অর্থাৎ যেখানে তাঁর নামসঙ্কীর্তন হয় সেখানে ভগবানের শীঘ্র আবির্ভাব হয়, এই অনুভব তিনি ভক্তদেরকে করিয়ে থাকেন। সেদিন মঠের প্রাঙ্গণে মহারাজ প্রভৃতির পূত সান্নিধ্যে বৈরাগ্যবান শুদ্ধসত্ত্ব সাধু-ব্রহ্মচারিদের ভক্তিরসাপ্লুতস্বরে রামনামকীর্তন গাওয়া হলে অপূর্ব ভাবমাধুর্যের স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। বেলুড় মঠে এই রামনাম সঙ্কীর্তন শুনে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী এটি শেখার জন্য ব্যাকুল হলো।[৮]

ঐ বছরের এপ্রিল মাসের 'প্রবুদ্ধ ভারত' মাসিক পত্রিকায় জানা যায় যে, ২০ মার্চ শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধারণ উৎসবেও ঐ সঙ্কীর্তন হয়। পত্রিকার অংশটি এইরূপ—'বেলুড় মঠে ১৩ মার্চে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ৭৫তম জন্মতিথি এবং ২০ মার্চ সাধারণ উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সৌভাগ্যের কথা যে, ঐ বছর তিথিপূজা রবিবার ছিল। তাই বহু ভক্ত ও ছাত্র সমাগম হয়। ... প্রায় এক হাজার ভক্ত ঐদিন ভক্তি-সঙ্গীতের রসাস্বাদন করেন। ... আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর উপস্থিতিতে ভক্তদের আনন্দবর্ধন হয়েছিল। এই অবসরে তিনি রামনাম সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা করেন এবং অনেক ভাবুকতাপূর্ণ হৃদয়বান ব্যক্তি এই কীর্তন শুনে মুগ্ধ হন। এটি সরল সংস্কৃত ছন্দে লেখা, ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সম্পূর্ণ লীলাকথা সংক্ষেপে প্রস্তুত করা আছে—যেটি বাদ্যসহযোগে খুব সহজেই সঙ্কীর্তনের রূপ দেওয়া যায়। ... আন্দুলের বিখ্যাত কালীকীর্তন সমিতি এবং মঠের সদস্যদের পরিবেশিত রামনাম সঙ্কীর্তন ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিল।'

রামনাম সঙ্কীর্তন শ্রবণরত হনুমানজী

রামনাম সঙ্কীর্তনে মহাত্মা তুলসীদাসের রচিত স্তোত্রাদি সন্নিবিষ্ট হয়ে ১৯১০ সালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হতে লাগল। সেই পুস্তিকার ভূমিকায় মহারাজ লিখেছিলেন—'পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর বড় সাধ ছিল, বঙ্গে ব্রহ্মচর্য মূর্তি শ্রীশ্রীমহাবীরের উপাসনা প্রবর্তিত হয়। সেই জন্য আমরা মঠে এই নাম সঙ্কীর্তনের পূর্বে শ্রীশ্রীমহাবীরের আরাধনার নিয়ম করেছি। অনুরোধ, অপর সকলেও এর অনুবর্তন করুন। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনপূর্বক ভগবৎ-প্রীতির অধিকারী হয়ে জন্মভূমি ধন্য ও পবিত্র করুন, হৃদয়ের এই অকপট প্রার্থনা।'[৯]

নাম-রামায়ণের প্রচার ঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দের ইচ্ছা ছিল সারা ভারতে যেন নাম রামায়ণের প্রচার হয়। এই কারণে তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই সঙ্কীর্তনের আয়োজন করতেন। মহারাজের স্মৃতিকথায় এরূপ ঘটনার অনেক উল্লেখ আছে। ১৯১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি

রামকৃষ্ণপুরে শ্যামবাবুর বাড়িতে এক মহোৎসবে রাজা মহারাজ যোগদান করেন, রামনাম হয়। রাতে রামায়ণ গানও হয়।[১০]

বারাণসীতে সঙ্কীর্তনের সূত্রপাত ঃ রাজা মহারাজ ১৯১২ সালের দীপাবলীর আগে অর্থাৎ নভেম্বর মাস থেকে ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত প্রায় ছয় মাস এবং ঐ একই বছরে ৪ অক্টোবর থেকে পরবর্তী বছর ১৯১৪ সালের ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত—সর্বসাকুল্যে মোট দেড় বছর বারাণসীতে অতিবাহিত করেছিলেন। এই সময় এই সঙ্কীর্তনকে কেন্দ্র করে অনেক ঘটনা ঘটে এবং এটির পাক্ষিক গাওয়ার প্রচলন শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে স্বামী বরদানন্দ লিখছেন—'১৯১২/১৩ সালের কথা। মহারাজের ইচ্ছানুসারে কাশীর উভয় আশ্রমে রামনাম সঙ্কীর্তনের ব্যবস্থা হয়—একাদশীতে সেবাশ্রমে এবং অমাবস্যা-পূর্ণিমায় অদ্বৈত আশ্রমে। ঐ সময়ে মহাবীরের উদ্দেশে একখানা আসন ও তদুপরি একখানি সঙ্কীর্তনের বই রাখা হতো।'[১১]

সাক্ষাৎ মহাবীরের আবির্ভাব ঃ রাজা মহারাজের জীবনের কয়েকটি ঘটনা দেখলে বোঝা যায় যে, নাম-রামায়ণ চলাকালীন মহারাজই একমাত্র ছদ্মবেশী মহাবীর হনুমানের দর্শন পেতেন। একথা তিনি অন্য কয়েকজনকে বলেও ছিলেন। তাঁর বারাণসীবাস কালেই রামনাম সঙ্কীর্তনের কিছু বই কলকাতা থেকে ছেপে আনা হয়েছিল। আশ্রমের কর্মিরা মহারাজের উৎসাহে কীর্তনের মহড়া দিতে লাগলেন। একবার একাদশীর দিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরাম, জানকী, মহাবীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে নৈবেদ্য উৎসর্গ করে পূজারতি করা হলো। আরতি শেষে সকলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসেছেন, স্তবপাঠ আরম্ভ হয়েছে, এমন সময় মহারাজ হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠে আসন দিতে বললেন। একটি আসন পেতে একখানি পুস্তিকা রাখা হলো তার ওপর। পরে মহারাজ বলেছিলেন, মহাবীর স্বয়ং এসেছিলেন কীর্তন শুনতে, তাই তিনি আসন দিতে বলেছিলেন।[১২] স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ তাঁর স্মৃতিচারণায় বলছেন, 'আমার যতদূর মনে আছে, বারাণসীতে রাজা মহারাজ একবার রামনাম প্রারম্ভের অনেক আগে—অন্যের আগমনের বহু পূর্বেই একজন বৃদ্ধকে আসতে দেখেছিলেন। আবার রামনাম শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের বেরিয়ে যাবার পূর্বেই সেই বৃদ্ধ প্রথমে চলে গিয়েছিলেন। মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই বৃদ্ধই মহাবীর হনুমান। সেদিন থেকে তিনি রামনামের সময় অতিথি মহাবীরের জন্য একটি আসন সংরক্ষণের প্রথা প্রবর্তন করেন।'[১৩]

প্রায় একই আর একটি ঘটনা। ১৯২১ সালের ৪ মার্চ, একাদশী তিথি। ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তদের বড় একটি দল নিয়ে রাজা মহারাজ মহাত্মা তুলসীদাসের সাধনভূমিতে অবস্থিত সঙ্কটমোচন মন্দিরে গেলেন। মন্দির প্রাঙ্গণে সকলে আসন গ্রহণ করে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মধুর রামনাম সঙ্কীর্তন আরম্ভ করলেন। ... কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, এক পলিতকেশ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেখানে এসে স্থিরভাবে বসলেন এবং তন্ময়ভাবে কীর্তন শুনতে লাগলেন। সৌম্যসুন্দর বৃদ্ধটি কিন্তু কীর্তন সমাপ্তির মুখে আসর ছেড়ে চলে গেলেন। জমজমাট কীর্তন শেষ হলে মহারাজ বললেন, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে স্বয়ং মহাবীর উপস্থিত হয়েছিলেন। বিস্মিত ও পুলকিত কয়েকজন সাধুভক্ত আশেপাশে খুঁজতে গেলেন, কিন্তু বৃদ্ধকে কেউ দেখতে পেলেন না।[১৪] এই ঘটনারই আরেকটি বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ঐদিন দুই আশ্রমের সকলে মিলে, অনেকগুলি এক্কাগাড়িতে সঙ্কটমোচন মন্দিরে যান। মন্দিরের বারান্দায় মহাবীরের দিকে মুখ করে বসেছেন নীরদ মহারাজ, বিশ্বরঞ্জন মহারাজ ও স্বামী বরদানন্দ মহারাজ আর দুপাশে পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বসেছেন সব দোহাররা। স্বামী বরদানন্দের বর্ণনা থেকে জানা যায়—'সেদিন কীর্তন খুব জমে উঠেছিল। একজন গৌরবর্ণ পুরুষ—সাদা ধবধবে চেহারা, লম্বা চুল-গোঁফ-দাড়ি, মোটা চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা—মহাবীরের মন্দিরের দোরগোড়ায়, বাইরের দিকে, পশ্চিম পাশে স্থির হয়ে বসলেন পূর্বমুখে, মহারাজের কতকটা মুখোমুখি হয়ে, আর কীর্তন শেষ হওয়া মাত্র উঠে চলে গেলেন। অনেকবার আমি তাঁকে লক্ষ্য করেছি। মহারাজ বললেন, তিনি হচ্ছেন মহাবীর। মহাবীরকে খুঁজতে কেউ কেউ তখন এদিক ওদিক ছুটল, কিন্তু বটগাছে কয়েকটি হনুমান ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পাওয়া গেল না।'[১৫] 'সঙ্কটমোচন' স্থানে আয়োজিত ঐ রামনাম সঙ্কীর্তন ফাল্গুনের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকেই মহারাজের অভিপ্রায় অনুযায়ী ঐ স্থানে প্রতি বছর ঐ দিনে রামনাম কীর্তন হয়ে থাকে।[১৬]

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

মাতৃ-অনুধ্যান

গৌরী-মার দৃষ্টিতে মা সারদা

পূর্বা সেনগুপ্ত *

১৯২০ সাল, বেলুড় মঠে, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মন্দিরটির শতবর্ষ উদ্‌যাপনের পবিত্রক্ষণে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারে শ্রীমায়ের চিতাগ্নি নির্বাপিত হয়েছিল। শেষ অংশটুকুর সমাপ্তিতে আকাশ থেকে নেমে এসেছিল বৃষ্টির ধারা। একদিকে ধরিত্রীর গঙ্গা, অন্যদিকে আকাশগঙ্গা। দুই পবিত্রজল মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছিল। মায়ের ভগবতী তনু সুস্নাত হলো, কিন্তু সেই মুহূর্তে বহু ভক্ত ভস্মাস্থি সংগ্রহে ব্যাকুল হলেন। তাদের আগ্রহ দেখে স্বামী শিবানন্দজী সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন, এই বস্তুর যথাযথ মূল্য না দিলে বিপদ হবে। এই সাবধানবাণীতে কাজ হলেও, হলপ করে বলা যায়, শ্রীমায়ের ভস্মাস্থি বাগবাজারের একাধিক গৃহে এখনও পূজিতা। গৃহদেবী-রূপে রক্ষিত। কেবল এই নয়, স্বামী শিবানন্দ উচ্চারিত আরেকটি বাণী আমরা এখানে স্মরণে রাখব, তিনি শক্তিসাধনার ধারার পথরেখাটিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, 'স্বয়ং মহামায়ার এক একটি দেহাংশে গড়ে ওঠে এক একটি শক্তিক্ষেত্র, মহাজাগরিত স্থান। আর বেলুড় মঠের এই স্থানে দেবীঅঙ্গের সবটুকু সংরক্ষিত।' তাহলে এটি কত বড় শক্তি আরাধনার স্থান তা আমাদের বুঝতে হবে।

প্রতিষ্ঠা লগ্নে বেলুড় মঠে শ্রীসারদা মন্দির

এই মহাশক্তির লীলাখেলায় বিন্দুবাসিনী দেবীর সঙ্গীরূপে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের জীবনও বড় কাব্যময়। আকাশে চন্দ্রমার সৌন্দর্য নির্ণীত হয় পাশের তারকাগুলির ঔজ্জ্বল্যের ভিত্তিতে। শ্রীমা যদি চন্দ্র হন, তাঁর পাশে পরিবেষ্টিত সপ্তসাধিকা এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এঁদের মধ্যে আমি গৌরী-মায়ের সঙ্গে শ্রীমায়ের সম্পর্ককে বেশি গুরুত্ব দিতে আগ্রহী, কারণ শ্রীমায়ের পাশে তিনিই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের একমাত্র সন্ন্যাসিনী শিষ্যা এবং তাঁর দৃষ্টিতে শ্রীমায়ের রূপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনের শাস্ত্রব্যাখ্যাতা যদি ভৈরবী ব্রাহ্মণী হন, তবে শ্রীমায়ের জীবনের শাস্ত্র ব্যাখ্যাকার হলেন গৌরীপুরী দেবী বা আমাদের গৌরী-মা। আমরা গৌরী-মায়ের জীবনীতে পাই, তিনি কালীঘাট অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। মা তাঁকে বলতেন, 'কালীঘাটের মেয়ে'। নাম ছিল মৃড়াণী দেবী। ছোট থেকেই বৈরাগ্য, বিবাহের কথায় ভয়। ছোটবেলায় একবার পালিয়ে কোন্নগর চলে গিয়েছিলেন। এক অচেনা ব্রাহ্মণ তাঁকে আশ্রয় দেন। বাড়ির লোক যখন সেই ব্রাহ্মণের কাছ থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন, তখন ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, 'হলদে পাখি ঘরে রাখা দায়। এই পাখিকে সংসারে বেঁধে রাখা যাবে না।' সব নারীর চোখ নীড়ের মতো হয় না। কারোর চোখ পাখির ডানার মতো অসীমে উড়তে চায়। সকলকে নিয়ে বিশ্বাসের বটপত্রে ভেসে যাওয়া, অসীম গগনচারী হওয়াই তাঁর জীবনের ব্রত। গৌরী-মা তাই-ই ছিলেন।

দক্ষিণেশ্বরের এক ঝিমঝিম দুপুর। গঙ্গার কলতান। শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে উপস্থিত হয়েছেন গৌরী-মা। সুদীর্ঘ তপস্যার অন্তিম অংশ শুরু হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে চলেছেন নহবতে। যেখানে মা আছেন। নহবতে ঢুকে শ্রীমাকে তিনি বললেন, 'ওগো ব্রহ্মময়ী, একজন সঙ্গী

* *রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষিকা এই প্রাজ্ঞ সুবক্তা পরিষদের ভাবানুশীলন বিভাগের ভূতপূর্ব স্বেচ্ছাসেবিকা সমাজশিক্ষার সতত শুভাকাঙ্ক্ষিণী।*

চেয়েছিলে না? এই দেখ।' তাহলে ব্রহ্মময়ী কিছু চেয়েছিলেন! কী চেয়েছিলেন! তাঁর মতো একজন ব্রহ্মবাদিনীকে, যিনি ব্রহ্মবিদ্যার মাধ্যমে ব্রহ্ম আর তাঁর শক্তির অভেদলীলার মাধুর্য, মাহাত্ম্যকে উন্মোচন করতে পারবেন। গৌরী-মা ছিলেন সেই ব্রহ্মবাদিনী। যিনি ব্রহ্মময়ী শ্রীমায়ের নিত্য সহচরী ছিলেন। তাঁর লীলা বর্ণনায় ছিলেন নিপুণ।

এই ব্রহ্মবাদিনীর যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল কেমন করে? গৃহবন্দী মৃড়াণীকে নিয়ে গঙ্গাসাগরের মেলায় গিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যগণ, সেই মেলা থেকে ইচ্ছে করে হারিয়ে গিয়ে, পুরুষের বেশ ধরে হিমালয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কী বিচিত্র সাহস! কী তীব্র বৈরাগ্য! শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বপ্রথম সন্ন্যাসিনী শিষ্যা গৌরী-মা। পরম বৈষ্ণব, দামোদরশিলার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। শাস্ত্রজ্ঞা।

শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম, বাগবাজার

শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাখেলার প্রথমাংশে দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমায়ের মধ্যে যে দিব্য সম্পর্ক, তা ধরতে পেরেছেন গৌরী-মা। শ্রীশ্রীঠাকুর একদিন মজা করে বলছেন, 'বল তো গৌরদাসী, তুই কাকে বেশী ভালোবাসিস? আমাকে না ওকে?' গৌরী-মা এক মুহূর্তে উত্তর দিয়েছিলেন কবিতার ছন্দে—

'রাই হতে তুমি নওকো বড় বাঁকা বংশীধারী
লোকের বিপদ হলে, তোমায় ডাকে মধুসূদন বলে
তোমার বিপদ হলে, বাঁশিতে ডাকো রাই কিশোরী।'

গৌরী-মা এটি উচ্চারণ করা মাত্রই মা লজ্জায় তাঁর মুখটি হাত দিয়ে চাপা দিয়েছিলেন। কী মধুর তাঁদের ভাব-ভঙ্গিমা! ঠাকুর তাঁর বক্তব্য মেনে নিয়ে হাসতে হাসতে স্থানত্যাগ করেছিলেন। সেই দিনই যেন তিনি বলেছিলেন, এ আন্দোলন সারদার, এ জাগরণ সেই অষ্টাদশী সারদার! তিনি যে অঙ্গীকার করেছিলেন, 'ইষ্ট পথে' সহায়তা করতে এসেছেন। গৌরী-মা নহবতবাসিনী মহাশক্তির সম্যকরূপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। আর তাঁর এই জানার মধ্য দিয়েই দক্ষিণেশ্বরের নহবতে স্ত্রী-মঠের সূচনা হয়েছিল। ঠাকুর তাই গৌরী-মাকে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, 'আমি জল ঢালি, তুই কাদা চটকা।' সেদিন স্পষ্ট ছিল নির্দেশ, 'এই শহরে, এই জন কোলাহলের মধ্যেই স্থাপিত হবে নতুন বীজ। আর তা হবে শ্রীমাকে কেন্দ্র করে। স্বামীজী বলছেন, ''মাকে কেন্দ্র করে কত গার্গী, মৈত্রেয়ীর জন্ম হবে।'' এর সার্থক ও প্রথম উত্তরসূরি ছিলেন গৌরী-মা।'

গৌরী-মাকে শাস্ত্রজ্ঞা জেনে ঠাকুর কলকাতার ভক্তদের গৃহে তাকে পাঠাতেন। যাতে সেই গৃহবন্দী মেয়েরা শাস্ত্র সম্বন্ধে জানতে পারে। শ্রীমায়ের চারপাশের মেয়েরাও তার মধ্যে ছিলেন। ঠাকুর যখন চলে গেলেন, আমরা জানি শ্রীমা তাঁর শাঁখা খুলে ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে শ্রীরামকৃষ্ণ এসে তাঁকে বললেন, 'এ তুমি খুলো না, আমি আর কোথায় গিয়েছি, এ ঘর থেকে ও ঘর!' পরবর্তিকালে আবার যখন লোকের কথায় বিব্রত শ্রীমা অলঙ্কার ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন, তখনই ঠাকুর তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেছেন, 'বৈষ্ণবতন্ত্র জান? গৌরী এসে তোমাকে বোঝাবে।' শ্রীমায়ের জীবনের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য গৌরী-মাকে যেন ঠাকুর রেখে গিয়েছিলেন। তিনি এসে শ্রীমাকে বুঝিয়েছিলেন, তন্ত্র সাহিত্যে বলা হয়, যিনি স্বয়ং লক্ষ্মী তিনি যদি নিরাভরণা হন তবে জগতের অমঙ্গল হয়। তন্ত্র সাহিত্য অনুযায়ী নারীদের মধুরভাবের সাধনের যে পথনির্দেশ আছে, তাতে সাধিকা কখনও নিরাভরণা হবেন না। যিনি ঈশ্বরের প্রিয়া তাঁর আচার ভিন্নতর। স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মধুরভাবে সাধন করেছিলেন, তখন মথুরবাবু তাঁকে অলঙ্কার গড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই অলঙ্কারই শ্রীমায়ের শ্রীঅঙ্গে শোভা পেত। গৌরী-মা সুন্দরভাবে শ্রীমাকে বোঝাচ্ছেন, যাঁর চিন্ময় স্বামী তাঁর আবার বৈধব্য কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ ইহদেহ ত্যাগ করার পর শ্রীমা প্রথম দীক্ষাপ্রদান করলেন বৃন্দাবনে। শোনা যায়, শ্রীমা দীক্ষা প্রসঙ্গে অনেক সময় গৌরী-মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

কাকে কী মন্ত্র দিলে ভালো, সে প্রসঙ্গও ব্রহ্মময়ী ও ব্রহ্মবাদিনীর মধ্যে আলোচিত হতো। এখানেই শেষ নয়, শ্রীমাকে স্বয়ং মহাশক্তিজ্ঞানে গৌরী-মা তাঁর কাছে মন্ত্রলাভ করানোর জন্য নানা ভক্তজনকে নিয়ে উপস্থিত হতেন। শ্রীমা কখনও বলতেন, 'এই তো সেদিন ওমুক-কে নিয়ে এলে! আবার আজ একে!'—গৌরী-মায়ের উত্তর হতো, 'দেবে না তো কী! কী জন্য এসেছ?' মানুষের উত্তরণ করানোই তো দেবীরূপ ধারণের উদ্দেশ্য। একবার গড়পারের এক পূজারি ব্রাহ্মণ গৌরী-মার কাছে দুঃখ করে বললেন, 'তাঁর রাধারানীকে দর্শন করার খুব ইচ্ছা।' গৌরী-মা জানালেন, বেশ, তিনি পারেন রাধারানীর সঙ্গে তাঁর দর্শন করিয়ে দিতে। ব্রাহ্মণ খুব আনন্দিত। গৌরী-মা এসে শ্রীমাকে জানালেন, সেই গড়পারের ব্রাহ্মণকে স্বয়ং রাধারানী দর্শন করাবার জন্য তিনি বাগবাজারে শ্রীমায়ের কাছেই তাকে আনবেন। মা তাঁকে প্রথমে ধমক দিলেন, এতে যে অন্যায় হয়! কিন্তু গৌরী-মা এসবে কর্ণপাত করলেন না। কারণ তিনি তাঁর বিশ্বাসে স্থির। ব্রাহ্মণটি এলেন! শ্রীমায়ের দিকে তাকিয়ে ভক্তিভাবে প্রণাম করে চলে গেলেন। তিনি কী দেখে তৃপ্ত হয়েছিলেন তা আমাদের অজানা। গৌরী-মায়ের গর্ভধারিণী গিরিবালা দেবী শক্তিসাধিকা ছিলেন। খুব ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। কিন্তু মেয়ের সারদা-ভক্তিতে তাঁর খুব একটা সায় ছিল না। একদিন গৌরী-মা নিজের গর্ভধারিণীকে নিয়ে এলেন শ্রীমায়ের কাছে। মাকে দেখেই গিরিবালা চমকে উঠে বললেন, 'হ্যাঁ মা! একী! তুমি এখানে?' গিরিবালাকে চমকে যেতে দেখে অবাক শ্রীমা বলে উঠলেন, 'কী হল?' গৌরী-মা উত্তর দিলেন সহাস্যে, 'যা হওয়ার তাই হয়েছে।' শ্রীমায়ের মধ্যে গিরিবালা দেবী নিজের আরাধ্যা দেবীকে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু শ্রীমায়ের সংসার ছিল ভক্ত-ভগবানের। তাঁর মধ্যে দেবীকে দর্শন তার কাছে কোনও পৃথক অর্থ বহন করত না। যিনি দর্শন করতেন, তাঁকেও ক্ষণিকের মধ্যে মাতৃত্বের স্বাদ প্রদান করে ভুলিয়ে দিতেন আমাদের মা।

জীবনের শেষ অংশে দেখি গৌরী-মা ঠাকুরের কথা অনুযায়ী সন্ন্যাসিনিদের একটা আশ্রম করছেন। কিন্তু তার নাম রাখছেন শ্রীমায়ের নামে, 'শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম'। এই সারদেশ্বরী আশ্রমের জন্য শ্রীমা স্বয়ং অর্থ সংগ্রহ কল্পে অবস্থাপন্ন বধূদের সঙ্গে গৌরী-মায়ের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন। গৌরী-মায়ের জীবন ও এই আশ্রম সম্বন্ধে শ্রীমা অনেক প্রশংসাসূচক কথা বলেছেন, যার মধ্য দিয়ে এই আশ্রম এবং গৌরী-মায়ের প্রতি তাঁর স্নেহের পরিমাণ বুঝতে পারা যায়। শ্রীমা যখন দক্ষিণ ভারতে গেলেন, সেখানে অনেকেই তাঁকে কিছু বলতে অনুরোধ করত। শ্রীমা এই রকম অনুরুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'আমি কী বক্তৃতা দিতে জানি, গৌরদাসী থাকলে সে দিতে পারত।' শ্রীমায়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা-বাক্য উচ্চারিত হতো, 'যে বড় হয় সে একটিই হয়, যেমন গৌরদাসী'। শ্রীমায়ের নানা লীলার সাক্ষী ছিলেন গৌরী-মা। তাই মা বলতেন, 'গৌরী কি মেয়ে? দেখ স্কুল, বাড়ি, গাড়ি সব করে ফেললে।' সারদেশ্বরী আশ্রমের প্রতি অতুলনীয় মমতায় তিনি বলে উঠেছিলেন, 'যে গৌরীর আশ্রমের পলতেটুকু উসকে দেবে বৈকুণ্ঠ তার কেনা।' আবার গৌরী-মায়ের সাধনজীবন নিয়ে বলছেন, 'গৌরী কী কম গা! একটা নুড়ি নিয়ে সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিলে।' মা গৌরী-মাকে সন্তানবৎ দেখতেন, অর্থাৎ গৌরী-মায়ের স্বামী শ্রীমায়ের সম্বন্ধে জামাতা হবেন—এটাই স্বাভাবিক। তাই প্রতি জামাইষষ্ঠীতে মায়ের বাড়ি থেকে সারদেশ্বরী আশ্রমে জামাইষষ্ঠীর বিশেষ তত্ত্ব যেত দামোদরশিলার জন্য।

একবার শ্রীমা ও গৌরী-মায়ের একসঙ্গে বসন্তরোগ দেখা দিল। রোগের প্রকোপে দুজনেরই দৈহিক অবস্থা নিদারুণ। একটি মেয়ে গৌরী-মার খুব সেবা করে তাকে সুস্থ করে তুললেন। শ্রীমাও সুস্থ হলেন। সুস্থ হয়ে যে মেয়েটি গৌরী-মাকে সেবা করেছিলেন, তাঁকে আশীর্বাদ করলেন—'এ জন্মে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে।' এতই ভালোবাসার গাঢ়তা। শ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে আছেন, তখন জয়রামবাটীর গ্রামের কেউ বা কারা রটিয়ে দেয়, শ্রীমা সকল ছেলেদের সাধু করে দিচ্ছেন। কোনও ছেলেকে তাঁর কাছে না পাঠানোই ভালো। মা শুনে ব্যথিত হলেন। ডেকে পাঠালেন গৌরী-মাকে। গৌরী-মা সব শুনে ঝোলা কাঁধে বেরুলেন। শ্রীমায়ের স্বরূপ কী তা তিনি গ্রামবাসীদের জমায়েত করে শুনিয়েছিলেন। সেদিন শ্রীমা সম্বন্ধে গৌরী-মা কী বলেছিলেন তা যদি নথিবদ্ধ করা থাকত, তাহলে তা হতো শ্রীমা সারদার স্বরূপ নির্ণয়ের মূল্যবান দলিল। ব্রহ্মময়ী ও ব্রহ্মবাদিনীর অপূর্ব মেলবন্ধন।

শ্রীমায়ের মন্দিরের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের অবসরে আমাদের গৌরী-মায়ের দৃষ্টিতে শ্রীমার স্বরূপ দর্শন অত্যন্ত জরুরী, কারণ এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারব এই মন্দির কেবল মন্দির নয়, শক্তিসাধনার মহাপীঠ। শক্তি আরাধনার এক বিশেষ স্থান।

শ্যামার জবা ও শঙ্করের বিল্বপত্র

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ *

শ্যামার প্রিয় জবাফুল

শাক্ত উপাসকদের কাছে মা কালী বা মা তারা যেমন উপাস্য বা ইষ্টদেবীরূপে আরাধিতা, তেমনি জবাফুলে বা জবার মালায়ও সেই আরাধনা সার্থকরূপ পায়।

মাতৃসাধক রামপ্রসাদের গানে আছে—'বসন পর, বসন পর, মাগো! বসন পর তুমি।/চন্দনে চর্চিত জবা, পদে দিব আমি।/কালীঘাটে কালী তুমি, মাগো কৈলাসে ভবানী।/বৃন্দাবনে রাধাপ্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ..../ কার বাড়ি গিয়াছিলে, মাগো, কে করেছে সেবা।/শিরে দেখি রক্তচন্দন, পদে রক্ত জবা গো।' কিংবা পান্নালাল ভট্টাচার্যের গলায় শোনা খুবই পরিচিত গান ঃ **'বল রে জবা বল,/কেমন করে পেলি রে তুই মায়ের চরণতল।'** জবাফুল আর শ্যামামায়ের পদতল যেন একে অপরের দ্যোতক। 'থাকরে জবা, বনের শোভা/বনের ফুল তুই বনে ফুটি,/তোরে হেরলে শিবের বক্ষে/মনে হয় মার চরণ দুটি।'

অশেষ গুণে গুণান্বিত জবা ঃ মা কালী বা মা তারার পূজা কেন, যে-কোনো দেবীশক্তির পূজায় নৈবেদ্য হয়েছে এই জবাফুল। জবাফুলের উপকারিতা বহুগুণ। এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা শরীরের পাচনক্রিয়াকে উন্নত করে। রয়েছে ইনফ্লেমেশন বন্ধ করার ক্ষমতাও। লিভারের সমস্যায় ও হাইপার টেনশানে জবা বেশ উপকারী। স্ত্রীরোগজনিত সমস্যায় জবা খুবই উপকারী। আয়ুর্বেদ ও নেচারোপ্যাথিতে জবাফুল, শিকড়, পাতা ও ছালকে বিভিন্ন ওষধিগুণের জন্য ব্যবহার করা হয়।

রূপচর্চায় মুখের যত্নে তো জবা আশীর্বাদস্বরূপ। ত্বকের বহু সমস্যার সমাধান ও মুখের তারুণ্য ধরে রাখতে জবার জুড়ি নেই। কালো দাগ, ছোপ, ব্রণ থেকে এটি মুক্তি দেয়। ফ্রি র‍্যাডিক্যালস সরাতে সক্ষম হওয়ায় এটি অ্যান্টি-এজিং ওষুধ হিসেবেও কাজ করে।

মা ভবতারিণী কালীর মুখশ্রীর কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়। আর এলোকেশী মায়ের সুন্দর চুলের সৌন্দর্যও জবাফুলের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত চুলের যত্নে ও প্রতিটি সমস্যায় জবাপাতা খুবই উপকারী। চুল পড়া ও রুক্ষতা রোধ করে। আমলকীসহ জবাফুল ও পাতার পেস্ট একটা অসাধারণ হেয়ার প্যাক। এতে চুল ঘন ও উজ্জ্বল হয়।

জবাফুল ও পাতা দিয়ে তৈরি চা উচ্চরক্তচাপ ও হৃদ্‌যন্ত্রের সমস্যায় ভালো কাজ দেয়। হৃদ্‌স্পন্দন স্বাভাবিক থাকে। অ্যানিমিয়া রোগীদের জন্যেও জবা উপকারী, নিয়মিত জবা-চা সেবনে শরীরে রক্তের পরিমাণ বাড়ে। জবা-চা শরীরে কোলেস্টেরলের ভারসাম্য বজায় রাখে। সর্দিকাশি সারায়। মুখের ঘা থেকেও মুক্তি দেয়।

তবে জবাফুলের নির্যাসের অনেক গুণ যেমন আছে, তেমনি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও রয়েছে। নিম্নরক্তচাপ যাদের আছে, তারা জবা সেবন করলে স্বাস্থ্যের কিছু ক্ষতিকারক প্রভাব পেতে পারেন। মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাবের সাথে বুক ধড়ফড় করতে পারে। এরকম অভিজ্ঞতা হলে জবা নেওয়া বন্ধ করতে হবে।

জবাফুলে প্রচুর পরিমাণে অ্যালুমিনিয়াম থাকে। কিডনি সমস্যা থাকলে অতিরিক্ত অ্যালুমিনিয়াম জমে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের বিকাশে ও অনেক স্নায়ুর রোগে অ্যালুমিনিয়ামের নেতিবাচক প্রভাব আছে। কারুর আবার জবাতে এলার্জি হতে পারে। এলার্জি হলে জবার চা-

** সমাজশিক্ষার নিয়মিত এই প্রাজ্ঞ ও পণ্ডিত শিক্ষক-লেখক রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে একটি সুপরিচিত নামবিশেষ।*

পান তৎক্ষণাৎ বন্ধ করতে হবে। চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে যাতে এলার্জির বৃদ্ধি না হয়।

হিবিসকাস রোজা-সাইনেনসিস বা জবাফুল ও পাতার নির্যাস তেলের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জবার দ্বিতীয় বৃহত্তম পণ্য হলো জবার তেল। ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ। এই তেল অ্যামিনো অ্যাসিডকে উদ্বুদ্ধ করে চুলের দৃঢ়তা ও কোলাজেন বৃদ্ধি করে। ফলে চুল দীর্ঘ হয়, চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং চুলের পরিমাণও বাড়ে।

জবাফুলের বিভিন্ন অংশ দিয়ে শ্যাম্পু তৈরি হয়। সাধারণ শ্যাম্পুর থেকে জবার শ্যাম্পু চুলের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে।

জবাফুল এবং পাতা থেকে জেল-এর মতো যে বস্তুটি পাওয়া যায়; তার উত্তম কণ্ডিশনিং গুণ আছে। শুষ্ক ও জীর্ণ চুলকে জবার নির্যাস দিয়ে তৈরি কণ্ডিশনার দিয়ে নরম এবং মসৃণ করা যায়।

জবাফুল, জবা পাতা এবং দই দিয়ে মাস্ক চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই মাস্ক চুলের গোড়ায় পুষ্টি জোগায় এবং চুলের গুণমান বৃদ্ধি করে। জবাফুল এবং মেথির বীজ দিয়ে তৈরি মাস্ক চুলের খুস্কি দূর করে। জবাফুল ও আমলকীর মিশ্রণে প্রস্তুত মাস্ক চুলের গোড়াকে শক্ত করে এবং চুলকে নরম করে। এমনকী, জবার সাথে নারকেল তেল, অলিভ তেল, আদা, ডিম, পেঁয়াজ, ঘৃতকুমারী এবং নিম আলাদা আলাদাভাবে সঠিক পরিমাণে মিশিয়ে ব্যবহার করলে দ্রুত চুল গজায়।

এর থেকে বোঝা যায়, কেন 'এলোকেশী', 'গলিতচিকুরা' মায়ের জবাফুল এত প্রিয়!

ডায়াবেটিস মেলিটাস রোগীদের অগ্ন্যাশয়ের বিটা কোষগুলিকেও রক্ষা করতে সাহায্য করে জবাফুলের পাপড়ির নির্যাস।

জবা যেন লেলিহান অগ্নিশিখা ঃ এসব গুণ থেকেই বোঝা যায়, কেন মায়ের পূজায় কিছু থাকুক না থাকুক, জবাফুল থাকতেই হবে। আর শক্তিরূপিণী মা কালীর আরাধনা মানেই তো শক্তি ও শৌর্যের আরাধনা। জবার লাল রঙ সেই শক্তি ও অগ্রগতির প্রতীক। আগুন থেকে আলো ও তাপশক্তি পাই। এই আলো মনের যত অন্ধকার ও বাইরের অন্ধকার নিঃশেষে দূর করে। জবা ফুলটি যেন লেলিহান অগ্নিশিখার মতো। তাই তো দেখি, বৈদিকযুগে কালী লেলিহান অগ্নিশিখার অন্যতম রূপ। মুণ্ডক উপনিষদে 'কালী করালী চ মনোজবা চ, সুলোহিতা যা চ সুধুম্রবর্ণা। স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচি চ দেবী, লেলায়মানা ইতি সপ্তজিহ্বাঃ।' অর্থাৎ আগুনের সপ্তজিহ্বার মধ্যে 'কালী' অন্যতমা। আবার আদি শঙ্করাচার্য তাঁর 'অপরাধভঞ্জন-স্তোত্র'-এ বলছেন ঃ ত্বং ভূমিস্ত্বং জলৌঘস্ত্বমসি হুতবহো গন্ধবাহস্ত্বমেব/ ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরপি মহৎপূর্বিকাহংকৃতিশ্চ।/ আত্মাপ্যেবাসি মাতঃ পরমিহ ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ/ ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিতরদনে কামরূপে করালে।। (হে মা, তুমিই ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ; তুমিই মন, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব ও প্রকৃতি; তুমিই আত্মা এবং তুমিই পরমতত্ত্ব; তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই; হে বিকাশিতদশনে, হে অভীষ্টরূপধারিণী, হে করালিনি, আমার অপরাধ ক্ষমা করতে হবে।) মা কালী চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। তিনিই পুরুষ ও নারী। তাই তো **সম্পূর্ণ ফুল জবা যাতে পুংচক্র ও স্ত্রীচক্র পূর্ণরূপে একত্রে বিদ্যমান, তাই তাঁর প্রিয় ফুল। বৃতি অর্থাৎ ধরিত্রী তিনি, দলমণ্ডল অর্থাৎ রূপমাধুর্যও তিনি, পুংকেশরচক্র বা সমস্ত পুরুষগণ, স্ত্রীকেশরচক্র বা ডিম্ব প্রসবিনীকুলও তিনি, গর্ভাশয় বা ডিম্বকাধারও তিনি। মা কালী, তিনিই আধার আবার তিনিই আধেয়।** 'আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা, মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।/অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতৎ, আপ্যায্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে।।/ ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা, বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।/ সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ, ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।।

সম্পূর্ণার পদে সম্পূর্ণ ফুল ঃ তুমি পুরুষ কি নারী, বুঝিতে নারি। মা কালীই তো শ্রীরামকৃষ্ণ, আবার তিনি মা সারদা। সম্পূর্ণা যিনি, এমন সম্পূর্ণ ফুলটি তাঁর পদতলেই মানায়। লোলজিহ্বা করালবদনী মায়ের রূপের প্রতীক হয়ে উঠেছে এই ঝুমকো পুংকেশরচক্রের লম্ববান লাল জবার পাপড়িগুলি। মনোজবা যেন রাঙা হয়ে ফুটে উঠে আর মায়ের পায়ে নিত্য লোটে।

শঙ্করের প্রিয় বিল্বপত্র

ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত শিবসঙ্গীতে আছে—'বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুশি।/মান অপমান সমান তো তার, তার কাছে নয় কেউ দোষী।' পতিতপাবন স্বয়ং শিবমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে ও তাঁর সংস্পর্শে এসে কীভাবে লম্পট ও স্বেচ্ছাচারী গিরিশচন্দ্রের জীবনের আমূল পরিবর্তন হয়েছিল, তা তো আমরা সবাই অবগত আছি। গানটি যেন তাঁর কথা স্মরণ করেই রচিত। এখন এই বেলপাতা কেন শিব মাথা পেতে নেন এবং এতে এত তুষ্ট হন, সে প্রসঙ্গে আসা যাক।

শিব হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি আশুতোষ। ভক্তের অল্প নিবেদনেই সন্তুষ্ট হন। শিবপূজার প্রথম উপকরণটি হলো বেলপাতা। ত্রিফলকযুক্ত এই বিল্বপত্র শিবের বড় প্রিয়। এর কারণ জগতসৃষ্টির মূলে যে তিন গুণের সমাহার সেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রতীক হচ্ছে বেলপাতা। এছাড়া জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার কাজের জন্য ঈশ্বরের যে তিন রূপ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সেই ত্রিদেব বা (Trinity of God)-এর প্রতীকও এই ত্রিপত্রক বিশিষ্ট বেলপাতা। পুরাণমতে, বেলপাতার পেছনের অংশে আবার মা লক্ষ্মীর বাস। ১১টি বেলপাতা দিয়ে তৈরি মালা শিবলিঙ্গে অর্পণ করলে অশুভ প্রভাব জীবন থেকে দূরে সরে যায়, বলে ভক্তদের বিশ্বাস।

এছাড়া ধুতুরা ফুল শিবের অত্যন্ত প্রিয় ফুল। আকন্দ ফুলও শিবের প্রিয়। আকন্দ ফুলের পাঁচটি খণ্ড শিবের পঞ্চানন রূপের যেন দ্যোতক। শিবলিঙ্গে দুধ ও গঙ্গাজল ঢালা হয়। এছাড়া জাফরান দিয়ে শিবপূজা করলে বিবাহিত জীবনের সকল বাধা বিপত্তি দূর হয়। এছাড়া তিল প্রদান, দূর্বাঘাস, আতপচাল, কর্পূর, গাঁজা প্রভৃতি শিবপূজার উপাদান। যাই হোক, আশুতোষকে এতসব না হলেও পাঁচটি বেলপাতা দিয়ে সহজেই তুষ্ট করা যায়। মাথা পেতে বেলপাতা তিনি গ্রহণ করেন ও ভক্তকে তার অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।

শিবপুরাণে সে কথাই সুন্দর একটি কাহিনীতে প্রতিভাত। সে কথাই বলা যাক। শিবচতুর্দশী রাত্রে এক ব্যাধ তার অজ্ঞাতসারে বিল্বপত্র প্রদানের কারণ হয়ে কীরূপ শিবকে তুষ্ট করে দেহান্তে শিবলোক প্রাপ্ত হয়েছিল তারই কাহিনী। বামদেব ঋষিকে তুণ্ডি ঋষি শিব কোন্ ব্রত পালনে সন্তুষ্ট হন জিগ্যেস করলে, তিনি শিবচতুর্দশী ব্রতপালনের মাহাত্ম্য বর্ণনা করছেন। এমনকী, অজ্ঞানত শিবরাত্রিতে জাগরণ করে এক নিষাদ মহাফল লাভ করেছিল। সেই ব্যাধ বনে বনে পশুবধ করে বেড়াত। একদিন কালঞ্জর পর্বতে জাল হাতে নিয়ে সে বহু পাখি ধরে খাঁচায় পুরে বাড়ি ফিরছে। তখন ছিল শীতের শেষ। ক্ষুধায় পীড়িত হয়ে সেই ব্যাধ চলতেই পারছিল না। দেখতে দেখতে পথে অন্ধকার হয়ে গেল। রাতের বেলা সে আর জঙ্গলে পথ চলতে পারল না। বনের হিংস্র জন্তুদের ডাক শুনে সে ভয়ে একটি বেলগাছে উঠে পড়ল। উঁচু গাছে উঠতে না উঠতে একটি বাঘ তাকে লক্ষ্য করে ছুটে এল। ক্ষুধার্ত বাঘটি গাছের নিচে গর্জন করতে লাগল। বিপদ জেনে ব্যাধ বেলপাতা, বেলের ডাল কেটে নিচে ফেলতে লাগল। বাঘ কিন্তু গাছের গোড়া থেকে কিছুটা দূরে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এদিকে বৃক্ষমূলে ছিল এক শিবলিঙ্গ। আর সে রাতেই ছিল শিবচতুর্দশী। যে বেলপাতা সে ফেলল, শিবলিঙ্গের উপরে গিয়ে সে পড়ল। ভয়ে সেই ব্যাধ রাত্রি জাগরণ করল। এদিকে ক্ষুধায় কাতর হয়ে উপবাস তো করেই আছে। রাতের অন্ধকার কেটে যেতেই বেলগাছ থেকে নেমে ব্যাধ চলল নিজের ঘরে। কিছুটা এগোতেই সেই বাঘটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মরদেহ ত্যাগ করল ব্যাধ। এল যমদূতরা নিয়ে যেতে। শিবের দূতরা তখনই সেখানে এসে পৌঁছাল। বলল ঃ 'একে তোমরা নিয়ে যেতে পার না। এ মহামতি বনের ভেতরে থেকে শিবরাত্রি ব্রত করেছে। বেলপাতা দিয়ে সারারাত শিবলিঙ্গের পূজা করেছে।' যমদূতরা বলল ঃ 'এ তো মহাপাপী এক ব্যাধ। কত যে পাপ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। দিনরাত জীবজন্তু নির্মমভাবে হত্যা করেছে। তোমরা একে শিবলোকে কি করে নিয়ে যাবে বলছ?' যমদূতরা ব্যাধকে বাঁধাবাঁধি করতে লাগল। তখন শিবদূতগণ শূল তুলে তাদের মাথায় মেরে তাদের তাড়িয়ে দিলে। ওরা ব্যাধকে রথে তুলে কৈলাসপুরের দিকে এগোতে লাগল। রথের উপর হলো পুষ্পবৃষ্টি। দিব্যবাদ্য বাজতে লাগল। শিবসদনে শিবসমীপে গেল সেই ব্যাধ। ঋষি বামদেব একথা বলে বললেন ঃ সর্বশ্রেষ্ঠ করে শিব নিষাদ-প্রবরে।/সিংহমুখ নাম তারে করেন প্রদান।/কৈলাসে সে ব্যাধবর করে অবস্থান।/প্রতিদিন শিবপূজা হরষেতে করে।/মহাসুখে নিত্যানন্দে রহে সেই স্থলে।/এরূপে দুর্লভ গতি সেই জন পায়।/শিবের মাহাত্ম্য বল কে বুঝে ধরায়।'[১]

(এর পরবর্তী অংশ ৩৫৭ পৃষ্ঠায়)

স্বামীজীর অনন্য আধ্যাত্মিক উত্তরসূরি

নিতাই নাগ *

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে মহানগরী কলকাতার বুকে দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে। একজন স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যজন বিপ্লবীনেতা, যোগীপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ। ১৮৬৩ সালে বিবেকানন্দের এবং ১৮৭২ সালে ১৫ আগস্ট অরবিন্দের। উভয়ের জন্ম কলকাতায়। দুজনেই দেশপ্রেমিক এবং দেশের স্বাধীনতার জন্য, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য ব্রতী হয়েছিলেন। স্বামীজী তাঁর বাণী ও রচনা এবং কর্মের দ্বারা ভারতের অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের প্রভাবিত করেছেন। অরবিন্দ স্বামীজীর প্রেরণাদায়ক বাণীতে শুধু নয়; তাঁর সূক্ষ্মদেহের উপস্থিতিতে কীভাবে যোগসাধন পথে সহায়তা লাভ করেছিলেন তা খুবই চমকপ্রদ।

বিলাত ফেরত ডাক্তার সিভিল সার্জন কৃষ্ণধন ঘোষের পুত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রখ্যাত নেতা রাজনারায়ণ বসুর দৌহিত্র অরবিন্দকে খাঁটি সাহেব হওয়ার জন্য সাত বছর বয়সে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে পাঠানো হয়েছিল। কেমব্রিজে কিংস কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর পিতার ইচ্ছেতে আই.সি.এস পরীক্ষায় বসেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর অন্তর ইংরেজ সরকারের উচ্চপদে চাকরির মাধ্যমে গোলামি করতে চায়নি। ফলে ইচ্ছাকৃতভাবে ঘোড়ায় চড়া পরীক্ষায় অনুপস্থিত থাকেন। ১৮৯৩ সালে যে বছরে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিতে যান, সেই বছরে অরবিন্দ স্বদেশে ফিরে আসেন এবং বরোদার রাজার অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে ছাত্রজীবনে ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ভারতীয় মজলিসে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন আর বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতি 'লোটাস অ্যান্ড ড্যাগার'-এ যোগ দেন। ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা। বেদে ও উপনিষদে এর প্রমাণ আছে। **বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' পাঠ করে 'বন্দেমাতরম্'কে স্বাধীনতার বীজমন্ত্ররূপে এবং বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনিই প্রথম 'ঋষি'রূপে স্বীকৃতি দেন।** তিনি আনন্দমঠের সন্তানদলের অনুরূপ ভবানী মন্দির গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। 'Bhawani Mandir' নামে একটি পুস্তিকায় তিনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের নাম উল্লেখ করে লেখেন—'It was to initiate this great work, the greatest and most wonderful work ever given a race, that Bhagawan Ramakrishna came and Vivekananda preached ... it was Kali, who is Bhawani, mother of strength whom Ramakrishna worshipped and with whom he became one.'

আই.সি.এস অরবিন্দ

১৯০৬ সালে বঙ্গবিভাজনের প্রেক্ষিতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে, তিনি কলকাতায় চলে আসেন বরোদার রাজ কলেজে অধ্যাপকের চাকরি ছেড়ে। কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজ স্থাপিত হলে তিনি তাঁর অধ্যক্ষ হন। বিপ্লবের মানসিক ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য ইংরেজিতে 'বন্দেমাতরম্' এবং বাংলায় 'যুগান্তর' পত্রিকায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে লেখালেখি করতে থাকেন। বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের গুপ্ত সমিতির বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ ঘটালে কলকাতায় ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হয়। কলকাতার মানিকতলা অঞ্চলে মুরারিপুকুরে অরবিন্দ ভ্রাতা বারীন ঘোষ-সহ অনেক তরুণ বিপ্লবী ধরা পড়ে। অরবিন্দকেও গ্রেপ্তার করা হয়। বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলায় তিনি আলিপুর জেলে বন্দী থাকেন। কারাবাস তাঁর আশ্রমবাস হয়ে ওঠে। আসলে তিনি গুজরাটে অবস্থানকালীন যে যোগসাধনায় রত হয়েছিলেন, তা যেন আলিপুর জেলের নির্জন কক্ষে মগ্ন চৈতন্যের মাধ্যমে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'— উপলব্ধি জীবন্ত হয়ে ওঠে। এই সময়ে স্বয়ং স্বামীজী তাঁকে জেলের মধ্যে দেখা দিয়েছিলেন। অরবিন্দ-শিষ্য নীরদবরণের লেখা 'শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে কথাবার্তা'-গ্রন্থে নির্দিষ্ট তথ্য

* *বিদগ্ধ এই বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী নিজ রচনাশৈলীতে সুপরিচিত।*

পাওয়া যায় এভাবে—'বিবেকানন্দই প্রথম আলিপুর জেলে এসে আমার ধ্যানের সময় আমায় সম্বোধি স্তর দেখিয়ে দেন এবং প্রায় মাসাধিক কাল সম্বোধি সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। পরে তার উর্ধ্বের স্তরের দৃষ্টি পাই।' আরও তথ্য পাওয়া যায় তাঁর মুখের কথায়—'... অতিমানসের অস্তিত্ববোধ যেন আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হলো। আরম্ভে অতিমানস সম্বন্ধে আমার কাছে স্পষ্টভাবে ধরা দেয়নি। বিবেকানন্দের আত্মা থেকেই পেলাম প্রথম অতিমানসের সন্ধান। আর পেলাম ঋত চেতনা কিভাবে সর্বত্র কাজ করে তার ইঙ্গিত।'

বঙ্গভঙ্গ অধিবেশনে শ্রীঅরবিন্দ

বরোদায় থাকাকালীন তিনি একবার বিবেকানন্দের দর্শন পেয়েছিলেন, তাও জানা যায় তাঁর কথাতেই—'... হঠযোগ অভ্যাস করার সময়ে আমি আর একবার বিবেকানন্দের উপস্থিতি অনুভব করেছিলাম। মনে হল তিনি পিছনে দাঁড়িয়ে আমার উপর নজর রাখছেন। পরবর্তিকালে এ ঘটনা আমার মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।'

খাঁটি সাহেবী কায়দায় পিতার পরিকল্পনায় জীবন গড়ার জন্য তিনি বাংলাভাষা ভালো জানতেন না; অথচ তীব্র আগ্রহ ছিল বাংলা সাহিত্য পাঠ করার ও কথা বলার। এজন্য কলকাতা থেকে সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে বরোদায় নিয়ে যান। স্বামীজীর বাণী ও রচনা পাঠে যে তাঁর আগ্রহ কীরূপ ছিল, তা দীনেন্দ্রকুমার রায় 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ' গ্রন্থে লিখেছেন—'... তিনি স্বামী বিবেকানন্দের বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি পাঠে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন; আমাকে বলিতেন, স্বামীজীর ভাষায় প্রাণে সাড়া পাওয়া যায়, ভাষার-ভাবের এরূপ ঝঙ্কার, শক্তি ও তেজ অন্যত্র দুর্লভ।'

অরবিন্দ আলিপুর জেল থেকে মুক্ত হয়ে সনাতন ধর্মের কথা ও জাতীয়তাবাদের বাণী প্রচার করতে থাকেন নানা স্থানে বক্তৃতায় এবং 'কর্মযোগিন' ও 'ধর্ম্ম' নামক দুটি পত্রিকায়। তারপর ইংরেজ সরকার তাঁকে পুনরায় ফন্দি করে বন্দী করার পরিকল্পনা করলে, তিনি ব্রিটিশ শাসনমুক্ত ফরাসী উপনিবেশ পণ্ডিচেরিতে চলে যান। বেদপুরী পণ্ডিচেরিতে অতিমানস চেতনার সাধনায় মগ্ন হন।

'ধর্ম্ম' পত্রিকার পৌষের ১৩১৬ সংখ্যায় তিনি লেখেন—'...ভবিষ্যৎ ভারতের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ। অনেকে মনে করেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার নিজের দান। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে বুঝতে পারা যায় যে, তাঁহার স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁহার পরমপূজ্যপাদ গুরুদেবেরই দান। তিনিও নিজের বলিয়া কিছু দাবি করেন নাই। লোকগুরু তাঁহাকে যেভাবে গঠিত করিয়াছিলেন তাহাই ভবিষ্যৎ ভারতকে গঠিত করিবার উৎকৃষ্ট পন্থা। তাঁহার সম্বন্ধে কোন নিয়ম বিচার ছিল না—তাঁহাকে তিনি সম্পূর্ণ বীরসাধকভাবে গঠন করিয়াছিলেন। তিনি জন্ম হইতেই বীর, ইহা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিতেন, ''তুই যে বীর রে''।'

২৭।১।১৯৩৯ তারিখে পণ্ডিচেরি আশ্রমে অরবিন্দের কাছে স্বামীজীর একটি আবেগপূর্ণ চিঠি পড়া হয়েছিল আর তাতে ছিল নির্বাণ শান্তির মহাসমুদ্রে নিস্তরঙ্গ অনুভূতির কথা। শ্রীঅরবিন্দ এ বিষয়ে নিজস্ব মন্তব্য করে বলেন—'... বিবেকানন্দের অনুভূতির সঠিক খবর মিলছে, তিনি বলছেন তাঁর সেই অবস্থার নির্বাণের কথা যার সঙ্গে জড়ানো রয়েছে জগৎকে মায়াজ্ঞান। ... বিবেকানন্দের এই চিঠিখানি খুব আন্তরিক।'

স্বামীজী শঙ্করাচার্যপন্থী বৈদিক সন্ন্যাসী ছিলেন। আচার্য শঙ্করকে তিনি কতটা অনুসরণ করতেন, সে প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন—'বিবেকানন্দ শঙ্করের তত্ত্ব মানতেন কতকগুলি ব্যতিক্রম রেখে; যেমন তাঁর দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, সেটা এসেছে বৌদ্ধ করুণা ও আধুনিক লোকহিতের মিশ্রণে।'

ধ্যানস্থ শ্রীঅরবিন্দ

'ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি' গ্রন্থে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনে শিকাগো ধর্মমহাসভায় গুরুত্বের বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। পরিশেষে, যোগী শ্রীঅরবিন্দ নিজ উপলব্ধির আলোয় স্বামীজী সম্বন্ধে 'চিন্তাবলি ও সূত্রাবলি'তে যা বলেছেন, তা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ—'... বিবেকানন্দ কি ছিলেন? মহাদেবের নয়ন নিঃসৃত দীপ্ত কটাক্ষ এক। কিন্তু তারও পিছনে হল সেই ভাগবত দৃষ্টি যা থেকে উদ্ভূত হয়েছে বিবেকানন্দ মহাদেব নিজে এবং ব্রহ্ম; বিষ্ণু আর বিশ্বাতীত ওম্।'*

* শ্রীঅরবিন্দের শুভ জন্মের সার্ধশতবর্ষ স্মরণে।

কৃপাবর্ষিণী মা নর্মদা

নর্মদানন্দন *

তরুণ সন্ন্যাসী মা নর্মদার ক্রোড়ে বর্ষযাপন করবেন বলে আশ্রম ছেড়েছেন। উদ্দেশ্য—উৎস থেকে সমুদ্র আবার সমুদ্র থেকে উৎস পরিভ্রমণ নগ্নপদে, নিঃস্ব অবস্থায়, কাঞ্চন স্পর্শ না করে, পাক-অন্ন ভিক্ষান্নেই উদরপূর্তি অর্থাৎ মাধুকরী নিয়ে চলছেন। অনেকদিন ধরে চলে সবথেকে ভয়ঙ্কর পরিক্রমা স্থল শূলপাণিশ্বর মহাদেবের ঝাড়ির সম্মুখে এসেছেন। প্রথম থেকেই শোনা আছে, এই অঞ্চলে কেউ থামতে বললেই থেমে পড়তে হবে, নয়তো কপালে দুর্ভোগ। ফলে মাঝে মাঝেই নদীর এপার থেকে, না হয় ওপার থেকে দস্যুরদল 'মূক' শব্দটি বলে লুটপাট চালাতে লাগল। লাল চোখ, হাতে তির-ধনুক, অবোধ্য ভাষায় কিছু বলে কাঁধের ঝোলা বা ব্যাগটি নেড়ে মাঝে মাঝে জিনিসপত্র দেখছে আর যেটা নেবার নিচ্ছে ও চলে যাচ্ছে। এই করতে করতে সাধু দুজন পৌঁছে গেলেন 'তয়ের খেরি' গ্রামে। সেখানে তিনটি পরিবার একটি টিলার উপর মাঝারি ধরনের ঘরের মধ্যে একসঙ্গে থাকে।

তিন গৃহস্বামী একসঙ্গে এসে নিজেদের ভাষায় বোঝাতে চাইল, গৃহমধ্যে তো সাধু মহাত্মাদের স্থান হবে না, অতএব গৃহের বাইরে খোলা আকাশের নিচে কঙ্করযুক্ত কন্টকময় প্রান্তের উপর ডিসেম্বরের কনকনে ঠাণ্ডায় রাত্রিবাস। ৫০০ মিটার দূরে মা নর্মদা কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছেন। বেশ গম্ভীর, চারিদিকে গভীর নিস্তব্ধতা, দূরে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। মাঝে মাঝে শিয়াল ও বন্য কুকুরের চিৎকার।

নাথ সম্প্রদায়ের সেই সঙ্গী সাধুটির সাথে এই তরুণ সাধুটি নিজের কম্বলটি বিছিয়ে একটু বসেছেন। হঠাৎ দেখেন, সেই তিন গৃহস্বামী ও তাদের ছেলে জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ বয়ে নিয়ে আসছে। যে জায়গাটায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন, তাকে ঘিরে প্রায় ছয় জায়গায় কাষ্ঠকুণ্ড স্থাপন করে অগ্নি সংযোগ করার উদ্যোগ করলেন। এই দেখে সাধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আগুনের কি প্রয়োজন?' ভিল কর্তাটি ভয় পেয়ে বললেন, 'সারারাত বাইরে থাকবেন, জন্তু-জানোয়ার আপনাদের টিকতে দেবে না। এখানে বাঘও আছে, বুনো শিয়ালও আছে, বুনো কুকুরও আছে। ওদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই এই ছয়টি অগ্নিকুণ্ডের আয়োজন।' নাথবাবার তো মুখ শুকিয়ে গেছে। ভাবছেন, 'সারারাত এই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকতে হবে? বুনো পশুদের সঙ্গে যুদ্ধ করে এই অগ্নিকুণ্ডে থাকতে হবে?' আশ্রমিক সাধুটি পরিক্রমাবাসীর সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে বসে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। সন্ধ্যে ৭টা, ৮টা, ১০টা বেজে গেল, কেউ কোথাও নেই। ভিল পরিবারের লোক ঘরে ঢুকে গেছে। এদিকে নাথবাবাজীর প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি। তরুণ সন্ন্যাসীকে বারবার জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সন্ন্যাসী আসন ছেড়ে উঠছেন না। প্রচণ্ড দাপাদাপির আওয়াজ শুনে সন্ন্যাসী চোখ খুললেন।

শূলপাণির ঝাড়ি অতিক্রমরত পরিব্রাজক

উনি বললেন, 'ক্যায়া হ্যায়, ইতনা শোর কিঁউ মাচায়ে?'

নাথবাবাজী বললেন, 'আরে স্বামীজী, সুবে সে থোরা মম্ফলী কি অলাবা কুছ নেহি মিলা। ইসলিয়ে পেট মে আগ জ্বল রাহা হ্যায়, ক্যায়া করে?'

** পরিষদ-সেবক এই নর্মদাপ্রেমী ব্যক্তিত্ব, স্পষ্টবক্তা হিসাবে সুপরিচিত।*

সন্ন্যাসী বললেন, 'আরে স্বামীজী আও, মা নর্মদাজী কো দোনো মিলকর প্রার্থনা করেঙ্গে।' এই বলে দুজনে 'নর্মদাষ্টকম্' পাঠ করতে শুরু করলেন।

'সবিন্দু-সিন্ধু-সুস্খলত-তরঙ্গ-ভগ্গং-রঞ্জিতং
দ্বিষত্তু-পাপজাত-জাতকারি-বারি-সংযুতম্।
কৃতান্ত-দূত-কালভূত-ভীতিহারি-বর্মদে
ত্বদীয়-পাদ-পংকজং নমামি দেবি নর্মদে!।।

....

প্রায় ১০-১৫ বার দুজনে একইসঙ্গে স্তোত্র পাঠ করে চলেছেন। খিদের জ্বালায় তন-মন অবসন্ন। দুজনেই প্রার্থনা করে চলেছেন—'মাগো! তোমার কৃপা কি আমাদের উপর বর্ষিত হবে না? কিছু কি জুটবে না?' প্রায় আধ ঘণ্টা-একঘণ্টা পরে ভিলেদের বাড়ির দরজা খুলে গেল। দুটি মোটা মোটা বড় সবুজ রঙের বাজরার রুটি এনে বললেন, 'মহারাজ! আজ ইস্‌সে মে আপকা ভোজন করনা হোগা, লিজিয়ে নমক।' এই বলে রুটি ও নুন দিয়ে গেল। ভীতগ্রস্ত নাথবাবার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলে উঠলেন, 'যাক্ বাবা, মা বাঁচিয়েছেন'। মট্ মট্ করে কামড়ে কামড়ে বাজরার রুটি খেতে শুরু করল। এদিকে সন্ন্যাসী প্রাণ খুলে হাসতেও পারছেন না। কামড়ে কামড়ে কোনোদিন বাজরার রুটি খাননি। কমণ্ডুলের জল ঢেলে রুটিকে ভিজিয়ে পাশ থেকে খেতে শুরু করলেন। খুব কষ্ট করে ১/৩ অংশ বাজরার রুটি খাওয়া শেষ করলেন। তাতেই তাঁর পেট ভরে গেল। নাথবাবা করুণ নয়নে সন্ন্যাসীর বাকি রুটিটির দিকে চেয়ে ছিলেন, কারণ ততক্ষণে নিজের রুটি খাওয়া শেষ করে ফেলেছেন। তরুণ সন্ন্যাসী অবলীলাক্রমে বাকি রুটি নাথবাবাকে দিয়ে দিলেন।

বন্য পশুর ভয়ে কাষ্ঠকুণ্ড জ্বালিয়ে রাত্রি যাপন

এবার নাথবাবা বেশ সাহস দেখাতে শুরু করলেন। নাথবাবা তরুণ সন্ন্যাসীকে বললেন, 'এবার তুমি শুয়ে পড়ো। আমি সারারাত পাহারা দেবো।' তরুণ সন্ন্যাসী কম্বলখানা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন ও নাক ডাকতে শুরু করলেন।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন তা তরুণ সন্ন্যাসীর খেয়াল নেই। হঠাৎ নাথবাবা ভয়ে ঠ্যালা দিতে দিতে বলতে লাগলেন, 'বাবাজী! ওঠো, ওঠো।' গাঢ় অন্ধকারে দেখাচ্ছে দুটি লাল বড় চোখ আমাদের অগ্নিকুণ্ডের পাশ দিয়ে যেন আমাদের দিকে আসতে চাইছে। আর নাথবাবা ভয়ে কাঁপছে। সন্ন্যাসী দেখলেন, যেখানে কাঠ কমে গেছে, আগুন নিভুনিভু, সেখানেই এই অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী কাঠ দিয়ে দিয়ে যেখানে লাল চোখের দেখা মিলছিল, সেখানকার আগুনকে উস্‌কে জোরালো করে তুললেন। ধীরে ধীরে চোখ দুটিও আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল।

নাথবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবাজী! এবার আমি একটু ঘুমাই।' সন্ন্যাসী ছয়টি কুণ্ডে কাঠ দিয়ে আগুনগুলিকে আরো উদ্দীপ্ত করতে লাগলেন। আর সন্ন্যাসী দেখলেন, চোখ দুটি দূরে সরে গেছে ঠিকই, কিন্তু স্থিরভাবে রয়ে গেছে, কোথাও নড়ছে না। সন্ন্যাসী মূলমন্ত্র উচ্চারণ করছেন আর দুচোখ চেয়ে বিরাট ঈশ্বরের অন্ধকার রূপকে 'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়' মন্ত্রে সঞ্জীবিত করছেন। মূলমন্ত্র উচ্চারণ করে মা নর্মদার কৃপাকে হৃদয়ে অনুভব করছেন। মা নর্মদা স্রোতের ভিন্ন রাগরাগিণী, কাঁচা কাঠের পোড়া শব্দ, দূরে বন্যকুকুরের চিৎকার—সব মিলিয়ে পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক জগতের এক অপূর্ব মেলবন্ধন রচিত হলো।

জীবন যখন বিপদ আশঙ্কায় ত্রস্ত, তখনও প্রকৃতি তার চিরাচরিত নৈসর্গিক সম্পদ নিয়ে মানুষকে স্বাগত জানায়, সেই কথাই যেন আজকে পরিস্ফুট হলো।

ধীরে ধীরে অন্ধকার রাত্রি স্তিমিত হয়ে ঊষার পদধ্বনি শুনতে লাগলেন। একটু পরিস্কার হলে, দেখা গেল অগ্নিকুণ্ডের ওধারে সেই জ্বলন্ত ভাঁটার মতো চোখ দুটি এখন অদৃশ্য। এদিক ওদিক কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না সেই চোখ দুটির অধিকারীকে। ইতিমধ্যে নাথবাবা তার গাঢ় নিদ্রা ভঙ্গ করে প্রাত্যহিক কর্মে যাবে কি যাবে না, ভাবছে। সন্ন্যাসীর অভয়বাণী শুনে সে বেরিয়ে গেল নিত্যকর্ম করতে। সূর্য উঠতেই ভিল কর্তারা এসে জানাল, গত রাতে একটি চিতা এই 'টাবরীর' (ঝুপড়ি) পাশে বাঁধা ছাগলটিকে ধরে নিয়ে গেছে। ছাগলের রক্তাক্ত পা-টি টাবরীর ধারে পড়ে ছিল।

এরপরই ভিল কর্তাদের বিদায় জানিয়ে সাধু দুটি হাঁটতে শুরু করলেন। গত রাতের অভিজ্ঞতা ও ভিলদের নিষ্ঠুর ব্যবহার তাদের হৃদয়কে যথেষ্ট বেদনা দিলেও 'মা নর্মদা'র অপূর্ব কৃপা স্মরণ করে তারা বেশ নির্বেদ ভাবেই চলছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন এক দম্পতি একদম অতি সামনে। যুবকের পরনে একটি সাদা ধুতি মালকোছা মেরে পরা, মাথায় পাগড়ি। পাগড়িতে একটি পাখির পালক গোঁজা, গলায় পাথরের মালা। অপূর্ব তার দেহ সুষমা। সঙ্গে তরুণীটিও তথৈবচ। হাঁটু পর্যন্ত পরা একটি ছাপা শাড়ি। মাথায় মস্ত খোঁপা, শরীরের যেটুকু অংশ অনাবৃত, যেন তেল চোপানো। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণে দুপুরের রোদ যেন ঝিলিক মারছে। চোখ দুটি দেবী প্রতিমার মতো টানা। দুজনেরই খালি পা। দুজনে হঠাৎ সামনে এসে যাওয়ায় আমরা বলে উঠলাম 'নর্মদে হর', তারাও মধুর কণ্ঠে উত্তর দিল 'নর্মদে হর', তারপর যে যার পথে।

নর্মদা পরিক্রমাবাসী দুই সাধু

রাতে শুয়ে চিন্তা করতেই মস্তকে নানান ভাবনা ভিড় করে এল। চিন্তায় এল এই অসভ্য জংলী ভিলদের এলাকায় এই সুসভ্য বেশবাস—এরা কারা? আমাদের একলা দেখেও উত্যক্ত করল না। সবচেয়ে আশ্চর্য অদ্ভুত দেহকান্তি ওরা কোথায় পেলো! এখন পর্যন্ত যত নারী পুরুষ দেখা গেছে, প্রত্যেকের শরীরে ভয়ানক রুক্ষতা, চোখ লাল, গায়ে খড়ি উঠছে। এরা কি দম্পতি! না ভাইবোন, না পিতা-পুত্রী!—ভেবে কোনো কুলকিনারা পাওয়া গেল না।

এরপর হাপেশ্বরের রাস্তায় আর এক ঘটনা। একটি টিপির উপর উঠতেই বিপরীতমুখী প্যান্ট-শার্ট পরা মাঝবয়সী একটি লোক। চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে, ইনি এদিককার কেউ নন। মাথায় মাঝ থেকে কপাল বেয়ে গলা পর্যন্ত একটা কাটা দাগ। রক্ত খানিকটা শুকিয়ে এসেছে, তখন তাজা রক্ত চোঁয়াচ্ছে মাথা থেকে। চুলে রক্ত জমাট বেঁধে জোট পাকিয়ে গেছে। অস্পষ্ট ইঙ্গিতে কিছু বলার চেষ্টা করল। একটু দাঁড়িয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে দাঁড়ালো না। হাপেশ্বরে পৌঁছে আশ্রমের অনেক সাধুকে জানালাম ব্যাপারটা। সকলে শুনল, বিস্ময় প্রকাশ করল, আর জানালো—এ ধরনের লোক তারা আগে কখনো দেখেনি।

দুটো ঘটনাই মস্তিষ্কে খুব তোলপাড় করছে। শোনা যায়, শূলপাণিশ্বর ঝাড়িতে চিরজীবি অশ্বত্থামার নিবাস দ্বাপর যুগ থেকে। মণিহারা মাথায় বীভৎস কাটা দাগ নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পৌরাণিক কাহিনী এখনও জীবন্ত? বিশ্বাস করার জোর পাওয়া গেল না। হাপেশ্বরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়া গেছে, তা তরুণ সন্ন্যাসী জানেন না।

মা নর্মদা সাধুদের প্রতিনিয়ত সাহস, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা, সহনশীলতা, নির্লোভ ও পবিত্রতা জুগিয়ে যান। তাঁকে নির্ভর করে চললে, তাঁকে অবলম্বন করে ভাবলে, সকল বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, এমনকী তিনি কৃপা করলে ত্রিকালবাদিত সত্য দর্শন করে জীবন মন স্বস্থ, শান্ত, সুরক্ষিত হয়।

সাধুজীবন যাপন করলে আশ্রম ... জমে যায়

ঠিক ঠিক সাধুজীবন যাপন করো, দেখবে মান-সম্মান-ঐশ্বর্য এত বাড়বে যে, শেষে রক্ষা করা কঠিন হবে। একটা মঠ বা centre করতে দু-চার জন সাধুই যথেষ্ট। আর, আশ্রম করার জন্য বড় বড় lecture দেওয়ারও প্রয়োজন হয় না। সাধুজীবন যাপন করলে আশ্রম আপনা থেকেই জমে যায়। লোকজন এলে মাঝে মাঝে একটু গান, উৎসব-অনুষ্ঠান, ঠাকুর-স্বামীজীর কথা আলোচনা করলেই হলো। এখন দেখতে পাই, ঠাকুর-স্বামীজীর ভাব প্রচারের থেকে মান-সম্মানের দিকেই আমাদের আগ্রহ বাড়ছে। বিরাট করে কিছু করতে হবে—মাইক বাজিয়ে, হাঁকডাক করে, পত্র-পত্রিকায় ছাপিয়ে। এসবের চেয়ে বেশি কাজ হয় সপ্তাহে নিয়মিত কয়েক দিন কয়েক জায়গায় গিয়ে পাঠ-আলোচনা করলে। —স্বামী সারদেশানন্দ *(প্রাচীন সাধুদের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ৪৫১)*

ভারতবর্ষকে কিভাবে শক্তিশালী করা যায়?

ড. এ পি জে আবদুল কালাম *

আমি সত্যিই খুব আনন্দিত শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালার মতো স্থানে আসতে পেরে। এটি আমার হৃদয়ের অত্যন্ত কাছের জায়গা। এটি এমন একটা জায়গা, যেখানে বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতা একই সঙ্গে কাজ করে। এই প্রকার মূল্যবোধ অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কথায় আছে, 'তোমার মধ্যে বিশুদ্ধতা (integrity) থাকুক বা না থাকুক, তোমার কিছুই যায় আসে না।'

আমি বিদ্যাশালার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে দেখলাম, পরিবেশে—সকল সাধুদের ও ছাত্রদের মুখে হাসি। আপনাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। হাসি খুব চমৎকার একটা জিনিস। এটাই একমাত্র—যেটা বিনামূল্যে বিতরণ করা যায় সকলকে। এর জন্য কোনো খরচ হয় না। হাসি আনন্দ ছড়িয়ে দেয়। একবার আনন্দ ছড়িয়ে পড়লে পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু আনন্দে ভরে ওঠে। হাসি ছাড়া বন্ধুত্ব, আনন্দ ও আদর্শজীবন সম্ভব নয়।

ছাত্রদের সঙ্গে এপিজে কালাম

আমি একটা ঘটনার বর্ণনা করব, যেটা ঘটেছে—আমি যখন তোমাদের মতো ছিলাম। মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি-তে আমি বেছে নিয়েছিলাম বিজ্ঞান, যেটা মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করে ও বিভিন্ন প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ও মৈত্রী স্থাপন করে। পদার্থবিদ্যার পর আমি বেছে নিয়েছিলাম বিমান-চালনা সংক্রান্ত বিজ্ঞান। আমার তখন উদ্দেশ্য ছিল আকাশে ওড়া। আমি পৃথিবীর ওপরে থাকতে চেয়েছিলাম। আমি ইন্টারভিউ-এর জন্য আবেদন করি ও ইন্টারভিউ কার্ড পাই। ইন্টারভিউ দেরাদুনে হয়েছিল, আর খুব কঠিন ছিল। তাঁরা প্রাকৃতিক ও বুদ্ধিগত দিকগুলি একটা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের মধ্যে দিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন।

১২ জন প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে ১১ জনকে বাছা হবে। আমাকে বলা হয়েছিল এক বা একাধিক প্রার্থী অযোগ্য হয়ে যাবে স্বাস্থ্যের কারণে। দুর্ভাগ্যবশত আমি তাদের মধ্যে একজন হলাম। খুব নিরাশ ও হতাশ হয়ে আমি হৃষীকেশ ফিরে আসি। আমি গঙ্গায় স্নান করি, পরনে একটা ধুতি ছিল। নিকটেই একটা খুব সুন্দর আশ্রম ছিল—স্বামী শিবানন্দ আশ্রম। আশ্রমে প্রবেশ করার খুব লোভ হচ্ছিল আমার, তাই আমি প্রবেশ করলাম। একটা বক্তৃতা চলছিল ভগবদ্‌গীতার ওপর। মহারাজ প্রতিদিন শ্রোতাদের মধ্যে একজনকে বেছে নিতেন আলোচনা করার জন্য, ভজন ও প্রার্থনা হয়ে যাওয়ার পর। সেদিন ঘটনাচক্রে আমার সুযোগ হয়েছিল। মহারাজ লক্ষ্য করেছিলেন আমার মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। আমি ওনাকে বিস্তারিত সব বললাম, উনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন গীতা থেকে উদ্ধৃত করে। ভগবান কৃষ্ণ তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন ভয়ার্ত অর্জুনকে। অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণের বার্তা ছিল 'পরাজিত হওয়া মনোভাবকে জয় করা'। ভারতবর্ষ একটা উন্নয়নশীল দেশ। ভারতকে শক্তিশালী করতে হলে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, আমাদের শক্তিশালী হতে হবে। আমরা নিজেদেরকে অন্যের বশবর্তী হতে দেব না। অন্যের অধীনে বলে নিজেদেরকে ভাবব না। আমরা অবশ্যই স্বপ্ন দেখব আর সেই স্বপ্নগুলো ধারণায় রূপান্তরিত করব, আর ধারণাগুলি কার্যে রূপান্তরিত হবে। স্বামী বিবেকানন্দ শুধু ধর্ম প্রচার করেননি, উনি ছিলেন একজন কর্মী। ভারতবর্ষে আছে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের প্রাচুর্য। এর সঙ্গে মূল্যবোধ যোগ করলে, বহু প্রজন্মের সম্পদ লাভ

** ২১ জানুয়ারি ২০০১, ভারতবর্ষের অন্যতম প্রয়াত রাষ্ট্রপতি এ.পি.জে. আবদুল কালাম মহাশয়ের মহীশূর শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাশালায় ছাত্রদের সামনে পরিবেশিত ভাষণের লিখিত প্রতিরূপ।*

হবে। এতে দেশের পরিবর্তন আসবে আর ভারতবর্ষ একটা উন্নত দেশ হিসেবে বিবেচিত হবে। ৩৫ বৎসরের অনূর্ধ্ব যুব-সম্প্রদায় যারা দেশের জনসংখ্যার নিরিখে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তারা একটা শক্তিশালী যন্ত্ররূপে পরিগণিত হবে।

ভারতবর্ষকে দারিদ্র্যের শিকল থেকে মুক্ত হতে হবে। যদি পরিবর্তন আনতে হয় ভারতবর্ষে, তবে জিডিপি (GDP) বৃদ্ধির হার বর্তমান ৬% থেকে ১১%-এ বৃদ্ধি পেতে হবে। গ্রামাঞ্চলে পরিবর্তন আনতে হবে আর বিনিয়োগকারীদের জন্য গ্রামাঞ্চল আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। গ্রামীণ এলাকাগুলিতে ভালোভাবে সংযোগ স্থাপন করতে হবে আর টেলি-যোগাযোগ পরিষেবা দিতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যুব-সম্প্রদায় স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিল, আর আজকের যুব-সম্প্রদায়ের দৃষ্টি থাকবে ভারতবর্ষকে একটা উন্নত দেশ হিসেবে দেখার।

বিভিন্ন বিষয়ের বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞরা চিহ্নিত করেছেন উন্নয়নের মূল দিকগুলি, যেটা ভারতীয় সমাজকে জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজে পরিণত করতে পারবে। এই জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজ, ভারতীয় সমাজে একটা পরিবর্তন আনবে আর ভবিষ্যতে দেশকে সম্পদ বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। তথ্য প্রযুক্তি আর যোগাযোগ নেটওয়ার্ক একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জৈব-প্রযুক্তি ও জৈব-বিজ্ঞানের এক মিলন ঘটবে এই জ্ঞান-ভিত্তিক সমাজে। এতে তথ্য ও বিনোদনের মতো পরিষেবাগুলি উপকৃত হবে। টেকনোলজি ইনফরমেশন ফোরকাস্টিং এসেসমেন্ট কাউন্সিল (TIFAC)-এর মতে ভারতবর্ষের প্রধান প্রতিকূলতা জনসংখ্যার ৭০% গ্রামাঞ্চলে, এর মধ্যে ৪০% দারিদ্যসীমার নিচে। এই অসুবিধাকে অতিক্রম করার জন্য পরিষদ পরামর্শ দেন যে, ভারতবর্ষকে চারটি মূল সমস্যার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে—কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ডিজিটাল প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ। এক দিকে কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করবে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, অন্যদিকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য দেবে ন্যায়পরায়ণতা ও সামাজিক নিরাপত্তা।

তোমরা যখন মিডিয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে অধ্যুষিত হচ্ছ, নিজেদেরকে সভ্যতার সন্তান বলে মনে রেখো। আমরা অনেক আগ্রাসনকে প্রতিহত করেছি, যদিও বহু রাজবংশের দ্বারা শোষিতও হয়েছি। আজ ভারতবর্ষ আগ্রাসনমুক্ত ও স্বাধীন। আজ আমরা পারিবারিক মূল্যবোধ ও আধ্যাত্মিক জীবনকে লালন করি। অনেক উন্নত দেশ এই রকম পূর্ণ-জীবনের স্বপ্ন দেখে থাকে। আমাদের দর্শন—'অন্যদের দাও আর নিজেও বেঁচে থাকো'।

তোমরা যখন আমাদের সমাজের অতিরঞ্জিত অশান্তির কথা শুনে থাক, এইটা অনুভব করার সাহস রাখবে যে, আমাদের কোটি কোটি মানুষ, নানা ধর্ম ও নানা ভাষার দেশ। এই গ্রহের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। অন্য কোনো দেশের আমাদের মতো এই রকম অভিজ্ঞতার অনন্য শক্তি নেই। অভিজ্ঞতা শান্তির সহায়। এই সুন্দর বার্তাটা সব দিকে ছড়িয়ে দেবে।

তোমরা দেশের এক বিরাট শক্তি। তোমাদের শ্রম একটা উন্নতশীল দেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরিত করবে। এটাই ভিশন, ইন্ডিয়ান মিলেনিয়াম মিশন ২০২০—একটা উন্নত ভারতবর্ষ। মনে রেখো কবির কথা—'আমি যখন কাজ করি, ঈশ্বর আমাকে মান্য করেন'। চলো একটা উন্নত ভারতবর্ষের জন্য কাজ করি।*

* *'প্রবুদ্ধ ভারত' ২০০১ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত ইংরাজী রচনার বঙ্গানুবাদ। ভাষান্তর করেছেন তীর্থঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।*
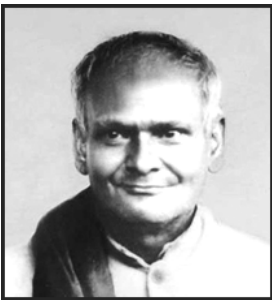
খোকা মহারাজ মঠের ভাণ্ডারি। ঘণ্টা দেওয়া সত্ত্বেও কেউ তরকারি কুটতে আসে না। নিজেই সব করেন।

একদিন শুধু ঠাকুরের জন্য পাঁচ রকমের তরকারি করে সকলের জন্য শুধু আলুসিদ্ধ, ডাল ও ভাত করেছেন। খেতে বসে শরৎ মহারাজ বললেন, 'বাঃ! বহু দিন আলুসিদ্ধ খাওয়া হয়নি। কই খোকা, আর তরকারি কোথায়?' খোকা মহারাজ বললেন, 'কেউ তরকারি কুটতে আসে না। আজ তাই শুধু এ-ই হয়েছে।' শরৎ মহারাজ বললেন, 'ঠাকুরকেও কি এই দিয়েছ?' খোকা

মহারাজ বললেন, 'না, ঠাকুরকে পাঁচ রকমের তরকারি করে দিয়েছি।' শরৎ মহারাজ সাধুদের শুনিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, কাল থেকে আমি তরকারি কুটতে আসব।' *(প্রাচীন সাধুদের কথা, ২য় খণ্ড, পৃঃ১৫৭)*

সন্ত–চরিত

বড়-পীর সাহেব-এর জীবন সাধনা

মলয় ঘোষদস্তিদার*

হজরত শায়খ মুহিউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের নিকট বড়–পীর সাহেব নামে পরিচিত। হজরত মোহাম্মদের পর তিনিই মুসলিম সমাজে সর্বাধিক সমাদৃত।

১০৭৮ খ্রিস্টাব্দে হিজরী ৪৭১ সনের পবিত্র রমজান মাসের প্রথম তারিখে সোমবার সোবহে সাদেকের সময় পারস্য দেশের অন্তর্গত জিলান নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত বংশে বড়–পীর সাহেব (রহঃ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আবু সালেহ মুহাম্মদ মুসা জঙ্গী (রঃ) এবং মাতার নাম সৈয়দা উম্মুল হজরত ফাতেমা (র)।

পাঁচ বছর বয়সেই তিনি নিয়মিতভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং মাতার নিকট লেখাপড়া শিখিতে থাকিলেন। তাঁহার একটি ছোট ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিবার পরই কিছুকাল বাদে তিনি পিতৃহীন হন। তাঁহার মাতা লেখাপড়া শিক্ষার জন্য তাঁহাকে জিলান নগরের একটি মাদ্রাসায় পাঠাইয়া দিলেন। মাদ্রাসায় যাওয়ার পথিমধ্যে অলৌকিকভাবে মানবশরীরে জনৈক ফেরেস্তা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেন।

সন্ত আবদুল কাদের

তাঁহার মাতা একদিন অদৃশ্যবাণী শুনিতে পাইলেন যে, আল্লাতায়ালা তাঁহার পুত্রকে দুনিয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন মানুষের মঙ্গলার্থে। তাই আল্লার বাণী প্রচারে আরব দুনিয়ার ইরাকের বাগদাদ শহরে যাওয়া কর্তব্য বলিয়া মনে করিলেন তিনি। অথচ পুত্রকে বিদেশ–বিভুঁইয়ে পাঠাইতে তাঁহার মন চাইছে না। মনের সমস্ত যন্ত্রণা চাপিয়া রাখিয়া পুত্রকে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

যাওয়ার পূর্বে মাতা ৪০টি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ছেলেকে দিয়া বলিলেন, জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত এই অর্থ খরচ করিও না। মায়ের আশীর্বাদ লইয়া তিনি বাগদাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

একবার পথিমধ্যে দস্যুদলের হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ প্রত্যক্ষ করিলেন এবং তাঁহাদের কবলে পড়িলেন। দস্যুসর্দার বড়–পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার নিকট কি আছে?' পীর সাহেব নির্ভয়ে বলিলেন, তাঁহার নিকট ৪০টি দীনার আছে। দস্যুসর্দার তাঁহার শরীর অনুসন্ধান করিয়া ৪০টি দীনারই পাইল। দস্যুসর্দার অবাক হইয়া তাঁহাকে বলিল, 'তোমার নিকট অর্থ আছে, কেন অকপটে স্বীকার করিলে? তুমি স্বীকার না করিলে বালক ভাবিয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিতাম।' পীর সাহেব বলিলেন, বিদেশ যাত্রার পূর্বে মাতা বলিয়াছিলেন, শত বিপদে পড়িলেও আমি যেন কখনো মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করি। মায়ের কথা অমান্য করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বাগদাদে আসার কিছুদিন পরেই অর্থাভাবে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এই সময় বেশিরভাগ দিন তাঁহাকে অনাহারে কাটাইতে হইত। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া তিনি নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মানুষের নিকট হাত পাতিতে তাঁহার আম্মাজান নিষেধ করিয়াছিলেন। তাই সারাক্ষণ আল্লার নাম স্মরণ করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেন। ক্ষুধার কষ্ট ভুলিয়া সারাক্ষণ কোরানের আয়াত পাঠ করিতেন। —'ফাইন্নামা আল উছরি ইয়ুছরান ইন্নামা আল উছরি ইয়ুছরা,' অর্থাৎ দুঃখের পরে সুখ আছে এবং সুখের পরে দুঃখ আছে। বাগদাদের প্রচণ্ড গরমে উত্তপ্ত বালুকাপথে খালি পায়ে তাঁহাকে চলাফেরা করিতে হইত। পরনে একটি জোব্বা ও একটি পাগড়ি ব্যতীত কিছু ছিল না। বৃষ্টিতে ভিজিলে পরনের জোব্বা গায়ে-ই শুকাইত। অনেক কৃচ্ছ্রসাধন সত্ত্বেও নিজের সংকল্প হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। এই কারণেই অনেক সম্মান ও গৌরবের উচ্চ শিখরে পৌঁছাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রত্যেক মা'রেফাত পন্থীকে কঠোর সাধনার দ্বারা

**প্রবীণ স্বেচ্ছাসেবী এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ অনুরাগী 'সমাজশিক্ষা'র পরম হিতৈষী।*

নিজেকে সুফী দরবেশরূপে গড়িয়া তুলিতে হয় এবং ধাপে-ধাপে আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে হয়। কিন্তু বড়-পীর সাহেবের বেলায় ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। কারণ তিনি জন্মের পূর্ব হইতেই রুহ জগতে অবস্থান করাতে ওলীরূপে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। আর এই কারণে তাঁহার মর্যাদা ছিল যাবতীয় আউলিয়ার ঊর্ধ্বে। এতৎ সত্ত্বেও তিনি কঠোর সাধনার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ইরাকের নির্জন গভীর জঙ্গলে বসিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। এই সময় অসংখ্য জিন আগমন করিত তাঁহার নিকট, তাঁহার প্রয়োজন মিটাইতে। গভীর জঙ্গলে সাধনা সম্পর্কে একবার বলিয়াছিলেন, 'সাধনা চলাকালীন হজরত খাজা খিজির (আঃ) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছিল।' তিনি (পীর সাহেব) তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত নানারকম আলোচনা হইত। পীর সাহেব ধারণা করিয়াছিলেন, তিনিও তাঁহারই মতো একজন জঙ্গলবাসী দরবেশ।

তৎকালে অনেক বিশিষ্ট আলেম ও সুফী দরবেশ খলিফা ও আমিরওমরাহদের দরবারে যাতায়াত করিতেন, কিন্তু পীর সাহেব কখনো ঐ সমস্ত আমিরওমরাহদের সংসর্গে যাইতেন না। এতৎ সত্ত্বেও আমিরওমরাহগণ পীর সাহেবকেই বেশি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত।

বড়-পীর সাহেবের জীবনের ব্রত ছিল, মানুষের পারলৌকিক মুক্তিসাধন! তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া নিজের জ্ঞানভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন; কর্মের মাধ্যমে নিজেকে উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়া জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐসময় মুসলমান সমাজ ধর্মের আদর্শচ্যুত হইয়া, নৈতিক মূল্যবোধ পরিহার করিয়া, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও আরামপ্রিয় হইয়া নিম্নকার্যে লিপ্ত হইত। সমাজের এই সঙ্কটকালে বড়-পীরের ন্যায় একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল—যাহাতে মৃতপ্রায় ইসলামকে পুনরায় জীবিত করিয়া তোলা যায়।

বাগদাদের আজাজ নামক স্থানে একটি মাদ্রাসায় বড়-পীর সাহেব অধ্যাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই অধ্যাপনার মাধ্যমেই তাঁহার ভিতর অগাধ জ্ঞান ও পবিত্র ভাবধারার সর্বপ্রথম বিকাশ ঘটে। গভীর অনুশীলনে তাঁহার আত্মার অভূতপূর্ব উন্নতিসাধন হয়। তিনি কোরান, হাদিস, তফসীর, ফেকাহ, দর্শন, সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি তৎকালীন প্রচলিত সমস্ত শাস্ত্রেই অগাধ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। মাদ্রাসায় শিক্ষাদানকালে তাঁহার অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডার উজাড় করিয়া দিতেন তাঁহার ছাত্রদের মধ্যে। এইভাবে পীর সাহেব দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে শরীয়ত ও মারেফাতের তালিম প্রদানপূর্বক তাহাদের চরিত্রগঠন গড়িয়া তোলেন।

এইভাবে তাঁহার প্রচারকার্য একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং দেশ-বিদেশে বিস্তার লাভ করে। ফলে মৃতপ্রায় ইসলাম পুনরায় জীবন লাভ করে। বড়-পীর সাহেব অত্যন্ত দয়ালু মানুষ ছিলেন। মানুষের দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে পারিতেন না। ইহার নিবারণে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। বাজারের আটা-রুটি বিক্রেতাদের বলিয়া রাখিতেন, কোনো গরিব-দুঃস্থ মানুষই যেন ফিরিয়া না যায়। কেহ মূল্য দিতে অসমর্থ হইলে, সেই অর্থ যেন তাঁহার (বড়-পীর সাহেবের) নিকট হইতে আদায় করিয়া লওয়া হয়। এই অভিনব ব্যবস্থার ফলে কোনো দুঃস্থ-গরিব মানুষই অনাহারে থাকিত না।

তিনি বলিতেন, **যে ব্যক্তি দুনিয়ার সামনে দাঁড়াইয়া গোলামের মতো ভিক্ষা প্রার্থনা করে, দুনিয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়া ছাড়ে। আর যে ব্যক্তি আল্লার সামনে দাঁড়াইয়া দুনিয়ার মানুষের মঙ্গলার্থে ভিক্ষাপ্রার্থনা করে, দুনিয়া তাঁহার পদানত হয়।** আল্লাহ্ সকলের জন্য যাহা নিশ্চিত করিয়াছেন তাহা অতি স্বাভাবিকভাবে যথাসময়ে সকলে পাইবে। তাই অযথা লোভ করিবার প্রয়োজন নাই। আর যাহা নিশ্চিত করা নাই, তাহার জন্য দুঃখ করা অনর্থক। যাহারা আল্লাহ্র এবাদত করে, নেক কার্য করে তাহা অপেক্ষা সুন্দর ও প্রীতিকর আল্লাহ্তায়ালার পছন্দের আর কিছুই নাই।

বড়-পীর সাহেবের জীবনের শেষ উপদেশ ছিল, অস্থায়ী দুনিয়ার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আখেরাতের সম্বল সৎকার্যসমূহকে বিসর্জন দিয়া পাপের পথে এক পা-ও অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্র নিকট নিজের দোষ কবুল করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।

রবিউসসানি মাসের ১০ তারিখ রবিবার দিবাগত রাত্রিতে বড়-পীর সাহেব এশার নামাজের পূর্বে পুত্রদিগকে তাঁহাকে গোসল করাইতে বলিলেন। গোসল শেষ হইলে তিনি শুধু ওজু করিয়া এশার নামাজ আদায় করিয়া অনেকক্ষণ সিজদায় পড়িয়া রহিলেন। অতঃপর মস্তক উত্তোলন করিয়া স্বীয় পরিবারবর্গ, ছাত্র, মুরাদ ও ভক্তবৃন্দের জন্য দুই হাত তুলিয়া তাহাদের জন্য আল্লাহ্তায়ালার নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর বড়-পীর সাহেবের মুখমণ্ডল এক অপূর্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি চক্ষুদ্বয় মুদিত করিয়া কলেমা তৈয়াব কলেমা শাহাদত পাঠ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মা নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিল। ইন্না-লিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন। হিজরী ৫৬১ সনের ১১ রবিউসসানি সোমবার প্রাতঃকালে ৯১ বৎসর বয়সে তিনি তাঁহার গুণ-মুগ্ধদের শোকসাগরে ভাসাইয়া পরপারে চলিয়া গেলেন।

ভারতীয় সংস্কৃতির এক অনন্য সঙ্গী

রণজয় গাঙ্গুলী *

'অতীত থেকে যে শিক্ষা নেয় না, ভবিষ্যৎ তাকে শাস্তি দেয়।'—*জরথুস্ট্র*

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে যে-রূপ মত আশ্রয় করে আসুক না কেন, আমি তাকে সেইভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। হে অর্জুন, মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার নির্দিষ্ট পথেই চলিয়া থাকে।

ভারতবর্ষ এমন এক দেশ, যার মহানুভবতা তার ধর্মীয় শাস্ত্রের প্রতিটি পর্যায়ে ছত্রে ছত্রে আভা বিচ্ছুরণ করে চলেছে। কারণ ভারতবর্ষের বৈদান্তিক জ্ঞান এমন উচ্চ পর্যায়ে অবস্থান করছে যে, হিন্দু নামে লুক্কায়িত বৈদান্তিক ধর্ম Exclusion (হেয় বা পরিত্যাজ্য) কথাটি ব্যাখ্যা করতে অপারগ। এই ভাব স্বামীজী তাঁর শিকাগো ধর্মমহাসভার 'অভ্যর্থনার উত্তরে' ব্যক্ত করেছেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশ থেকে শ্লোক তুলে বলেছেন, **'আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলম্বীর মত সহ্য করি, তাহা নহে—সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।'** তিনি আরো বলেছেন, **'জরথুস্ট্রের অনুগামী সুবৃহৎ পারসিক জাতির অবশিষ্টাংশকে যে ধর্ম আশ্রয়দান করিয়াছিল এবং আজ পর্যন্ত যে ধর্ম তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত।'**

জরথুস্ট্র

এই পারসিক ধর্ম নিয়েই আজকের নিবন্ধ। আজ থেকে প্রায় বারোশ' বছর বা তার থেকে কিছু বেশি বছর আগে আরবিয়ানরা ইরান জয় করে সেখানে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। ধীরে ধীরে প্রায় সমস্ত ইরান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। খুব সামান্য কিছু ইরানীয় হাজার সমস্যার মধ্যেও তাদের ধর্মে সম্পূর্ণ আস্থাশীল থেকে এক গোপন কোণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এর পরবর্তী ক্ষেত্রে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বাসনা নিয়ে জন্মভূমি ছেড়ে চিরদিনের মতো নৌপথে আশ্রয়প্রার্থীরূপে তাঁরা ভারতে আসেন। ৬৩৬-৬৫১ CE গুজরাটের হিন্দুরাজা জেদি রানা তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কারণ তাঁর ধর্ম এটি করতেই অনুপ্রাণিত করে। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত **তাঁরা পুরুষানুক্রমে গুজরাট, মুম্বাই অঞ্চলে নিজেদের পবিত্র মজদীয় ধর্ম অক্ষুণ্ণ রেখে সসম্মানেই বাস করছেন। তাঁরা এখন মনেপ্রাণে ভারতীয়। তাঁরা পারস্য থেকে এসেছিলেন বলে তাঁদের পার্সি বলা হয়। এখন তাদের সংখ্যা ১ লক্ষ-এর কিছু বেশি হবে। মূল পারস্যে বা ইরানে এই ধর্ম প্রায় লুপ্ত।**

কিন্তু এই পার্সিধর্ম আসলে মজদীয় ধর্ম। এটি মহাপুরুষ জরথুস্ট্রের প্রবর্তিত। জরথুস্ট্র এক ঈশ্বরের কথা বলেন, তিনি হলেন 'অহুর মজ্‌দা'। ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ আবেস্তা'। পার্সিদের পূর্বপুরুষ ও প্রাচীন ভারতীয় আর্যগণ একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ভারতীয় আর্যদের 'বেদ' ও পার্সিদের ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ আবেস্তা' এই দুই মহাগ্রন্থের ভাব ও ভাষাগত বহু সাদৃশ্য বিদ্যমান।

খ্রিস্ট জন্মের ৮০০ বছর আগে জরথুস্ট্র রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ঈশ্বরের টানে বৈরাগ্যের ভাব হৃদয়ে জাগরূক হলে, তিনি ত্রিশ বছর বয়সে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে দেশ পর্যটন ও তারপর তপস্যায় রত হন। এরপর বহু বছর কঠোর তপস্যা করে সাবাতন পর্বত শিখরে দিব্যজ্ঞান ও দিব্যজ্যোতির দর্শন পান।

এর আগে ইরানের সামাজিক ও ধর্মীয় আচার আচরণ ছিল অত্যন্ত গর্হিত ও মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ। মদ্যপান, মিথ্যাচারণ প্রভৃতি অসৎ অভ্যাস ছিল অধিকাংশ লোকের অঙ্গভূষণ। ধর্মের নামে অধর্মানুষ্ঠানই হতো সবচেয়ে বেশি।

** সমাজশিক্ষার এই স্বেচ্ছাসেবী প্রাথমিক শিক্ষক পরিষদের 'ভাবানুশীলন বিভাগের' ভূতপূর্ব সর্বাধিনায়ক।*

সত্যনিষ্ঠা, পরদুঃখকাতরতা, আত্মোপলব্ধির চেষ্টা তিরোহিত হওয়ার অর্থই অধর্মের বাতাবরণ তৈরি হওয়া। তখনই ঠিক ধর্মের মূলভাব চরিত্রে ধারণ করে পরমাত্মা স্বয়ং অবতীর্ণ হন। এখানেও তাই হয়েছিল। এই প্রবল অধার্মিক বাতাবরণে সত্যনিষ্ঠ, পরদুঃখকাতর ও সংসার বৈরাগ্যকে অঙ্গভূষণ করে জরথুস্ট্র এসেছিলেন ইরানের বুকে।

দিব্যজ্ঞান ও চাপরাস পেয়ে তিনি দেশের কল্যাণে সত্যধর্ম প্রচারে ব্রতী হলেন। প্রচুর বাধা অতিক্রম করে, তবে অনুকূল অবস্থা লাভ হয়। জরথুস্ট্রের চারিত্রিক শুচিতা, পরদুঃখকাতরতা, দিব্যজ্ঞান রাজহৃদয়ে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা তৈরি করল। ঠাকুর বলতেন, 'পদ্ম ফুটলে ভ্রমর আপনি আসে'। জরথুস্ট্রের হৃদয়-দিব্যপদ্মের মিষ্ট গন্ধে চারিদিক থেকে লোক তাঁর কাছে আসতে লাগল। জরথুস্ট্রের মজ্‌দীয় ধর্মের দীপশিখা অন্যের হৃদয়ের অন্ধকার অপসারিত করল।

কিন্তু বিরুদ্ধাচরণ তো আর পুরোপুরি বিদূরিত হয় না। অন্ধকার থাকে বলেই মানুষ আলোর গুরুত্ব বুঝতে পারে। কুমতি, বিরুদ্ধভাবাপন্ন **অহ্রিমনের অনুচররা মাথায় আঘাত করে জরথুস্ট্রকে ৭৭ বছর বয়সে হত্যা করে**। কিন্তু তাঁর আত্মত্যাগ, উচ্চ আদর্শ, পরহিতব্রত, পুণ্য আদর্শ ছিল ঈশ্বরীয়। তাই তার প্রভাব ২৫০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েও জরথুস্ট্রের পবিত্র নাম চিন্তাশীল সদ্ব্যক্তির অন্তর থেকে হারিয়ে যায়নি।

আমরা যদি পার্সিধর্মের আদর্শগুলি দেখি, তাহলে হিন্দুধর্মের সঙ্গে ভেদাভেদ খুঁজে পাওয়াই প্রায় অসম্ভব। পার্সিরা বিশ্বাস করেন ঃ

১) ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীন চিন্তা দিয়েছেন, যার দ্বারা মানুষ ভালো ও মন্দের বিচার করতে পারে।

২) যারা ভালো পথে চলবে—তারা তিনটি মতাদর্শ মেনে চলবে ঃ (ক) শুভচিন্তা (হুমাতা), (খ) শুভবাক্য (হুখ্‌তা) এবং (গ) শুভকর্ম (হুবশ্‌তা)।

৩) ঈশ্বরের ৬টি শক্তি দ্বারা তিনি সকল শুভকর্ম পরিচালনা করেন—শুদ্ধ-পবিত্র মন, সত্য বা ন্যায়পরায়ণতা, আদর্শ শাসনদণ্ড, প্রেম বা মৈত্রী, পূর্ণতা ও অমৃতত্ত্ব বা আনন্দ। যাঁরা ঈশ্বরের পথে চলতে চান, তাঁদেরও এই আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে।

৪) চন্দ্র, সূর্য, সমুদ্র জগৎপিতা অহুর মজ্‌দার শ্রেষ্ঠ মহিমা প্রকাশক। অগ্নি তাঁর জ্ঞান, জ্যোতি ও পবিত্রতার প্রতীক। অগ্নির মাধ্যমেও তাই তিনি উপাস্য। অগ্নি নিজে উপাস্য নন।

৫) উপনয়ন প্রথায় আস্থাশীল। নারী-পুরুষ উভয়ের প্রতিই এটি সমভাবে প্রযোজ্য।

৬) ভিক্ষাবৃত্তি এক মহাপাপ। আত্মনির্ভরশীলতা আত্মসম্মান তাঁদের কাছে মহাপুণ্য।

৭) জরথুস্ট্রের মত ধরে বিবাহকে একটি পবিত্র বন্ধন মানা হয়। চারিত্রিক শুচিতা সংরক্ষণের পন্থা। বহু বিবাহকে নিষিদ্ধ মনে করে।

৮) মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে। কর্মের দ্বারা সৎ বা অসদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়। তাই সমগ্রজীবন ধরে মনেপ্রাণে সৎকর্মানুষ্ঠান শ্রেয়।

৯) চারিত্রিক শুচিতা, পরদুঃখকাতরতা, আত্মনির্ভর-শীলতা, ধনী-দরিদ্রের বিভেদ বিমোচন, একেশ্বরবাদ, নারীর মর্যাদা, সৎচিন্তা, সৎবাক্য ও সৎকর্ম প্রভৃতি ধর্মের মর্মবাণী।

১০) **যে নিজেকে জয় করতে পারে না, সে কিছুই জয় করতে পারে না**। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও বিনষ্ট হন না। জগৎ অহুর মজ্‌দাহ-এর কাছে সৎপথে চালিত করার জন্য প্রার্থনা করা উচিত—'জেন্দ আবেস্তা'-র এই সব বাণী।

বেদের উপনয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, পুরোহিত প্রভৃতির উল্লেখ 'জেন্দ-আবেস্তা'-তেও রয়েছে। বেদের যজ্ঞ, মন্ত্র, মিত্র, অসুর, সোম, সবন প্রভৃতি শব্দ জেন্দ আবেস্তাতে যথাক্রমে যসন, মন্থ্র, মিথ্র, অহুর, হওম, হবন-রূপে স্থান পেয়েছে। আসলে আর্য → অরিয় → এরিয়ান → ইরান—এইভাবে পরিবর্তন ঘটেছে।

ভারতে বসবাসকারী পার্সি মানুষজন তাদের নিজস্ব জরথুস্ট্রিয়ান ধর্মে সংস্কৃতি চর্চা করলেও মনেপ্রাণে ভারতীয় হয়ে উঠেছিলেন। ভারতীয় জরথুস্ট্রিয়ানরা ভারতকে অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করেছেন। আজও আমরা টাটা গ্রুপের জন্য গর্ববোধ করি। কত ভাবে তারা ভারতের উন্নয়নে সাহায্য করে চলেছেন। ভারতীয় হিন্দি সিনেমা জগতের একজন পার্সি পরিচালক ও অভিনেতা ছিলেন। তিনি শ্রী শোরাব মোদি। তিনি ছিলেন মায়ের মন্ত্রশিষ্য। সেই সময় (১৯১৮) তাঁর দাদা ছিলেন প্রবাসী কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত। তিনি শুনেছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীর কথা। তাঁর ভাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করে বোম্বে থেকে কলকাতায় নিয়ে এসে শ্রীমা সারদাদেবীকে দেখার ও প্রণাম করার জন্য প্রেরণ করেন।

কিন্তু বাগবাজারে মাকে দেখার পরই মায়ের কাছে মন্ত্র প্রার্থনা করেন। মাও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। নিয়ম মেনে দীক্ষা দিলেন। ভিন্নভাষী দুজন অদ্ভুতভাবে দু-জনের কথা বুঝে গেলেন। মা দীক্ষা দিয়ে উঠে স্বামী অপূর্বানন্দকে বললেন, 'বেশ ছেলেটি, যা বললুম, ঠিক বুঝে নিল।' শোরাবজী পরে স্মৃতিচারণ করেছেন ঃ 'সেদিন যদিও তিনি আমার ভাষা বোঝেননি, আমিও বাংলাভাষা জানতাম না, কিন্তু আমরা দু-জনেই কথা বলেছি কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই। মা বাংলায় বলেছেন, আমি হিন্দিতে উত্তর দিয়েছি; যখন তাঁর কাছ থেকে চলে আসছি, আমি বললাম, ''মা, আমি যাচ্ছি।'' মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, ''বাবা, যাই বলো না, বল আমি আসছি''।' সেদিন তিনি অবাক হয়েছিলেন, হৃদয়ে অপূর্ব সুমিষ্ট পরিতৃপ্তি নিয়ে বোম্বে ফিরে আসেন। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। সিনেমা জগতের কাজে লিপ্ত হয়ে যান মায়ের কথা প্রায় প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু জীবনের শেষকালে তাঁর অদ্ভুত অনুভূতি প্রাপ্ত হয়। তিনি সবকিছুর থেকে অনায়াসে নিজেকে সরিয়ে নিতে পেরেছিলেন। শুধু তাঁর মায়ের সেই কথা মনে পড়ত, 'বাবা, যাই বল না, বল আসি।'

সেদিন মায়ের একবারও ভাবতে হয়নি ভিন্নধর্মীকে গ্রহণ করতে। তিনি সেই সময়ের বিধবা হিন্দুরমণী ও তথাকথিত অশিক্ষিত হয়েও সাদরে গ্রহণ করেছিলেন পার্সিয়ানটিকে। কারণ হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ—'বসুধৈব কুটুম্বকম্' শ্রীমায়ের মধ্যে বিকশিত ছিল। এটাই ভারত মাতার মর্মবাণী।

দাদাভাই নৌরোজি নাম আমরা অনেকে জানি। তিনি ভারতীয় জরথুস্ট্রিয়ান ছিলেন। তিনি ভারতের রাজনীতিতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

জামসেদজীর কথা আগেই বলা হয়েছে। রুস্তম ম্যানেকও ভারতীয় সমাজকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। গোদরেজ কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা আরদেশির গোদরেজ-ও ছিলেন পার্সি ধর্মাবলম্বী ভারতীয়। ভারতের পরমাণু গবেষণার জনক 'Indian Atomic Energy Commission'-এর প্রথম চেয়ারম্যান হোমি জাহাঙ্গীর ভাবাও ছিলেন জরথুস্ট্রিয়ান। হিন্দি সিনেমার অভিনেত্রী অরুণা ইরানী, ফিরোজ গান্ধী, টাটা স্টিলের প্রতিষ্ঠাতা দোরাবজী টাটা, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট টিমের প্রথম ক্যাপ্টেন ডায়ানা এডুলজী, Serum Institute of India-এর প্রতিষ্ঠাতা ড. সাইরাস পুনাওয়ালা—এনারা জরথুস্ট্রের আদর্শ মেনে চলা মানুষ হলেও ভীষণভাবে ভারতীয়। বিশ্বের দরবারে ভারতের বর্তমানে উজ্জ্বলতম অবস্থানে এনাদের ভূমিকা সুস্পষ্ট।

ভারতীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরম্পরার আত্তীকরণ সত্ত্বেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণ্ণ ও যথাযথভাবে পালনে এই পারসিক সম্প্রদায় এককথায় অনন্য ও 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। এইভাবে কোনো সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়ে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে, বৈদিক পরম্পরাকেই পারসিক ধর্মাবলম্বীরা যেন আর একবার অনুরণিত করলেন—'একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'।

(৩৪৫ পৃষ্ঠায় 'শ্যামার জবা ও শঙ্করের বিল্বপত্র'-এর শেষাংশ)

বেলপাতায় কতখানি তুষ্ট মহাদেব, এ কাহিনীতে আমরা সম্যক বুঝতে পারি। কিন্তু কেনই বা তুষ্ট, এর অসাধারণত্ব কোথায়, আরেকটু তলিয়ে দেখা যাক।

বেল ফল, পাতা ও তার শিকড় সবগুলিই বেশ কাজে লাগে। বেলপাতার রসের আশ্চর্যজনক স্বাস্থ্য উপকারিতা আছে। বেলে অ্যান্টি-ফাঙ্গাল, অ্যান্টি-প্যারাসাইট গুণ রয়েছে যা হজমের জন্য লাভজনক। বেলের শরবত শরীর ঠাণ্ডা করে। প্রচণ্ড গরমে নাক থেকে রক্তপাত হলে এই বেল ফলের শরবত ওষুধ হিসেবে খাওয়ানো হয়। পেটব্যথা, গ্যাস, ডায়রিয়া ও পেট খারাপের সমস্যায়ও বেশ উপকারী বেল। সপ্তাহে ২ থেকে ৩টি বেলপাতা এক্ষেত্রে বড়ই উপকারী। ল্যাকসেটিভ বৈশিষ্ট্যের জন্য বেল কোষ্ঠকাঠিন্য, পেটব্যথা বা হজমের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। এর বিটা ক্যারোটিন যকৃৎকে সুস্থ রাখে। বেল ভিটামিন সি-এর ভালো উৎস। থাইমিন ও রাইবোফ্লেভিন-এর মতো ভিটামিনও এতে আছে—যা লিভারের পক্ষে উপকারী। ভিটামিন সি-এর পরিপূরক হওয়ায় শরীরের অনাক্রম্যতাও বাড়ায়। মাতৃদুগ্ধের পরিমাণ বাড়াতে বেলপাতার উপকারিতা রয়েছে। এত যার গুণ, তা কেন গুণাধীশ ত্রিগুণাতীতের প্রিয় হবে না? আবার নিয়মিত বেলপাতা খেলে সংযমশক্তি বাড়ে। শঙ্করের ত্যাগ বৈরাগ্য যোগীরূপের তাই তো বিল্বপত্র এত প্রিয়!

১. *বৃহৎ শিবপুরাণ—ভগবান বেদব্যাস প্রণীত, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন অনূদিত, তারা লাইব্রেরি, ২৭ ক্যানিং স্ট্রিট, ৭ম সং., কলি, পৃঃ৫১৪-১৫।*

কবিতামালা

মা আসবেন স্বামী বরেশ্বরানন্দ *

শরৎ এল, শিউলি এল, এল শিশির বিন্দু।
সকলের মনে আনন্দ এল, ভরল নদ ও সিন্ধু।।
গজে আগমন করলে পরে, হয় শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।
নৌকায় গমন করলে পরে, জলবৃদ্ধি হয় দেশজোড়া।।
ষষ্ঠীর সকালে হবে কল্পারম্ভ, দুর্গাপূজার নব সূচনা।
সন্ধ্যায় হবে দেবীর বোধন, আমন্ত্রণ ও অধিবাস রচনা।।
সপ্তমীতে নবপত্রিকা স্থাপন ও দেবীর পূজা আরম্ভ।
অষ্টমীতে কুমারী পূজা, দেবী পূজার এক বিশেষ অঙ্গ।।
রাত্রে হবে সন্ধিপূজা, এটা একটি বিশেষ ক্ষণ।
অষ্টমী ও নবমী তিথির, এটা হলো মহা সন্ধিক্ষণ।।
নবমীতে মায়ের পূজা শেষ হোমের পূর্ণাহুতিতে।
দশমীতে দধিকর্মা বিতরণ, মায়ের বিদায় বেলাতে।।
ডমরু বাজিয়ে শিব ঠাকুর, আসবেন মাকে নিতে।
কৈলাসে যাবেন মা, থাকবেন নন্দী ভৃঙ্গী সাথে।।
এমনিভাবে প্রতি বছর, মা আসবেন এই মর্ত্যধামে।
সকলে আনন্দ করবে তখন, মায়ের পূজার মাধ্যমে।।

মা, তুমি আসছো বলে ❀ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ *

কমলের বন, দোলে অগণন, স্বচ্ছ সরসী–সলিলে,
কাশফুল যত ব্যজনেতে রত, মা তুমি আসছো বলে।
ফুটেই শিউলি ঝরে সবগুলি, তোমায় দেয় অঞ্জলি,
বাসির ভয়েতে রয় না ভোরেতে, কেঁদে ফিরে অলি।
নীলাকাশে মেলা, শ্বেত মেঘভেলা, ডাকে দিয়ে হাতছানি,
বলে ঃ 'মাগো এসো, মোর কোলে বসো, লাগবে না পারানি।'
আনন্দে উছল নীল নদী জল, ডাক দেয় কলস্বরে,
বলে ঃ 'বাঁধা তরী, চড় গো শঙ্করী, তোমায় দেব পার করে।'
চম্পার সৌরভ, শূন্যের গৌরব, সে কি মা তোমার তরে?
শোষিত কর্দম, সরণী হলো সুগম, পথিক অবাধে ফেরে।
শরৎ প্রকৃতি বর্ষায় টেনে ইতি, সুন্দরের পানে চলে—
আনন্দ চারিদিকে আকাশে বাতাসে, মা তুমি আসছো বলে।

আয় মা দুর্গতিনাশিনী ❀ মিষ্টি বসু *

হে মা দুর্গা, দশহাতে তোর অস্ত্র–শস্ত্র
আর কতকাল রইবে থেমে?
খড়্গ হাতে সংহারিণী আয় না নেমে।
ঝল্‌সে উঠুক এবার সকল অস্ত্র–শস্ত্র।
রক্তচোষা অসুরগুলো উঠছে বেড়ে যত্র তত্র,
রুষ্ট হয়ে একবার দাঁড়া দেখি মা,
ত্রিশূল উঁচিয়ে নয় তো থামা।
দেখি কেমন পুষ্ট হয় ওরা!
ঘুচিয়ে দে না দুর্নীতি সব,
দেশ জুড়ে আর দেখব কত আর্তরব!
বল্ মা বল্ আর কবে বল্,
মুছিয়ে দিবি সন্তানের এই চোখের জল?

শিবের কথা ❀ শিপ্রা দত্ত *

শিব তুমি মঙ্গলময়, প্রণমি তোমায়,
সকল অমঙ্গল হইতে করিতেছ উদ্ধার,
আমরা অবোধ অতি বুঝিতে পারি না তা,
সমুদ্র মন্থনে যখন উঠিল হলাহল
আমাদের রক্ষা করিতে পান করিলে গরল
নীলকণ্ঠ হইয়া তুমি রক্ষা করিলে এই ধরাতল,
আজও তুমি আমাদের সহায় সম্বল।

কৃপাময়ী ❀ সুমনা চৌধুরী

তোমার কৃপার মঙ্গলঘট
উথলিয়া যেন মোরে ভাসায়।
একাকিনী যবে বসি নিশ্চুপে
চরণপ্রান্তে শান্তি–আশায়।
কে করিবে মাগো তোমার বর্ণনা
যত দেখি তোমা, তবুও অজানা।
কৃপা করি তবু দিতেছ ভরিয়া
হৃদি মম তব মাতৃবিভায়।
কঙ্কনপরা ঐ দুটি হাতে
স্পর্শমাত্র পারো অবিদ্যা নাশিতে।
করুণায় ভরা স্নিগ্ধ নয়নে
আনন্দ ঢালো আমার সত্তায়।
চাই না মা কিছু শুধু থাকি চেয়ে
ঝরে অশ্রুধারা দুটি আঁখি বেয়ে।
তোমার কোলেতে ঠাঁই দিও মাগো
জননী আমার আমি তব মেয়ে।।

** সমাজশিক্ষার এই কবিরা পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী।*

আশ্বিনের প্রার্থনা শীলা সরকার *

আশ্বিন এলে বাংলা মাতে, দুর্গাপুজোর উৎসবে,
আজ আর বাংলা নয়কো খুশি, শিউলি ভরা সৌরভে।
কাশের গুচ্ছ দোলায় চামর, মেঘের ভেলা আকাশে,
এমন দিনেও হাসে না খুকু, মুখখানা তার ফ্যাকাশে।
শরৎ এলে মন দিত পাড়ি অনেক দূরের তেপান্তর,
খুশির সেদিন কোথায় গেল? কেমন করে ফেরাই ঘর?

করোনা যে কাড়লো ধরার খুশি এবং আনন্দ,
করোনাপশু বধ হবেই হবে, একটুও যে নেই সন্দ।
শরৎ এলে ভরলো পুকুর, টলটল্ জল পাই না থই,
মাগো, তোমার অপার করুণা সুন্দর মুখ কই সে কই?
করোনাকে হারিয়ে তুমি আলো জ্বালাও চারদিকে,
আমরা নত থাকবো তোমার পায়ের কাছে হাসিমুখে।।

তুই-মা সত্য ❀ পলি চৌধুরী *

পূজা বিধি, মন্ত্র-তন্ত্র,
জপ-তপ নেই মা আমার,
আমি তোর অবোধ সন্তান——
মা বলে তোকে জানি সদা।
তোর চরণ ছুঁতে মন পাগল করে মা,
ধূপ-দীপ, চন্দন ও ফুল দিয়ে

জানি না তোর পুজোর নিয়ম।
ভালোবাসার ফুল মোর অন্তরের
সদাই করি নিবেদন অঞ্জলি ভরে।
তোকে জানতে হয় না কোন ভ্রম
তুই সবার মা, চিরন্তন মা তোরই বাণী।
অনেক পরে এসেছি এ ধরাতে জন্ম নিয়ে

তবুও মনে হয় তোর আঁচল
গন্ধে সুরভি সদাই ভাসে।
সুখে-দুখে তোকে দেখি অনুভবি
স্বপ্নে-জাগরণে তোকে পাই সর্বসময়ে।
তুই মা সত্য——তোর সন্তান আমি
এ বুঝিতে আজ দ্বিধা নাই মোর।

ভুল ❀ সমাজ বসু *

ভুলেও ভেব না, আমার ঘর——
জমিজমা, বিষয় আশয়——
এই ভুল নিয়েই মানুষ
আজীবন মেতে থাকে
তার প্রাচুর্যের গল্পে——
বোনে সুখের বীজ।
অথচ——
ভুলেও ভাবে না,
এ জগতে সামান্য ধূলিকণাটুকুও তাঁর।

মহান কৃষক ❀ তপন কুমার দাস *

সেই কোন আদিকাল হতে
ধরেছ হাল; করছ চাষ
অক্লান্ত, অবিরাম।
একের পর এক; হাতে হাতে
করেছ যে পরখ।
আজও খুঁজে চলেছ নানান কৌশল
উৎকর্ষতার দুর্বার সন্ধানে;
কখনও সফল কখনও বিফল
কোনো কিছু করনি বিচার
সারাটি জীবন শ্রমের কোনো

অন্ত নেই তোমার
সকলের পেটের অন্ন
জোগাড়ের তরে।
আসুক বৃষ্টি; হোক না বজ্রপাত
ফসল ফলাতে নিজের জীবন
করেছ উৎসর্গ।
আজিকার এ সমাজ
তোমাদের অবিরাম ঘামেরই দাম।
তোমাদের হাড়ভাঙা খাটুনির ফলে
বাবুদের বাবুয়ানা চলে।

জীবন সঙ্গীত ❀ নিতাই চন্দ্র রজক *

ভবের লীলা সাঙ্গ হলে ভঙ্গ দিয়ে যাই,
একাই আমি, যাই একেলাই সঙ্গী কেহ নাই;
মুখে হরি হরি বলে,
শ্মশানঘাটে নিয়ে চলে।
ধরার সাথে লেঠালেঠি সবই চুকে যায়।

যে সংসারে আপন ভেবে কেটে দিলাম কাল,
যা ছিল ধন আমার স্বজন বাগিয়ে নিল মাল;
চিতায় আমায় হবে শুতে,
কিংবা ভূমে দেবে পুঁতে।
মরভূমির লীলা সেরে সবাই চলে যায়।

মাটির দেহে ভাড়াঘরে কেটে অনেক দিন,
চুকলো ভবের বেচাকেনা শোধ দিলাম সব ঋণ;
কাঁদবে দুদিন সুত দারা,
এখন আর কেউ নয়কো তারা।
কালের তিমির আঁধার জালে সবই ঢেকে যায়।

ধুলার ধরা মায়ায় ভরা কেবল মায়াময়,
কালের বাঁশি বাজলে সবই ছেড়ে যেতে হয়;
দেহ বসন দিই রে খুলে,
পরিজন সব যায় রে ভুলে।
মানবমনে স্মৃতিটুকু কেবল থেকে যায়।

* *সমাজশিক্ষার এই কবিরা পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী।*

কল্পতরু আলো ঘোষ *

তুমি তো কল্পতরু সে কথা সবাই জানে,
কি চাইবো তোমার কাছে?
তুমি তো সব দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছো।
তুমি তো নিত্য কালের পথের দিশারী।
এই পথে চলতে চলতে থেমে যাব একদিন।
সেই দিন পথে ফেলে যেও না।
কোলে তুলে নিয়ো এটুকুই চাওয়া।

নির্মোহ স্বপ্নের কাছে গচ্ছিত যে দিন,
সে স্বপ্ন ভেঙে দিও না নির্মম হাতে।
বাইরে দূরে অন্বেষণে কেটেছে কত কাল।
অন্তরে প্রদীপ (জ্বালিয়ে) বসে আছো (জ্বেলে)
পরমপুরুষ মুক্ত জ্যোতির্ময়,
আলোর প্লাবনে মুগ্ধ হৃদয়,
ধন্য হলো, ধন্য হলো, এ জনম আমার।

করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু ❀ সুব্রত মাইতি *

শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী নারায়ণ,
ধরাধামে নররূপে তাঁর আগমন।
বাল্যকালে তিনি ছিলেন গদাই মর্ত্যধামে,
দীক্ষান্তে জানে সবাই শ্রীরামকৃষ্ণ নামে।
পরশপাথর তিনি এই পৃথিবীতে,
কত পাপী–তাপী উদ্ধার হয় তাঁর পরশেতে।
অনাথের নাথ তিনি অগতির গতি,
অজ্ঞানতা ঘুচিয়ে বিলোন জ্ঞানের জ্যোতি।

গিরিশ–বিনোদিনী হেন ভক্তকুলে,
উদ্ধার করেন তিনি জ্ঞানচক্ষু খুলে।
তাঁর বচন অমৃতসম 'কথামৃত' গ্রন্থে,
সংকলন করেন 'শ্রীম' এই মহামন্ত্রে।
প্রভুর আশীর্বাদে শিষ্য নরেন শিকাগোতে,
ফেরেন বিশ্বজয় করে 'সর্ব–ধর্ম–সভা' হতে।
স্বামী বিবেকানন্দ নামে তিনিই বেলুড় ধামে,
প্রতিষ্ঠা করেন মঠ গুরু–মহারাজজীর নামে।

শঙ্খচিলের মতো ❀ অশোক মুখোপাধ্যায় *

চলন্ত ট্রেনের খোলা জানলায় দেখা
ক্রমশ অপস্রিয়মাণ গাছগাছালি নদীনালাগুলো,
যেন জীবনের ছেড়ে আসা দিনগুলোর মতো
সরে সরে যায় আস্তে আস্তে।
আর আমি ছুটি চলন্ত ট্রেনের মতো
আগামী অনাগত ভবিষ্যতের দিকে,
ভালোমন্দ জানার অপেক্ষা না রেখেই।

তবু যেতেই হবে।
অনলস প্রত্যয়ী বকের মাছ শিকারের
কায়দা সকলের জানা থাকে না,
তবে বন্ধনহীন জীবনের আনন্দ তো
উদাসী শঙ্খচিল মুক্ত আকাশে খুঁজে পায়।
দাঁড়ে পোষা ময়নার মতো,
মৃত জীবন তো আর সবার কাম্য হতে পারে না।

ভারত প্রতিমা স্বামীজী ❀ গদাধর রানা *

চির সুমহান্ ভারতবর্ষ এই দেশ,
স্বামীজীর চোখে শাশ্বত সনাতন।
এ দেশের প্রতি ধূলিকণা সুন্দর,
জন্মেছেন হেথায় মহাজন অগণন।

বৈরাগ্য আর প্রেমের মূর্ত প্রতীক,
ত্যাগের অগ্নিমন্ত্রেই যাঁর দীক্ষা।
ভোগবাদজাত দৈত্যদলনে সৈনিক,
নবীন তন্ত্রে মন্দ্রিত যাঁর শিক্ষা।

দ্বৈতবাদেই অদ্বৈতেরি চেতনায়,
পরমাত্মায় মনের নিবিড় অনুরাগ।
ধ্যানগম্ভীর নিমীলিত দুই নয়ন,
খোঁজে অবকাশ বিনাশিতে প্রমাদ।

চিরঅম্লান দীপশিক্ষাসম দীপ্যমান,
চিরভাস্বর চিরউজ্জ্বল মহীয়ান্।
জ্ঞান ও কর্ম ভক্তিযোগের সাম্যগান,
জীবনসাধনে প্রভুর আদর্শে গরীয়ান।

ভারতবর্ষই স্বামীজীর মহাতীর্থ,
ভারতাত্মাই জাগ্রত প্রিয় দেবতা।
তাঁরি পূত বাণী জীবনগঠনে দিশারী,
ধ্যান ছিল তাঁর সমন্বয় আর একতা।

ভারত তাঁরই দিবানিশীথের স্বপ্ন,
সম্প্রীতির রঙে মুছে গেছে ঘোর কালিমা।
স্বয়ং স্বামীজীই হলেন ভারতবর্ষ,
(যেন) রক্তমাংসেই গড়া ভারতপ্রতিমা।

---

* সমাজশিক্ষার এই কবিরা পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী।

সুমতি দাও প্রভু নির্মল কুমার পট্টনায়ক *

মুক্তি আমি চাহি না প্রভু,
ফিরিয়া আসিতে দাও সেথা—
যেথা আছ তুমি—

শত অবহেলা সহা
ভূময়-তৃণ-ছায়ে ভগ্ন কুটিরে,
জীর্ণ বসন, শীর্ণ কায়,
সেই মূঢ় মানবের মাঝে।

সুমতি দাও প্রভু—
যেন শির করি নত
ধূলি-ধূসর চরণে ঠেকাই,

কামনা-বাসনা সকল ত্যাজি
সেবা যেন করি ব্রত—
দূরিতে যাতনা সবাকার
অনুভবি সম হৃদি মাঝে।

বিদ্রোহী নজরুল ❀ হিমাংশু মিস্ত্রি *

সত্যের কবি, সাম্যের কবি, তুমি যে বিদ্রোহী বীর,
অত্যাচারের হিমালয় ভেদি চিরউন্নত শির।
যারা চিরকাল অবহেলিত সহেছে অসম্মান,
সর্বহারার কণ্ঠে শোনালে অগ্নিবীণার গান।
অন্ধকারের শৃঙ্খল ভাঙা তুমি যে রাজাধিরাজ,
শত্রুর বুকে শেল হয়ে বেঁধা জ্যৈষ্ঠ মেঘের বাজ।
ধর্মের নামে যেখানে দেখেছ শোষণ অত্যাচার,
সিংহ নিনাদে দাঁড়ায়েছ রুখে প্রতিবাদে সোচ্চার।
আঁধার চিরিয়া ফুটে ওঠা এক অগ্নিমন্ত্রদাতা,
জীর্ণ জাতির বুকেতে জাগালে উজ্জ্বল মানবতা।

সমাজের যত ভণ্ডামি আর জাতপাত অহংকার,
মিলন মন্ত্রে করে দিলে সব ভেদাভেদ একাকার।
তোমার বিষের বাঁশিতে শুনি সেই শাশ্বত সুর,
যৌবন হলো চিরউচ্ছল প্রাণ রসে ভরপুর।
হৃদয়বীণায় ধ্বনিত হয়েছে প্রেমের দীপ্তবাণী,
ভালোবেসে ভিখারি সেজেছ প্রিয়ারে করেছ রানী।
চিরসুন্দরের পূজারি তুমি যে ভোরের ভৈরব,
ধূমকেতু হয়ে চির অম্লান বাঙালির গৌরব।
ঘুমিয়ে পড়েছ মাটির বুকে বসন্তের বুলবুল,
সত্যের কবি, সাম্যের কবি বিদ্রোহী নজরুল।

অন্তরের কথা ❀ শিউলি ব্যানার্জী *

'মুক্তি', 'মুক্তি' বলে কেঁদো না আর,
'মুক্তি' হলে ভবনদী হবে পার।
মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যার আছে,
সে সব সুখভোগ ত্যাগ করে পাছে
মুক্তির অন্তরায় বলে।
সে হয় সাধু, মহাত্মা জগতের কাছে।
'মুক্তি', 'মুক্তি' বলে কেঁদো না আর
নির্বাসনা হলে হবে ভবনদী পার।
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর কথা অন্তরে যে শোনে

তার কাছে আছে শান্তির বারতা।
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা
অন্তরে যে শোনে
সে খোঁজে, জগতের আনাচে-কানাচে
সর্বধর্ম সমন্বয়ের বারতা।
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কথা
অন্তরে যে শোনে
তার অন্তর বলে ঃ জীবে প্রেম,
শিবজ্ঞানে জীবসেবা

এই করিব আমি,
মনুষ্যরে দিব এই বারতা।
হবো সাধু, গৃহী বা ত্যাগী
যেখানেই থাকি না কেন,
হবো আদর্শ যোগী,
হবো জ্ঞানী,
সংসার দাবানলে যে অনল জ্বলে
তাতে পোড়াবো না নিজেকে
আর কোনো ছলে।।

ইষ্টমন্ত্রে পীযূষ কান্তি ঘোষ *

বহু প্রতীক্ষার পর এল সে দিন
ধন্য হলাম, দীক্ষিত হলাম ইষ্টমন্ত্রে।
জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতন
তিক্ত অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এ মনুষ্যজীবন
স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদীর শিকার
হার, জিত, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ ...
তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘ সে পথ
পরিক্রমার পর মিলেছে কাণ্ডারী।
যাঁর কৃপায় ও আশীষে করব বৈতরণী পার
মনে বল, প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস

এই তো সব শেষ সম্বল, তাকে পুঁজি করে
অচলাভক্তি নিয়ে তাঁর শ্রীচরণে আশ্রিত এ মন।
সৌভাগ্য ও সুযোগের মিলন, অপার করুণা তাঁর
করুণাসাগরে দিই ডুব,
করুণাময়ের অশেষ কৃপা
তাঁর ভাবধারায় আপ্লুত এ হৃদয়
বহুকাল ছিল তৃষ্ণার্ত, অবশেষে সুযোগ এল
তৃষ্ণা মিটেছে, চোখের জলে তাঁর পাদপদ্ম সিক্ত
হৃদয়ে তাঁর শ্রীচরণ যুগল, সামনে মঙ্গলদীপ
মস্তকে গুরুর আশীষ করি ধারণ।

---

* *সমাজশিক্ষার এই কবিরা পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী।*

গরমেও ফুলকপি চাষ করুন

ফুলকপি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। এটি দেশে সবজি হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত আমরা ফুলকপির সবজি পাই বিশেষ করে ঠাণ্ডার মরশুমে। কিন্তু এখন অনেক উন্নত জাত এসেছে, সেগুলো দ্বিতীয় মরশুমেও চাষীভাইয়েরা চাষ করছেন। শীতের মরশুমে ফুলকপির সবজি প্রাথমিক পর্যায়ে এলে সাধারণত এর দাম বেশি থাকে। কিন্তু সরবরাহ বাড়লে দাম কমে যায়। এমতাবস্থায় চাষীরা মাত্র কয়েক দিনের জন্য লাভবান হন। কিন্তু এখন কৃষি বিজ্ঞানীরা এমন কিছু উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছেন, যেগুলো চাষীরা জুন-জুলাই মাসেও চাষ করতে পারবেন। এ সময় বাজারে ফুলকপি পাওয়া যায় না। এই কারণে এই সময়ে চাষীদের এই ফুলকপি চাষ করে ভালো আয়ের সুযোগ রয়েছে।
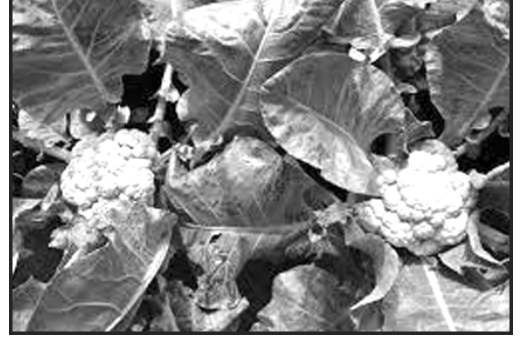
এই সব উন্নত জাতগুলি হলো ঃ ১) পুষা মেঘনা, ২) পুষা অশ্বিনী, ৩) পুষা কার্তিক, ৪) পুষা কার্তিক সংকর। এই সব জাতের ফুলকপি আবাদ করে চাষীরা এর থেকে ভালো আয় করতে পারেন। তবে এই ফুলকপি চাষ করতে কৃষক ভাইদের খেয়াল রাখতে হবে, মাঠ যেন জলাবদ্ধ না হয়। আগাম ফুলকপি, এমনকী এমন জমিতেও বপন করা উচিত নয়, যেখানে পোকামাকড় ও উইপোকা আছে। যে ক্ষেতে ফুলকপির ফসল রোপণ করা হবে, সেই ক্ষেতে তা শোধনের প্রয়োজন আছে। প্রথম দিকে ফুলকপির চারা ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে প্রস্তুত হয়। এটিকে খুব ভালো করে যত্ন নিতে হবে এবং সময়মতো আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। এই চাষে পোকামাকড় ও রোগ দেখা দিলে ওষুধ স্প্রে করতে হবে। আগাম ফুলকপি কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

নতুন জাতের গোলাপ চাষে মিলবে লাভ

সারা বিশ্বে হাজার হাজার রকমের ফুল আছে, কিন্তু গোলাপ তার মধ্যে অনন্য এবং অন্যতম। তাকে বলা হয় ফুলের রানী। গোলাপকে বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর এবং সুগন্ধি ফুল বলে মনে করা হয়। বিভিন্ন রঙের গোলাপ খুব আকর্ষণীয় দেখায়। গোলাপকে ভালোবাসার প্রতীক বলে মনে করা হয়।

গোলাপ চাষ বাণিজ্যিক ফসলের ফুল হিসেবে পরিচিত। গোলাপ চাষ চাষীদের জন্য অনেক আর্থিক সুবিধা দিতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা। সব বাণিজ্যিক ফুলের ফসলের মধ্যে গোলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। গোলাপের বৃদ্ধির পদ্ধতি অনুসারে, হাইব্রিড-টি, ফ্লোরিবুন্ডা, মিনিয়েচার, ভেলির মতো গোলাপের জাত রয়েছে। এর মধ্যে হাইব্রিড-টি, চাষীরা বাণিজ্যিকভাবে গোলাপফুল উৎপাদনে ব্যবহার করেন।

ফ্লোরিবুন্ডা ক্ষুদ্রাকৃতি এবং লতাজাতীয় গোলাপ, বাগানের পাশাপাশি টবেও জন্মায়। গোলাপগাছ ছায়া জায়গায় ভালোভাবে বৃদ্ধি পায় না এবং প্রস্ফুটিত হয় না। অতএব গোলাপের ভালো বৃদ্ধির জন্য, কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা তীব্র সূর্যালোক প্রয়োজন। জল নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত হালকা মাটি গোলাপ ফসলের জন্য ভালো বলে মনে করা হয়। জল নিষ্কাশন না হলে মাটিতে শিকড় পচে যায় এবং গাছ মরে যায়। জুন ও অক্টোবরে গোলাপ ছাঁটাই করা হয়। ছাঁটাই করার সময় একটি ধারালো ছুরি এবং কাঁচি ব্যবহার করতে হবে এবং ছাঁটাইয়ের পর ছত্রাকনাশক স্প্রে ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরী। গোলাপের সঠিক বৃদ্ধি এবং উচ্চফলনের জন্য সর্বদা মাটির গুণমাণ ভালো রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। গোলাপের গড় ফলন হেক্টর প্রতি আড়াই থেকে তিন লাখ হতে পারে।

গোলাপের প্রধান জাতগুলি হলো গ্ল্যাডিয়েটর, সুপারস্টার, মোটেজুমা, পিস হ্যাপিনেস, আইফেল টাওয়ার, লাডোরা, কুইন এলিজাবেথ, কনভারজেন্স, এডওয়ার্ড ইত্যাদি। পুনে, মুম্বাই, নাসিক, নাগপুর, দিল্লী, জয়পুর ইত্যাদি জায়গায় হাজার হাজার প্রজাতির ফুল রয়েছে, তবে গোলাপ সবচেয়ে জনপ্রিয়।

বাড়িতেই করুন শিম চাষ

বাঙালির ঘরে ঘরে এক জনপ্রিয় সবজি হলো শিম। প্রোটিনসমৃদ্ধ এই সবজি চাষ করাও খুব সহজ। এটি জমি ছাড়াও রাস্তার ধারে, পথের আলে, ঘরের চালে এবং গাছেও ফলানো সম্ভব। এ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলা শিম চাষে খুব আগ্রহী। প্রতি বছর জেলা জুড়ে প্রায় দেড় থেকে দুহাজার হেক্টর জমিতে শিমের চাষ হয়ে থাকে। বাজারে বিভিন্ন প্রকার শিমের চাহিদা থাকায়, এই চাষে কৃষকরা খুবই আগ্রহী হয়ে পড়েছেন। শ্রাবণ–ভাদ্র মাস থেকে এই সবজির বীজ পুঁততে শুরু করেন কৃষকরা। তবে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত বীজ লাগান যায়। এজন্য জমিকে আগে থেকে চাষ দিয়ে তৈরি রাখতে হবে। অনেক চাষী শুধুমাত্র শিম চাষের জন্যই জমি তৈরি করে নেন। এতে আগাম শিম পাওয়া যায়, দামও ভালো মেলে।

ফলের চেয়ে যার পাতার দাম বেশি

কাফির লেবু সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি না। এটি এক ধরনের লেবুজাতীয় ফল যার আদিনিবাস বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যাণ্ড এবং ফিলিপাইনস–সহ উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে। এর ফল ও পাতা দক্ষিণ–এশীয় রান্নায় এবং তেল সুগন্ধি শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

উৎস ঃ কাফির নামকরণের উৎস সঠিকভাবে জানা যায় না। সাধারণত মুসলমানেরা বিধর্মী বা অমুসলিম বোঝাতে কাফির/কাফের শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। এই লেবুটির আদিনিবাস যেহেতু অমুসলিম–প্রধান অঞ্চলে, সেখান থেকে এমন নামকরণ হতে পারে।

ঔষধিগুণ ঃ কাফির লেবুর কিছু ঔষধি গুণও রয়েছে। এশিয়ার কিছু দেশে এই ফলের রস এবং খোসা–বাটা স্থানীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়। এটা মাথার উকুন মেরে ফেলে। এছাড়া থাইল্যাণ্ডে এই ফলের রস কাপড় ও চুলের পরিস্কারক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে অবশ্য এই লেবুর ব্যবহার তেমন নেই। বাংলাদেশে এর উৎপত্তি হলেও বড় বড় রেষ্টুরেন্ট ছাড়া ব্যবহার দেখা যায় না। যদিও এই লেবুর পাতার সুগন্ধ এতই বেশি যে, সব উন্নত দেশের খাবারের বেশিরভাগ মেনুতে এটা ব্যবহার করা হয়। দেশে বড় বড় সুপার–শপে অনেক দামে বিক্রি হয় এই লেবুর শুকনো ও কাঁচা পাতা।

ক্ষেতে আগাছা দমন করব কীভাবে?

জমিতে ফসল নষ্টের জন্য আগাছা ৪০ শতাংশ দায়ী। তাই ফসল ফলাতে গেলে নিয়মিত আগাছা দমন করতে হবে। আগাছা দমন না করলে ফসল ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি। আগাছা দমনের বিষয় এলেই কৃষকরা মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিক প্রয়োগ করে থাকে জমিতে, তবে এর ফলে জমির ক্ষতি হয় এবং জমি তার নিজস্ব উর্বরা শক্তি হারায়।

দমন পদ্ধতি ঃ আমাদের দেশের যে সমস্ত আগাছানাশক বেশ পরিচিতি লাভ করেছে, তার মধ্যে রিফিট ৫০০ ইসি, গ্রামোক্সোন ২০ এমএল ইত্যাদি অন্যতম। আমাদের দেশে তিন ধরনের আগাছা সাধারণত দেখা যায়। এগুলো হলো ঘাসজাতীয়, মুথাজাতীয় ও চওড়া পাতাজাতীয়। আগাছা দমনের বেশ কয়েকটি পদ্ধতি আছে, এসব পদ্ধতির অন্যতম হচ্ছে পরিচর্যা পদ্ধতি। জমি ফেলে না রেখে খুরপি দিয়ে আগাছা পরিস্কার, জমি ভালো রাখার অন্যতম প্রাচীন উপায়। লাঙল, হুইল, উইডার, কাল্টিভেটর যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষতিকর আগাছা মাটিতে মিশিয়ে দেওয়াও অন্য আর একরকম পদ্ধতি।

রাসায়নিক দিয়ে আগাছা দমন ঃ রাসায়নিক দিয়েও সহজে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফসল অনুযায়ী সঠিক মাত্রায়

রাসায়নিক প্রয়োগ করলে আগাছা দমন ঘটানো সম্ভব। তবে নিয়ম না মেনে রাসায়নিক প্রয়োগে ক্ষেতের মাটি থেকে শুরু করে, পশু–পাখি, এমনকী মানুষের সমূহ বিপদের আশঙ্কা থাকে। নির্বাচিত আগাছানাশক প্রয়োগ করলে নির্দিষ্ট কিছু আগাছাকে মেরে দেয়। আগাছানাশক গুঁড়ো বা তরল দুই রকমের হয়। বালি বা জল মিশিয়েই এই আগাছানাশক ক্ষেতে প্রয়োগ করা উচিত। মূলত বীজ বোনার আগে, বীজ বোনার পর এবং আগাছা জন্মানোর পর—এই তিন সময়ে আলাদা আলাদা–ভাবে আগাছা নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা যায়।

চাষ যখন অন্য পথে

বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে চাষের জমির পরিমাণ কমেছে। একদিকে যেমন জনসংখ্যা বাড়ছে, তেমনি প্রয়োজন হচ্ছে অতিরিক্ত খাদ্য। এদিকে কীটনাশক প্রয়োগ করে যে ফসল ফলানো হচ্ছে, তাতে রয়েছে ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা। তাই এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে হাইড্রোপনিক্স চাষাবাদ ভবিষ্যতের দিশারী হয়ে উঠেছে। হাইড্রোপনিক্স একটি অত্যাধুনিক কৃষি পদ্ধতি। অতি লাভজনক ফসলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে মাটির পরিবর্তে জলে গাছের প্রয়োজনীয় খাবার সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন করা হয়। যেখানে স্বাভাবিক চাষের জমি কম, সেখানে বাড়ির ছাদ, উঠোন, পলি টানেল এবং নেট হাউসে হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে সবজি ও ফল উৎপাদন হয়। এই পদ্ধতিতে চাষের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, সারা বছরই চাষ করা যায় এবং উৎপাদিত ফসলে কোনো কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না। সর্বোপরি, মাটি ছাড়াই ফসল উৎপাদন করে খাদ্যের চাহিদা পূরণ করা যায়। হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতি হচ্ছে মাটিবিহীন ফসল ও সবজি চাষের পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মূল নীতি হলো, গাছের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান জলের মধ্যে সরবরাহ করে প্লাস্টিকের ট্রে, বালতি বা বোতলে ফসল উৎপাদন করা। প্রায় সব শাকসবজি ও ফলমূল হাইড্রোপনিক্স পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। যেমন সবজির মধ্যে আছে লেটুস, গিমা, কলমি, ধনেপাতা, বাঁধাকপি, শসা, মেলন, স্কোয়াশ ইত্যাদি। ফলের মধ্যে রয়েছে স্ট্রবেরীর চাষ। তাছাড়া ফুল চাষও সম্ভব, যেমন গাঁদা, গোলাপ, অর্কিড, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি।
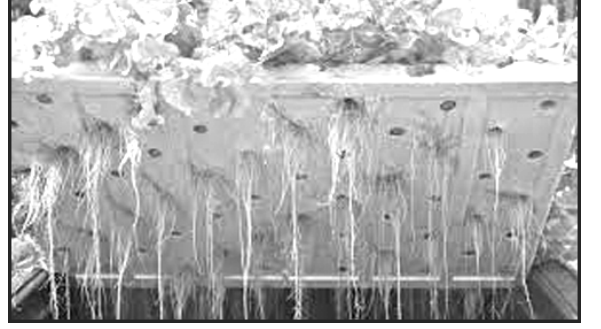
উন্নত পদ্ধতিতে মাসকলাই চাষ

মাসকলাই ভারতীয় উপমহাদেশে সবথেকে বেশি প্রচলিত ডালগুলির মধ্যে অন্যতম। এটি সবুজ সার আচ্ছাদক শস্য এবং পশুখাদ্য হিসেবেও ব্যবহার্য। এর রোগবালাইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ডাউনি মিলডিউ, রাস্ট, পাতার দাগপড়া রোগ এবং শুঁয়োপোকার প্রকোপ। আমাদের দেশে বিভিন্ন জাতের ডাল ফসল চাষ করা হয়। মাসকলাই এই ডাল ফসলের মধ্যে অন্যতম। আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ মাংস থেকে তাদের দেহের জন্য প্রয়োজনীয় আমিষের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। সেক্ষেত্রে মাসকলাই ডাল এসব মানুষের আমিষের ঘাটতি পূরণ করতে পারে।

ডালশস্যটির চাষ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকাল থেকেই চলছে। এটি বনেও জন্মে, তবে এঁটেল মাটিতে ভালো ফলে। খরাসহিষ্ণু এই ডাল বর্ষা ও শীত মরশুমের ফসল। ধানের সঙ্গে কখনো মিশ্রচাষেও এই ফলন ফলানো হয়।

পাত্রেই হবে ড্রাগন ফল

ড্রাগন ফল আপনারা সবাই দেখেছেন। দেখতে যতটা সুন্দর, তত বেশি উপকারী এই ফলটি। ড্রাগন ফলে অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি, প্রোটিন এবং কার্বোহাইড্রেটের ভালো উৎস পাওয়া যায়।

এটি একটি ক্যাকটাস ধরনের উদ্ভিদ। এই কারণে এই গাছপালায় খুব জল প্রয়োজন হয়। বাজারে ড্রাগন ফলের দাম অনেক বেশি। আপনাদের অবগতির জন্য বলে রাখা ভালো ড্রাগন গাছ থেকে ফল পেতে ৪ থেকে ৫ বছর সময় লাগে।

আপনি যদি এই গাছটি আপনার বাড়িতে চাষ করেন, তবে আপনাকে লালমাটি, কোকোপিট, কম্পোস্ট এবং বালি সংগ্রহ করতে হবে। মনে রাখবেন যে, আপনি যদি এই ফলের কাটিং নেন, তবে এটি রোপণের ৪ দিন আগে খোলা রেখে দিন, এতে এটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাবে। তারপর আপনাকে একটি টবে বা পাত্রের মধ্যে গাছ রোপণ করতে হবে। এরপর পাত্রের মাটিতে ভালো করে জল দিতে হবে।

পাত্রে গাছ লাগানোর পর আপনাকে এটি এমন জায়গায় রাখতে হবে, যেখানে সূর্যের আলো ভালোভাবে পৌঁছায়। ড্রাগন ফল রোদে দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই গাছের মাটি শুকিয়ে গেলেই জল দিতে হবে। যখন গাছ বাড়তে শুরু করে তখন একটি অবলম্বন প্রয়োজন, অতএব পাত্রে একটি লাঠি রাখতে হবে এবং এটির সঙ্গে গাছটি বেঁধে দিতে হবে।

ড্রাগন গাছের যত্ন ঃ ড্রাগন উদ্ভিদের জন্য ১৫-২৪ ইঞ্চি চওড়া এবং ১০-১২ ইঞ্চি গভীর টব/পাত্রগুলি সেরা হিসাবে বিবেচিত হয়। পাত্রে দুটি বা তিনটি গর্ত থাকতে হবে। পিঁপড়া ড্রাগন গাছকে আক্রমণ করে, তাই এই সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা উচিত। বাজারে এখন সহজেই জৈব কীটনাশক পাওয়া যায়।

আপনি সহজেই যে-কোনো ঐ-ধরনের পাত্রতে ড্রাগন গাছ চাষ করতে পারেন। এর জন্য ড্রাগন ফল সম্পর্কে সঠিক তথ্য থাকা একান্ত প্রয়োজন।

জিরা চাষে লাভ

জিরা এমন একটি ফসল—যা প্রতিটি রান্নাঘরে পাওয়া যায়। এটি মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে, সারা দেশে এর ব্যাপক চাহিদা আছে। আর এ-জন্য এই চাষে কৃষকরা বেশ লাভের মুখ দেখতে পান। জিরা চাষ অন্য সব ধরনের চাষের চেয়ে বেশি লাভজনক, কিন্তু জিরা চাষে আমরা যদি আবহাওয়া, বীজ, সার এবং সেচ সঠিকভাবে না জানি, তাহলে আমাদেরকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।

জিরা চাষের প্রয়োজনীয় মাটি ঃ জৈব পদার্থের ভালো নিষ্কাশন আছে এমন দোঁয়াশ মাটি প্রয়োজন। প্রতি হেক্টরে প্রায় ১২ থেকে ১৬ কেজি জিরা বীজ সাধারণত যথেষ্ট।

আগাছা দমন ঃ জিরা চাষে আগাছা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জিরা চাষের জন্য সাধারণত জিরা লাগানোর ১ মাস ও ২ মাস পর আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থা ঃ বীজ বপনের পর প্রায়ই হালকা সেচের প্রয়োজন হয় এবং দ্বিতীয় সেচ ৭ থেকে ১০ দিন পর দিতে হয়। মাটির ধরন ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে পরবর্তী সেচের সময়।

জিরা কাটা ও ফলন ঃ ফসল কাটার আগে, মাঠ পরিষ্কার করা হয় এবং শুকিয়ে যাওয়া গাছপালা সরিয়ে দেওয়া হয়। কাস্তের সাহায্যে জিরা গাছ কাটা হয়। রোদে শুকানোর জন্য গাছপালা পরিষ্কার মেঝেতে রাখতে হবে। রোদে শুকানোর পর লাঠি হালকা পিটিয়ে গাছ থেকে জিরা আলাদা করা হয়। বর্তমানে চাষীরা এই জিরা চাষে যথেষ্ট আগ্রহী হয়েছেন।
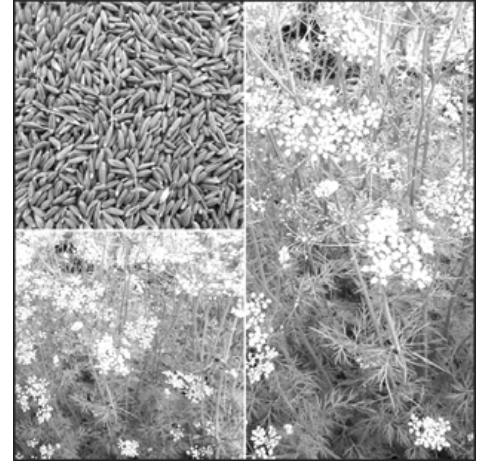
সবেদা চাষে আয় বাড়ান

সবেদা আমাদের সবার কাছে খুবই পরিচিত। সবেদার ফলন যেমন খোলা জমিতে করা যায়, তেমনই খুব সহজে এই গাছ বাড়ির বাগানে বা টবেও করা সম্ভব।

জাত ও মাটি তৈরি পদ্ধতি ঃ সবেদা মূলত দুই ধরনের হয়। গোলাকার এবং ডিম্বাকৃতি। সব ধরনের মাটি সবেদা চাষের জন্য উপযোগী। তবে বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে এই চাষ ভালো হয়, ঘন বৃষ্টিপাত হওয়া অঞ্চলে সবেদা ভালো হয়।

রোপণ ঃ সবেদার বিভিন্ন জাত হয়। তাই জাত ও মাটির প্রকারভেদে সবেদা গাছ রোপণ করা উচিত।

সার প্রয়োগ ঃ সবেদা গাছ লাগানোর ১ বছর পর প্রতি বর্ষার আগে গাছপ্রতি পরিমাণ মতো পচা গোবর সার, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া, ১৫০ গ্রাম টিএসপি, ৫০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট সার হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই ঃ পোকা গাছের পাতা, পাতার বোঁটা, কচি ডগা ও ফলের রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। এরা দুভাবে ক্ষতি করে। প্রথমত রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছের জীবনীশক্তি কমে যায়। দ্বিতীয়ত, রস চুষে খাওয়ার সময় এরা গাছে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ মিশিয়ে দেয়। ফলে আক্রান্ত পাতা, ডগা ও ফলের ওপর হলুদ দাগ দেখা যায়। এজন্য গাছ মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়। এতে সব পাতা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে। পরে গাছ ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরে যায়।

এক বছর সতেজ থাকবে এই আপেল

যুক্তরাষ্ট্রে এক নতুন ধরনের আপেল বিক্রি শুরু হয়েছে—যেটি এক বছর পর্যন্ত সতেজ থাকবে বলে বলা হচ্ছে। দুই দশক ধরে এই আপেলের উপর গবেষণা করার পর আপেলটি ব্যবসায়িকভাবে ওয়াশিংটন রাজ্যের কৃষকদের চাষ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। শুধু ওয়াশিংটনের কৃষকরা আগামী দশ বছর এই জাতের আপেল চাষ করতে পারবে।

১৯৯৭ সালে ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটি গবেষণামূলকভাবে এই আপেলটি প্রথমবার চাষ করে। নতুন ধরনের এই আপেলের চাষ ব্যবসায়িকভাবে শুরু করতে ১ কোটি ডলার খরচ হয়েছে। ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভার্সিটিতে এই আপেলটি চাষ ও বংশবৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা-করা একজন গবেষক কেট ইভান্স জানান, এই আপেল ফ্রিজে থাকলে ১০-১২ মাস পর্যন্ত খাওয়ার যোগ্য থাকে এবং আপেলের স্বাদ এবং অন্যান্য গুণাগুণও অক্ষুণ্ণ থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি আপেল হয় ওয়াশিংটনে। ঐ এলাকায় অন্যতম জনপ্রিয় আপেলের জাত গোল্ডেন ডেলিশাস এবং রেড ডেলিশাস। তবে সম্প্রতি পিঙ্ক লেডি ও রয়্যাল গালা জাতের আপেলও বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। জেনে রাখা ভালো, যুক্তরাষ্ট্রে কলার পর সবচেয়ে বেশি বিক্রি হওয়া ফল হলো আপেল।

ঔষধি গাছ সিঙ্কোনা

সিঙ্কোনা একপ্রকার ঔষধি উদ্ভিদ। এই গাছের শক্ত ছাল থেকে ম্যালেরিয়া রোগের মহৌষধ কুইনিন তৈরি করা হয়। সিঙ্কোনার অনেকগুলি প্রজাতি আছে। এর মধ্যে মাত্র ৪টি প্রজাতি ভারতে চাষ হয় এবং সেগুলির ছাল থেকে ব্যবসাভিত্তিক হিসেবে কুইনিন প্রস্তুত করা হয়। এই গাছ দুর্বল কাণ্ড এবং উচ্চতায় ৪-৫ মিটার হয়। ভারতে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলা ও আসামের খাসিয়া, জয়ন্তী পাহাড়ে, দক্ষিণ ভারত ও মধ্য ভারতের সাতপুরা পর্বতমালায় ব্যাপক চাষ হয়। এই চাষের জন্য সারা বছরই সমানভাবে বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। কাটিং বা কলম থেকে সিঙ্কোনা গাছের বংশবৃদ্ধি করা যায়।

সাদা মাছি নিয়ন্ত্রণ

আমাদের রাজ্যে তথা পূর্বভারতে বেশ কিছু রাজ্যে নারিকেল চাষের ক্ষেত্রে একটি নবতম সংযোজন হলো, নতুন প্রজাতির সাদা মাছি। যাঁরা কৃষিকাজের সাথে যুক্ত অথবা যাঁরা এ বিষয়ে খবরাখবর রাখেন, তাঁদের কাছে সাদা মাছি একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। প্রায় প্রতি বছর এই সাদা মাছির প্রকোপ দেখা যায়। প্রতি বছর এই সাদা মাছির প্রকোপে সবজি চাষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

'হেমিপটেরা' পর্বের এই মাছির সাথে শ্রেণীবিন্যাসগতভাবে 'দয়ে পোকা' এবং 'জাব পোকা'র মিল রয়েছে। এই মাছিও গাছের পাতার নিম্নভাগের রস শুষে খেয়ে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ কৌশল ঃ দেখা গেছে আমাদের দেশীয় অনেক পোকা রয়েছে, যারা প্রাকৃতিকভাবেই এই সাদা মাছিগুলিকে খেয়ে ফেলে। তাই পরোক্ষভাবে এরা আমাদের উপকার করে। আমরা ইচ্ছা করলেই কৃত্রিমভাবে বাগানে এই ধরনের বন্ধু পোকাদের আমদানি করে, এই সাদা মাছির সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। এটি একটি অত্যন্ত সফল পরিবেশ-বান্ধব প্রক্রিয়া।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সাদা মাছি দমন করা যায় ঃ (১) যেসব পাতায় কালো ছোপ রয়েছে, সেখানে ১% স্টার্চের দ্রবণ স্প্রে করতে হবে। স্টার্চ শুকিয়ে গেলে তা পাপড়ের মতো কালো ছোপগুলি সমেত উঠে আসবে। (২) বাগানে প্রতি নারকেল গাছে হলুদ রঙের আঠালো ফাঁদ (sticker) ব্যবহার করতে হবে। যেকোনো নিকটবর্তী সার-কীটনাশকের দোকানে এটি পাওয়া যায়। (৩) বাগানে বন্ধুপোকা নিয়ে আসতে হবে। (৪) অযাচিতভাবে রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। প্রকোপ খুব বেশি হলে পাতায় এবং গাছের কাণ্ডে ০.৫% নিম তেলের মিশ্রণ স্প্রে করতে পারেন।

স্বল্প বিনিয়োগে শোল চাষ

আমাদের দেশীয় মাছগুলির মধ্যে যে বিশেষ কয়েকটি মাছের আস্বাদন ও পুষ্টির যুগলবন্দী ছাড়া সহজপাচ্য পথ্য ও ঔষধিগুণসম্পন্ন খাদ্য হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব আছে, শোল মাছ তাদের মধ্যে অন্যতম। এই মাছটি আরও কয়েকটি গুণের কারণে অন্তত দুটি রাজ্যের সেরা মাছের শিরোপা পেয়েছে। আক্ষেপের বিষয়, আমাদের রাজ্যে এই মাছটি এখনও তেমনভাবে সমাদৃত নয়। বাজারে যেটুকু পাওয়া যায় সবটাই প্রকৃতিজাত। এই মাছটির চাষ পদ্ধতির সরলীকরণ করা না গেলে, আগামী দিনে জোগানে অপ্রতুলতা থেকেই যাবে। সর্বত্রই এই মাছটি জীবন্ত অবস্থাতেই বিক্রি হয়। পুষ্টি এবং একটি মাত্র কাঁটার জন্য সবসময় এই মাছটি এগিয়ে আছে। ফলে শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থ যে-কোনো মানুষ অনায়াসেই খেতে পারবেন কোনো অসুবিধা বোধ না করেই এই পুষ্টিসমৃদ্ধ মাছটিকে।

মাছ চাষের পদ্ধতি ঃ যে-কোনো ধরনের পুকুরে পিট তৈরি করে, পলিথিন চাদর বিছিয়ে ছবিতে দেখানো হয়েছে যেমন তেমনই বৃষ্টির জল ধরে নিয়ে তাতে অন্য পুকুর থেকে প্ল্যাঙ্কটন নেটের সাহায্যে প্রাণীকণা জোগান দিয়ে, অন্য পুকুর বা জলা থেকে অ্যাজোলা পানা ছেড়ে দিয়েও সেই পুকুরে বা পিটেও চাষ করা সম্ভব এই মাছ। ডোবাজাতীয় জলাশয় বা ছোট পুকুর—যেখানে অল্প কচুরীপানা, কলমি/শুষনি/শাপলা আছে, সেখানে এই জাতীয় পোনা প্রাকৃতিকভাবেই পাওয়া যেতে পারে। কোনো প্রণোদিত প্রজননের দরকারই পড়ে না। যদি তা না পাওয়া যায়, যে-কোনো ছোট পুকুর বা বড় পুকুরে বাঁশের/নাইলনের খাঁচা বসিয়ে যেকোনো জলাভূমি থেকে চারা সংগ্রহ করে কিংবা রাজ্যের বিশেষ কয়েকটি মাছের বাজারে সারা বছর অল্পবিস্তর পোনা পাওয়া যায়—যা সংগ্রহ করে এনে চাষ করা সম্ভব।

এই মাছটির দুটি ফুলকা ছাড়াও অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র থাকায় এরা বাড়তি সুবিধা পায়। কম জলেও বেঁচে থাকতে পারে সহজে। যেখানে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকে কম কিংবা কার্বনডাই অক্সাইড ও অ্যামোনিয়া থাকে মাত্রায় বেশি—এই জাতীয় জলাশয়ে জিওল মাছ বা এমন মাছ চাষ সম্ভব নয়। এই মাছ চাষে তাই ঝুঁকি কম, বিনিয়োগের অর্থ, তুলনামূলকভাবে অনেক কম সময়ে লভ্যাংশ-সহ ফেরত পাওয়া যায়। চারা পরিবহনের সুবিধা আছে, মাছ বিক্রয় না হলে ফের তাকে পুকুরজাত করা যায় বলে চাষীর লোকসানের সম্ভাবনা একেবারেই থাকে না।

ছোট অগভীর পুকুর যেখানে তিন চার ফুট জল থাকে, অন্তত চার মাস সেখানেই এই মাছের চাষ সম্ভব। পুকুর প্রস্তুতির জন্য প্রায় কিছুই করতে হয় না। মাঝে মধ্যে জলের পি.এইচ দেখে নিয়ে প্রয়োজনবোধে চুন প্রয়োগ করার দরকার হতে পারে,
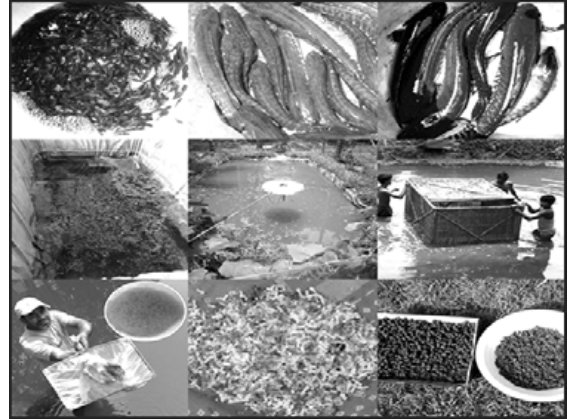
তাও তেমন জরুরী নয়। পুকুরে রাতের দিকে ৩ ওয়াট-এর একটি আলো জ্বালানো থাকলে পোকামাকড়, মশার লার্ভা বাড়তি খাবার হিসাবে পাওয়া সম্ভব। অ্যাকোরিয়ামের দোকান থেকে পাওয়া টিউবিফেক্স বা সরু কেঁচো, পিঁপড়ের ডিম এদের পছন্দের খাবার। বড় অবস্থায় গেঁড়ি বা গুগলির মাংস টুকরো করে সেদ্ধ অবস্থায় ছোট করে জোগান দিলেও খাবার হিসেবে তা ভালো কাজ করে। তবে এই মাছ চাষে জলের গুণমাণ মাঝে মধ্যে দেখে নেওয়া যেতে পারে। অক্সিজেন কম থাকলেও চিন্তা থাকে না, তবে জলের পি.এইচ ৭.৫-৭.৭ থাকা একান্তই দরকার। এর কম পি.এইচ হলে চুন প্রয়োগ এবং পি.এইচ বেশি হলে তেঁতুল গাছের ডাল পাতাসমেত দুদিন রেখে তুলে নিলেই বেশি পি.এইচ স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

খাদ্য প্রয়োগ ঃ শোল মাছ চাষে পরিপূরক খাবার প্রয়োগ একান্ত জরুরী। আগে যেমন বলা হয়েছে, প্রাণীকণার জোগান টিউবিফেক্স কেঁচো খুব কার্যকরী ও পছন্দের খাবার। একটু বড় হলেই কিন্তু পিঁপড়ের ডিম, গুগলি সেদ্ধ দেওয়া যেতে পারে। তার খাবার প্রয়োগের নির্দিষ্ট একটি বা দুটি জায়গা বেছে নিয়ে সেই জায়গা থেকেই দিনে একবার বা দুবার খাবার প্রয়োগ ধৈর্য-সহকারে করতে হবে। রাত্রে বাল্বের আলোর প্রভাবে কিছু কীটপতঙ্গের জোগান বাড়তি খাবার হিসেবে কাজ করে। মশার লার্ভা এদের অত্যন্ত পছন্দের খাবার। তাই যেখানে শোল মাছ চাষ হবে, সেখানে মশার উৎপাত থাকবে না ধরে নেওয়া যায়।

রোগ-বালাইয়ের সংক্রমণ সচরাচর বেশ খানিকটা কম থাকে। তবে পুকুরে বা জলাশয়ে মাসে একদিন করে নিমপাতা, কাঁচা হলুদের সঙ্গে তুলসী পাতা ও রসুনের কোয়া মিশিয়ে জলে প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমনভাবে গ্রীষ্মকালে বাড়িতে তুলসী গাছে সারাদিন ধরে ফোঁটা ফোঁটা করে জল দেওয়া হয়।

এই মাছ সংগ্রহ করা কিছুটা শ্রমসাধ্য হয়। কিন্তু পুকুরে জল কমে গেলে জাল টেনে মাছ ধরার তেমন অসুবিধা হয় না। পরিপূরক খাদ্য তৈরি করতে হলে শুঁটকি মাছের গুঁড়ো, সেদ্ধ করা গম বা খুদের সাথে মিশিয়ে চিটে গুড় ও সাবুর সাহায্যে আঠালো অবস্থায় মেখে নিয়ে পুকুরে রাখা পাইপের মধ্যে দেওয়া যেতে পারে।

একটি তিন কাঠা পুকুর থেকে ৭-৮ মাসের মধ্যে ৪০০-৫০০ গ্রাম ওজন হতে পারে একটি মাছের। এর ফলে মাছের উৎপাদন ৫০০ কেজি সহজেই সম্ভব। আর্থিক দিক থেকে এই মাছ চাষ অত্যন্ত লাভজনক।

কৃষি সমস্যা সমাধানে বায়োডায়নামিক চাষাবাদ

সম্ভবত ভারতই একমাত্র দেশ, যেখানে শত শত বছর ধরে চালু আছে জৈব চাষ। মাঝে এই পদ্ধতিকে পুরোনো বলা হলেও সারা বিশ্বেই এখন জৈব পদ্ধতির জয়জয়কার। অবশ্য জার্মানিতে এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু হয়েছে ৯০ বছর আগে।

২৯ বছর বয়সী নাসারি চাভান একজন আদিবাসী কৃষক। নাসারি যখন চাষের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন, তখন তাঁদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। এলাকার অন্যান্যদের মতো তাঁদের পরিবারও ধুঁকছিল ঋণের চাপে। SARG বিকাশ সমিতি নামের একটি বেসরকারি সংস্থা, যারা ভারতে বায়োডায়নামিক চাষাবাদ প্রবর্তনে কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের একটি ওয়ার্কশপে সাত বছর প্রশিক্ষণ নেন নাসারি। এরপরই কীটনাশক ও ক্ষতিকর সারের ব্যবহার জমির যে ক্ষতি করেছিল, জৈব সারের ব্যবহারের ফলে, তা পুষিয়ে নিয়ে আবার উর্বর হয়ে উঠতে শুরু করেছে জমি। পরিবারকে ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করে লাভের মুখ দেখেছেন নাসারি। এখন ঐ এলাকায় তিনি আর একা নন। আরো ৫০০ জন চাষী এখন জমিতে জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন।

বায়োডায়নামিক চাষাবাদ আমাদের খরচ বাঁচায়, যেহেতু বাইরে থেকে আমাদের কিছুই কিনতে হয় না। সেই সঙ্গে এতে করে স্বাস্থ্যকর খাবারও খেতে পারি আমরা। বায়োডায়নামিক ও অরগ্যানিক কৃষক ও গবেষকদের সাথে নিজের ভাবনা ভাগাভাগি করে নেন নাসারি। বায়োডায়নামিক চাষ পদ্ধতি আলাদা করে সার দেওয়ার উপর নির্ভর না করে, জমির নিজস্ব বায়ু সংস্থানের উপর নির্ভর করে। ফলে বাড়তি কিছু কেনার প্রয়োজন হয় না।

প্রাচীন ভারতের চাষাবাদ পদ্ধতির সাথে এর মিল রয়েছে প্রচুর। যেমন এ পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে গরু। গরুর বর্জ্য ব্যবহার করেই ভারতে বায়োডায়নামিক পদ্ধতিতে চাষ দেখেছে সফলতার মুখ। তবে কিছু নতুন জিনিসও রয়েছে। যেমন শীতের সময় গরুর বর্জ্য ব্যবহার করে যে সার হয়, সেটাই গরুর শিং-এর সাহায্যে মাটিতে পুতে দিলে মাটি পুনরুজ্জীবন লাভ করে।

ভারতের নানা অঞ্চলের কৃষকরা বায়োডায়নামিক পদ্ধতি ব্যবহার করে চাষাবাদের ফলে তাঁদের ভাগ্যের যে পরিবর্তন হয়েছে, তার জ্বলন্ত উদাহরণ রয়েছে। তামিলনাড়ুর দক্ষিণভাগে খরাক্রান্ত এলাকায় এই বায়োডায়নামিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে সাফল্য আসে। যদিও কেবল এ পদ্ধতি ব্যবহার করেই ভারতের কৃষি সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়, তবুও এর মাধ্যমে ক্ষতিকর কীটনাশকের অতিব্যবহার বন্ধ করা সম্ভব। বায়োডায়নামিক পদ্ধতিতে চাষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে শহুরে কৃষকদের কাছেও।

রাজধানীর অদূরে শিল্প শহর হিসেবে খ্যাত নয়ডায় একটি বায়োডায়নামিক ফার্ম রয়েছে, যারা যৌথ খামারের ধারণাকে কাজে লাগিয়ে চাষাবাদ করছে।

খরিফ ধানের জন্য জমি প্রস্তুত

খরিফ ধানের জন্য উচ্চফলনশীল জাত সংগ্রহ করতে হবে এবং খরিফ ধানের জন্য জমি প্রস্তুত এখন থেকেই শুরু করতে হবে।

বীজ শোধন ঃ বীজ শোধন হতে পারে দুটি উপায়ে—শুকনো বীজ শোধন এবং ভিজিয়ে রাখা বীজ শোধন। কার্বেনডাজিম ৫০%-এর সঙ্গে ম্যানকোজেব ৫০% মিশ্রণ করে, প্রতি ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে ১ কেজি বীজ ভিজিয়ে রাখুন ৮-১০ ঘণ্টার জন্য। এরপর বীজ ছায়ায় শুকিয়ে নিতে হবে। জৈব ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি ছত্রাকনাশক মেশানো যেতে পারে বীজ শোধন করার জন্য প্রতি কেজি বীজের সঙ্গে ৪ গ্রাম।

জমি নির্বাচন ঃ জমি উর্বর হলে ভালো হয়। জমির কাছাকাছি জল পর্যাপ্ত রয়েছে কিনা দেখতে হবে। জমির চেয়ে একটু উঁচুতে আশপাশের জমি আমন ধানের জন্য আদর্শ।

বীজতলার আকার ঃ সাধারণত মোট চাষযোগ্য জমির এক দশমাংশ জমি হবে বীজতলা (অর্থাৎ ২ কাঠা এক বিঘা জমির জন্য)। পাতলাভাবে যদি বীজ বপন করা হয় তাহলে চারা সুস্থ, শক্তিশালী এবং পুরু হবে।

বীজের হার ঃ এক বিঘা চাষযোগ্য জমির জন্য ৪-৫ কেজি শোধিত বীজ বপন করতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ খরিফ ধানের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জৈব সার ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়, সাধারণত ২ কাঠা বীজতলার জন্য ২০০ কেজি পচনশীল গোবর সার, ১-১.৫ কেজি ইউরিয়া, ২ কেজি সিঙ্গেল সুপার ফসফেট এবং ৫০০ গ্রাম মিউরেট অফ পটাশ দিতে হবে। প্রতি কাঠা জমিতে রোপণের আগে ৬৫০ গ্রাম ইউরিয়া এক সপ্তাহ আগে প্রয়োগ করা উচিত।

রোদের তাপে আমের উৎপাদনে হ্রাস

তীব্র তাপের ঢেউ গ্রাস করেছে ভারতকে। গত ১২২ বছরে, ২০২২ সালের মার্চ মাসে রেকর্ড করা সবচেয়ে উষ্ণ মাস। এ বছর আমের উৎপাদন কমবে এবং আমের দাম যে বাড়বে তার আগাম আভাস দিয়েছিলেন কৃষিবিদরা। গত মার্চ মাসে হঠাৎ করে চরম তাপপ্রবাহ শুরু হয়, তখন আমের প্রচুর মুকুল ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা সহ্য করতে পারেনি। প্রচণ্ড গরমের পর গাছে থাকা আমের মুকুল শুকিয়ে যায়। খারাপ আবহাওয়ায় ক্রমবর্ধমান তাপ সব ফুল নষ্ট করে দেয়।

যেহেতু ভারত বিশ্বের বৃহত্তম আম উৎপাদনকারী দেশ, তাই এর প্রভাব আন্তর্জাতিক হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। এখানে প্রায় এক হাজার প্রজাতির আম জন্মে। কিন্তু বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয় মাত্র ৩০টি।

বিদেশ মন্ত্রকের মতে, ভারত বিশ্বের মোট আমের প্রায় অর্ধেক উৎপন্ন করে। মহারাষ্ট্রের আলফোনসো আম দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় রপ্তানি আম, অন্যান্য জনপ্রিয় জাতগুলির মধ্যে রয়েছে সিজার, ল্যাংড়া এবং চৌসা।

তবে কৃষিবিজ্ঞানীদের মতে, কীটনাশক ব্যবহারের ফলে আমের ফলন অনেক কমেছে। তাই কৃষিবিদরা মনে করছেন, কীটনাশকের ব্যবহার পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

স্বাস্থ্য থেকে সুস্বাদের ভাণ্ডার জৈব গুড়

গুড় ভারতীয়দের পছন্দের খাবারের মধ্যে অন্যতম। তবে প্রায় এমন হয়, যেখানে কৃষকরা কঠোর পরিশ্রম করে চাষ করেও সঠিক দাম পান না। এই পরিস্থিতিতে জৈব গুড় তাদের জন্য খুব ভালো বিকল্প হতে পারে।

কিছু কৃষক তাঁদের চাষাবাদ পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন আনছেন। তাঁরা এখন প্রচলিত চাষ পদ্ধতি ছেড়ে নতুন কিছু উদ্ভাবনে মন দিয়েছেন। তাঁরা শুধু ভালো মানসম্পন্ন গুড় তৈরিই করছেন না, ভালো দামে বিক্রি করে লাভও করছেন। কম খরচে বেশি লাভ পাওয়ার জৈব গুড় কৃষকদের জন্য আশীর্বাদে পরিণত হয়েছে। এক কুইন্টাল আখ থেকে ১৩ কেজি জৈব গুড় তৈরি হয়। কিছু কৃষক এই গুড়ের মধ্যে গুজবেরি, মটল, পুদিনা, আদা, শুকনো আদা জাতীয় অনেক কিছু রাখেন, যার ফলে এর গুণমান আরও বৃদ্ধি পায়।

এইভাবে গুড় তৈরি করতে হলে একটি ক্রাশিং মেশিন বসাতে ১০ লাখ টাকা খরচ হয়। এটি অনেক কৃষক একসাথে কিনতে না পারলেও ঋণ নিয়ে করতে পারেন। এককালীন বিনিয়োগ ভবিষ্যতের রিটার্ন নিশ্চিত করতে পারে। বর্তমানে চিনিকলের কাছে আখ বিক্রি না করে কৃষকরা জৈব গুড় তৈরি করে সারা দেশে সরবরাহ করে ভালো লাভ করছেন। এতে তাঁরা মিলের কাছে আখ বিক্রি না করে দ্বিগুণ লাভ পাচ্ছেন।

জৈব গুড় তৈরির প্রক্রিয়া ঃ আখের রস একটি বড় প্যানে ঢেলে দেওয়া হয়—যেখানে প্রায় ৪০০-৫০০ লিটার আখের রস নেড়ে রান্না করা হয়। আখের রস ফুটিয়ে খুব অল্প পরিমাণে বেকিং সোডা যোগ করে পরিষ্কার করা হয়, যাতে সমস্ত অমেধ্য বেরিয়ে আসে। এরপর এটি ফিল্টার করা হয় এবং অবশিষ্ট অমেধ্যগুলি সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এটি কড়ায় বা প্যানে দ্রুত নাড়তে হবে। দুই ঘণ্টা নাড়াচাড়া করার পরে, অবশিষ্ট অমেধ্যগুলিও সরানো হয় এবং তারপরে ঘনীভূত রস একটি শুকনো প্যানে ঢেলে দেওয়া হয়। তারপরে এটিকে আগুনে দ্রুত নাড়তে হবে, যতক্ষণ না এটি সম্পূর্ণ ঘন হয়ে যায়। পুরুষরা দক্ষতার সাথে তরলটি নাড়াচাড়া করে, ফলে এটি পুড়ে যায় না। এরপর একটি বড় ফ্ল্যাট মই দিয়ে ঘন তরলটি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। এটি চলতে থাকে যতক্ষণ না ঘন তরল পাউডারের সামঞ্জস্যে পৌঁছায়। সঠিক সামঞ্জস্য পেতে তাঁরা সামান্য প্রাকৃতিক চুন এবং সামান্য জৈব নারকেল যোগ করেন।

এইভাবে স্বাস্থ্যকর জৈব গুড় তৈরি করা হয়—যাতে কোনও ক্ষতিকারক রাসায়নিক থাকে না এবং যেটুকু উপস্থিত থাকে, যা প্রায়শই পরিশোধন প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যায়। এ কারণেই আজকাল দেশ-বিদেশে জৈব গুড়ের চাহিদা বাড়ছে এবং চাষীরা তা থেকে প্রচুর মুনাফাও করছেন। এই খাঁটি জৈব গুড় ক্ষতিকর ও বিষাক্ত রাসায়নিক মুক্ত এবং এটি শরীরকে শক্তিশালী করে।

চা-বাগিচায় মাকড় দমন

চা-বাগিচা ও সবজি চাষে মাকড়ের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন দার্জিলিং-তরাই-ডুয়ার্সের চাষীরা। মাকড়েরা ডিম পাড়ে চা-গাছের শিরা-উপশিরায়। এরা পাতার রস খায়, ফলে পাতা কালো হয়ে ঝরে পড়ে। এর উপর আবার রয়েছে ধাড়ি মাকড়ের উৎপাত। কৃষিবিদদের পরামর্শ, প্রতি একরে ৪০০-৫০০ মিলি ফেনাজাকুইন দিয়ে গাছের পাতায় স্প্রে করলে ধাড়ি মাকড় বিনষ্ট হবে। পাশাপাশি অ্যাজা ১% অথবা ৫% যুক্ত নিমঘটিত কীটনাশক প্রয়োগ করলে চা-বাগিচায় লাল মাকড়ের উপদ্রব বন্ধ হবে। এছাড়াও পোকার উপদ্রব কমাতে যেমন আগাছা পরিষ্কার করতে হবে, তেমনি চা-চাষের জন্য প্রয়োজন ছায়ামুক্ত গাছ, জল, সেচ, রাসায়নিক সার, জীবাণু সার, জৈব সার ও অণুখাদ্য প্রয়োগ এবং উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা।

কাঁকরোলের বাজার ভালো

বর্তমান সময়ে কাঁকরোলের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এই গাছ বাড়িতেও মাচার সাহায্যে করা যায়। এই গাছ একবার লাগালে ৫ মাস ধরে ফসল পাওয়া যায়। অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে কাঁকরোল চাষ ভালো হয়। বীজ বসাবার এক মাস আগে জমিতে লাঙল দিয়ে বিঘা প্রতি ১০-১২ গাড়ি গোবর সার, ২৫ কেজি ইউরিয়া, ৩০ কেজি সুপার ফসফেট ও ২০ কেজি মিউরেট অব পটাশ দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়। এছাড়া ডিএপি, সোনারাজা, সুফলা ইত্যাদি সারও ব্যবহার করা হয় ফলন বাড়ানোর জন্য। কাঁকরোলের বাজার ভালো থাকার জন্য এর আয়ও ভালো হয়।

কাঁঠালি কলা চাষে আয়

কাঁঠালি কলা একটি ভিন্ন প্রজাতির কলা। কাঁচা অবস্থায় এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, আয়রন, ভিটামিন এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থাকে। দেশে তো বটেই, এমনকী বিদেশের বাজারেও পাকা কাঁঠালি কলার চাহিদা ব্যাপক। আবার মার্কিন মুলুকে কাঁচা কাঁঠালি কলার থোড় ও মোচার চাহিদা দিনে দিনে বাড়ছে। বর্তমানে সারা দেশ জুড়ে কাঁঠালি কলার চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পোস্ট সার সহযোগে ইউরিয়া, ফসফেট ও পটাশ সার মিশ্রিত করে এই ফসলের চাহিদা ও ফলন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষীরা লাভের মুখ দেখছেন।
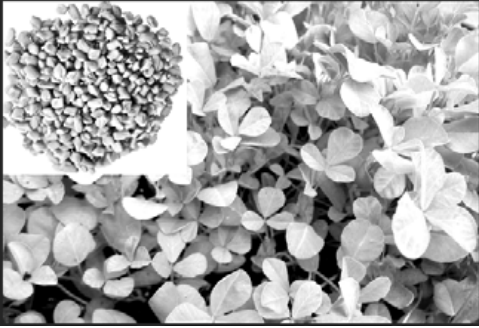
মেথি চাষও লাভজনক

মেথি আশ্বিন-কার্তিক মাসে বোনা হয়। বেলে-দোঁয়াশ মাটি মেথি চাষের জন্য আদর্শ। তবে জলনিকাশি ব্যবস্থাটি ভালো হওয়া দরকার। বীজ বোনার জন্য ৩০ দিন ও ৬০ দিনের মাথায় নিড়ানি দিয়ে আগাছামুক্ত করা দরকার। ২ কেজি করে নাইট্রোজেন চাপান সার হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে ও হালকা সেচ দিতে হবে। মেথিতে রোগপোকার সমস্যা নেই বললেই চলে। বিঘা প্রতি ২০০-২৫০ কেজি ফলন পাওয়া যায়। ফসল তুলতে সময় লাগে ১০০-১২০ দিন।

পপি চাষে আয় বৃদ্ধি

পপি খুব সুন্দর ও সুখী ফুল। এই চাষের পদ্ধতিও খুব সহজ। বেলে-দোঁয়াশ মাটিতে সামান্য গোবর সার মিশিয়ে বীজ পুঁতে দিন। কিছুদিনের মধ্যেই চারা গজিয়ে উঠবে। এই গাছের উচ্চতা দু-ফুটের মতো হয়। এদের কোনও কোনও প্রজাতির পাতায় কাঁটা, পাতা ও ফুলের বোঁটায় রোঁয়া থাকে। এই গাছে বেশি জল দেওয়া যাবে না। শীতকালই পপি চাষের উপযুক্ত সময়।

বিজ্ঞানকে সঙ্গী করে তুলা চাষ

তুলা একটি প্রধান অর্থকরী ফসল। তুলা বর্তমানে দু-রকমভাবে চাষ করেও ভালো ফল পাচ্ছে। কিন্তু ভালো লাভ পাবার জন্য চাষী আমন ধান চাষ করার পরই তুলার চাষ করতে শুরু করেন। এই চাষ মে-জুন মাসের শেষ পর্যন্ত করা যেতে পারে। ২৭°-৩২° তাপমাত্রায় ও ৬০-৭৫ সেন্টিমিটার গড় বৃষ্টিপাত এই চাষের জন্য খুবই প্রয়োজন। প্রতি গাছের থেকে ৪-৫ বার তুলা পাওয়া যায়। এই চাষে বিঘা প্রতি ৪ কুইন্টাল ফসল পাওয়া সম্ভব।

এক সাফল্যের কাহিনী

বর্তমান সময়ে কৃষি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। হ্যাঁ, কৃষকভাইদের কৃষিকাজে যেমন খরচ কম হয়, তেমনি দ্বিগুণ লাভও পাওয়া যায়। উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর জেলায় বসবাসকারী কৃষক ড. কিষাণ রানা এর উদাহরণ, যিনি সরকারি চাকরি না করে ঘরে বসে সবজি চাষ করে ভালো লাভ পেয়েছেন, এবং তিনি একজন সফল কৃষক হিসেবে আমাদের সবার সামনে আবির্ভূত হচ্ছেন।

ড. কিষাণ রানা উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বর জেলার বাসিন্দা। কিষাণ রানা পিএইচডি পড়েছিলেন। এরপর কিষাণ রানাও সরকারি চাকরি করার অনেক সুযোগ পান, কিন্তু কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় কিষাণ রানা চাষবাসকেই জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেন। নিজের গ্রামে এসে প্রগতিশীল সবজি চাষ করে জেলার সুনাম বয়ে এনেছেন তিনি।

ড. কিষাণ রানার প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, সম্প্রতি সবজি হিসেবে কুমড়া চাষ করে প্রায় ১৬ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। কিষাণ রানা বাগান ও সবজি উৎপাদনকে কর্মসংস্থান ও ভালো আয়ের মাধ্যম হিসেবেও বর্ণনা করেছেন।

মাটির বোতলে জল পান

গ্রীষ্মের মৌসুমে মানুষ বিভিন্ন উপায়ে জল সংরক্ষণ করে, যাতে অনেকক্ষণ জল ঠাণ্ডা থাকে। তবে এই আধুনিক যুগেও অনেকে এখনও জল ঠাণ্ডা রাখতে মাটির পাত্র ব্যবহার করেন। বন্ধুরা, আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে মাটির হাঁড়ি দেখেছেন। কিন্তু মাটির তৈরি জলের বোতল দেখেছেন কি?

আপনি জানেন, মৃৎপাত্র দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনই এটি উপকারী। আসলে মাটির পাত্রে জল পান শরীরকে অনেক রোগ থেকে রক্ষা করে। আমরা যদি দীর্ঘ সময় ধরে জল ঠাণ্ডা রাখতে চাই এবং অনেক রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাই, তবে একটি মাটির বোতল আমাদের সবার জন্য ভালো বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হয়।

দাম ঃ মাটির বোতল দেখতে বেশ সুন্দর। যার কারণে বর্তমান সময়ে মানুষ এটি কিনতে খুব পছন্দ করে। এর দামও আমাদের সাধ্যের মধ্যে। ১০০–১৫০ টাকা দামে এই বোতল বাজারে পাওয়া যায়।

মাটির বোতলের সুবিধা ঃ (১) গ্রীষ্মে দীর্ঘ সময় ধরে জল ঠাণ্ডা রাখে। (২) যে কোনো জায়গায় সহজে নিয়ে যাওয়া যায়। (৩) মাটির বোতল অনেক রোগ প্রতিরোধ করে। (৪) প্রাকৃতিকভাবে জল বিশুদ্ধ রাখে। (৫) এটাও দেখা গেছে যে, মাটির পাত্রে জল পান করলে একজন ব্যক্তির হিটস্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। (৬) মাটির বোতলে জল পান করলে মানুষের গলা পরিষ্কার থাকে। এটি দ্রুত ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে।

ক্যান্সারের চিকিৎসায় আয়ুর্বেদ

ক্যান্সার মাত্রেই ভয়াবহ মৃত্যুর থাবা, তবে বর্তমানে এমনটা বলা যাচ্ছে না। বর্তমানে প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসা ক্যান্সারে সফলতার দাবি করছে। ক্যান্সারের চিকিৎসায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বহু মানুষ দাবি করছেন যে, তাঁরা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করে সফল এবং তাঁরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে সুস্থ জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই আগামী দিনে এই সকল চিকিৎসা কেন্দ্রগুলো—যেগুলো চার দশকের বেশি সময় ধরে কাজ করছে, তা আরও ফলপ্রসূ হবে এমনটা আশা রাখছেন বিশেষজ্ঞরা।

অ্যালিজা আর পৃথিবীতে ফিরবে না

মঙ্গলগ্রহে গিয়ে পৃথিবীতে আর ফিরে আসবে না যে মেয়েটি, তিনি হলেন অ্যালিজা কার্সন। নাসার কনিষ্ঠতম সদস্য তিনি। এই মেয়ের আগ্রহ, তৃষ্ণা আর নিষ্ঠা দেখে মাত্র ১১ বছর বয়সে নাসা তাকে মনোনীত করে নেয় এবং ঘোষণা করে যে, সমস্ত অবস্থা অনুকূল হলে, সে হবে ২০৩৩ সালে মঙ্গলে যাওয়া পৃথিবীর প্রথম মানুষ।

এখন তার বয়স ১৭। যেহেতু সে মঙ্গলে গেলে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম, তাই নাসার কাছে সে কোনও যৌনতা, বিয়ে বা সন্তানধারণের নিষেধাজ্ঞা পত্রতে স্বাক্ষর করেছে। ভাবতে অবাক লাগে, মানুষের স্বপ্ন কত বড় হতে পারে।

অ্যালিজা জানে, সে আর ফিরে আসবে না এই পৃথিবীতে, আর মাত্র ১৪–১৫ বছর পরে একমাত্র নিঃসঙ্গ মানুষ হিসেবে কোটি কোটি মাইল দূরের লোহার মরিচায় ঢাকা প্রচণ্ড শীতল নিষ্প্রাণ গ্রহের ক্ষীয়মান নীল নক্ষত্রের নিচে হারিয়ে যাবে। সেই একা হারিয়ে যাওয়া তার কাছে কত বড় আনন্দ। সেই আনন্দের কাছে পৃথিবীর সাজানো সংসার–প্রেম–সন্তানাদি এ–সবের আনন্দ নির্বিঘ্নে বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে।

অ্যালিজা কার্সন আমাদের স্বপ্ন দেখতে শেখায়। সে বলে—'Always follow your dream and don't I let anyone take it from you.'

গোবর থেকে প্রাকৃতিক রঙ তৈরিতে নারীর অবদান

গোবর ব্যবহার করে রঙ তৈরির অভিনব পরীক্ষা করেছেন দুর্গা প্রিয়দর্শিনী। গ্রামাঞ্চলে কৃষকরা কৃষিকাজের পাশাপাশি কৃষি সম্পূরক ব্যবসাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। প্রধানত গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক হারে পশুপালন করা হয়। পশুপালনের মাধ্যমে ডেয়ারি করা হয়। এছাড়া গোবর সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ফসলের বৃদ্ধি এবং মাটির গঠনের জন্য গোবর সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু গোবরে এমন একটি ব্যবহার আছে তা অনেকে জানে না। দুর্গা প্রিয়দর্শিনী নামের এক নারী এমন এক অনন্য ব্যবহার অর্জন করেছেন যে, তা নিয়ে সর্বত্র আলোচনা চলছে। গোবর ব্যবহার করে রঙ তৈরির অভিনব পরীক্ষা করেছেন এই নারী।

দুর্গা একজন সাধারণ গৃহবধূ। তবে কৃষিকাজে তার বরাবরই আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে দুগ্ধ ব্যবসায়। তিনি হরিয়ানার ঝাজ্জার গ্রামে পশুপালন শিখতে যেতেন। তিনি ইন্টারনেটে গোবর থেকে রঙ তৈরির একটি ভিডিও দেখেন। এরপর তিনি পুরোপুরি নিজেকে চিত্রকলায় নিয়োজিত করেন। কীভাবে দুর্গা এই কাজ করছেন তা নিচে বর্ণিত হলো ঃ

গোবর থেকে রঙ তৈরি ঃ প্রথমে গোবর জলে মিশিয়ে নিতে হবে। তারপর এটিকে ট্রিপল ডিস্ক রিফাইনারিতে নিক্ষেপ করে শক্ত করা হয়। এটিতে এরপর ক্যালসিয়াম যোগ করে ইমালসন এবং ডিস্টেম্পার তৈরি করা হয়। এই পেইন্ট তৈরিতে প্রায় ৩০ শতাংশ গোবর ব্যবহার করা হয়। এই রঙ—আসল রঙের সাথে প্রাকৃতিক রঙ মিশ্রিত করে সম্পূর্ণ অর্গানিক হয়ে যায়।

দুর্গা প্রিয়দর্শিনী জৈব রঙ সম্পর্কে আরও বেশি মানুষকে সচেতন করতে চান। এই প্রাকৃতিক রঙের বাজারজাতকরণের জন্য দুর্গা নিজেই কঠোর পরিশ্রম করছেন। ওড়িশা সহ ছত্রিশগড়ের কয়েকটি শহরে দুর্গা বিপণন শুরু করেছেন। পেইন্টের উপকারিতা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে তাঁরা কলেজ এবং সেমিনারেও যাচ্ছেন। একজন সাধারণ নারীর এই অস্বাভাবিক গল্প সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।

বাংলায় হচ্ছে বুলেট

বুলেট এই নামটা শুনে অনেকেই বোধহয় চমকে যাচ্ছেন। আসলে বুলেট আর কিছুই নয়, একপ্রকার লঙ্কা। তবে দেখতে একে লঙ্কার মতো হলেও এটি লম্বাটে নয়, বরং অনেকটাই বেঁটে আকৃতির। আকারেও অন্যান্য লঙ্কার থেকে অনেকটা মোটা। এই লঙ্কারই পোশাকি নাম বুলেট। চাষীরা আবার একে ডাকেন হাইব্রিড বুলেট বলে। স্বাদে ও ঝাঁঝে বুলেটের মতোই। ক্যাপসিকামের ক্ষুদ্র সংস্করণ ও সাধারণ বুলেট লঙ্কার থেকে সামান্য বড় এই লঙ্কার কদর বাড়ছে দেশ ছাড়িয়ে ভিন্ন দেশেও। তাই বর্তমানে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ভাঙড়ের বিঘের পর বিঘে জমিতে অধিক ফলন ও উপযুক্ত লাভের আশায় হাইব্রিড বুলেটের চাষ হচ্ছে রমরমিয়ে।

কাঁকড়ার আস্তানা তৈরি সুন্দরবনে

প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে ও মানুষের জীবন-জীবিকার সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই সুন্দরবনে সরকারি সহায়তায় গড়ে উঠেছে কাঁকড়ার খামার। দেশ ও বিদেশের বাজারে কাঁকড়ার চাহিদা থাকায়, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে চাষীরা লাভের মুখ দেখবেন বলে বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস।

সুন্দরবনের প্রায় ২-৩ লক্ষ মানুষ নোনা নদী ও খাঁড়ি থেকে মাছের মীন ও কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। এতে তাঁদের অনেক সময়ই বিষাক্ত সাপ ও কুমিরের আক্রমণের মুখে পড়ে জীবন হারাতে হয়। অন্যদিকে নির্বিচারে মীন ধরে নেওয়ার ফলে দেখা গেছে, অনেক প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্তির পথে।

এই বিষয়টি সমাধান করতে এগিয়ে এসেছে পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা বিষয়টি সম্পর্কে একটা ধারণা দিয়েছেন। তাঁদের কথায়, এই খামার তৈরি করতে ১ হেক্টরের নোনাপুকুর হলেই হবে। তবে পুকুরের সঙ্গে নোনা নদী বা খামারের সংযোগ থাকতে হবে। কুচো কাঁকড়া বা বীজ কাঁকড়া সংগ্রহ করতে হবে দক্ষিণ ভারত থেকে। বীজে রোগের সম্ভাবনা যাতে না থাকে, তাই বীজগুলি শোধন করে নিতে হবে মিথিলিন ব্লু ও ফরমালিন দিয়ে। কাঁকড়ার খাদ্য হিসাবে দিতে হবে ঝিনুক, ছোট মাছ, শামুক ইত্যাদি। পাশাপাশি গরু-ছাগলের টুকরো মাংস দেওয়া যেতে পারে। কাঁকড়াগুলির পালানো বন্ধ করতে পুকুরের পাড়ে দিতে হবে নাইলনের জাল, বাঁশের বেড়া। কাঁকড়াগুলি ৪০০-৫০০ গ্রাম ওজনের হলে তা বিক্রয়যোগ্য বলে গণ্য করা উচিত মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

ফল-সবজি বাগানেও আয় সন্তোষজনক

গ্রামের যেসব চাষীর পরিবারের মধ্যে চাষের কোনো নিজস্ব জমি নেই, অন্যের জমিতে ভাগে চাষ করে তাঁরা দিন কাটান, সে সব পরিবারের সদস্যরা বাড়িতে ফাঁকা জায়গাকে কাজে লাগিয়ে ফলের গাছ যেমন কলা, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, দু-একটি সবজি—যেমন বেগুন, লাউ, কুমড়ো, কাঁচালঙ্কার গাছ লাগাতে পারেন। এতে পরিবারের ফল ও সবজির চাহিদা যেমন কিছুটা হলেও মিটবে, তেমনই বাড়তি ফল ও সবজি বিক্রি করে পরিবারগুলি কিছু টাকা আয়ও করতে পারেন। এছাড়াও বাড়ির আশেপাশে, খোলা জায়গায় গাছপালা লাগিয়ে কিছু রোজগার করা সম্ভব।

ভরসার আর এক নাম—'সুধা'

আমন ধান চাষে কৃষকদের ভরসা জোগাতে পারে সুনিশ্চিত ধান চাষ বা **'সুধা' পদ্ধতি**—এমনটাই জানিয়েছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, আমন ধান পুরোপুরি বৃষ্টি নির্ভর চাষ। কিন্তু প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা ক্রমেই বাড়ছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে বীজতলার ২৫-৩০ দিনের বেশি চারা রাখা যাবে না। স্বাভাবিকভাবে বৃষ্টি হোক বা না হোক, বীজতলা থেকে চারা তুলে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়। কিন্তু সুধা পদ্ধতিতে ৬০ দিন পর্যন্ত বীজতলায় ধানের চারা রাখা যায়। ফলে বৃষ্টিপাত দেখে সুবিধামতো কৃষক মূল জমিতে চারা রোপণের অনেক সময় পান। বিশেষ করে লালমাটির জেলাগুলিতে এই পদ্ধতি সম্ভাবনাময়।

আইস কিউব ব্যবসায় বেজায় লাভ

প্রচণ্ড গরমের পরিপ্রেক্ষিতে আজকাল আইস কিউবের চাহিদা অনেক বেশি। আইস কিউব বাড়ি থেকে জুসের দোকান, বিয়েবাড়ি থেকে শুরু করে প্রায় সর্বত্রই এর ব্যবহার রয়েছে। তাহলে এখন নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন এই ব্যবসা কতটা লাভ দিতে পারে।

আইস কিউব ব্যবসা শুরু করার জন্য প্রথমে কাছাকাছি প্রশাসনিক অফিসে নিজের ব্যবসা নিবন্ধীকরণ করতে হবে। এই ব্যবসা শুরু করার জন্য একটি ফ্রিজার প্রয়োজন। দ্বিতীয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি হলো, বিশুদ্ধ জল এবং বিদ্যুৎ। এই ফ্রিজারটি যেকোনো জায়গায় রাখা যেতে পারে।

প্রাথমিকভাবে এই ব্যবসা শুরু করতে লাগে আনুমানিক ১ লাখ টাকা। এর জন্য ব্যবহৃত ডিপ ফ্রিজারের দাম ৫০,০০০ টাকা থেকে শুরু হয়। **এই ব্যবসা থেকে কত লাভ হবে ঃ** নিয়মিত এই ব্যবসা করে মাসে ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত মুনাফা পেতে পারেন। ঋতুর উপর নির্ভর করে ক্রমবর্ধমান চাহিদার মধ্যে আপনি ৫০,০০০ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা পেতে পারেন।

বরফের টুকরোর চাহিদা শুধু গ্রীষ্মেই বাজারে থাকে না, বাকি মৌসুমে চাহিদা কিছুটা কম হলেও প্রতি মৌসুমেই থাকে। যেহেতু এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী ব্যবসা, তাই এটি আপনাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য লাভ দেবে। এই ব্যবসা নতুন শুরু করার জন্য সরকার ভর্তুকিও দেবে বলে জানা গেছে।
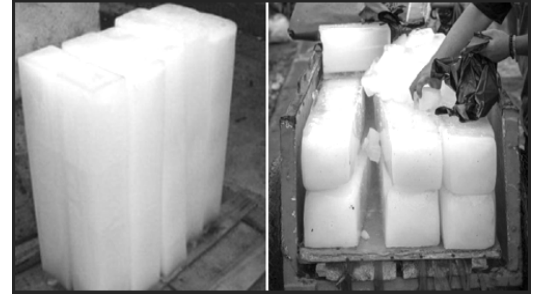
খরিফ ফসলের MSP বৃদ্ধি

সরকার কৃষকদের সুবিধার জন্য অনেক প্রকল্প চালায়, যার মধ্যে ভর্তুকি সহায়তার পরিমাণ, ঋণ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সরকার MSP (Minimum Support Price) বাড়িয়ে কৃষকদের আরও খুশি করেছে। ৮ জুন ২০২২, কেন্দ্রীয় সরকার খরিফ মরশুমের জন্য ন্যূনতম সমর্থন মূল্য (MSP) বাড়ানোর অনুমোদন দিয়েছে।

MSP কি? MSP অর্থাৎ ন্যূনতম সমর্থন মূল্য হলো, শস্য বপনের আগে সেই শস্যের দামের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত গ্যারান্টি। কৃষকরা যখন ফসল উৎপাদন করে, তখন আবহাওয়া, বৃষ্টির কারণে ফসলের ওঠানামা হয়, যা দামেও প্রভাব ফেলে। MSP-এর সুবিধা পান কৃষকরা। যদি কোনো কারণে বাজারে শস্যের দাম কম থাকে, তাহলে কৃষকদের চিন্তা করতে হবে না। কারণ সরকার তাদের ফসল পূর্বনির্ধারিত মূল্যে (MSP) কিনবে, এতে কৃষকদের কোনো ক্ষতি হবে না।

কোন ফসলের MSP পাওয়া যায়? ধান, গম, বাজরা, ভুট্টা, জোয়ার, রাগি এবং বার্লি অন্তর্ভুক্ত ৭টি খাদ্যশস্যের উপর সরকার কর্তৃক MSP নির্ধারণ করা হয়েছে, এছাড়াও ৫ জাতের ডালের মধ্যে রয়েছে ছোলা, তুর, মুগ, উরদ, মসুর ইত্যাদি। সয়াবিন, সরিষা, সূর্যমুখী, তিল, আখ, তুলা, পাট এবং নারকেল এই-জাতীয় তৈলবীজের উপর MSP নির্ধারণ করা হয়েছে।

গবাদি পশুদের পুষ্টির জন্য 'ইউরিয়া গুড়ের ব্লক'

আমাদের দেশে গবাদি পশুরা নিম্ন গুণমান খাদ্যের উপর নির্ভরশীল—যাতে প্রোটিনের মাত্রা খুবই কম। এর ফলে গবাদি পশুদের বৃদ্ধি ও প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন খরা ও বন্যার ফলেও গবাদি পশুদের খাদ্যের অভাব দেখা যেতে পারে। এমতাবস্থায় চাষীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। এই অবস্থা থেকে চাষী ও গবাদি পশুদের রক্ষার জন্য 'ইউরিয়া মোলাসেস ব্লক (UMB)' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

UMB কী জাতীয় খাদ্য ঃ UMB হলো এক উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার—যা পশুদের পাকস্থলীতে উপস্থিত রুমেন জাতীয় অণুজীবকে নন-প্রোটিন নাইট্রোজেন সরবরাহ করে। গবাধি পশুদের পৌষ্টিকতন্ত্রে এই রুমেন অণুজীব নন-প্রোটিন নাইট্রোজেন থেকে প্রোটিন প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ফলে গবাদি পশুদের বৃদ্ধি ও দুগ্ধ উৎপাদন বেড়ে যায়।

UMB-তে উপস্থিত প্রয়োজনীয় খনিজ ভিটামিন, লবণ, গবাদি পশুদের ভালো স্বাস্থ্য রক্ষা এবং উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। UMB-তে উপস্থিত গুড়, বিভিন্ন খনিজ ও অন্যান্য মৌল গবাদি পশুদের শক্তির উৎস। এর মিষ্টি স্বাদ ও গন্ধ আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু।

UMB কীভাবে ব্যবহার করবেন ঃ ১) তৃণভোজী/গবাদি প্রাণিদের জন্যই শুধু এই ব্যবহার করা উচিত। ২) ৬ মাসের ঊর্ধ্বে গবাদি পশুদের এটা দেওয়া যেতে পারে। ৩) খালি পেটে এই খাবার কখনো দেওয়া উচিত নয়। ঘাস বা খড় জাতীয় খাবারের পরে এটা খাওয়ানো যেতে পারে। ৪) ভেড়া, ছাগল জাতীয় ছোট প্রাণীদের জন্য দিনে ১০০ গ্রামের বেশি এই খাবার দেওয়া যাবে না। ৫ কেজির ব্লককে ছাগল/ভেড়াকে তিন সপ্তাহ ধরে খাওয়ানো যেতে পারে। ৫) ২০০ কেজি ওজনের একটি গরুর জন্য ৫ কেজির ব্লক এক সপ্তাহ ধরে খাওয়ানো যেতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ একটা জিনিস জেনে রাখা উচিত, UMB কখনো মূল খাদ্য নয়, এটি একটি পরিপূরক খাদ্য। এই খাদ্য বাচ্চা পশুদের দেওয়া উচিত নয়। এছাড়াও এটি কখনো গুঁড়ো করে বা ভিজিয়ে খাওয়ানো যাবে না।

লাল সিন্ধি গরু

লাল সিন্ধি গরু একটি জনপ্রিয় দুধেল জাত। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে এই জাতটির উৎপত্তি। এই জাতের প্রাণিগুলো বিশাল এবং তাপ সহনশীল। এই জাতের গাভী ভালো দুধদাতা এবং তাদের দুধের সম্ভাবনা সাহিওয়াল জাতের সাথে তুলনীয়। রেড সিন্ধি জাতটি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, শ্রীলঙ্কাসহ ২০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়। ভারতে শাবকটিকে বিপন্ন হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কারণ এই জাতের প্রাণী মাঠে পাওয়া যায় না। বর্তমানে এই জাতটি সারা দেশে শুধুমাত্র কয়েকটি সংগঠিত পশুপালনের মধ্যে রাখা হয়।

লাল সিন্ধির শারীরিক বৈশিষ্ট্য ঃ একটি লাল সিন্ধি গরু ১১৬ সেমি লম্বা এবং গড় ওজন ৩৪০ কেজি। ষাঁড়ের উচ্চতা ১৩৪ সেমি এবং গড় ওজন ৪২০ কেজি। এগুলি প্রায়শই লাল রঙের হয়, তবে হলুদ-বাদামী থেকে গাঢ় বাদামী পর্যন্ত হতে পারে। পুরুষ-গরুরা স্ত্রী-গরুদের তুলনায় গাঢ় হয় এবং যখন পরিপক্ক হয়, তখন মাথা, পা এবং লেজের মতো প্রান্তভাগ প্রায় কালো হতে পারে।

লাল সিন্ধি জাতের কার্যকরী বৈশিষ্ট্য ও দুধ উৎপাদন ঃ লাল সিন্ধি গাভীর দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয় গবাদি পশুদের মধ্যে সবচেয়ে সাশ্রয়ী দুধ উৎপাদনকারী। ক) এই জাতটি **রে করাচি, সিন্ধি** এবং **মাহি** নামেও পরিচিত। খ) করাচি এবং হায়দ্রাবাদ অবিভক্ত ভারতীয় অঞ্চলে উদ্ভূত, এবং আমাদের দেশে কিছু সংগঠিত খামারে লালন-পালন করা হয়।
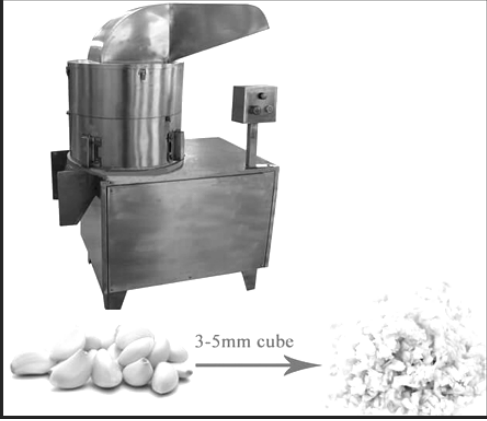
রসুন কাটার মেশিনে বহুমুখী সাশ্রয়

আমাদের দেশে অনেকেই কৃষিকাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে, কিন্তু কৃষিকাজ আমাদের সকলের মতো সহজ কাজ নয়। ফসল বপন থেকে শুরু করে ফসল তোলা পর্যন্ত অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে হয়।

রসুন এবং পেঁয়াজ—ফসল প্রস্তুত, এই ফসল কাটা এবং গ্রেডিং অনেক শ্রম লাগে এবং একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। রসুন ও পেঁয়াজ কাটার সময় অনেকের আঙুল কেটে যায়। এটি থেকে বাঁচতে ধুলের বাসিন্দা ২২ বছর বয়সী রবি আধুনিক পদ্ধতিতে একটি মেশিন আবিষ্কার করেছেন। যাতে রসুন ও পেঁয়াজের ডাঁটা সহজেই কাটা যায়।

এই মেশিনের বৈশিষ্ট্য ঃ এই মেশিনে রবি ১২ ভোল্টের ব্যাটারি এবং ৪০০০ আরপিএম ডিসি মোটর, সুইচ, গিয়ারবক্স, আসবাবপত্র এবং লোহার ব্লেড ব্যবহার করেছে। এই মেশিনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ৫০ জন কর্মী এক সঙ্গে কাজ করতে পারেন। দেখা যায়, কৃষকরা কম সময়ে এই মেশিন দিয়ে বেশি কাজ করতে পারেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে কৃষকরা সহজেই কুঁড়ি থেকে ডাঁটা কাটতে পারেন। এক্ষেত্রে রসুনের গুণাগুণ ভালো থাকে—যার কারণে বাজারে রসুনের দাম ভালো পাওয়া যায়। এই মেশিনটি খুবই হালকা হওয়ায় এটিকে যেকোনো জায়গায় বহন করা সহজ। এছাড়াও এটি কৃষকদের জন্য খুবই লাভজনক। এই মেশিনটি তৈরি করতে রবির খরচ হয়েছে প্রায় ৪,৫০০ টাকা।

ভালো ফলনে মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা

জমিকে ভালো উর্বর এবং উৎপাদনশীল করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। চাষে ভালো উৎপাদন পেতে হলে, জমির উর্বরাশক্তিকে সবসময় ভালো অবস্থায় রাখতে হবে। সেই সঙ্গে মাটির স্বাস্থ্যকেও ভালো রাখতে হবে। মাটির স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গেলে নিয়মিত মাটির পরীক্ষা করে গুণাগুণ এবং ঐ মাটিতে গাছের খাদ্যগুলি কী কী পরিমাণ আছে ও মাটির অম্লত্ব, ক্ষারত্ব সংশোধন করে নিতে হবে স্থানীয় কৃষিদপ্তরের সহযোগিতা নিয়ে। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী সঠিক মাত্রায় মাটিতে জৈব সার দিলে মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

কলার সাথে হলুদ চাষ

চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে, ফলে কৃষকদের উৎপাদনেও ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এসবের মাঝেই এই সমস্যা মোকাবিলায় নতুন করে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কির বসবাসকারী কৃষকরা। তাঁরা একই জমিতে অনেক রকমের ফসল লাগিয়ে ভালো লাভ করছেন।

বারাবাঙ্কি জেলায় বসবাসকারী কৃষক অমরেন্দ্র প্রতাপ সহ-ফসল প্রযুক্তিতে চাষ করে লাভবান হয়েছেন। বর্তমানে তিনি কলার পাশাপাশি হলুদ চাষ করছেন। সহ-ফসল চাষে হলুদের ফসল বাড়ানোর ফলে কলার ফসলে কোনো প্রভাব পড়ে না, বরং কলা সাধারণত বড় এবং গুণমানের হয়। হলুদের ফসল এক বছরের এবং কলাও প্রায় ১২ থেকে ১৪ মাসে তৈরি হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, কলা ফসলে হলুদের চাষ খুবই উপকারী। অমরেন্দ্র প্রতাপের সহ-ফসল চাষে অনুপ্রাণিত হয়ে জেলার অন্যান্য কৃষকরাও এই পথে কৃষিকাজ শুরু করেছেন।

কৃষকরা সহ-ফসল চাষ করে আগের থেকে অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করছেন। অমরেন্দ্র কলা, তরমুজ, মাশরুম, ক্যান্টালুপ, হলুদ এবং শসা-সহ প্রায় এক ডজন ফসল চাষ করেন। অমরেন্দ্রের এই অভিনব চাষ পদ্ধতি তাকে সফলতা দিয়েছে।

ফলের বাগানে বাড়বে ফলন

গত কয়েক বছরে কৃষকদের মধ্যে ফলের বাগান করার প্রচলন যথেষ্ট বেড়েছে। সরকারও ক্রমাগত কৃষকদের তা করতে আরো উৎসাহিত করছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফলের বাগান করে চাষীরা খুব অল্প সময়ে বেশি লাভ পেতে পারেন। অনেক রাজ্য সরকার আবার ফলের বাগান স্থাপনের জন্য ভরতুকি প্রদান করে।

ফলের বাগান করতে গেলে চাষীদের মনে রাখতে হবে যে, গাছ ছড়িয়ে পড়ার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দরকার। দোঁয়াশ মাটি ফল বাগানের জন্য সবচেয়ে ভালো। মাটির গভীরে কোনো শক্ত স্তর থাকা উচিত নয়। এছাড়া মাটির মাঝখানে প্রচুর পরিমাণে কম্পোস্ট সার থাকতে হবে।

ফলের বাগান করার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় ঃ একটি ফলের বাগান করতে হলে আগে কীভাবে সেচ দেওয়া হবে, সেদিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। জলের চাপমুক্ত এলাকায় ফোঁটা ফোঁটা সেচ পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত—যা জল ও শ্রম উভয়ই সাশ্রয় করতে এবং প্রয়োজন অনুসারে গাছে যেটুকু জলের প্রয়োজন তা জোগান দিয়ে ফলন বৃদ্ধি পাবে। জুলাই–আগস্ট মাসে সন্ধ্যায় চারা রোপণ শুরু করতে হবে। রোপণের পর সেচ দিতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী জল দিতে হবে। গাছের নীচ থেকে বেরিয়ে আসা শাখা এবং রোগাক্রান্ত শাখাগুলিকে সরিয়ে ফেলতে হবে। এছাড়াও জল নিষ্কাশনের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, গাছের গোড়ায় জল জমে গেলে ফলের মিষ্টতা কমে যায়।

ছাদ–বাগানের মাটি ভালো থাকার পদ্ধতি !

আজকাল অনেকেই বাড়ির ছাদে বাগান করে থাকেন। মূলত শহুরে জীবনে একটু সবুজের ছোঁয়া পেতেই এই চেষ্টা। তাছাড়া জায়গার অভাবে ঝুলবারান্দা কিংবা সামনের এক টুকরো উঠোনে বাগান গড়ে তোলেন অনেকেই।

কিন্তু ছোট জায়গায় বাগান করার অন্যতম সমস্যা হচ্ছে বাগানের মাটি। অথচ মাটি ভালো না হলে ভালো গাছ হওয়া কার্যত অসম্ভব। কিন্তু কিভাবে উর্বর করবেন মাটি? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাটিকে উর্বর করার প্রথম ধাপ হলো মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা, মাটির গঠন ও ধরন বোঝা।

জৈব সার ব্যবহার করুন ঃ মাটির গুণমান উন্নত করতে পাত্রের মাটির সঙ্গে জৈব সার ব্যবহার করতে পারেন। জৈব সার মাটির হিউমাস এবং জল ধারণ করার ক্ষমতা বাড়ায়, এটি উদ্ভিদকে ম্যাক্রো–পুষ্টি প্রদান করে। ভারতে সবচেয়ে সহজলভ্য জৈব সার হলো গোবর সার। সুষম সারকে নাইট্রোজেন–সমৃদ্ধ সারে রূপান্তরিত করতে জলজ–জাতীয় উদ্ভিদের পাতা যোগ করা যেতে পারে।

কম্পোস্ট করার চেষ্টা করুন ঃ প্রায় যে–কোনো জৈব বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করার উপায় হিসেবে কম্পোস্টিং খুবই কার্যকর একটি পদ্ধতি। কম্পোস্টিং–এর সবচেয়ে ভালো দিক, এটি জৈব পদার্থের দ্রবণীয় পুষ্টিকে স্থিতিশীল করে এবং মাটিতে হিউমাস গঠন করে। টবের মাটির উপর কয়েক সেন্টিমিটার পুরু করে এই সার প্রয়োগ করতে হয়।

কেঁচো ঃ এখন মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি–বাদল হচ্ছে। এই ধরনের আবহাওয়াতে কেঁচোর আনাগোনা বেড়ে যায়। তবে এরা বন্ধু প্রাণী। কেঁচো মাটি খুঁড়ে যেমন মাটি উর্বর করে, তেমনই নাইট্রোজেনের জোগান দিয়েও গাছকে পুষ্টি দেয়। তাই কোনো গাছের গোড়ায় যদি দেখেন অনেক কেঁচো জমা হয়েছে, তবে মেরে না ফেলে বরং তাদের তুলে অন্যান্য গাছের টবে সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। এতে করে সব গাছেরই উপকার হবে।

আগাছা দমন ঃ টবের মাটিতে এমনিতেই সীমিত পরিমাপ খনিজ পদার্থ থাকে। তার উপর যদি আগাছা জন্মায়, তবে তা মাটি থেকে পুষ্টি উপাদান শোষণ করে নেয়। এতে উর্বরতা নষ্ট হয় ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তাই বাগানের মাটিতে যেন আগাছা না জন্মায় সেই দিকে নজর দিতে হবে।

সুষ্ঠু জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঃ অতিরিক্ত জলের সময় নজর দিতে হবে, টবে যেন অতিরিক্ত জল না জমে। এতে গাছের গোড়া পচে যেতে পারে, আবার খনিজ পদার্থও ধুয়ে যেতে পারে।

এখন বাড়িতেই চাষ করুন সুইট লেমন

সুইট লেমন সাইট্রাস জাতীয় একটি নতুন ফল—যা বিভিন্ন জায়গায় স্বল্প পরিসরে ৩–৪ বছর ধরে চাষ করা হচ্ছে। এটি একটি বনসাই জাতীয় গাছ। গাছটি লম্বায় প্রায় ২–২.৫ ফুট এবং খানিকটা ঝোপালো হয়ে থাকে। বর্তমানে অনেকেই ছাদ–বাগান করে থাকেন। ছাদ–বাগানে লাগানোর জন্য সুইট লেমন খুবই উপযুক্ত একটি গাছ।

এবার আসা যাক, সুইট লেমন গাছের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সুইট লেমন গাছে সারা বছর থোকায় থোকায় ফল ধরে থাকে। একটি গাছে প্রায় ২০০–২৫০টি ফল ধরে থাকে। দুই বছর বয়সের একটি গাছ থেকে প্রায় ৫–৬ কেজি ফল পাওয়া যায়। গাছটির ফল ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই গাছে ফলও বেশি ধরবে। এই সুইট লেমন দেখতে লেবুর মতোই, তবে এটি মিষ্টি লেবু। কাঁচা অবস্থায় এটি সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে এবং পাকলে হলুদ হয়ে যায়। এই লেবুতে অ্যাসিডের পরিমাণ অনেক কম থাকে।

তবে মনে রাখতে হবে, এই লেবু চাষ করতে প্রচুর সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয়। গাছ লাগানোর ৪/৫ মাস পর থেকে নিয়মিত ২০–২৫ দিন অন্তর সরিষার খোল–পচা জল প্রয়োগ করতে হবে। সরষের খোল ১৫ দিন জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে, তারপর সেই পচা খোলের জল পাতলা করে গাছের গোড়ায় দিতে হবে।

লেবু কিংবা লেবু জাতীয় গাছে প্রায়ই কিছু কিছু ডাল মরতে দেখা যায়। এই সব মরা ডালগুলো কেটে ফেলতে হবে। এছাড়াও ছাদের লেবু গাছকে অধিক ডালপালাযুক্ত সুন্দরভাবে তৈরি করতে হলে, চারা লাগানোর কিছুদিন পর ডাল কেটে দিতে হবে। পরবর্তিকালে শুধু মরা ডাল কাটলেই চলবে। আপনি কাঁচা বা হলুদ রঙ অবস্থায় ফল সংগ্রহ করতে পারেন।

দুম্বা চাষে মালদহের ছেলে

দুম্বা সাধারণত মরুদেশের প্রাণী। দুম্বা কিছুটা ভেড়ার মতো দেখতে হয়। তবে এটি কুঁজ–বিশিষ্ট প্রাণী। এই প্রাণী সাধারণত মরুদেশে পালন করা হয়। তবে আমাদের দেশেও এই প্রাণীর চাহিদা বিপুল। কোরবানি ইদের সময় এর চাহিদা অনেকাংশে বেড়ে যায়। অনেকেই সৌদি আরব থেকে প্রায় ২–৩ লক্ষ টাকা দিয়ে নিয়ে আসেন। তবে মুসলিম সমাজে সাধারণ মানুষদের এই দুম্বা ক্রয় সাধ্যের বাহিরে।

এবার এই দুম্বা পালন করে আয়ের নতুন দিশা দেখাচ্ছেন মালদহের সিরাজুল শেখ। এই প্রাণী পালনের জন্য মরুভূমির বিশেষভাবে প্রয়োজন। বাংলায় পাহাড়, নদী থাকলেও নেই মরুভূমি। তাই বাড়িতেই কৃত্রিম মরুভূমি বানিয়ে এই প্রাণীপালন শুরু করেন সিরাজুল। এখানে রয়েছে খামার। সিরাজুল জানান, তিনি দেখেছেন, কোরবানির সময় অনেকেই কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে কিনে আনেন দুম্বা। তিনি আরও বলেন, তার দেখাদেখি রাজস্থানে অনেকেই বাড়িতে খামার করে দুম্বা পালন করছেন। বাংলার আবহাওয়া দুম্বা চাষের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। তবে এই পালনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইদের সময় ছাগল–ভেড়ার থেকে দুম্বার চাহিদা বেশি থাকে। তাই সিরাজুল ঠিক করেই ফেলেছেন, এক একটি দুম্বা তিনি বিক্রি করবেন ১ থেকে ২ লক্ষ টাকায়।

বস্তা চাষের খুঁটিনাটি

চাষীদের অসুবিধার কথা ভেবে, কৃষি বিজ্ঞানীগণ শাক–সবজি চাষাবাদের নতুন কৌশল বা পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এই নতুন চাষ পদ্ধতিটি হলো 'ব্যাগ গার্ডেনিং' যার মাধ্যমে সীমিত পরিসরে শাক–সবজি উৎপাদন করা সম্ভব। এই সব পদ্ধতি সেই সব পরিবারের জন্য উপযোগী—যাদের প্রচলিত উপায়ে চাষাবাদ করার জমি বা সুযোগ নেই। এই পদ্ধতিতে চাষ করে কৃষক ভাইরা খুবই উপকৃত হচ্ছেন।

বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ করতে প্রথমে প্রতি বস্তার জন্য ৩০ কেজি মাটির সাথে পরিমাণমতো জৈব সার, বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার–সহ সামান্য পরিমাণে খোল মেশানো হয়। পরবর্তী সময় বস্তায় ভরে প্রায় ৩ ফুট উঁচু করে ৪–৫ দিন রেখে দিয়ে তাতে বীজ বপন করা হয়।

একবার রোপণে ধান হবে পাঁচবার

নতুন ধানের জাতের উদ্ভাবন করে তাক লাগিয়েছেন কানিহাটি গ্রামের জিনবিজ্ঞানী ড. আবেদ চৌধুরী। তাঁর উদ্ভাবন করা নতুন জাত এবার নিজ গ্রামে চাষ হয়েছে। অবাক হওয়ার বিষয়, এই ধান একবার রোপণের পর পাঁচবার কাটা যায়। বছরে এই একই ধান গাছ থেকে সর্বোচ্চ পাঁচবার ফসল জন্মায়। প্রবাসী এই বিজ্ঞানী দীর্ঘদিন ধরে ধানের নতুন জাত আবিষ্কার নিয়ে গবেষণা চালিয়ে আসছেন। নতুন জাতের এ ধান যাতে সব দেশে চাষাবাদ করা যায়, সেই চেষ্টা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানী। মানুষ চায় কম দামে ধান পেতে। বোরো হিসেবে বছরের প্রথমে লাগানো এ ধান ১১০ দিন পর পাকছে। ওই গাছেই পর্যায়ক্রমে ৪৫ দিন পরপর আরও দুইবার আউশ এবং দুইবার আমন ধান পেকেছে। কম সময়ে পাকা এই ধানের উৎপাদন বেশি আর খরচও অনেক কম। তবে প্রথম ফলনের চেয়ে পরের ফলনগুলোতে উৎপাদন কিছুটা কম। কিন্তু পাঁচবারের ফলন মিলিয়ে উৎপাদন প্রায় পাঁচ গুণ বেশি।

কৃষি স্বার্থে নদীর সংস্কার

সুন্দরবনের বুক চিরে এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে অনেক নদী। এককালে এগুলি ভাগীরথী নদীর শাখানদী ছিল। বহুকাল ধরে পলি সঞ্চয়ের ফলে ও নিয়মিত সংস্কারের অভাবে বুজে গেছে নদীগুলির উৎসমুখ। তাই নদীগুলি আজ মূলত খাঁড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে নদী বিজ্ঞানীদের মতে, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নদীগুলিকে সেই আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এর ফলে সুন্দরবন এলাকা তথা রাজ্যের বহু কৃষিজীবী উপকৃত হবেন। একই সঙ্গে সংরক্ষিত হবে পরিবেশও। বিজ্ঞানীদের মতে, বর্ষায় নদীগুলি কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। ওই সময় নদীতে লবণের মাত্রাও প্রায় শূন্য হয়ে যায়। লকগেট বসিয়ে নদীগুলিতে এই মিষ্টিজল ধরে রাখা সম্ভব। নদীতে ধরে রাখা মিষ্টিজল সেচের কাজে লাগানো সম্ভব। এতে বিদ্যুৎ ও ডিজেলের খরচ যেমন বাঁচবে, তেমনি বাঁচবে ভূগর্ভস্থ জলের স্তরও।
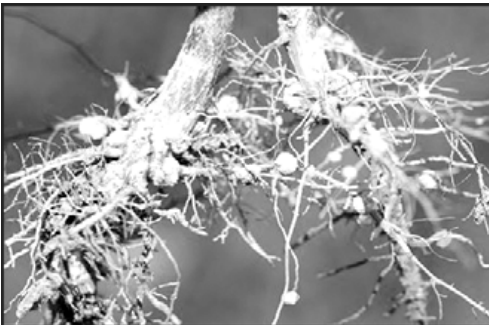
মুগ উৎপাদনে জীবাণুসার

ডালশস্য আমাদের কাছে অতি পরিচিত। এই ডালশস্য যেকোনো মাটিতেই চাষ করা যায়। তবে দোঁয়াশ–এঁটেল মাটি এই চাষের পক্ষে উপযুক্ত। গ্রীষ্ম পড়ার শুরুতেই এই চাষ করা লাভজনক। ফাল্গুন থেকে চৈত্র মাসের মধ্যে বীজ বোনার আদর্শ সময়। এই চাষে মাটিতে রসাল ভাব থাকা অত্যন্ত জরুরী। এই শস্য চাষে জীবাণুসার খুবই উপযোগী। মাটিতে পরিমাণ মতো জৈব সার প্রয়োগ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। বিঘাপ্রতি তিন কেজি মুগ বীজের সাথে রাইবেজিয়াম জীবাণু এবং ভাতের ফ্যান মাখিয়ে বীজ বপন করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

কোয়েল পালনে আশার আলো

আজ সমাজশিক্ষার তরফ থেকে যারা পশুপালনে আগ্রহী, তাদের জন্য নিয়ে এসেছে এক দুর্দান্ত অভিনব পশুপালন তথা পাখিপালন পদ্ধতি। আমরা আজ কোয়েল পালনের কথা বলছি। এতে আপনি ঘরে বসেই প্রতি মাসে ভালো টাকা আয় করতে পারবেন। এখন জেনে নিই কোয়েল পালন থেকে কত আয় হবে এবং তা পালন করার সময় কী কী বিষয় মাথায় রাখতে হবে।

কোয়েল পালন থেকে চাষীরা ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারেন। কোয়েলের এক দিনের বাচ্চার দাম ৬ টাকা। শিশুর বয়স ও ওজন বাড়ার সাথে সাথে এর খরচও বাড়ে। যখন একটি কোয়েল ছানা ৩০০ গ্রাম হয়, তখন এর দাম হয় ১৫ টাকা, যা বাজারে বিক্রি হয় প্রায় ৪৫ টাকায়। চাষীরা এভাবে ২০০টি ছানা পালন করলে প্রায় ৬,০০০ টাকা লাভ হবে।

কোয়েলের মাংস পুষ্টিগুণে ভরা ঃ (ক) কোয়েলের মাংস পুষ্টিগুণে ভরপুর হওয়ায় বাজারে এর মাংসের চাহিদা অনেক বেশি। এর মাংস খেলে শরীরে তাপ বাড়ে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়।

(খ) কোয়েলের ডিমে ফসফরাস ও আয়রন থাকে।

(গ) এর ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের কারণে লোকেরা এটিকে আরও পছন্দ করে।

কোয়েল চাষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঃ (ক) বেশির ভাগ কোয়েল পালন বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং উত্তর প্রদেশে করা হয়। (খ) কোয়েলের খুব গরম জলবায়ুর প্রয়োজন হয় না। এর জন্য ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা খুবই উপযুক্ত। (গ) কোয়েলও দেশি মুরগির মতো পালন করা যায়। (ঘ) গ্রামীণ পরিবেশে সহজেই কোয়েল লালন-পালন করা যায়। (ঙ) কোয়েল পালনের জায়গা সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। (চ) শেডের মধ্যে ভালো বাতাস ও আলো থাকতে হবে। (ছ) এদের পুষ্টিকর খাবার খাওয়াতে হবে এবং বিশুদ্ধ জল দিতে হবে।

কোয়েলের জাত ঃ (ক) কোয়েলের প্রায় ১৮টি প্রজাতি রয়েছে। কিন্তু সমস্ত কোয়েলের মধ্যে জাপানি কোয়েল দেশে সবচেয়ে বেশি পালন করা হয়। (খ) বোল হোয়াইট ব্রিড মাংস উৎপাদনের দিক থেকে ভালো বলে বিবেচিত হয়। (গ) দ্বিতীয় জাতটি হোয়াইট ব্রিড—যা মাংস উৎপাদনের উপযোগী। (ঘ) বেশি ডিম পাড়ার জাত হলো ব্রিটিশ রেঞ্জ, ইংলিশ হোয়াইট, মাঞ্চুরিয়ান গোলান ফারাও এবং টাক্সেডো। (ঙ) চাষীরা তাদের উৎপাদন ইচ্ছা অনুযায়ী যে-কোনো জাত বেছে নিতে এবং অনুসরণ করতে পারে।

হাঁস চাষের বারমাস্যা

বৈজ্ঞানিক উপায়ে হাঁস চাষ করা মুরগি চাষের থেকে বেশি লাভজনক। পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া হাঁস চাষের অনুকূল। দেশি হাঁসের ডিম দেওয়ার ক্ষমতা কম কিন্তু এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি। আবার উন্নত জাতের হাঁস যেমন, খাঁকি ক্যাম্পবেলের ডিম উৎপাদনের ক্ষমতা বেশি কিন্তু পরিচর্যার প্রয়োজন হয় অনেক বেশি। তাই, দেশি হাঁসের সঙ্গে খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁসের প্রজনন ঘটিয়ে উন্নত সংকরজাতের হাঁস উৎপাদন করা যায়। যেসব কারণে বর্তমানে হাঁস চাষ লাভজনক—

ক) খাঁকি ক্যাম্পবেল হাঁস বছরে ২০০-২৫০টি ডিম পাড়তে পারে। খাঁকি ক্যাম্পবেল থেকে তৈরি সংকরজাতের হাঁস অন্তত বছরে ১৩০-১৫০টি ডিম পাড়তে পারবে।

খ) এই হাঁসের রোগ-ব্যাধি মুরগির তুলনায় কম হয়।

গ) পুকুরে চরিয়ে পালন করলে হাঁস চাষের খরচ খুব কম। মাছ ও হাঁসের একসঙ্গে চাষ খুবই লাভজনক।

বিভিন্ন ধরনের হাঁস ঃ বিভিন্ন ধরনের হাঁসের মধ্যে আমরা বেশি ডিম দেওয়া হাঁস, বেশি মাংস পাওয়া হাঁস, সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য হাঁস—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি।

হাঁসের রোগ-ব্যাধি ঃ হাঁসের রোগ-ব্যাধি খুব কম হয়। তবে দু-একটি সংক্রামক রোগের আক্রমণ কখনো হতে পারে, যার ফলে হাঁস খাওয়া বন্ধ করে দেয়। এগুলি হলো—

১) ডাক কলেরা—যে-কোনো বয়সের হাঁসের এই ব্যাক্টেরিয়াঘটিত সংক্রমণ হতে পারে। তবে চার সপ্তাহের বেশি

বয়সের হাঁসেরই এই রোগ বেশি হতে দেখা যায়। এই রোগে আক্রান্ত হলে হাঁস খাওয়া বন্ধ করে দেয়, জ্বর হয়, ঝিমোতে থাকে, চামড়ার নিচে লালচে ভাব দেখা যায়, পাতলা পায়খানা হতে থাকে। এই রোগে সাধারণত ৫০ শতাংশ পাখি মারা যায়। **চিকিৎসা ঃ** ৩০ মিলি সালফা মিজাথিন (৩৩.৩%) ৫ লিটার খাবার জলে গুলে আক্রান্ত পাখিকে দিতে হবে। এরপর পাঁচ দিন সকালে ও বিকালে এভাবে পরপর ঔষধ খাওয়াতে হবে। এছাড়াও ডাক কলেরা ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করাও যেতে পারে।

২) ডাক ভাইরাল হেপাটাইটিস—মূলত ২-৩ সপ্তাহের হাঁসের বাচ্চার এই রোগের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। আক্রান্ত পাখির মল ও সংস্পর্শ থেকে সুস্থ পাখিতে এই রোগ ছড়ায়। এই রোগে মৃত্যু হার প্রায় ৯০ শতাংশ। এই রোগে হাঁস সবুজ পায়খানা করে, হাঁটতে গেলে টলে পড়ে যায় এবং অবশেষে মারা যায়। এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। **রোগ প্রতিরোধ ঃ** এই রোগ প্রতিরোধ করার জন্য একদিনের বাচ্চাকে টিকা দিতে হয়। এছাড়াও ডিম-পাড়া হাঁসকে এই ভ্যাকসিন দিয়ে রাখলে উৎপাদিত বাচ্চার মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়।

৩) ডাক প্লেগ—এটি হাঁসের ভাইরাসঘটিত একটি ছোঁয়াচে রোগ। যে-কোনো বয়সের হাঁসের ক্ষেত্রে এই রোগ হয়ে থাকে। এই রোগে মৃত্যুহার খুব বেশি হয়। **লক্ষণ ঃ** এই রোগ হলে পাখির পালক উস্কোখুস্কো থাকবে, পাখি ঝিমোবে, মাথা ও চোখ ফুলে উঠবে, সবুজাভ সাদা রঙের পাতলা পায়খানা হবে, ডানা ঝুলে পড়ে, মৃত পাখির শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত জমে থাকবে। এই রোগের ভালো চিকিৎসা নেই। অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ প্রয়োগে কিছু সুফল পাওয়া যায়। এজন্য প্রাণী চিকিৎসকদের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। **প্রতিকার ঃ** (ক) হাঁসের মধ্যে এই রোগ দেখা দিলে হাঁসের ঘর চুন-ব্লিচিং দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। (খ) আক্রান্ত হাঁসকে আলাদা রাখতে হবে, পুকুরে ছাড়া চলবে না। (গ) ৪ সপ্তাহে এবং ১৬ সপ্তাহে দু-বার ডাক প্লেগ ভ্যাক্সিন করতে হবে। চামড়ার নিচে ১ মিলি ওষুধ ইঞ্জেকশান করে এই ভ্যাক্সিন দিতে হবে।

কেন্দু চাষে লক্ষ্মীলাভ

কেন্দু গাছ স্থানীয়ভাবে যা তেন্সুরিণী নামে পরিচিত। এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় ফল, যা গ্রীষ্মকালীন মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যা রাজ্যে পাওয়া যায়। ফলগুলি অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং ফাইবার সমৃদ্ধ। এই সব অঞ্চলের উপজাতিরা লু বা গরম থেকে রক্ষা পেতে এই ফলটি খেয়ে থাকে।

রোপণ পদ্ধতি ঃ কেন্দু হলো একটি মাঝারি আকারের গাছ বা গাছের গুল্ম—যা প্রাকৃতিক অবস্থায় বনভূমিতে পাওয়া যায়। ভালো ধরনের মাটিতে গাছের বৃদ্ধি হয় খুব ভালোভাবে। মাটি ও জলবায়ুর ধরন অনুসারে উদ্ভিদের মধ্যে ব্যবধান ঠিক করা হয়। দেশের পূর্বাঞ্চলে যেখানে পাথুরে মাটি বা ল্যাটেরাইট মাটি রয়েছে, সেখানে গাছগুলি ৬ মিটার দূরত্বে রোপণ করতে হবে। গাঙ্গেয় সমভূমিতে গাছের ব্যবধান থাকবে ৮-১০ মিটার দূরত্বে। যেহেতু কেন্দু ধীরগতির উদ্ভিদ, তাই ১ বছরের বেশি পুরানো উদ্ভিদ যার বৃদ্ধি রয়েছে এবং গাছটি সতেজ সবল, সেরকম গাছের কয়েকটি পাতা রোপণ করা উচিত। তবে বর্গাকার পদ্ধতিতে এই গাছ রোপণ করা উচিত।

মালচিং ঃ এই গাছ আগাছা নিয়ন্ত্রণ করে এবং মাটির আর্দ্রতাকে গাছের বৃদ্ধির জন্য বজায় রাখে। মালচিং করার সামগ্রী হলো—ধানের খড়, করাত ধুলো, শুকনো কলাপাতা, পলিথিন ইত্যাদি। কালো পলিথিন আগাছা নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে উপযুক্ত। জৈব মালচিং মাটির গুণমান উন্নত করার পাশাপাশি আগাছা নিয়ন্ত্রণ এবং মাটির জৈবিক ক্রিয়াকলাপ উন্নত করে।

রোগবালাই ও দমন ঃ গাছের পুরানো পাতা বেশি রোগাসক্ত হয়ে থাকে। প্রয়োজনীয় ছত্রাকনাশক বা মানকোজেব দ্বারা এই রোগ নিরাময় সম্ভব। এছাড়াও জৈব পদ্ধতিতে নিমতেল ব্যবহার করে এই গাছের রোগ নিরাময় করা যায়।

পুকুরে দেশি পুঁটির চাষ

ছোট মাছের মধ্যে পুঁটিমাছ খুবই সুস্বাদু ও জনপ্রিয়। এই মাছ সাধারণত পুকুরে রুই মাছের সাথে অত্যাধিকহারে হয়ে থাকে। আবার, অনেকে এই মাছ বাড়ির চৌবাচ্চায়ও চাষ করেন। তবে পুকুর বা ছোট জলাশয়ে এই মাছ খুব সহজেই চাষ করা যায়। প্রাকৃতিক খাবার গ্রহণের দক্ষতা, সম্পূরক খাবারের প্রতি আগ্রহ, বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে টিকে থাকা ও অধিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার কারণে চাষীদের কাছে এর জনপ্রিয়তাও দিন দিন বাড়ছে। খুব সহজেই যেহেতু এই মাছ চাষ করা যায়, তাই পুঁটিমাছ চাষে কৃষকদের লক্ষ্মীলাভও হচ্ছে ভালোই। কারণ, সুস্বাদু এই মাছের বাজার চাহিদা প্রায় সারা বছর।

পুকুর নির্বাচন ঃ পুঁটি মূলত মিষ্টি জলের মাছ। এটি সাধারণত খাল এবং বিল-এ পাওয়া যায়। তবে বর্তমানে আমাদের দেশে এই মাছকে পুকুর কিংবা ছোটখাট জলাশয়ে চাষ করা হচ্ছে। পুঁটিমাছ চাষ করার জন্য পুকুরের পাড় যেন সর্বদা মজবুত ও বন্যামুক্ত থাকে। এছাড়াও পুকুরে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ে ও পুকুরটি যেন জলজ আগাছামুক্ত থাকে।

চাষের সময় ঃ সাধারণত বছরের যেকোনো সময়েই আপনি পুঁটিমাছের চাষ করতে পারেন, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পুকুরে কিংবা যে-কোনো ধরনের ছোটখাট জলাশয়ে পুঁটির পোনা ছাড়ার ক্ষেত্রে সকাল অথবা সন্ধ্যা এই দুই সময়ের যে-কোনো একটি নির্বাচন করতে হবে। কারণ এসময় তাপমাত্রা সহনীয় অবস্থায় থাকে। তা না হলে মাছ মরে যেতে পারে। এপ্রিল-মে মাসে পুঁটিমাছ ডিম ছাড়ে। তাই এসময় পুঁটিমাছ চাষ করা উপযোগী।

চাষ পদ্ধতি ঃ পুঁটিমাছ সাধারণত পুকুর-নদীতে বছরে ২ বার ডিম দেয় বলে এদের পোনা মজুদের প্রয়োজন হয় না। পুকুরে পুঁটি চাষ করার জন্য আপনাকে সঠিক নিয়ম মানতে হবে। পুকুরে পোনা ছাড়ার ক্ষেত্রে প্রথমে অক্সিজেন ব্যাগে পরিবহনকৃত পোনা, ব্যাগ সহ জলে ভাসিয়ে রাখতে হবে। এরপর পরিবহনকৃত ব্যাগের জল এবং পুকুরের জলের তাপমাত্রা একই মাত্রায় আনতে হবে। এরপর ব্যাগের মুখ খুলে পুকুরের জল অল্প অল্প করে ব্যাগে দিতে হবে এবং ব্যাগের জল অল্প অল্প করে পুকুরে ফেলতে হবে। ৪০-৫০ মিনিট সময় ধরে এইভাবে পোনাকে পুকুরের জলের সঙ্গে মানানসই করতে হবে।

খাদ্য ঃ পুঁটিমাছ চাষে আপনাকে নিয়মিত উপযুক্ত খাবার প্রয়োগ করতে হবে। এই মাছ স্বাভাবিক খাদ্য হিসাবে শেওলা খেয়ে থাকে। এছাড়াও পুঁটিমাছ সাধারণত সব ধরনের খাবার খেয়ে থাকে। তাই এদের চাষ করার ক্ষেত্রে আলাদা কোনো খাবারের প্রয়োজন হয় না।

সার প্রয়োগ ঃ পুঁটিমাছ চাষ করার জন্য পুকুরে বা জলাশয়ে সঠিক নিয়মে সার প্রয়োগ করতে হবে। মাঝে মধ্যে ইউরিয়া এবং অন্যান্য সার প্রয়োগ করতে হবে। এতে জলের গুণাগুণ বজায় থাকে এবং মাছের কোনো ক্ষতি হয় না। বরং এতে মাছের বৃদ্ধি অনেক ভালো হয়।

পরিচর্যা ঃ প্রথমেই পুকুরে রাক্ষুসে বড় মাছ দূর করতে হবে। যেমন শোল, টাকি, গজার, বোয়াল, মাগুর ইত্যাদি হলো রাক্ষুসে মাছ। এই মাছ পুঁটিমাছের পোনা খেয়ে ফেলে। তাই সর্বপ্রথম রাসায়নিক সারের মাধ্যমে এই সকল মাছ দূরীভূত করতে হবে। পুকুরের বা জলাশয়ের তলদেশ সবসময় পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাখতে হবে। মাছের যত্ন নিতে হবে। বৃষ্টির দিনে বা মেঘলা আবহাওয়ায় মাছের খাবার বেশি না দেওয়াই ভালো।

মাছ আহরণ ঃ বাড়িতে পুকুর কিংবা যে-কোনো ধরনের ছোটখাট জলাশয়ে সঠিক নিয়মে পুঁটিমাছ চাষ করলে, সেখান থেকে চাষীরা প্রচুর পরিমাণে পুঁটিমাছ পেতে পারেন, যা আপনার পারিবারিক চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করে বিপুল অর্থ পাওয়া যায়।

সেবাযোগ

জনজাতিদের সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন ।।৩

স্বামী একরূপানন্দ *

দেওঘর ঃ শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর চেষ্টায় ব্রহ্মচারী বিদ্যাচৈতন্য ৩ জন ছাত্রকে নিয়ে ১৯২২ সালে এই বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। তখন মিহিজামে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে কাজ শুরু হয়। তৎকালীন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি সরস্বতী পূজার দিনে বর্তমান স্থানে এই স্কুলের সূচনা করেন। ১৯৭৩ সালের ২২ ডিসেম্বর এই স্কুল সি.বি.এস.সি. বোর্ডের অধীনে আসে। এই স্কুলটি ভারতের সেরা স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম। ২০১৫ সালে এই স্কুলটি ভারতের সি.বি.এস.সি বোর্ড স্কুলগুলোর মধ্যে চতুর্থ স্থান ও ২০২০ সালে প্রথম স্থান লাভ করে। বর্তমানে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মোট ৫০০ জনের মতো ছাত্র এই স্কুলে পড়ে। তাদের জন্য সর্বসুবিধাযুক্ত ১৬টি ছাত্রাবাস রয়েছে। জনজাতি ও পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য বিবেকানন্দ বালকেন্দ্র রয়েছে। সেখানে ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পড়ানো হয়। তাদের জন্য ফ্রি কোচিং, সুষম খাদ্য, পড়াশোনার সামগ্রী ও পোশাকাদি দেওয়া হয়ে থাকে।

ওড়িশা ঃ 'ওড়িশা' ভারতের ইতিহাসে বহুচর্চিত স্বর্ণাক্ষরে লিখিত এক নাম। বহু উত্থান-পতনের কাহিনী রয়েছে এই রাজ্যের ইতিহাসে। রাজ্যটি দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। ওড়িশার কথা মহাভারত ও পুরাণেও রয়েছে। ২৬১ খ্রিস্টাব্দে মৌর্যবংশের সম্রাট অশোক বর্তমান ভুবনেশ্বরের কাছে দয়া নদীর ধারে কলিঙ্গ যুদ্ধ করেছিলেন। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে বহু প্রাণনাশ হয়েছিল। যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণনাশ ও রক্তস্রোত দেখে সম্রাট অশোকের মনে পরিবর্তন আসে। তিনি যুদ্ধত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও পরবর্তিকালে ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। ১৫৬৮ সালে আইকনোক্লাস্ট কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে শাহী বাংলার সৈন্যদল অঞ্চলটি দখল করে। এরপর ওড়িশা তার রাজনৈতিক পরিচয় ও স্বাধীনতা হারায়। ১৭৫১ সাল থেকে অঞ্চলটি মারাঠাদের দখলে চলে যায়। ১৮০৩ সালে ওড়িশা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দখলে যায়। ১৮৩৬ সালে ওড়িয়াভাষী জেলাগুলি নিয়ে পৃথক ওড়িশা প্রদেশ গঠিত হয়।

ওড়িশায় প্রধানত ৬২টি জনজাতি সম্প্রদায় রয়েছে ও ২৩৩টি জনজাতির উপশাখা রয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা বেশি। ওড়িশার প্রধান জনজাতি সম্প্রদায়গুলো হলো—খোন্ড, সাউরাস, বোন্দা, সাঁওতাল, গোন্ড, ভূমিয়া, ওঁরাও, কোয়াস, পারাজাস, গাডাভা, ভূমিজ, বাগাটা, ভূমিয়, ভূয়ান প্রভৃতি। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে সেখানকার মোট জনসংখ্যার ২২.৮৫% জনজাতিভুক্ত। ভারতের মোট জনজাতির ৯.৭% জনজাতি ওড়িশায় বাস করে। উড়িষ্যার প্রধান জনজাতি খোন্ড। তারা প্রধানত কালাহান্ডি, রায়গড়া, কোরাপুট, ময়ূরভঞ্জ ও বৌধ জেলায় অধিক পরিমাণে বাস করে। ওড়িশায় সাঁওতাল জনজাতি ৫,০০,০০০ জনের মতো রয়েছে ও তারা বেশিরভাগ ময়ূরভঞ্জ জেলায় বাস করে। হো জনজাতি ১,০০,০০০ জনের মতো, তারা বেশিরভাগ ময়ূরভঞ্জ, কেওনঝড়, জয়পুর, বালাসোর, ভদ্রক, সম্বলপুর, ঝাড়সুগুড়া, খান্ডমল জেলায় বাস করে। সাউড়া সম্প্রদায়ের জনজাতি ৩,০০,০০০ জনের মতো, তারা বেশিরভাগ গঞ্জাম ও পুরী জেলায় বাস করে।

ওড়িশা-য় জনজাতি সম্প্রদায়

উড়িষ্যার জনজাতিরা প্রধানত ৩টি বংশোদ্ভব। ১) অস্ট্রো এশিয়াটিক (মানদারি), ২) দ্রাবিড়, ৩) ইন্দো-আর্য।

রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা ঃ ওড়িশায় বর্তমানে ৬টি রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে। ভুবনেশ্বর, রায়গড়া, কোঠার,

* *সুবক্তা, সুলেখক, রামকৃষ্ণ মঠ, তমলুক আশ্রমে সেবারত।*

রাউরকেল্লা ও পুরীতে ২টি। তবে জনজাতিদের মধ্যে সেবাকাজ উল্লেখ করতে গেলে, সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় রায়গড়া জেলার মুনিগুড়া রামকৃষ্ণ মিশনের নাম। তাই আমরা হাতামুনিগুড়া রামকৃষ্ণ মিশন দিয়ে ওড়িশায় রামকৃষ্ণ মিশনের জনজাতিদের সেবাকাজ নিয়ে আলোচনা শুরু করছি।

হাতামুনিগুড়া ঃ ওড়িশার কোরাপুট জেলাকে বিভক্ত করে দুটি মহকুমা নিয়ে রায়গড়া জেলা গঠিত। এখানের ৫৭.৫২ শতাংশ লোক জনজাতি অংশের। ওড়িশার দুইটি জনজাতি খুবই দরিদ্র। তারা হলো খোন্ড ও সৌরাস। খোন্ডদের ভাষা কুইখোন্ড। সৌরাস সম্প্রদায়ের জনজাতিরা সাহারা, সোরা, সৌরা, সৌরাস ইত্যাদি নামে পরিচিত। তাদের লিখিত ভাষা সৌরা।

ভারতের অন্যান্য জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর ন্যায় ওড়িশার জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতেও এখনো শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি, অনাহার-দরিদ্রতা সেখানকার জনজাতিদের নিত্যসঙ্গী। তাদের অশিক্ষা ও দরিদ্রতা দূরীকরণের লক্ষ্যে রায়গড়া জেলার মুনিগুড়া ব্লকে একশত একর জায়গা নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন গড়ে তুলেছে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। রামকৃষ্ণ মিশন এখানে একটি সর্বসুবিধাযুক্ত ইংলিশ মিডিয়াম আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে তুলেছে। বর্তমানে এখানে প্রায় ৭০০ জন

হাতামুনিগুড়ায় জনজাতি সেবায় রামকৃষ্ণ মিশন

জনজাতিভুক্ত ছাত্র পড়াশোনা করে। তাদের সম্পূর্ণ বিনা বেতনে শিক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য, বাসস্থান, পড়াশোনার সামগ্রী ও পোশাক-সহ নানাবিধ সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। এখানের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে জনজাতি অংশের বেকারগণের বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণ নিয়ে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার সুযোগ রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন তাদের জন্যও বিনামূল্যে শিক্ষা, থাকা, খাওয়া ও পোশাক-সহ নানা সুবিধা প্রদান করে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে সাহায্য করে। এখানকার গ্রন্থাগারে ১৩,৫৬৯টি পুস্তক রয়েছে। জনজাতিদের জন্য দাতব্য চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগে জনজাতিদের রিলিফ দেওয়া হচ্ছে

সারা বছর রায়গড়া জেলার জনজাতিদের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী, বাসনপত্র ও পোশাক-সহ নানা ধরনের জিনিস বিতরণ করে।

ভুবনেশ্বর ঃ ১৯১৯ সালের ৩১ অক্টোবর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ ও মানসপুত্র স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের হাত ধরে এই আশ্রমের পথচলা শুরু। ভুবনেশ্বর শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই আশ্রমটি গড়ে উঠেছে। যদিও দৈনন্দিন ঠাকুরসেবা ও বিশেষ পূজাদি এই আশ্রমের প্রধান কাজ। কিন্তু ইদানীংকালে শিক্ষাক্ষেত্রেও এই আশ্রমের একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন এখানে একটি হাইস্কুল পরিচালনা করে, যেখানে প্রতি বছর ৬০০ জনের উপর ছাত্র-ছাত্রীর পড়ার সুযোগ লাভ করে। বহু দুষ্প্রাপ্য বই এখানকার গ্রন্থাগারে রয়েছে, যার সংখ্যা ৩৫,৪১১টি। জনজাতি ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস রয়েছে। ছাত্রাবাসের আবাসিকদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া ও পড়াশোনার বন্দোবস্ত রয়েছে। এছাড়াও এই আশ্রম থেকে উড়িয়া ভাষায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও বেদান্ত সাহিত্যের ১৪৮টি পুস্তক ও একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়।

পুরী মিশন ঃ পুরীতে রামকৃষ্ণ মিশনের দুইটি আশ্রম রয়েছে। একটি মঠ ও অন্যটি মিশন সেন্টার। মিশন সেন্টারে জনজাতি অংশের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস রয়েছে। সেখানে প্রতি বছর ৮০ জন ছাত্র বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া ও পড়াশোনার সুযোগ পায়। একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে, ১৩টি কেন্দ্র থেকে ৩৬৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ফ্রি কোচিং পায়। লাইব্রেরিতে ২৭,৪৪৬টি পুস্তক রয়েছে। এছাড়াও দৈনন্দিন ঠাকুরসেবা, দাতব্য চিকিৎসা পরিষেবা, রিলিফ কাজ ইত্যাদি হয়ে থাকে।

ছত্তিশগড় ঃ এই অঞ্চল ১৭৪১ সাল থেকে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত মারাঠাদের শাসনে ছিল। এরপর ১৮৪৫ সাল

থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশরা শাসন করে। ১৯২০ সালে প্রথম পৃথক ছত্তিশগড় রাজ্যের দাবি ওঠে, এরপর বারবার এই দাবি উঠলেও কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। ভারতের স্বাধীনতার পর মধ্যপ্রদেশ-এর রাজধানী হয় নাগপুর। ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর মধ্যভারত, বিন্ধ্যপ্রদেশ ও ভোপাল নিয়ে নতুন মধ্যপ্রদেশ গঠিত হয় ও মারাঠাভাষী বিদর্ভ মুম্বাই রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়। পরে ২০০০ সালের ১ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশকে বিভক্ত করে ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশ নামে দুইটি পৃথক রাজ্য গঠিত হয়।

জলপ্রপাত, বনাঞ্চল, প্রাচীন মন্দির ও স্থাপত্য শিল্প ছত্তিশগড়কে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে সীতা ও লক্ষ্মণসহ ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলে অর্থাৎ তৎকালীন দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁদের ১৪ বছর বনবাসের মধ্যে ১০ বছরই এই জঙ্গলে কাটিয়ে ছিলেন। রামায়ণে উল্লেখিত শবরীর কথা আমাদের অনেকের জানা রয়েছে। ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরের নিকট শিবরিনারায়ণে সেই শবরীর বাসস্থান ছিল। সেখানকার মোট জনসংখ্যার ৩৪% জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানে গোন্দ, হাল্বা, কামার/বুজিয়া, অবুঝ মারিয়া, কোরবা, মুরিয়া, বিসন হর্ণ মারিয়া, ভাতরা, ধুরভা ও ওঁরাও-সহ মোট ৪২টি জনজাতি সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। মারিয়া জনজাতি সেখানকার বৃহত্তম জনজাতি সম্প্রদায় ও গোন্দ ভারতের বৃহত্তম জনজাতি সম্প্রদায়। এখানকার জনজাতিরা ইন্দো-আরিয়ান, দ্রাবিড় ও মুন্ডা সম্প্রদায়ের। তাদের প্রধান ভাষা—ছত্তিশগড়ি। এছাড়া গাড়বা, গোনাডি, হালবা, ভাতড়ি ইত্যাদি ভাষায় অনেকে কথা বলে।

রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা ঃ ছত্তিশগড়কে জানতে হলে বস্তার জেলায় যেতে হবে। কারণ সেই পাহাড়ি জনপদে লুক্কায়িত রয়েছে সেই রাজ্যের সংস্কৃতি, দর্শনীয় স্থান ও জনজাতিদের চিরাচরিত জীবনযাত্রা। এই অঞ্চলে জনজাতি ও উড়িয়া সংস্কৃতির মিশ্রণ রয়েছে। জলপ্রপাত, বন-জঙ্গল, জন্তু-জানোয়ার, প্রাচীন দেব-দেবীর কোলে দীর্ঘ ৮০০ বছর ধরে এরা লালিত-পালিত। তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার আলো তাদের দ্বারে পৌঁছায়নি। তারা এতটাই সহজ-সরল যে, তাদের নামই হলো অবুঝ মারিয়া। এই জেলার জনসংখ্যার প্রায় ৭০% জনজাতি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। এখানকার ৪০ শতাংশ মানুষের জীবনযাত্রা বনজসম্পদের ওপর নির্ভরশীল, ৩০ শতাংশ মানুষের জীবিকা নির্ভর করে কৃষিকাজের ওপর, ১৫ শতাংশ পশুপালনের ওপর ও মাত্র ১৫ শতাংশ শ্রমিকের কাজ করে। জ্বালানী, ঔষধি, খাদ্য ও পানীয়, বাড়ি তৈরির সরঞ্জামের জন্য তারা বনের ওপর নির্ভরশীল। অশিক্ষা ও দরিদ্রতা যাদের জীবনসাথী তাদের কাছে শিক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পৌঁছে দিতে ভারত সরকার দায়বদ্ধ। কিন্তু জনজাতিদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি এতটাই ভালোবাসা যে, তাদের ভয় হতো তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার আলো পৌঁছালে নিজস্ব সংস্কৃতি নষ্ট হতে পারে। তাই বহু বছর তারা কাউকে সেখানে প্রবেশ করতে দেয়নি।

নারায়ণপুর ঃ ১৮৮৫ সালে রামকৃষ্ণ মিশন অবুঝ মারিয়াদের জন্য ৬ জায়গায় কাজ শুরু করে। রামকৃষ্ণ মিশন তাদের বোঝানোর চেষ্টা শুরু করে—চারবেলা খাওয়া, উন্নতশিক্ষা ও প্রশিক্ষণাদি দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে স্বাবলম্বী করে তুলবে। রামকৃষ্ণ মিশন নারায়ণপুরে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় স্থাপন করে। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে প্রায় ১,২২৪ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। তাদের মধ্যে ছাত্র ৮০৫ জন ও ছাত্রী ৪১৯ জনের মতো। তারা প্রায় ৭০ শতাংশ মারিয়া জনজাতি অংশের। অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া সহজ-সরল জনজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া, পড়াশোনার সামগ্রী, পোশাক ও চিকিৎসা পরিষেবা-সহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়ে থাকে। এখানে একটি প্রাথমিক স্কুল ও একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। গভীর জঙ্গলে ৬টি স্কুল রয়েছে, তার মধ্যে ৩টি হাইস্কুল ও ৩টি মিডেল স্কুল। সেখানে বিনামূল্যে শিক্ষা, পুষ্টিকর খাদ্য, পড়াশোনার সামগ্রী ও পোশাকাদি দেওয়া হয়ে থাকে। সেই স্কুলগুলোতে ১,১১৮ জনের মতো ছাত্র-ছাত্রী পড়ে। নারায়ণপুর স্কুলে ৩টি পৃথক ছাত্রাবাস রয়েছে। নারায়ণপুরে ২০০৬ সালে একটি ফ্রি কোচিং সেন্টার শুরু হয়। সেখানে দরিদ্র জনজাতি ও পিছিয়ে-পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়। ৫৯টি স্কুলের প্রায় ১৬৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এই পরিষেবা প্রদান করা হয়। ১৯৯৫ সালের ১ জুলাই জনজাতি ছাত্রীদের জন্য একটি হাইস্কুল শুরু হয়। সেখানে বর্তমানে ৩০১ জন ছাত্রী বিনামূল্যে পড়া, থাকা-খাওয়া, পোশাক, পড়াশোনার সামগ্রী-সহ বিশেষ সুযোগ পায়।

২০১২ সালের ১ অক্টোবর নারায়ণপুরে ১২ একর জমির ওপর একটি আই.টি.আই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। যেটি স্থানীয় জনজাতিদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য বিশেষ ভূমিকা নিচ্ছে। গভীর জঙ্গলে অত্যাধুনিক সার্বিক সুবিধাযুক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি না দেখলে ধারণাই হবে না—কতটা উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় সেখান থেকে। এখানে ট্রাক্টর সারানো, ড্রাইভিং, গাড়ি সারানো, ইলেক্ট্রিক,

ওয়েল্ডার, কাঠের কাজ, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতি বছর ১০টি বিভাগের ২৩২ জন ছাত্র বিনামূল্যে থাকা-খাওয়া-সহ প্রশিক্ষণের সুযোগ লাভ করে। 'বিবেকানন্দ আরোগ্য ধাম' নামে একটি সর্বসুবিধাযুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়াও গভীর জঙ্গলে ৫টি চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। ২০১০ সালে একটা ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি হয়। তাছাড়া ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবাও রয়েছে। নারায়ণপুর আশ্রম থেকে ৪ কিলোমিটার দূরে ৫২ একর জায়গা নিয়ে একটি সুন্দর কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। সেখানে প্রত্যন্ত গ্রামের কৃষকদের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলা হয়। এখানে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ, পোলট্রি, পশুপালন প্রশিক্ষণ ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে।

মধ্যপ্রদেশ ঃ মধ্যপ্রদেশ বর্তমানে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য। এই রাজ্যের জনসংখ্যা ৮.৫০ কোটি। জনজাতি প্রায় ১,৫৩,১৬,৭৮৪ জনের মতো। মোট জনসংখ্যার ২১.১% জনজাতিভুক্ত। এখানে প্রধানত ৪৬টি জনজাতি সম্প্রদায় রয়েছে। এই রাজ্যের কয়েকটি জনজাতি সম্প্রদায় হলো ঃ গোন্ড, ভিল, বাইগা, সাহারিয়া, বাহারিয়া, কোরকু, সানতিয়া, কোল ইত্যাদি।

রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকা ঃ মধ্যপ্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের ৩টি শাখা কেন্দ্র রয়েছে। ভোপাল, ইন্দোর ও গোয়ালিয়র-এ।

ভোপাল ঃ ভোপাল শহরের এম.পি. নগরে রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ শুরু হয় ১৯৬৮ সালে। ২০০৬ সালে বেলুড় মঠের শাখা কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেখানে একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করে। বিদ্যালয়ে ১১০০ জনের মতো ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করে। এছাড়া জনজাতি ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস রয়েছে। আশ্রম একটি পুস্তকাগার, দাতব্য চিকিৎসালয় ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ পরিচালনা করে।

গোয়ালিয়র ঃ ১৯৬৪ সালের ১১ ডিসেম্বর তৎকালীন ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই আশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আশ্রমটি ২০১৬ সালে ১ নভেম্বর বেলুড় মঠের অধীনে আসে। আশ্রমটির ২টি ক্যাম্পাস রয়েছে—রামকৃষ্ণ পুরী ও শচীন তেণ্ডুলকর মার্গ। রামকৃষ্ণ পুরীতে একটি সি.বি.এসসি. বোর্ডের অধীন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, সেখানে ১০০০ জনের মতো ছাত্র-ছাত্রী পড়ার সুযোগ পায়, এছাড়া সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, দিব্যাঙ্গদের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলা, লাইব্রেরি, দাতব্য চিকিৎসা ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়া মূলকেন্দ্র থেকে ২.৫ কিলোমিটার দূরে শচীন তেণ্ডুলকর মার্গে ৫০ একর জায়গা নিয়ে সারদা বালগ্রাম গড়ে উঠেছে। সেখানে পশ্চাৎপদ জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মধ্যপ্রদেশ বোর্ডের অধীন একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি ছাত্রাবাস রয়েছে। যেখানে ১৫০ জন জনজাতি, তপশীলিজাতি ও পশ্চাৎপদজাতির ছাত্র-ছাত্রী বিনাবেতনে থাকা-খাওয়া ও শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। দরিদ্রদের বিনামূল্যে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা, স্বনির্ভর প্রকল্প ইত্যাদি রয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'প্রকৃতির বৈষম্য থাকলেও সকলের সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাকেও অধিক, কাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হবে।' *(বাণী ও রচনা, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৬৬)* স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন দুর্বল ও দরিদ্র জনজাতিদের উন্নয়নে সারাদেশে চেষ্টা করছে। নতুন নতুন রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র গড়ে জনজাতিদের শিক্ষা, খাদ্য ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করছে। যদিও সারাদেশে জনজাতিদের অবস্থা এতটাই করুণ ও দুর্দশাগ্রস্ত যে, তাদের অভাবও অনেকটাই রয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন সাধ্যমতো চেষ্টা করছে কী করে তাদের উন্নত করা যায়। দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য জনজাতিদের উন্নতি খুবই জরুরী। দরিদ্র ও পিছিয়ে-পড়া মানুষদের উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। পাখি যেমন একটি ডানা নিয়ে উড়তে পারে না, তেমনি শুধু কিছু উন্নত জাতি দিয়ে দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।

জনজাতিদের বিন্দুমাত্র উপেক্ষা না করে ভারতীয় গণপ্রজাতন্ত্র এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতোত্তর সময় থেকে এদের সার্বিক উন্নতির জন্য প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার নানানভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনও এই পিছিয়ে-পড়া মানুষদের নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করে ভারতবর্ষের মূল স্রোতে আনার চেষ্টা করে সফলও হয়েছে। ভারতবর্ষ যে জনজাতিদের কখনোই ভুলছে না বা ভুলবে না, তার-ই জীবন্ত ও জাজ্বল্য উদাহরণ হলো ২০২২ সালে ভারতীয় গণপ্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার সাঁওতাল জনজাতির প্রতিনিধি দ্রৌপদী মুর্মুর নির্বাচন। শূদ্র জাগরণ ও নারী জাগরণের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষ স্থাপন করল। বর্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে মানবসভ্যতার উন্নয়নে একটি যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে এটি স্বীকৃত হবে। *(সমাপ্ত)*

পূর্ণত্বের বিকাশ

‘দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব’

স্বামী একচিত্তানন্দ *

ঋষির কণ্ঠ হতে উৎসারিত হয় বেদমন্ত্রধ্বনি। যুগঋষি স্বামী বিবেকানন্দ যখন সুদূর পশ্চিম থেকে গুরুভাই গঙ্গাধরকে চিঠিতে (১৮৯৪) লেখেন, ‘পড়েছ, ‘‘মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব’’। আমি বলি, ‘‘দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব’’ ’—তখন তা আর সাধারণ পত্রসংলাপে সীমাবদ্ধ থাকে না, অনাগত কালের উদ্দেশে তা হয়ে ওঠে ধ্রুব নির্দেশবার্তা। ভবিষ্যতের যুগনির্মাণের সূত্র লুকিয়ে থাকে সেখানে।

ক্রান্তদর্শী ঋষির আপ্তবাক্যের সত্যতা নিশ্চিতভাবেই প্রতিপাদন করেছিল উত্তরকাল। ‘দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর’—স্বামীজীর অনুগামীদের কাছে এঁরাই হয়ে উঠেছিলেন দেবতা; এঁদের সেবা করাই প্রতিপন্ন হয়েছিল নতুন যুগের ‘পরম ধর্ম’ বলে। অনুভবের আলোয় সত্যদর্শন করে এঁরা হয়েছিলেন আপ্তকাম, দেখেছিলেন—আর্ত, পীড়িত নারায়ণের প্রত্যক্ষ সেবায় উন্মোচিত হয় মোক্ষমার্গের সিংহদ্বার।

রামকৃষ্ণ-পরিমণ্ডলে প্রবেশের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন যাঁরা—তাঁদের সকলেরই সুযোগ হয়েছে সঙ্ঘজীবনে এই মহাবাক্যের যথার্থতা মিলিয়ে নেবার।

সুযোগ এসেছিল আমার জীবনেও।

দু-চোখ মেলে দেখেছি—বিরাট সঙ্ঘমন্দিরে ‘ত্যাগ ও সেবা’র বিচিত্র উপচারে মানুষ-দেবতার আরাধনার আয়োজন। বিশেষ করে সমাজের প্রান্তিক অংশ থেকে উঠে আসা মানুষগুলির। ফিরিয়ে দিতে হবে তাদের সম্মান ও মর্যাদাবোধ, জাগিয়ে তুলতে হবে তাদের অন্তরের ঘুমন্ত দেবতাকে। এই নিবন্ধে সেই সেবাসাধনারই কিছু ছবি ভাগ করে নেব সকলের সঙ্গে।

২০০১ সালে সঙ্ঘে প্রবেশ। প্রায় একবছর পর পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে হলো স্থানান্তর।

জানতাম ঃ সেখানে ঠায় বসে আছেন গদাধর।

দর্শন হলো তাঁর।

শ্রীমন্দিরে এবং ‘বিবেক মন্দিরে’ (স্কুলের জুনিয়র সেকশনে)।

এখানে প্রতিমায়, ওখানে জীবন্ত মানুষে।

এখানে ফল-ফুল-ধূপ-দীপের সমাহারে সাজানো পূজার নৈবেদ্য, ওখানে বই-খাতা-কালি-কলম নিয়ে ছাত্র-নারায়ণদের বন্দনা!

বেলুড় মঠ থেকে পুরুলিয়া যাত্রার মুখে মঠের প্রবীণ সাধুরা বলেছিলেন ঃ ‘ক্লাসে ঢোকার মুখে মনে মনে ছাত্রদের প্রণাম করবে।’

তা মনে মনে নয়, জ্যান্ত ‘গদাধর’কে দেখে সামনাসামনি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করবারই অবস্থা।

গদাধর সর্দার। রোগা-পটকা চেহারা, কুচকুচে কালো রঙ, চোখে চশমা। পড়ে তখন পঞ্চম শ্রেণীতে। দিনরাত শুধু ছুটে বেড়ায় এপাশ-ওপাশ। ক্লাসে কখনো পাওয়া যায় না সময়মতো। আঁকার ক্লাস নিবেদিতা কলামন্দিরে। সেখানে তুলি-কলম নিয়ে যাবে না। বিরক্ত মাস্টারমশাই কখনো বা অভিযোগ জানিয়ে বলতেন, ‘বিদ্যাপীঠের এরা ভীষণ ক্ষতি করছে তো!’ পড়াশোনায় এহেন অমনোযোগী ছেলেটি অমন স্কুলে জায়গা পেল কি করে? প্রশ্ন করে যা শুনলাম—তাইতে গায়ের লোম খাড়া হবার জোগাড়। পিতৃহীন গদাধরের গর্ভধারিণী কাজ করতেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এক ভক্ত-দম্পতির বাড়িতে। সেই পালয়িতা-পালয়িত্রী পরম মমতায় এতকাল আগলে রেখেছিলেন ‘পরানপুতুল’ গদাধরকে। এখন বয়স বেড়েছে ছেলের। প্রথাগত পাঠ-গ্রহণের সময় হয়েছে। আশ্রম সম্পাদক পূজনীয় স্বামী উমানন্দজীকে অনুরোধ করেছেন তাঁরা, গদাধরের ‘বিদ্যাপীঠ’ভুক্তির আবেদন সহৃদয়তার সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য। সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়েই মহারাজ ‘নিরাশ্রয়’ গদাধরকে এনে রেখেছেন আশ্রম-আশ্রয়ে।

‘Restlessness personified’ সেই গদাধরকে নিয়ে আমাদের যুদ্ধ চলল বছরের পর বছর। বকাঝকা, কাউন্সেলিং, রেমেডিয়েল কোচিং—আয়োজনে খামতি নেই কোথাও।

তিন বছরের শেষে যুদ্ধে ‘বিরতি’ ঘোষণা করে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে এলাম বেলুড় মঠে, ব্রহ্মচারী

* *সুবক্তা সুলেখক এই তরুণ সন্ন্যাসী নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।*

প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ওদিকে শ্রীমানও কিন্তু চুপ করে বসে নেই। আর ক'টি দিন কাটিয়েই পুরুলিয়া পর্ব মিটিয়ে ফিরে এসেছে স্বধামে। আশ্রম তাকে 'মানুষ' করে তোলার সাধনায় কতদূর সাফল্য শেষমেশ অর্জন করেছিল জানি না। কিন্তু মানুষ-নারায়ণের উপাসনা কী করে করতে হয়—তার প্রাথমিক পাঠ গ্রহণের সুযোগ আমাদের হয়েছিল জ্যান্ত 'গদাধর'কে সামনে রেখেই।

অনেক দিন বাদে বেলুড় মঠে এসে দেখা পাই গদাধরের। পালয়িত্রী 'জননী'র সঙ্গে সে এসেছে মঠে। প্রণাম করে জানাল—পড়াশোনার পাট চুকিয়ে সে তখন বাড়ির পাশেই খুলে বসেছে পসরা, দোকান চালানোর বিদ্যায় হয়েছে তার হাতেখড়ি।

অতি সম্প্রতি 'সোশ্যাল মিডিয়া'র কল্যাণে জানা গেল—গদাধর এখন একটি ওষুধের কোম্পানিতে কাজ করছে; রীতিমতো খ্যাতকীর্তি এক সেলস-এজেন্ট সে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেছে মাথা উঁচু করে।

মঠে ট্রেনিং সেন্টারের পর্ব মিটে যাওয়ার পর বেলুড়ে বিদ্যামন্দির হলো নতুন ঠিকানা। ঠাঁই হলো ছাত্রাবাসে। সেখানে অপেক্ষা করেছিল এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভুবন। সিংহভাগ ছেলে সেখানে গ্রামবাংলা থেকে উঠে আসা। তাদের পড়াশোনা, থাকা-খাওয়ার খরচা বাবদ বড় অঙ্কের স্কলারশিপ দিয়ে থাকে কলেজ। এই তালিকাভুক্ত বেশ কয়েকটি ছেলেকে আবার খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয় ছাত্রাবাসের অধীক্ষক হিসেবে। তারা উঠে এসেছিল স্বামীজীর ঘুম-ভাঙ্গানিয়া গান শুনে, বিদ্যামন্দিরে এসে মুক্তকণ্ঠে গেয়েছিল সেই গান, পরে সে গানের রেশ ছড়িয়ে দিয়েছিল দিক্-দিগন্তরে।

সবার আগে মনে পড়ে দর্শন বিভাগের ছাত্র সুব্রত টুডুর কথা। ছেলেটি পুরুলিয়া থেকে বিদ্যামন্দিরে এসেছিল জীবিকার সন্ধানে। কলেজে ছোট একটি কাজের সূত্র ধরেই তার যাত্রা শুরু। কিন্তু মা সরস্বতীর ভাবনা ছিল অন্যরকম। পড়াশোনায় ছেলের আগ্রহ দেখতে পেয়ে, প্রধান করণিক মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশের জন্য উৎসাহ জোগালেন। তারপর প্রথাগত ভর্তি পরীক্ষায় বসা। সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলো সুব্রত। স্নাতক-স্নাতকোত্তরের পালা শেষ করে, এম.ফিল. করে এখন সে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার কাজে যোগ দিয়েছে।

তালিকায় একটি নিশ্চিত সংযোজন—বিশ্বনাথ পাহাড়ি। মালদার ছেলে। পরম্পরাক্রমে তারা সপরিবারে 'বন্ডেড লেবার'। পূজনীয় দিব্যানন্দজী মহারাজ ছেলেটিকে আবিষ্কার করেন, নিয়ে আসেন আলোর জগতে। পাহাড়ি বিদ্যামন্দিরে স্নাতক বাংলায় পড়াশোনার সুযোগ পায়। সুযোগের সে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-সন্ন্যাসিরা সকলে বাড়িয়ে দেন সহযোগিতার হাত। স্নাতকের পড়াশোনার পাঠ সমাধা করে বিশ্বনাথ স্নাতকোত্তর বাংলায় পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়। এরপর এম.ফিল. শেষ করে সে নলহাটি হীরালাল ভকত কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেয়। এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক, গবেষক।

ছাত্রাবাসে পেয়েছিলাম স্নেহাস্পদ ভাই বাপ্পাকে। বাপ্পা বিষয়ী। গণিতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। চোখেমুখে সেই ঔজ্জ্বল্যের ছাপ। বাড়ি মেদিনীপুরে—শালবনিতে। বাবা প্রান্তিক চাষী। কোন সূত্রে বিদ্যামন্দিরের খবর পেয়েছিলেন জানি না। কিন্তু বাপ্পাকে দেখে মনে হতো ঃ প্রতিষ্ঠান যাদের জন্য পথ চেয়ে থাকে—বাপ্পা ঠিক তাদেরই প্রতিনিধি। পদবীটা 'বিষয়ী' হলেও মনের দিক থেকে বড্ড সরল ছেলেটি। সারল্যই তার সম্বল, সারল্যই তার 'দুর্বলতা'। তারই বলে মুখচোরা ছাত্রদের ভিড়ে বাপ্পা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিল নিজেকে। বিদ্যামন্দিরের শুদ্ধ পরিমণ্ডল তাকে দিয়েছিল সকলের সমবেত আশীর্বাদ। সে আশীর্বাদ বাপ্পা ধারণ করতে পেরেছিল। পরে আই.আই.টি. মুম্বই থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এম.এস.সি., পি.এইচ.ডি. শেষ করেও স্বাভাবিক সারল্যের কারণেই উচ্চতর গবেষণার অঙ্গনে প্রবেশ করতে হাজারো বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়। ঈশ্বরের অশেষ কৃপায় সামূহিক প্রতিকূলতাকে জয় করে সে আজ এলাহাবাদে হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউটে পূর্ণ উদ্যমে 'জ্ঞানযজ্ঞ' উদ্‌যাপন করে চলেছে।

লোকনাথ দাই—ছাত্রমহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি নাম বিদ্যামন্দিরে। কোতুলপুরের ছেলে। অভাবের সংসার, বাড়িতে অশান্তি। দিন কাটত অর্ধাশনে। সালটা ২০১৯। বিদ্যামন্দিরে সে-বছরের মতো স্নাতক পর্বে সংস্কৃতে ভর্তির পাঠ মিটে গেছে। এক পড়ন্ত বিকেলে মাকে নিয়ে লোকনাথ সশরীরে এসে হাজির হয় বিদ্যামন্দিরে। তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহারাজের কাছে সানুনয়ে প্রার্থনা জানায়, তাকে পাঠগ্রহণের সুযোগ করে দেবার জন্য। আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডি ভেঙে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র বিবেচনায় ছেলেটিকে মহারাজ সুযোগ দিলেন। লোকনাথ সেই সুযোগ ষোলো আনা কাজে লাগাতে ভুল করেনি। স্নাতক স্তরে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে সে এখন শিক্ষার বৃহত্তর অঙ্গনে প্রতিষ্ঠার সাধনায় নিমগ্ন।

বিদ্যামন্দিরে তার পরের বছরই এসেছিল সৌমিত্র মণ্ডল। এই ছেলের কথা আলোচনা না করলে এই নিবেদন অসম্পূর্ণ থাকবে। সৌমিত্র একইভাবে সাগরের অন্ধকার

ভূখণ্ড থেকে উঠে আসা। বাবা দিনমজুর। আয়ের আর কোনো উৎস নেই। কোভিড তখন দাপিয়ে বেড়াচ্ছে গোটা বিশ্বজুড়ে। তার ধ্বংসলীলায় সঙ্গী হয়েছে আমফান-ইয়াস। দরিদ্র পরিবারটির একেবারে ছিন্নমূল অবস্থা। বিদ্যামন্দিরে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার মুখে এই ছেলেটি তার খুড়োকে নিয়ে এসে কর্তৃপক্ষের কাছে সানুনয় প্রার্থনা জানায়—যাতে তাকে কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ করে দেওয়া হয়। যেমন 'বেনিয়মী' আবেদন, সংস্কৃতের বিভাগীয় প্রধানের বদান্যতায় এখানেও তেমনি 'বেনিয়মী' বিবেচনা। বিদ্যামন্দির পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলো সৌমিত্র। অতিমারীপর্বে ক্যাম্পাসে সিনিয়র দাদা যে ক'জন ছিল—সবাই এগিয়ে এলো। টেনে তুলতে হবে ভাইটিকে। 'এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা'। 'চরৈবেতি' মন্ত্র শুনেছে সৌমিত্র। সে থামবার পাত্র নয়। পরের পরীক্ষায় অর্জন করল শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীর শিরোপা। এই গৌরব সে আজও ধারণ করে আছে। এখনো।

বিদ্যামন্দির-পর্বে দেখেছিলাম আমাদের নারায়ণপুর আর ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র থেকে উঠে আসা কিছু আদিবাসী ছাত্রকে। অধ্যক্ষ স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজীর ব্যবস্থাপনায় 'পূর্ণত্বের বিকাশে' তারা আজ সকলেই কীর্তিমান, হয়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠানের ভূষণ।

তারপর চলে এলাম নরেন্দ্রপুরে। এখানে 'ব্রহ্মানন্দ ভবনে' এসে শুনতে পাই আরেকটি অলৌকিক কীর্তিগাথা। দুই যমজ ভাই তুষার আর তুহিন। ২০১৯ সালে ভর্তিপর্বে এসে উপস্থিত দুজনে। তুষার এসেছিল ভর্তি হবার ইচ্ছে নিয়ে, তুহিন এসেছিল যাত্রাসঙ্গী হয়ে। তুহিন ভর্তি হবার কথা ছিল না। কেননা—বাড়িতে বাবা-মা রয়েছেন; তাঁদের দেখার কেউ নেই, নেই আর্থিক সঙ্গতিও। সেই কারণে বাবা-মাকে দেখাশোনা করার, আর তাদের আয়ের কিছু ব্যবস্থা করার জন্য তুহিনকে লেখাপড়া বন্ধ করে বাড়িতেই থাকতে হতো। কথা এমনটাই ছিল। কিন্তু কাহিনী হয়ে গেল অন্যরকম। অধ্যক্ষ ভূদেবানন্দ মহারাজ তুষারকে দেখে তার পাশে তুহিনকে ডেকে বললেনঃ 'না, তোমাকেও পড়তে হবে। পড়াশোনার সব খরচ বহন করবে কলেজ।' দুই ভাই একসঙ্গে ভর্তি হলো। সংগ্রাম করল হাতে হাত রেখে। আজ তারা তিন বছরের যাত্রাপথ সম্পূর্ণ করেছে। সাম্মানিক বাংলায় স্নাতক পঠনের সোপান অতিক্রম করে স্নাতকোত্তরের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত।

দুজনকে সামনে দেখি আর 'সালাম' জানাই।
না, তুহিন-তুষারকে নয়, তাদের অন্তরের দেবতাকে!
'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'।
নিশ্চিত প্রতীতি জাগে—জীবন্ত মানুষে তাঁর আরাধনা হয়।
পূজার নৈবেদ্য সানন্দে গ্রহণ করেন তিনি।
জয়তু শ্রীরামকৃষ্ণ!

(৩৯৯ পৃষ্ঠায় 'সেবা চিকিৎসকের পূর্ণতারূপ সভ্যতার কথকতা'র শেষাংশ)

প্রযুক্তি যদি আধুনিক চিকিৎসার চূড়ান্ত রূপ হয়ে থাকে তবে যুক্তিগতভাবে ডাক্তারের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সত্যই কি তাই? চিকিৎসার কৃত্রিম মেধার সঙ্গে মেধাবী চিকিৎসকের প্রকৃতিগত পার্থক্য কোথায়! চিকিৎসকের অন্তরাত্মা প্রযুক্তিসীমার বাইরে, সেখানে সে সেবায় সমাহিত। জীবন না থাকলে সভ্যতা থাকে না। জীবনসঙ্গীতের মিড় ধরা আছে সেবায়। সেবাহীন প্রযুক্তি ও সভ্যতা অনেকটা উপমায় মূর্ত হয় রবীন্দ্রসঙ্গীতে।

'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে ...
আমার সুরগুলি পায় চরণ,
আমি পাইনে তোমারে, ... '

এই 'তোমারে' পাওয়াকে যে-কোনো শাস্ত্রের নির্যাস পাওয়ার সমার্থক। সভ্যতা যত এগিয়েছে, যত নতুন নতুন দিগন্ত বিস্তার হয়েছে, পরিপূরক রূপে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও অভিনব ধারার সংযোজন হয়েছে। ক্রীড়া জগতে এসেছে উন্নত কৌশল ও প্রযুক্তি, সমতুল্যে ক্রীড়া চিকিৎসায় বিশেষত্ব এসেছে। মানুষ মহাকাশে গেছে, তৈরি হয়েছে মহাকাশ চিকিৎসার বিশেষ বিভাগ। পরমাণু শক্তির উন্নতিকল্পে ব্যবহার যখন সভ্যতার করায়ত্ত হয়েছে, তখনই পরমাণু-শক্তিজনিত ক্ষতির চিকিৎসার ধারা উন্মোচিত হয়েছে। নগরোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে শিল্পের প্রসার, শিল্প সংক্রান্ত চিকিৎসার শাখা খুলেছে। সভ্যতার একক মানুষ আর মানুষের সুস্থতার ধারক চিকিৎসক।

চিকিৎসা-শাস্ত্র সর্বতোভাবে সমন্বিত বিদ্যা। তীব্র সামাজিক অভিঘাতের দায় নিয়ে অগ্রসর হতে হলে সেবার অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া অসম্ভব। মেধা এবং মন মিলিত হয় মননে। সেবা ছাড়া মনন-এর স্বতঃস্ফূর্ততা নেই। চিকিৎসকের জীবনের সার্থকতা তার রোগীর সুস্থ রূপায়ণে। সেবা ছাড়া চিকিৎসার পূর্ণাঙ্গরূপ মাত্রা পায় না। তাই **সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের জয়ধ্বজা স্পর্ধিত স্ফলন তখনই সম্ভব, যখন সেবার কোমলতা তার ধারক হয়ে ওঠে।**

ঋণ স্বীকার ঃ কোলাজ-এ ব্যবহৃত ছবিগুলি অন্তর্জাল থেকে সংগৃহীত।

জীবন-শৈলী

দৈনন্দিন অভ্যাসে নাগরিক সচেতনতা

অরিজিৎ সরকার *

জীবন প্রবহমান। নানান তার গতি-প্রকৃতি। উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশার সঙ্গে চক্রবৎ চলে মানুষের জীবন। কখনোই সেই জীবন এক স্থানে স্থবির নয়, এগিয়ে চলাই তার ধর্ম। আজকের শিশু তাই আগামী দিনের নাগরিক। দেশ এবং সমাজের সম্পদ। কিন্তু বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রগতির যুগে নাগরিক হলেও, সচেতন নাগরিক কি সত্যিই আমরা হতে পেরেছি? আমরা পৃথিবীতে জীবন যাপন করি কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের কোনো চেতনা বা হুঁশ নেই। ইংরেজিতে একটি সুন্দর কথা আছে—The purpose of life is life of purpose—অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্য হলো একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন যাপন করা। মনে পড়ে একটি রূপকধর্মী গল্পের কথা। একবার এক গোর্কী সাহেব গ্রামের চাষীদের কাছে গিয়ে বিজ্ঞানের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলছিলেন। চাষীদের মধ্যে একজন তখন বলে উঠল—'Yes we are taught to fly in the air like birds, and to swim in the water like fishes, but how to live on the earth we do not know'—অর্থাৎ *'বাতাসে পাখির মতো উড়তে শিখেছি, জলে মাছের মতো সাঁতার কাটতে শিখেছি, কিন্তু পৃথিবীতে কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় সেটা আমরা জানি না।'* সংসারের জাঁতাকলে হৃদয়বিদারক তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রতা, নম্রতা, মৃদুতা, বিনম্র আচরণ, ক্ষমা, ভালোবাসা, সততা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা—ইত্যাদি অভ্যাসের পরিবর্তনই হলো নাগরিক সচেতনতা। পাশ্চাত্য দার্শনিক ক্লেয়ার বুথ লুসি তাই বলেছেন—'চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়—**মানুষের প্রগতির মূলে আছে তার দৈনন্দিন সৎকার্য, সৎবাক্য, সৎজীবন।**' আসলে এগুলো তত্ত্বকথা নয়, অভ্যাসের গঠন ও পরিবর্তনই আমাদের স্বভাব বা চরিত্র গঠন করে। কোনো কোনো চিন্তাবিদ তাই মনে করছেন যে, আমরা এই জগতে অনেক দিন বেঁচে থাকি না, কেবলমাত্র এক দিনই বাঁচি এবং বাকি দিনগুলোতে সেই একই দিনের পুনরাবৃত্তি করি। তাই দৈনন্দিন জীবন আমাদের ক্ষুদ্র অভ্যাসগুলোকে পরিবর্তন করার সুযোগ দেয়, দেয় নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে। তাই অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য চাই—(১) একটি আদর্শ বা লক্ষ্য, (২) একটি অনুপ্রেরণা, (৩) বাধা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি। ভর্তৃহরির নীতিশতকে আমরা সমাজে চার প্রকার মানুষের কথা জানি। মধ্যপ্রদেশের মালব্য অঞ্চলের কবি ও অজ্ঞেয়বাদী ভর্তৃহরির মতে—(ক) এক ধরনের মানুষ যাঁরা সৎ, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা নিজস্বার্থ বিসর্জন দেন, (খ) দ্বিতীয় স্তরের মানুষ অপরের কল্যাণ করলেও নিজের স্বার্থত্যাগ করেন না, (গ) তৃতীয় স্তরের মানুষ—'মানব রাক্ষস'—যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষাকেও ধ্বংস করতে দ্বিধা করেন না, (ঘ) চতুর্থ প্রকারের মানুষ নিজ স্বার্থসিদ্ধি না হলে অপরের কল্যাণ উদ্যোগ নষ্ট করে দেন। সমাজে এই চার ধরনের মানুষ থাকলেও সমাজ টিকে থাকে ঐ সৎ পবিত্র মানুষগুলোর সমন্বয়ের জন্যই। তাই সচেতন বা প্রবুদ্ধ নাগরিকের জন্য চাই আধ্যাত্মিক বিকাশ। জীব বৈজ্ঞানিক জুলিয়ন হাক্সলি বলেছেন—'**মানুষ যখন তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শরীর উপাধিসমন্বিত ব্যক্তিসত্তাকে সমাজকল্যাণরূপ কাজকর্মের মাধ্যমে ছাপিয়ে যায়, তখনই সে "ব্যক্তি" হয়ে যায়।**' তাই আমাদের সমাজ, পরিবার ও শিক্ষা পদ্ধতিতে চাই জীবনভিত্তিক শিক্ষা—যা তাকে সচেতন করে তুলবে। কথায় আছে—**স্বভাব যায় না মলে।** পুরানো স্বভাব সহজে যায় না, কারণ পুরানো স্বভাব বা অভ্যাসের গোড়ায় রয়েছে পুরানো ক্ষুধা। তাই বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা তাকে বদলাতে হবে। এখন প্রশ্ন আসে কীভাবে এই ক্ষুদ্র অভ্যাস দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর করে

স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী

* *লিলুয়া এম.সি.কে.ভি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের এই অধ্যাপক সুবক্তা হিসাবে জনপ্রিয়।*

নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে, আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করে। উত্তরে বলা যায়—(১) সকালে শয্যা ত্যাগ—এই সময় প্রকৃতি স্থির থাকে, শান্ত থাকে, তাই মনও শান্ত হয়ে যায়। কবির ভাষায়—**'জাগো জাগো যত জ্যোতির তনয়/উঠে পড়, দিন এল, আর ঘুম নয়।'** তাই যতক্ষণ জেগে থাকা সেই পূর্ণ সময়ের সদ্ব্যবহার চাই। (২) পরিচ্ছন্নতা—শারীরিক ও মানসিক স্তরে। দেহের শুদ্ধতা থেকেই মনের শুদ্ধতা গড়ে ওঠে। পূজনীয় স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ খুব ছোট বয়সে মুখ দিয়ে অরুচিকর কোনো শব্দ প্রয়োগে তাঁর গর্ভধারিণী তাঁকে বলেছিলেন জিহ্বায় মা সরস্বতীর অধিষ্ঠান। তাই বিরূপ শব্দ প্রয়োগ মা সরস্বতীকে অবমাননা করে। মহারাজের মা সুশব্দ প্রয়োগের মাধ্যাম মনটিকেও শুদ্ধ করার কৌশলটি শিখিয়েছিলেন। (৩) পোশাক-পরিচ্ছদ, স্বাস্থ্য ও লোকব্যবহার—বলা হয়, 'মালিন্যহীন পোশাক-বিষয়ক সচেতনতা নৈতিক শক্তির একটি উৎস—নির্মল বিবেকের পরই তার স্থান।' ঠিক তেমনই দরকার স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক অভ্যাস গঠন। স্বামীজী বলেছেন—**'স্নায়ুগুলিকে সবল কর। আমাদের প্রয়োজন লোহার মতো শক্ত পেশী এবং ইস্পাতের মতো স্নায়ু। শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু।'** ঠিক তেমনই লোকব্যবহার সম্বন্ধেও চাই সচেতনতা। সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা, অন্যায়ের যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করা (সংঘর্ষ নয়, দলাদলি নয়) এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারণই আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক হতে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে মনীষীদের কথা স্মরণীয়—**'প্রতিবেশীর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক থাকা ভালো; কিন্তু অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে অহেতুক কৌতূহলী হওয়া সুস্থ মনের পরিচয় নয়।'** (৪) সর্বোপরি চাই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ—কর্ণাটকের বেলুড় নামক স্থানে শ্রী চন্নকেশবের মন্দির আছে। মন্দিরটি যখন তৈরি হলো, তখন স্থাপত্যশিল্পের অনুপম দৃশ্য দেখে রাজা বিষ্ণুবর্ধন ভাস্কর জকনাচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—'শিল্পী, মন্দিরের সর্বত্র তুমি তোমার শিল্পপ্রতিভা যেভাবে তুলে ধরেছ, তা সত্যিই অসাধারণ। কিন্তু যেদিকে কেউ তাকাবেও না, সেই নিভৃত কোণগুলিকেও এমন সূক্ষ্ম অলঙ্করণে সমৃদ্ধ করার কারণ কি?' উত্তরে ভাস্কর বলেছিলেন—**'হে রাজন, মানুষের চোখকে তৃপ্ত করার জন্য নয়, ভগবান যাতে দেখে খুশি হন, সেজন্যই আমি মন্দিরের সবটুকু সুন্দর করে তৈরি করেছি। ভগবানের দৃষ্টি সর্বত্র।'**

প্রকৃতপক্ষে অভ্যাস আমাদের দ্বিতীয় প্রকৃতি। অভ্যাস দিয়েই আমরা গঠিত। তাই পুনঃ পুনঃ সৎচিন্তা ও সৎ-কর্মের দৈনন্দিন অনুশীলনই অভ্যাসকে পরিবর্তিত করে সচেতন নাগরিক গড়ে তোলে। আমরা অনেক সময়ই হয়তো পরিস্থিতির চাপে ভয় পাই, পিছিয়ে যাই ভালো কাজ করতে গিয়ে, কিন্তু তা না করে এগিয়ে যেতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়—কলেজ ছাড়ার মুহূর্তে সব ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করলেন—সবচেয়ে মারাত্মক সংক্রামক কি? সবাই বই-পড়া উত্তর দিলেও বিধানচন্দ্র মাথা নেড়ে সেই দিন বলেছিলেন—**'ভয়, ভয়ই হলো মারাত্মক সংক্রামক। একজন ভয় পেলে আরেকজনও ভয় পাবেই।'** তাই আত্মবিশ্লেষণ ও ব্যক্তিবিশ্লেষণ করে এগিয়ে যেতে হবে।

বিধানচন্দ্র রায়

সচেতন নাগরিক হিসাবে মনে রাখতে হবে—**'প্রশ্ন** কোরো না স্বদেশ তোমার জন্য কী করতে পারে; বলো তুমি দেশের জন্য কী করতে পারো; বলো, আমরা একজোট হয়ে মানুষের মুক্তির জন্য কী করতে পারি।' আর এরই জন্য দরকার ক্ষুদ্র অভ্যাসের পরিবর্তন—ইংরেজিতে একটি সমাধান ফর্মূলা—**E A R T H**—অর্থাৎ—'E' মানে—'Evaluate', মূল্যায়ন করা নিজেকে; 'A' মানে—'Act', পদক্ষেপ নেওয়া, ছোট ছোট পরিবর্তন; 'R' মানে—'Review', অর্থাৎ—বিশ্লেষণ করে দেখা আরও একবার; 'T' মানে—'Think'—মননশীলতার প্রয়োগ এবং সর্বশেষে 'H' অর্থাৎ 'Habit'—অভ্যাস চাই।

জীবন তাই Enjoyment, Excitement আর Exhaustion—অর্থাৎ আমোদ-প্রমোদ, উত্তেজনা ও নিঃশেষিত হওয়া নয় বরং প্রবুদ্ধ নাগরিক হয়ে ওঠার এক মঞ্চ। ঐ কথাটি মনে রাখা—If you want to feel rich, just count all the things you have that money cannot buy—আর তার জন্যই চাই অভ্যাস। অবতারবরিষ্ঠ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাই ঘটি নিত্যদিন মাজার প্রসঙ্গে তোতাপুরীকে বলেছিলেন—'তা না করলে এতে ময়লা ধরে যাবে'—দৈনন্দিন ক্ষুদ্র অভ্যাসে নাগরিক সচেতনতার চিরকালীন মহামন্ত্র—**রোজ ঘটি মাজা।**

যুগ–যন্ত্রণা

ডিজিটাল সমস্যার সযত্ন সমাধান

স্বামী সুনির্মলানন্দ *

শিশুরা এখন আর বই পড়ে না। বড়রাও তাই। অতীতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি বই পড়তেন। এখন বই, অনেকের কাছে প্রয়োজনাতিরিক্ত। তাছাড়া বইতেও পড়ার কি আছে? হাতের মুঠোফোনই নিমেষে সবরকম তথ্য, জ্ঞান, বিনোদনের জোগান দিচ্ছে। যে কাউকে জিজ্ঞাসা করুন ঃ এক সপ্তাহে আপনি কতগুলি বই পড়েন? সম্ভবত একটিও নয়। যার অর্থ—বই, বিশেষ করে মুদ্রিত বই হারিয়ে যাওয়ার পথে। ক্রমশ বই বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবেই বিভিন্ন পত্রিকা ও জ্ঞানের অন্যান্য মুদ্রিত আকরগুলিও। এমন দিন আসবে, কাগজের বই উঠে যাবে। বই-এর স্থান হবে জাদুঘর। আর যদি লাইব্রেরী বেঁচে থাকে, সেখানে বই সংরক্ষিত হয়ে থাকতে পারে।

স্কুলগুলিতে এখনও বইয়ের ব্যবহার আছে। তবে লেখার জন্য কলম ও কাগজের ব্যবহার ন্যূনতম। পশ্চিমের দেশগুলিতে ট্যাবেই বাড়ির কাজ সারা হয়। অনলাইনে শিক্ষকেরা পড়ান এবং ছাত্রছাত্রীরা অনলাইনেই তাদের বাড়ির কাজ জমা দেয়। আর অতিমারীতে তো পুরো শিক্ষাব্যবস্থারই পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে কম্পিউটার বা স্মার্টফোন ব্যবহার করে বাড়িতে থেকে পড়াশোনার যে পদ্ধতি চালু হয়েছে, তা শীঘ্রই চলে যাবে, এমনটাও নয়।

প্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে পড়াশোনার এই উন্নতশীল পদ্ধতিই হলো নতুন শিক্ষাব্যবস্থার চিত্র। এই পদ্ধতি নিশ্চিতভাবে থেকে যাওয়ার জন্য চালু হয়েছে। অনলাইনে পড়াশোনার জন্য শিশুদের এখন প্রয়োজন ট্যাবলেট এবং মোবাইল ফোন। যোগাযোগের জন্যও এগুলি দরকার। অতিমারীর সময় থেকেই ইউরোপ ও পশ্চিমের দেশগুলিতে শিশুরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করছে। এর ফলে শিক্ষকেরা তাদের পড়াশোনার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে পারছে। এভাবে, **আধুনিক শিশুটি ট্যাবলেট এবং মোবাইল ফোন ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠছে। যদিও এই দক্ষতা আসক্তি তৈরি করছে।**

এরপর রয়েছে অবসর সময় কাটানোর জন্য নানারকমের গেমস। টেলিভিশন, মোবাইলে কার্টুন দেখলেও ভিডিও গেম চাই। তার জন্য রয়েছে 'প্লে-স্টেশন' অ্যাপ। এই অ্যাপটি শিশুদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে যে, এটা থাকা মানেই সম্মান রইল; যার এটি নেই সে দুর্ভাগ্যের দলে। সে কারণে, ঐসব দেশে এরকম শিশু পাওয়াই যাবে না, যাকে এই অ্যাপটি অন্যের কাছ থেকে চাইতে বা চুরি করতে হবে। ইলেকট্রনিক যন্ত্রের প্রতি শিশুদের এমন-ই আসক্তি।

ট্যাবের মাধ্যমে শিশুর লেখাপড়া

সাম্প্রতিকতম যন্ত্রগুলির মধ্যে বিশেষত মোবাইল ফোনের সঙ্গে প্রত্যেকেরই বন্ধন। কাঠ, পাথর এবং দেওয়ালের গা বেয়ে বেড়েওঠা বিষাক্ত আইভি লতার মতো। শিশুদের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। একটা ধারণা তৈরি হয়েছে যে, এই প্রবণতা ক্ষণস্থায়ী, কারণ এইসব যন্ত্র নতুন এসেছে, তাই ছোট-বড় সবাই এগুলিতে আসক্ত। যখনই এগুলোর ব্যবহার একঘেয়ে হয়ে পড়বে, এই আসক্তিও চলে যাবে। যাইহোক, মনে হয় এই তত্ত্বটিও খাটছে না, কারণ প্রত্যেক দিন নতুন নতুন প্লে-স্টেশন এবং গেমস ফোনে আসছে। সামাজিক মাধ্যমগুলির কথা ভুললেও চলবে না। এই যন্ত্রগুলির মতো এগুলিও প্রলুব্ধ করে।

আপাতদৃষ্টিতে, ব্যবহারকারী তার প্লে-স্টেশন বা ভিডিও গেম চালু রাখতে জানলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু তার বেশি ক্ষতি হবে যদি সেগুলিকে বন্ধ (সুইচ অফ) করে না রাখে। ফোন বা কম্পিউটারে খেলা ভালো, কিন্তু খেলা ছেড়ে বেরিয়ে আসাটাই মনের শক্তির পরিচয়। এটাই

*'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক এই সুবক্তা বিদগ্ধ সন্ন্যাসী আমস্টারডাম, নেদারল্যাণ্ডে 'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি'র ভারপ্রাপ্ত প্রধান।

মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে ফোন বা কম্পিউটারের সুইচ অন্ এবং অফ্ করলেন। কিন্তু ঐ ইচ্ছাটাই এখন বাইরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। **কোনো কিছু ত্যাগ করার ইচ্ছাশক্তি আমাদের দুর্বল।** ঘটনাক্রমে, সম্প্রতি অনেক কার্টুন দেখানো হচ্ছে—এই মোবাইলের যুগে মানুষেরা কেমন ব্যবহার করছে এবং কীভাবে তারা এইসব যন্ত্রের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছে। বড়রা জড়িয়ে পড়ছে, মানছি। কিন্তু শিশু ও কিশোরদের জড়িয়ে পড়া গভীর উদ্বেগের বিষয়। সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার, শিশুরা এইসব যন্ত্রের প্রতি এতটাই আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে যে কোনোভাবেই সেগুলিকে ছাড়তে চাইছে না।

এই হলো পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি।

পশ্চিমে অন্তত যেসব বাচ্চাদের বয়স পাঁচ বছর, তারা মোবাইল ব্যবহার করে, এবং অন্য কোনো কিছুর বিনিময়ে তারা এই যন্ত্রটি হাতছাড়া করতে নারাজ। এর জন্য, বর্তমানে বহু বাবা-মাকে কাউন্সিলিং-এর দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। আর কাউন্সিলার, বাবা-মা এবং সাধারণ মানুষের কাছেও এই বিরূপ পরিস্থিতি প্রথমবার। সুতরাং কাউন্সিলাররাও বা কি উপদেশ দেবেন? তাঁরা কিছুই বলতে পারছেন না। যেটা বলতে চাই, আগের মতো কাউন্সিলাররা উপদেশ আকারে বাচ্চাদের বলতে পারছেন না ঃ 'মোবাইল, ট্যাবলেট রেখে বই পড়ো। যেমন কমিক্সের বই পড়ো।' কারণ, আমরা তো ইতিমধ্যেই বলেছি যে, বই দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়বে, এবং কমিক্সের বইও খুব সহজে আর পাওয়া যাবে না। ঠিক যেমন, **বর্তমানে বিক্রির জন্য রেমিংটন টাইপরাইটার আপনি পাবেন না। হাসির বই, পৌরাণিক হাসির বই এবং ঐ ধরনের বই এখন খুব সহজে পাওয়া যায় না।** হ্যাঁ, আপনি বলবেন, লাইব্রেরী আছে। কিন্তু সেগুলিও নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় উপদেশ হিসাবে বলতে পারেন, 'যাও, বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলা কর।' এটিও একটি সংবেদনশীল উপদেশ হবে না, কারণ, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশগুলির শহরগুলি জনসংখ্যায় একেবারে টইটম্বুর। তাহলে, **খেলার জায়গা কোথায়? এই ভয়ঙ্কর জনারণ্যে খেলার মাঠ কোথায়? আর খেলার সঙ্গীরাও বা কোথায়?** তৃতীয় উপদেশ, **'তোমার বাবা ও মায়ের সাথে কথা বল।'** এটাও সংবেদনশীল পরামর্শ হবে না, কারণ এখানে বড় সমস্যা হলো বাবা-মায়েদের ব্যস্ততা। বর্তমানে উপার্জন-কর্মে নিযুক্ত থাকা বাবা-মায়েদের একটি সামাজিক প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতে এটা ছিল না। এমনকী একশো বছর আগেও বাবা-মা উভয়েরই চাকরি করা সম্ভব ছিল না। এখন দুজনেই উপার্জন করে। দুজনেই ব্যস্ত নিজেদের কেরিয়ারের চিন্তায়। এই পরিস্থিতির দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

সমাজের জন্য যদি সুস্থ পরিবার চাই, তাহলে এই বিষয়টিকে আন্তরিকভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে এবং সমস্যাগুলোর সমাধান প্রয়োজন। এর কারণ, **পরিবার বলতে একটি হোটেল বোঝায় না, যেখানে কিছু যুবক এবং বয়স্করা আহার করে, টিভি দেখে এবং ঘুমোতে যায়। পরিবার হলো একটি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ এবং আধ্যাত্মিক-ক্রীড়া অনুশীলনের স্থান এবং এখানে ভালোবাসার শক্তিতে পরিবারের সবাই উজ্জীবিত হয়।** শুদ্ধ এবং স্বার্থহীন ভালোবাসাই পরিবারের চালিকা-শক্তি। সব পরিবারেই যে এটি সম্ভব হবে, তা নয়। পরিবারকে বাঁচাতে সৎভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে। অসুস্থ পরিবার ভবিষ্যতে অসুস্থ নাগরিক তৈরি করে। আর অসুস্থ নাগরিক মানেই সমাজে কুকর্ম বেড়ে যাওয়া।

কচিকাঁচারা মোবাইলের গেমে ব্যস্ত

বাবা-মা দুজনেই অফিসে। বাচ্চাটি ডে-কেয়ার সেন্টারে কিংবা বাড়িতে পরিচারিকার অধীনে। আর্থিকভাবে মনে হবে সুরাহার, কিন্তু এ খুবই যন্ত্রণার এবং পরিণতি উল্টো হয়। জীবনের যে উষ্ণতা এবং ভালোবাসা পেয়ে বড় হয়ে ওঠার কথা, তা এই শিশুরা পায় না। তারপর, বাবা-মায়ের দুজনেরই কর্মব্যস্ত জীবন দু-ভাবে ক্ষতি করে। একদিকে, বাচ্চারা সঠিক শিক্ষা পায় না, যেহেতু তাদের প্রয়োজনীয় ভালোবাসা থেকে তারা বঞ্চিত। অন্যদিকে, বাড়ির বয়স্ক বাবা-মায়েরাও অবহেলিত হন। ভালোবাসা ও যত্নের অভাবে তাঁরাও কষ্ট পান। অনেক বাড়িই এখন বৃদ্ধাশ্রমে পরিণত হয়েছে। বয়স্ক বাবা-মায়েরা অবহেলিত নাগরিক হয়ে পড়ছেন। তাঁদের দেখার কেউ নেই। লোক রেখে সেবা সমাধানের পথ নয়। উল্টে এটি সমস্যাকে

বাড়িয়ে দেয়। এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষণীয়। এতো অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এইসব বয়স্ক বাবা-মায়েদের চরম অহংকার যে, 'আমার ছেলে অমুক, তমুক, নিউইয়র্ক, আমেরিকায় চাকরি করে।' এভাবে বাবা-মায়েরা এক স্বপ্নের জগতে বাস করে, কিন্তু বাস্তবে সাহায্য, যত্ন এবং দেখভালের অভাবে তাঁরা মনের কষ্টে ভুগেন। **অনেক বয়স্ক মানুষকে তাঁদের মানসিক দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে খোঁজ নেওয়ার কেউ নেই।**

সাধারণভাবে হিন্দুদের পরিবারে বাচ্চার অভাব আছে। একটি পরিবারে সর্বোচ্চ এক বা দুই সন্তান। প্রচীন সেই 'যৌথ পরিবার' বা একসঙ্গে অনেকে বাস করা পরিবারের দেখা পাওয়া এখন দুর্লভ। এক ছাদের তলায় যখন একসঙ্গে পরিবারের অনেকের বাস করার সামাজিক রীতি ছিল, তখন বাচ্চারা সর্বদা সঙ্গী পেত, তাদের যত্ন নেওয়ার জন্য বাড়িতে অনেকে থাকত। বাচ্চাদের নিয়ে বড়দের খুব কম চিন্তা করতে হতো। সবকিছুই ঠিকমতো চলত সামান্য সমস্যা নিয়ে। এখন পরিস্থিতি আলাদা। একটি অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে দশ, পনের তলায় এক-একটি ঘর। এখানে না আছে খেলার মাঠ, না আছে খেলার সঙ্গী। বাইরে যাওয়াও নেই। এক ঘরের মধ্যে বাবা-মায়েরা কাজে ব্যস্ত। বাচ্চারা কি করবে?

একাকী বৃদ্ধা

তাদের কাছে একটিই বিকল্প পথ খোলা আছে। তা হলো মোবাইল কিংবা ট্যাবলেটে বিভিন্ন ভিডিও গেম এবং প্লে-স্টেশনে ব্যস্ত থাকা। অর্থাৎ, তারা একটি অলীক জগতে বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের জীবনে স্বাভাবিক হাসি, মজা এবং খেলা নেই। আর বাবা-মায়েরা টাকা-পয়সার চিন্তায় সদা ব্যস্ত থেকে নিজেদের জগতে বুঁদ। শনিবার এবং রবিবারগুলো আরও ব্যস্ততার চেহারা নেয় পাঠক্রম বহির্ভূত কাজের কারণে। ধীরে ধীরে এইরকম একটি জীবনশৈলী নিয়মে পরিণত হয়, এবং সেটি বাচ্চার চরিত্রে প্রবেশ করে। বাচ্চাদের এইসব যন্ত্রের প্রতি আসক্তি ব্যস্ত বাবা-মায়েদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে! এ ব্যাপারে বকুনি কাজে আসবে না, চেঁচামেচি করেও কিছু হবে না। আর, আগে যেমনটি বলা হয়েছে, কাউন্সেলিং অল্প সাহায্য করতে পারে। কারণ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নতুন।

এবার একটি পরিবারের চিত্র দেখুন। বাবা-মায়েরা ব্যস্ত তাদের কাজ নিয়ে, বাচ্চাটিও মোবাইল কিংবা ট্যাবে খেলায় ব্যস্ত। যতক্ষণ বাচ্চাটি উৎপাত করছে না, ততক্ষণ বাবা-মায়েরাও খুশি, যেহেতু তাঁরা কাজ করতে পারছেন। ঝামেলা হলেই বাড়িতে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু পরিবর্তনও এসেছে কাজের জগতে। দু'বছর আগে যখন ভয়ঙ্কর অতিমারী এল, বাড়িতে থেকে অফিসের কাজ করার রীতি তৈরি হলো। উচ্ছ্বাসে শোনা গেল, 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' (বাড়িতে থেকে কাজ)। সবাই ভাবল, কাজের সঙ্গে পরিবারও জুড়ে গেল, পরিবারে সবার মধ্যে ভালোবাসা বাড়বে, সবাই আরও একসঙ্গে 'বেঁধে' থাকবে। যাইহোক, কাজ মানে তো শুধু কাজ নয়। কাজের মাঝে নিয়মিত অনলাইনে অফিসের মিটিং আছে। আর মিটিং-এর মাঝে যদি বাচ্চাটি কেঁদে ফেলে, মিটিং নিশ্চিতভাবে ভালোভাবে চলবে না। তার চেয়ে বড় কথা, চাকরিটি বিপন্ন হতে পারে। সে কারণে, অনেক বাবা-মা তাদের ছোট্ট শিশুদের, এমনকী বাচ্চা সন্তানদের ডে-কেয়ার সেন্টারে রেখে আসেন, আর নিজেরা বাড়িতে থেকে কাজ করেন। একবার ভাবুন! শিশুটি বাড়ির বাইরে, বাবা-মা বাড়িতে!

তাহলে বিস্মিত হই কেন যখন দেখি, সন্তানেরা বাবা-মায়েদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়? 'আমি যখন ছোট ছিলাম, তোমরা আমাকে দেখনি। এখন আমি কেন তোমাদের দেখব? আমাকেও টাকা উপার্জন করতে হবে এবং আমার পরিবারকে দেখতে হবে।'

এই সবই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা সঠিক ছিলেন। **একটি অসুস্থ সমাজের শিকড়গুলি অসুস্থ পরিবারেই প্রোথিত**। পরিবারে ভালোবাসা, যত্ন, হাসি, মজা, আনন্দ এবং অবসরের অভাবই হলো পরিবারগুলির অসুস্থতার কারণ। সেজন্যই চিরাচরিত পরিবারতান্ত্রিক জীবন গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের কাঠামোগুলো পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু পরিবার থাকবে মূল কেন্দ্রে। যখন সমাজটারই আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, তখন এই ডিজিটাল যুগে কোনো মনোবিদ পুরনো বই ঘেঁটে শিশুকে শেখাতে পারবেন না। তিনি যা করতে পারেন, তা হলো, তিনি বাবা-মায়েদের উপদেশ দেবেন যে, তাঁরা যেন তাঁদের সন্তানদের কথা ভেবে নিজেরাই মানিয়ে নেন।

তাহলে সমাধান কিসে? বলা ভালো, প্রাথমিকভাবে, কেন এইরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়? শিশুদের আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে, গেম খেলতে হবে—এটাই কিন্তু যন্ত্রের প্রতি তাদের আসক্তির কারণ নয়। আসল কারণ, বাবা-মায়েরাই চান তাদের সন্তানেরা এই যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলুক। তাঁরা চান সন্তানরা 'আধুনিক' হোক। আধুনিকতার এই বেদীতে আমরা কি সঁপে দিচ্ছি? আমাদের ঐতিহ্যকে। আপনারা শুধু টাকা উপার্জন করতে চান, আর চান আপনাদের সন্তানেরা 'অতি-আধুনিক' হয়ে উঠুক। উগ্র-আধুনিকতার প্রতি এই আকাঙ্ক্ষাই আপনাদেরকে বাধ্য করছে ঐতিহ্যের বিনিময়ে আধুনিকতাকে আলিঙ্গন করতে। সমস্যাটি এখানেই।

আমরা তাহলে কি বুঝলাম? আগে, ঐতিহ্য মেনে বাবা-মায়েরা সন্তানদের প্রার্থনা করার শিক্ষা দিতেন। আট বছর বয়সে পুত্র সন্তানদের পবিত্র পৈতে পরিয়ে তাকে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করানো হতো। তারপর সে প্রতিদিনই ঐ তেজস্বী মন্ত্রটি জপ করত। মেয়েদেরকে পূজা এবং প্রার্থনার শিক্ষা দেওয়া হতো। এসবই প্রচুর মানসিক শক্তি এবং ইচ্ছাশক্তি অর্জনে সাহায্য করত। এছাড়াও, বাচ্চারা দেখত তাদের বাবা-মায়েরা মন্দিরে যাচ্ছে, বাড়িতে প্রতিদিন পূজা, প্রার্থনা করছে এবং ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছে। **পরিবারের মধ্যেই বিরাজ করত আভ্যন্তরীণ নিয়মানুবর্তিতা, আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ এবং অপার আনন্দ।** সেই আনন্দের মধ্যে আছে ভালোবাসা, পারস্পরিক বোঝাপড়া, যত্নবান হওয়া এবং একে অন্যের প্রতি চিন্তা-ভাবনা।

এখন সবই অতীত। সবাই যেহেতু ব্যস্ত, সেসব প্রায় কিছুই হয় না। বাবা-মায়েরা সকালে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন। এটাই আধুনিক জীবনযাপন। আর সকালে স্কুলের ক্লাস না থাকলে, শিশুরাও দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর শুরু হয়ে যায় চরম ব্যস্ততা। কোনোরকমে সকালের জলখাবার মুখে গুঁজে স্কুলের দিকে, কর্মক্ষেত্রের দিকে দৌড়। **উচ্চ চিন্তা করার সময় নেই। জীবন এখন একটি বোঝামাত্র।**

সমাধানের পথ হলো পূর্বের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনা। দিনের শুরু হবে পূজা এবং প্রার্থনা দিয়ে। প্রার্থনার মতো একটি মূল্যবান এবং সর্বোৎকৃষ্ট স্বাস্থ্যকর অনুশীলনের জন্য এই কম্পিউটার-ক্লিষ্ট পৃথিবীতে কয়েক মিনিট সময় দেওয়ার মতো সময় নেই, সেরকম ব্যস্ত নিশ্চয়ই কেউই নই। পূজা এবং প্রার্থনার জন্য আমরা সময় বেছে নিতে পারি। আপনারা যা করেন, শিশুরা তাই দেখে। **শিশুরা চোখ দিয়ে উপদেশ শোনে।** আপনাদের পূজা-প্রার্থনার সময় ওদের শেখান কীভাবে প্রতিদিন প্রার্থনা করতে হয়। এ ব্যাপারে কড়া মনোভাবাপন্ন হতে হবে। ধীরে ধীরে বয়সের সঙ্গে তাদের ভেতরের শক্তি বাড়বে। তখন তারা নিজেরাই যেকোনো ক্ষতিকারক জিনিস এড়িয়ে চলবে।

দ্বিতীয় যে ঐতিহ্যটি অনুসরণ করতে হবে, তা হলো ইতিহাস পাঠ, বিশেষ করে রামায়ণ। রামায়ণ শুধুমাত্র ইতিহাস বা রামের গল্প নয়। এটি নিজেই একটি সংস্কৃতি। এই বইয়ের পাঠ মানসিক শক্তি জোগায়। মুদ্রিত বই যদি না পাওয়া যায়, অনলাইনে পড়তে হবে। বাড়িতে রামায়ণের মতো বই, ধ্রুব, প্রহ্লাদের জীবনের গল্প এবং এই ধরনের বই-পাঠ শিশুদের মানসিক বিকাশে দারুণ সাহায্য করে। ভিডিও গেম খেলার চেয়ে বই পড়ার অভ্যাস অনেক ভালো।

পূজা ও প্রার্থনাতে পরিবারের সবাই

তৃতীয় যে ঐতিহ্যটি অনুসরণ করা দরকার, তা হলো শিশুদের শ্রদ্ধাবান হতে শেখানো। জ্ঞান, ঐতিহ্যের প্রতি এবং বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। এটি জীবনে মূল্যবোধ তৈরি করে।

চতুর্থ বিষয়টি হলো, শিশুদের বাড়ির বাইরে খেলাধুলায় উৎসাহিত করা।

পঞ্চমত, শিশুদেরকে কাজকর্মে নিয়োজিত করে রাখা। তাদের কিছু কাজ করতে দেওয়া উচিত। ধনী বাড়ির ছেলেমেয়েরা এমনভাবে বড় হয়ে ওঠে যে, তারা আদৌ কখনো কষ্ট জিনিসটা বোঝে না। বড় হয়ে ওঠে মাতৃগর্ভে থাকা বাচ্চার মতো। কোনো পরিণতি নেই। অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীনের দ্বারাই কেবল পরিণতি আসে। তাই আপনাদের সন্তানদের কাজ করতে বলুন। তারপর, তাদের সঙ্গে ভালো কথা আলোচনা করুন, সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করুন। এ সবকিছুই তাদেরকে ডিজিটাল খেলনার কথা ভুলিয়ে দেবে। সন্তান বড় হয়ে উঠবে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে।

জীবনের শাশ্বত নিয়ম—**'আমরা যা দিই তাই ফিরে পাই।'** আমরা ভালোবাসা, স্নেহ, যথার্থ জ্ঞান, প্রশিক্ষণ এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিই এবং যখন আমরা বৃদ্ধ হই, তাই ফিরে পাই।*

* *মূল ইংরাজী থেকে অনুবাদ করেছেন আশ্রম মহাবিদ্যালয় প্রাক্তনী একটি বিদ্যালয়ের ইংরাজী শিক্ষক অরুণ মালাকার।*

সেবা চিকিৎসকের পূর্ণতারূপ সভ্যতার কথকতা

পূর্বা বসু *

আমরা সকলে এই পৃথিবীতে আসি আমাদের সম্ভাব্য উৎকর্ষের বিকাশ এবং তার যথাযথ প্রতিফলন-এর উদ্দেশ্যে। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুসরণে বলতে গেলে কিছু ছাপ রেখে যেতে হয়। মানবজন্ম বৃথা কালক্ষয়ে অতিবাহিত করবার মতো অপচয় আর কিছু নেই। বিশ্বকবির সুরে তাই আকুতির অনুরণন ...

'সংসার মাঝে দু একটি সুর,
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর।
দু-একটি কাঁটা দূর করি দিব,
তারপরে ছুটি নিব।'

কীভাবে জীবনে মাধুরী সাজাই, কীভাবে পাথেয় চয়ন করি, তার অনুসন্ধানেই যদি বেলা বয়ে যায়, তাহলে জীবনে সঞ্চয় রইবে কেমন করে? জীবনের ধন যে জীবনেই উৎসর্গ করে যেতে হয়। জীবন পথে আলোর উৎস হয়ে মহাপুরুষ তো সকলে হতে পারে না। কিন্তু অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহে তরঙ্গ হতে চাইলে রামেশ্বর সেতুবন্ধে কাঠবিড়ালীর মতো আমরা সকলেই সামিল হতে পারি। কাজ করবার ইচ্ছেটুকুই যথেষ্ট, বাকি অকিঞ্চিৎকর!

চিকিৎসক তথা প্রচলিত ভাষায় ডাক্তারের জীবনে কর্মসূত্রে মানুষের জীবন ছুঁয়ে যাওয়ার ডাক বড় সহজে আসে। পেশা তো আরও কত আছে। বুদ্ধিদীপ্ত মান্যগণ্য পরিশ্রমী সফল পেশাজীবী অপ্রতুল নয় মোটেই। সকলেই আপন আপন কর্ম দ্বারা সমাজের ঋণ পরিশোধে ব্রতী। কিন্তু ডাক্তারির মতো এমন কাজের বাগানে সেবার ফুল ফুটে ওঠার আপতন আর কোথায় আছে। চিকিৎসা শাস্ত্রের যথাযথ প্রয়োগে মানুষের জীবন যখন বদলে যায়, তখনই কর্মের সন্তুষ্টির সঙ্গে মানুষের সেবার আশ্চর্য সমাপতন।

পেশাগত শিক্ষার প্রথাগত সমীপে মানুষের জীবন-মৃত্যু রচনায় অংশ নেওয়ার মহার্ঘ অনুভূতি যখন আসে তখন আপনা থেকেই বিনয়াবনত হয় প্রাণ। চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা-প্রার্থীর প্রাণ সমর্পণের যে শর্তহীন বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতা, কোনো চিকিৎসকের সাধ্য কি তার দায়িত্ব নেয় যতক্ষণ না সেবার মন্ত্র তাকে তার দীক্ষায় উত্তীর্ণ করে। শঙ্কর তো ভিখারি হয়েই অন্নপূর্ণার দরজায় এসেছেন, কিন্তু শিবকে পাওয়ার তপস্যা না করলে সে ভিক্ষার তেজ পার্বতী সহ্য করতে পারতেন না। ঠিক তেমনি রুগি প্রার্থী হয়েই ডাক্তারের কাছে আসে, কিন্তু সেবার মন্ত্রে উদ্ভাসিত না হলে সে দায় ডাক্তার-এর বহন করার সাধ্য নেই। চিকিৎসক এবং চিকিৎসাপ্রার্থী যখন নিবেদন এবং সেবার পারস্পরিক বন্ধনে সম্পৃক্ত হয়, তখন তা অনেকটা পুজোর থালায় আরতির আলোর মতো, দেবতা এবং পূজারী দুজনের ওপরেই সে আলোর সমান উদ্ভাস।

চিকিৎসাকে মহান পেশা বলে মিথ্যেই আমরা স্তুতি সাজাই। বৃথাই আমরা চিকিৎসকের ত্যাগ-এর গৌরব গাথা গাই। চিকিৎসা তার বিজ্ঞানের দীপ্তিতে দৃপ্ত। তাই সে সত্য। সে সত্য ধারণের অধিকার সর্বতো আত্মনিবেশ ছাড়া অসম্ভব। সে সেবার-ই প্রতিরূপ। চিকিৎসা তখনই আলো হয়ে ওঠে, যখন জ্ঞানের সঙ্গে সেবারূপী ভক্তির অভিঘাত আসে। জন্ম মৃত্যুর নিয়ন্ত্রণ বিধাতার কাছে—সে কথা ঠিক। কিন্তু যাত্রাপথে আসা যাওয়ার সহায়তাটুকু করতে পারা, কখনও কাউকে ফিরিয়ে আনতে পারার যে অনাবিল আনন্দ, তা ভাষায় বর্ণনা সম্ভব নয়। **শিল্পী যেমন শিল্পের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে শিল্পের সার্থকতার জন্য, ডাক্তারও তেমনি সেবায় দীক্ষিত হয় তার চিকিৎসার সম্পূর্ণতার উদ্দেশে।** কাজের সার্থকতায় তার সর্বোত্তম সন্তোষ, আর সেবা ছাড়া চিকিৎসা অসার্থক।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রকৃত শিক্ষা রুগির সহযোগিতা ছাড়া অসম্পূর্ণ। রোগ এবং রোগীর একাত্মতার মধ্যে চিকিৎসক আত্মমগ্ন হলে তবেই সামঞ্জস্য আসে শিক্ষায়। চিকিৎসক এবং রোগীর সম্পর্ক পৃথিবীর প্রাচীন এবং পবিত্র সম্পর্ক—যা আপনাতে আপনি পূর্ণ। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই সম্পর্ক কলঙ্কিত হতে পারে না। যুগ পরিবর্তনে যদি তা যুগ-যন্ত্রণার রুধির ক্ষরণে কাতর হয়ে পড়ে তাহলে যে চিকিৎসার মূল মন্ত্রটিই অন্তর্হিত হয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি চিকিৎসায় নিত্য নতুন ধারা আনুক, চিকিৎসা পদ্ধতি আরও আরও ঋদ্ধ হোক। কিন্তু চিকিৎসক

** ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসায়েন্স, কলকাতার এই প্রথিতযশা মহিলা চিকিৎসক সতত সমাজশিক্ষার শুভাকাঙ্ক্ষিণী।*

এবং চিকিৎসা প্রার্থীর ঐকান্তিকতা থাকুক অপরিবর্তনীয়ের সুরক্ষায়। ডাক্তারের নিরন্তর যুদ্ধ রোগের সাথে, আর রোগীর সাথে তার জনম-ভোর সেবার আকাঙ্ক্ষা।

'জীবনে জীবন যোগ করা না হলে
কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা।'

স্বামীজীর কর্মযোগ ছাড়া জীবনে জীবন যোগ করবার মহত্তর উপায় আছে কী!

চিকিৎসা পরিষেবা চিকিৎসকের সেবা, চিকিৎসকের সার্থকতা সভ্যতার কথকতা। চিকিৎসকের হাত ধরে প্রাণ আসে পৃথিবীতে, আসে মাতৃজঠর থেকে এক জীবনের প্রথম আবির্ভাব। সেই মুহূর্তের সাক্ষী হওয়ার আনন্দ অনির্বচনীয়। দিক্‌ভ্রষ্ট অথবা অবসাদগ্রস্ত মনের অলি গলি যেখানে পরমাত্মীয়রাও পৌঁছতে পারে না, সেখানে ডাক্তারের অনায়াস ভ্রমণ। আপন মনের গোলোকধাঁধা বুঝতে অপারগ রোগীকে দিক-নির্দেশে আলোয় ফিরিয়ে আনা। মুমূর্ষু রোগীর পাণ্ডুর আননে ধীরে ধীরে জীবনের রঙের সঞ্চার করা। শরীর মনের সংঘাতে বিপর্যস্ত জীবনে আশার দীপ জ্বেলে রাখা। আজীবন ভালো থাকার পথ নির্দেশ, বিপন্মুক্তির মন্ত্র, শরীর-মনের বিপদের রক্ষাকবচ —এ সবই ডাক্তারের হাত ধরে। মৃত্যুমুখে পতিত প্রাণের স্পর্ধিত প্রতিরোধ। এই বিশাল কর্মকাণ্ড কেবল মাত্র বিজ্ঞানের বলে সম্ভব নয়। সেবা, শুশ্রূষা ব্যতীত কোনো অসুখই নিরাময় হয় না। বিজ্ঞান যদি জ্ঞানযোগ হয়, চিকিৎসা তবে কর্মযোগ। সেবারূপী ভক্তিযোগ তার ত্র্যহস্পর্শ। সেখানেই জীবনের আরাধনা সার্থক।

ভক্তিতে নিজেকে ভুলে যাওয়া আর সেবায় আত্মবিস্মরণ একার্থক। তাই ডাক্তারকে চিকিৎসার্থে প্রয়োজনে নিজের জীবনধারা ভুলে যেতে হয়। হয়তো কখনো স্বীয় অসুস্থ পরমাত্মীয়কে ফেলে রেখে রোগীর সেবা গল্পকথা হয়ে ওঠে। নিজ স্ত্রী-সন্তান অথবা জনক-জননীর মৃত্যু উপেক্ষা করে শ্মশান থেকে বিনা অশ্রুমোচনে কর্তব্যে ব্রতী হওয়ার উদাহরণ অপ্রতুল নয়। উৎসবে উপহারে সর্বজনীন আনন্দে সকলে মিশে গেলেও রোগীর শয্যার পাশে অনিদ্রিত ডাক্তারের অভাব হয় না। কত শত পীড়া শুধুমাত্র চিকিৎসকের আশ্বাসবাণীতেই উপশম হয়। এই আশ্বাস জাগিয়ে রাখতে ডাক্তারের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসলেও পিছিয়ে আসা যায় না।

রোগের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে যদি পরাজয় ঘটে, দিনশেষে যেন সম্ভাব্য সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধের সান্ত্বনাটুকু থেকে বঞ্চিত না হয় ডাক্তার। তিলমাত্র অবহেলাও যদি সে পরাজয়ের কারণ হয় তবে সেই লজ্জা, সেই গ্লানি বর্ণনাতীত। **রোগীর মুখের হাসি একমাত্র ডাক্তারের মুখে হাসি হয়ে ফোটে।** কোনো পরিমাণ অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি কোনোদিন তার সমতুল্য নয়। রোগীর ক্ষতির চেয়ে বড় ক্ষতি চিকিৎসকের জীবনে আর কিছু নেই। **রোগীর সন্তোষ ছাড়া চিকিৎসার পেশা অসার্থক।** পেশাই যদি সার্থক না হয়, তবে জীবনের সার্থকতা কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? রোগী এবং ডাক্তারের স্বার্থ একই সূত্রে গাঁথা। এই একমাত্র সত্য চিকিৎসার পটভূমিতে।

চিকিৎসা ব্যবস্থা তো শুধু প্রামাণ্য বিজ্ঞানের ওপরে নির্ভরশীল নয়, একে পুরাকাল থেকে সম্পূর্ণ শাস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়ে এসেছে। শিক্ষা নিজেই বহুমাত্রিক গুণের সমাহার। আর শাস্ত্র হয়ে উঠতে হলে সার্বিক সমন্বয়ের মানে উত্তীর্ণ হতে হয়। চিকিৎসা পদ্ধতির বিবিধ ধারা রয়েছে, যা এককভাবে অথবা পারস্পরিক সংমিশ্রণে প্রযুক্ত হতে পারে। আপাতদৃষ্টিতে পৃথক পৃথক পদ্ধতি মনে হলেও চিকিৎসা পদ্ধতির এই ধারাগুলি পরস্পর বিরোধী নয়। অনেক সময়েই রোগীর স্বার্থে একাধিক ধারা একসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায়। চিকিৎসকের সর্বতোভাবে একমাত্র লক্ষ্য রোগীর সুস্থতা। একথা ভুলে গেলে চলবে না, কোনো একটি বিশেষ চিকিৎসা ধারায় বিশ্বাস বা তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা

চিকিৎসার উদ্দেশ্য নয়, চিকিৎসার অন্তর্নিহিত উপলক্ষ্য রোগমুক্তি। কিন্তু রোগ উপশমের পরেও চিকিৎসকের দায়ভার সমাপ্ত হয় না। রোগীকে মূল সামাজিক স্রোতে

পুনর্বাসনে উজ্জীবন না করতে পারলে সার্থকতা উদ্‌যাপিত হয় না।

চিকিৎসা বিজ্ঞান কোথাও সামাজিক বিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একথা তো সর্বজনবিদিত সমাজসেবা ও সমাজশিক্ষার পৃথক অস্তিত্ব নেই, এই দুই-এর মূলেই সমাজবিজ্ঞান। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমাজের ওপরে যে-কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে হলে সেবা করতেই হবে। মূলত জীবিত থাকা এবং সুস্থ জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় যে-কোনো বিদ্যা-ই সেবার মন্ত্র ছাড়া অধীত হয় না। চিকিৎসা যেহেতু বেঁচে থাকার ন্যূনতম প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার অন্যতম, তাই সেবা এক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে সমন্বিত।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন বিশেষ নবরূপে মান্যতা পেয়েছে। এই দুই বিষয়েই পৃথকভাবে উচ্চশিক্ষার স্বীকৃতি রয়েছে। সেবা এই বিষয়ে প্রধান উপজীব্য। সামাজিক দায় এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের দায়-এর তুলনায় বেশি বৈ কম নয়। অতএব সেবা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়! বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পথ্য এবং রোগ পরবর্তী পুনর্বাসন রোগ উপশমের থেকে দীর্ঘ হয়। একথা অনস্বীকার্য, রোগী সমাজের মূল স্রোতে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকুক তা সর্বতোভাবে কাম্য। সার্বিক পুনর্বাসন ছাড়া চিকিৎসা অসম্পূর্ণ। ঠিক তেমনই রোগ প্রতিরোধ সুস্থ সমাজের পরিচায়ক। যে সমাজে রোগের বিকাশ যত কম, সে সমাজ তত বেশি শক্তিশালী। রোগের চিকিৎসা ব্যয়সাপেক্ষ এবং ব্যক্তি ও সমাজের বুকে অনাবশ্যক অর্থনৈতিক দায় ন্যস্ত করে—যা প্রকারান্তরে উন্নয়নকে দুর্বল করে সভ্যতার পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। তাই রোগ প্রতিরোধ সমাজ তথা সভ্যতার উন্নতির প্রাথমিক শর্ত।

সভ্যতার জয়যাত্রা মানুষের অস্তিত্বের পরিচায়ক।

অগ্রগতি তার নিরন্তর সাধনা। যে মানবজীবন সভ্যতার ধারক ও বাহক-রূপে নিয়োজিত তাকে অবিচ্ছেদ্য রাখতে কেবলমাত্র বিজ্ঞান যথেষ্ট নয়। সেবা ছাড়া বিজ্ঞানকে ধারণ করবার ক্ষমতা কার আছে? আধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর সময়ে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির ব্যাপক অনুপ্রবেশ।

(এর পরবর্তী অংশ ৩৯০ পৃষ্ঠায়)

লাল নীল সবুজের অন্তরে

দেবশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় *

নানা রঙের বাহার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সে আকাশের বুকে রামধনুই হোক বা মাটির পৃথিবীতে ফুলের সম্ভার। কৃত্রিম রঙের বাহারও কম আকর্ষণীয় নয়—পুজোর নতুন জামার রঙ বা নতুন ক্লাসের নতুন বই-এর রঙ!

কেন লাল-নীল-সবুজ? ঃ রঙের কথা যখন উঠল, বা রামধনুর রঙ—তখন সাতরঙ ছেড়ে কেন শুধু লাল-নীল-সবুজ? এই প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দেবে কম্পিউটার নিয়ে নাড়া-চাড়া করা যে-কোনো শিশু-কিশোর—কম্পিউটারের Red-Green-Blue (RGB) colour। ব্যাপারটা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। প্রকৃতপক্ষে যে-কোনো রঙ নির্ধারিত হয় মানুষের দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে। মানুষের দৃষ্টিশক্তি নির্ধারক দুই প্রকার কোষ আছে—'রড' ও 'কোন' কোষ। 'কোন' কোষ তিন প্রকার—লাল রঙ সংবেদনশীল, নীল রঙ সংবেদনশীল ও সবুজ রঙ সংবেদনশীল। এই তিন প্রকার কোষের সুবিন্যস্ত কর্মদক্ষতায় আমরা বিভিন্ন রঙের সমাহার দেখি।

বায়ুমণ্ডলে সূর্যালোকের প্রতিসরণ

জীবজগতে রঙের বৈচিত্র্য

Cosmic microwave background radiation

ট্রাফিক আইন—(fluorescent রঙ)

জীবজগতে রঙ ঃ উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা যখন হলুদ রঙ দেখি, তখন লাল ও সবুজ 'কোন' কোষ একযোগে কাজ করে আমাদের মস্তিষ্কে হলুদ রঙের অনুভূতি জাগায়। এখানে একটি কথা প্রণিধানযোগ্য, বিভিন্ন রঙ আসলে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের [400-700 nm, এক ন্যানোমিটার (nm) এক মিটারের একশো কোটিতম ভগ্নাংশ] তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ। লাল রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি, এবং বেগুনী রঙের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। বর্ণালীর অন্যান্য রঙ—এই দুটির মধ্যবর্তী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের হয়।

আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য বর্ণালীর বাইরেও বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গ বিদ্যমান—দীর্ঘতম দৈর্ঘ্যের 'রেডিও' তরঙ্গ (কয়েকশো মিটার) এবং ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের 'গামা' তরঙ্গ (কয়েক পিকো মিটার, এক পিকো মিটার—এক ন্যানো মিটারের দশ হাজারতম ভগ্নাংশ)। বর্ণালীর (visible spectrum) বাইরে যে-কোনো তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গকে আমরা 'বর্ণহীন' বা 'অদৃশ্য রঙ' বলে উল্লেখ করব।

মানুষ যেমন বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য করতে পারে, কোনো কোনো প্রাণী—যেমন গিরগিটি জাতীয় সরীসৃপ, তাদের শরীরের রঙ পরিবর্তন করতে পারে। বহুরূপীর শরীরেও মানুষের মতো আলোক-সংবেদনশীল নানা কোষ বর্তমান। সাম্প্রতিক গবেষণায় জানা গেছে, সেই কোষগুলি সরীসৃপের চামড়ার নিচে অবস্থান করে। পরিবেশের তাপমাত্রা ও অন্যান্য কারণে এই কোষগুলিতে আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে—যা বহুরূপীর রঙ পরিবর্তনের সহায়ক।

এবার আসা যাক ফুল ও পাতার রঙে। কোনো ফুল সাদা, কোনোটি লাল বা নীল বা হলুদ। কেনই বা গাছের পাতার রঙ সবুজ? এবং পাতা ঝরার সময় বিবর্ণ, ধূসর, কখনো বা লাল, হলুদ? বৃক্ষরাজিতে রঙের এই বাহার আসে বিভিন্ন ধরনের আলোক শোষণকারী কণা (pigment)-র উপস্থিতিতে। এর মধ্যে সমগ্র জীবজগতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কণা হলো ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিল কণা নানা প্রকারের—ক্লোরোফিল-এ, বি, সি, ডি ইত্যাদি। বিভিন্ন ক্লোরোফিল কণা বর্ণালীর বিভিন্ন আলোকরশ্মি শোষণ করে বৃক্ষের সালোকসংশ্লেষে সহায়তা করে—যা সমগ্র জীবজগতের খাদ্যের উৎস। এখানে উল্লেখযোগ্য, 'কণা'টি যে রঙ শোষণ করে তার পরিপূরক (complementary) রঙ বিকিরণ করে। আমরা এই বিকীর্ণ রঙটাই দেখে থাকি। ক্লোরোফিল সবুজ রঙ বিকিরণ করে বলে আমরা গাছের পাতা
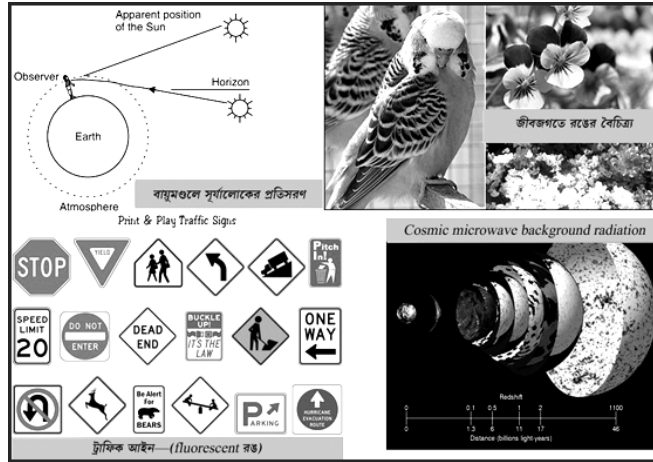
* *অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এণ্ড সায়েন্স, পিলানী, হায়দ্রাবাদ।*

সবুজ দেখি। পরিণত পাতা ঝরে পড়ার সময় এই ক্লোরোফিল কণাটি নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু অনেক সময়েই অন্যান্য আলোক শোষণকারী কণা—যেমন জ্যান্থোফিল—অটুট থাকে। সেই কারণে ঝরাপাতার সবুজ রঙটি নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু অন্য কণার উপস্থিতির কারণে ঝরাপাতা লাল, হলুদ বা ধূসর দেখায়। সবচেয়ে সুন্দর উদাহরণ হলো—শীতপ্রধান দেশে বা হিমালয়ের উচ্চ পার্বত্য এলাকায়, হেমন্ত কালে, প্রায় এককালীন সমস্ত গাছের পাতা লাল-হলুদ বর্ণ ধারণ করে এক অপূর্ব শোভার সৃষ্টি করে—যা 'fall colour' নামে পরিচিত। গাছের পাতার মতো বিভিন্ন ফুলে বিভিন্ন প্রকার আলোক শোষণকারী কণার উপস্থিতিতে ফুলের রঙ ভিন্ন হয়।

জড়জগতে রঙ ঃ রঙের আলোচনায় রামধনুর উল্লেখ না করলে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যায়। রামধনুর সাতরঙ আসে সূর্যরশ্মি থেকে, সূর্যরশ্মিকে প্রিজম (Prism)-এর মধ্য দিয়ে পাঠালে তা সাতরঙে বিভাজিত হয়, কিন্তু আকাশের গায়ে প্রিজম কোথায়? আসলে বৃষ্টিস্নাত আকাশে এক একটি জলকণা এক একটি প্রিজম-এর কাজ করে। বৃষ্টির ঠিক পরে (বা বৃষ্টি চলাকালীন) সূর্যের বিপরীত দিকের আকাশে অর্ধমণ্ডলাকার যে রামধনু দেখা যায়, তার কারণ সংক্ষেপে, সূর্যরশ্মির আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ও প্রতিসরণ। পরিষ্কার আকাশে দুটি রামধনু দেখা যায়। মুখ্য—অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল, ও গৌণ—অপেক্ষাকৃত হালকা। দুটি রামধনুর কারণ জলকণার অভ্যন্তরে আলোকরশ্মি দুবার প্রতিফলিত হয়। এই কারণে একটি রামধনু অপরটির প্রতিচ্ছবি (দর্পণে যেমন দেখা যায়)।

এখন প্রশ্ন, রামধনু যদি সাতরঙা হয়, তবে পরিষ্কার আকাশ কেন নীল? শ্রীরামকৃষ্ণের অনবদ্য উপমায়—দূর বলে আকাশের রঙ নীল, কাছে গেলে কোনো রঙ নেই। আকাশের রঙ নীল—এর কারণ, বায়ুমণ্ডলে সূর্যালোকের বিচ্ছুরণ। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে বলে 'Rayleigh Scattering'—এই বিচ্ছুরণ সম্ভব যখন কোনো আলোকরশ্মির তার চেয়ে কমপক্ষে দশগুণ ছোট বস্তুকণার সাথে সংঘর্ষ ঘটে। দূষণমুক্ত, পরিষ্কার বায়ুমণ্ডলের মূল উপাদান অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস। বর্ণালীর নীল রঙ ও অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন অণুর ব্যাসার্ধ এই বিচ্ছুরণের পক্ষে সবচেয়ে বেশি অনুকূল। বর্ণালীর অন্যান্য রঙের জন্য নয়। এই কারণে পরিষ্কার আকাশে নীল রঙের বিচ্ছুরণ সবচেয়ে বেশি। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে যখন যথেষ্ট পরিমাণে ধূলিকণা বা জলকণা থাকে, তখন এই কণাগুলির আয়তন যথেষ্ট বেশি হওয়ার কারণে বর্ণালীর প্রায় সবকয়টি রঙ মোটামুটি সমানভাবে বিচ্ছুরিত হয়। এবং আকাশ ধূসর (সব রঙের মিশ্রণ) বা মেঘলা বর্ণ ধারণ করে।

আকাশের রঙ নীল, ধূসর বা মেঘলা হলেও সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময় দিক্চক্রবাল অরুণাভ দেখায়। এর জন্য দায়ী লাল-হলুদ রঙের দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য। দিক্চক্রবাল থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রমকালে সূর্যরশ্মিকে বিভিন্ন ঘনত্বের বায়ুস্তর ভেদ করতে হয়। ঘনত্বের তারতম্যের কারণে বর্ণালীর বিভিন্ন রঙের প্রতিসরণ (সহজভাবে বলতে গেলে আলোর গতিপথ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত হয়) ভিন্ন হয়ে থাকে। লাল-হলুদ বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য দীর্ঘ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত এই রঙগুলি ভূপৃষ্ঠে মনুষ্যদৃষ্টিগোচর হয় ও দিক্চক্রবাল লাল দেখায়।

বর্ণ ও বর্ণহীনের সহাবস্থান ঃ কখনো কখনো দেখা যায়, বর্ণহীন বস্তু হঠাৎ করে বর্ণময় হয়ে ওঠে। যেমন রাতের অন্ধকার রাস্তায় 'Speed-limit Board'-এর উপর গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়লে বোর্ডটি আলো বিকীর্ণ করে—যা অন্য সময়ে আপাত-'বর্ণহীন'। এই আপাত-বর্ণহীনের রঙিন হওয়ার ঘটনাকে 'fluorescence' বলে। এর কারণ দেখতে হলে আলোককণা ও বস্তুর পারস্পরিক আদানপ্রদান বুঝতে হবে। যখন কোনো একটি বস্তু একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ করে, তখন বস্তুর অন্তর্গত ইলেকট্রন অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে। কিন্তু ইলেকট্রন এই অতিরিক্ত শক্তি অল্প সময়ের মধ্যে (কয়েক ন্যানোসেকেণ্ড) বিকিরণ করে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। Fluorescence-এর ক্ষেত্রে শোষিত আলোকরশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম (অতিবেগুনী রশ্মি) ও বিকিরিত রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি (বর্ণালীর যেকোনো রঙ), সেই কারণে রাতের ক্ষীণ আলোকের উপস্থিতিতে আপাত-বর্ণহীন বস্তু ক্ষণিকের জন্য বর্ণময় হয়ে ওঠে। বর্ণালী বা বর্ণহীন রশ্মির সহাবস্থান যেন রূপ আর অরূপের খেলা। রশ্মি বর্ণহীন হলেও তার প্রয়োগ অপরিসীম। আমরা একটি উদাহরণ দিয়ে এই আলোচনা শেষ করব। দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের—Cosmic microwave background radiation (CMBR)। এই CMBR সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। শক্তিশালী রেডিও টেলিস্কোপের সাহায্যে এই বিকিরণ ধরা পড়েছে। এই CMBR বিকিরণ আসলে ব্রহ্মাণ্ড শুরু (Big Bang)-এর সমকালীন 'অবশিষ্ট বিকিরণ'। এই CMBR-এর সাহায্যে ব্রহ্মাণ্ডের বয়স নির্ধারণ করা হয়। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য বৈজ্ঞানিক আর্নো পেনাজী ও রবার্ট উইলসন্ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন ১৯৭৮ সালে।

তরঙ্গমালা, শক্তি ও সময়ের এই অপরিসীম বিস্তার, বিন্যাস ও পুনর্বিন্যাস মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে। তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য লাল-নীল-সবুজের সীমানায় অসীম 'অদৃশ্য বর্ণ' উঁকি মেরে যায়।

লালকেল্লা

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের গৌরব নিশান !

তাপস বেরা *

লালকেল্লা (Red Fort) খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাচীর-বেষ্টিত পুরনো দিল্লী (অধুনা দিল্লী, ভারত) শহরে মুঘল সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত একটি দুর্গ। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই দুর্গটি ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশরা এই দুর্গটিকে একটি সামরিক ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করত। বর্তমানে এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের একটি শক্তিশালী প্রতীক। ২০০৭ সালে লালকেল্লা ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে নির্বাচিত হয়।

১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান সুবৃহৎ এই কেল্লাটির নির্মাণকার্য শুরু করেন। প্রথম দিকে এই দুর্গের নাম ছিল 'কিলা-ই-মুবারক' ('আশীর্বাদধন্য দুর্গ'); কারণ এই দুর্গে সম্রাটের পরিবারবর্গ বাস করতেন। দুর্গটি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর জলেই পুষ্ট হতো দুর্গপ্রাকারের পরিখাগুলো। দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোণের প্রাচীর সালিমগড় দুর্গ নামে অপর একটি প্রাচীন দুর্গের সঙ্গে সংযুক্ত। ১৫৪৬ সালে ইসলাম শাহ সুরি এই প্রতিরক্ষা দুর্গটি নির্মাণ করেছিলেন। লালকেল্লার পরিকল্পনা ও সাজসজ্জা শাহজাহানের শাসনকালে মুঘল স্থাপত্য ও চিত্রকলার উৎকর্ষের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে লালকেল্লা ছিল দিল্লী ক্ষেত্রের সপ্তম নগরী তথা শাহজাহানের নতুন রাজধানী শাহজাহানাবাদের রাজপ্রাসাদ। পরবর্তিকালে অবশ্য তিনি দিল্লী থেকে আগ্রা শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

দিল্লীর ঐতিহাসিক দুর্গ লালকেল্লা

লালকেল্লায় বসবাসকারী শেষ মুঘল সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের ব্যর্থতার পর ১৭ সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ জাফর লালকেল্লা পরিত্যাগ করেন। পরে তিনি ব্রিটিশ বন্দী হিসেবে এই দুর্গে ফিরে আসেন। এখানেই ১৮৫৮ সালের ২৭ জানুয়ারি তাঁর বিচার শুরু হয় এবং ৭ অক্টোবর তাঁকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হয়। এরপর লালকেল্লার কর্তৃত্ব ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে চলে যায়। তারা এটিকে একটি ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে থাকে। ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের পরাজয়ের পর লালকেল্লাতেই যুদ্ধবন্দীদের বিচার হয়। স্বাধীনতার পর থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এই কেল্লাটি ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণাধীন।

স্থাপত্য ঃ লালকেল্লার অলংকরণ ও শিল্পকর্ম অতি উচ্চমানের। পারসীক, ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিল্পকলার সংমিশ্রণে সৃষ্ট এই অভিনব শিল্পকলা ব্যঞ্জনাময়, বর্ণময় এবং স্বতন্ত্রতার দাবিদার। দিল্লীর লালকেল্লা ভারতের সেই সকল স্থাপনাগুলোর অন্যতম—যার সঙ্গে ভারতীয় শিল্পের যোগ ঐতিহাসিকসূত্রে গ্রথিত। স্থাপত্যসৌন্দর্যের বিচারেও এই দুর্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে ১৯১৩ সালে লালকেল্লা জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন স্থাপনারূপে ঘোষিত হয় এবং সরকার কেল্লার রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে।

দুর্গের প্রাচীর মসৃণ এবং দৃঢ়। দুর্গের দুটি প্রধান দরজা ঃ দিল্লীগেট ও লাহোরগেট। লাহোরগেট হলো প্রধান দরজা। এই গেট দিয়ে ঢুকলে একটি লম্বা আচ্ছাদিত বাজারপথ পড়ে। এর নাম চট্টাচক। এই পথের দু-দিকের দেওয়াল দোকানের মতো করে স্টল দিয়ে সাজানো। চট্টাচক ধরে সোজা এলে উত্তর-দক্ষিণ পথ পাওয়া যায়। এই পথটি আসলে দুর্গের পশ্চিমের সামরিকক্ষেত্র ও পূর্বের রাজপ্রাসাদের সীমানা। এই পথের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত দরজাটিই হলো দিল্লীগেট।

লালকেল্লার অভ্যন্তরীণ স্থাপনাসমূহগুলি নিম্নে আলোচিত হলো।

দেওয়ান-ই-আম ঃ দিল্লীগেটের বাইরে একটি বড়ো মুক্তাঙ্গন রয়েছে। এটি এককালে **দেওয়ান-ই-আম**-এর অঙ্গনরূপে ব্যবহৃত হতো। এখানে *ঝরোখা* নামে

* *আশ্রম মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী তরুণ এই ইতিহাসবিদ্ শান্ত ও সুমিষ্ট ব্যবহারে সর্বজনপ্রিয়।*

একটি অলংকৃত সিংহাসনে বসে সম্রাট জনসাধারণকে দর্শন দিতেন। এই স্তম্ভগুলো সোনায় চিত্রিত ছিল এবং সোনা ও রুপোর রেলিং দিয়ে সাধারণকে সিংহাসনের থেকে পৃথক করে রাখা হতো। দেওয়ান-ই-আমের থাম এবং গম্বুজ এমন পরিকল্পিতভাবে নির্মিত হয়েছে যে, কক্ষের যেকোনো স্থান থেকে সিংহাসনে আসীন বাদশাকে ভালোভাবে দেখা যাবে, এবং একই রকমভাবে তাঁর বক্তব্য শোনা যাবে। এই বিখ্যাত সভাগৃহের মধ্যেই সংস্থাপিত ছিল শাহজাহানের

দেওয়ান-ই-আম

শিল্পপ্রীতির আর একটি বিখ্যাত নিদর্শন এবং মহার্ঘ-সৃষ্টি ময়ূর সিংহাসন। শিল্পী বেবাদল খাঁ নির্মিত এই সুদৃশ্য সিংহাসন মণি-মাণিক্য আর রত্নে ভরা। পারস্য সম্রাট নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণকালে এই রত্নখচিত মহামূল্যবান সিংহাসন লুণ্ঠন করে নিয়ে চলে যান।

দেওয়ান-ই-খাস ঃ দেওয়ান-ই-খাস ছিল পুরোপুরি শ্বেতপাথরে মোড়া একটি কক্ষ। এর স্তম্ভগুলো পুষ্পচিত্রে সজ্জিত ছিল। ভিতরের অলংকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল প্রায়-মহামূল্যবান ধাতুসমূহ। দেওয়ান-ই-খাস তার গঠনগত সৌষ্ঠব আর মহার্ঘ অলংকরণের জন্য বিখ্যাত। এই সুদৃশ্য সৌধের ছাদের নীচের অংশ রুপার পাত দিয়ে মোড়া ছিল। বার্নিয়ের মতে, এই রুপার মূল্য ছিল প্রায় ২৬ কোটি ফ্রাঁ। রুপার পাতমোড়া ছাদ আর তিনদিকে মার্বেল, সোনা আর মণিমুক্তাদি সুসজ্জিত এই সৌধ সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষের চোখ এবং হৃদয়কে ক্ষণিকের জন্য হলেও শান্তি আর আনন্দের রাজ্যে নিয়ে যেতে সক্ষম। এই ইমারতটি অন্যগুলির তুলনায় কিছুটা খোলামেলা। ৯০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৬৭ ফুট প্রস্থে বিন্যস্ত এই ইমারতের সম্মুখ-ভাগের দেওয়াল পাঁচটি সম মাপের বহুভুজাকার খিলান দ্বারা শোভিত। এর কোনো পার্শ্বে আবেষ্টনী প্রাচীর না থাকায় সর্বদা শীতল বাতাস এখানে খেলা করতে পারত। মসৃণ মার্বেলে মোড়া মেঝেগুলো আয়নার মতোই স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল মনে হতো। বিশ্ববিখ্যাত একটি কাব্যিক ছন্দ এই ইমারতকে স্মরণীয় করে রেখেছে। এর দেওয়ালে ফারসীতে লেখা আছে—

'আগার ফেরদৌস বারি যামিনাস্ত
ও হামিনাস্ত, নামিনাস্ত, ও হামিনাস্ত।'

এর অর্থ হলো—'পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে, তা এখানে, এখানে, তা এখানে।' 'শাহ-মহল' নামেও পরিচিত এই মহলের বহির্ভাগের মার্জিত এবং সৌম্য রূপ অভ্যন্তরভাগে ততটা চোখে পড়ে না। শ্বেত-শুভ্র মার্বেল পাথরে নির্মিত এই সৌধের অভ্যন্তরভাগের অতি-অলঙ্করণ এবং দামী স্বচ্ছ ধাতুর মাত্রাহীন প্রয়োগ চোখের সামনে বিদ্যুতের ঝলকানি সৃষ্টি করতে পারে।

নহর-ই-বেহিস্ত ঃ সিংহাসনের পশ্চাতে ছিল সম্রাট পরিবারের নিজস্ব কক্ষগুলো। এই কক্ষগুলো দুর্গের পূর্বপ্রান্ত-ঘেঁষা দুটি কক্ষের সারির উপর অবস্থিত ছিল। এই সারি দুটি উচ্চ বেদীর উপর অবস্থিত ছিল এবং কক্ষগুলো থেকে যমুনা নদীর দৃশ্য দেখা যেত। কক্ষগুলো নহর-ই-বেহিস্ত *(স্বর্গোদ্যানের জলধারা)* নামে একটি নিরবচ্ছিন্ন জলধারা দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই জলধারা প্রত্যেক কক্ষের মাঝ

দেওয়ান-ই-খাস

বরাবর প্রসারিত ছিল। যমুনা নদী থেকে দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত *শাহবুর্জ* নামে একটি মিনারে জল টেনে তুলে এই জলধারাকে পুষ্ট করা হতো। ইসলামি শিল্পকলা অনুযায়ী নির্মিত হলেও এই সব কক্ষে হিন্দু শিল্পকলার প্রভাবও খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাসাদ প্রাঙ্গণটিকে মুঘল স্থাপত্যশৈলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে করা হয়।

জেনানা ঃ প্রাসাদের সর্বদক্ষিণে অবস্থিত কক্ষ দুটি ছিল *জেনানা* বা মহিলাদের বাসস্থান। ছোট কক্ষটির নাম **মুমতাজমহল** (বর্তমানে একটি সংগ্রহালয়) এবং অপরটির নাম **রংমহল**। রংমহল তার চাকচিক্যময় অলংকৃত সিলিং এবং *নহর-ই-বেহিস্ত*-এর জলধারাপুষ্ট শ্বেতপাথরের জলাধারটির জন্য প্রসিদ্ধ। দেওয়ান-ই-খাস-এর মতো এই সুদৃশ্য সৌধের সাথে পাল্লা দিয়েই নির্মিত হয়েছে 'রঙ্গমহল' বা 'ইমতিয়াজমহল'। সমকালীন জনৈক সভাপণ্ডিতের মতে,

'এই সৌধ স্বর্গের কল্পিত নন্দনকাননের থেকেও সুন্দর।' মহম্মদ শলাহি-র মতে, এই সৌধের ছাদের নিম্নাংশ প্রথমে সোনার পাত ও ফুল দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল। পরে সোনার পরিবর্তে রুপার পাত ব্যবহার করা হয়। আরো পরে আর্থিক কারণে সম্রাট ফারুকশিয়ার রুপার পরিবর্তে তামার পাত এবং সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তামার পরিবর্তে কাঠের আস্তরণ ব্যবহার করেছিলেন। পারিপার্শ্বিকতা এবং অলংকরণের বিচারে এই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া সৌধটি প্রকৃত অর্থেই ছিল শাহজাহানের সৌন্দর্যবোধ এবং স্থাপত্যবোধের অন্যতম নিদর্শন।

মোতি মসজিদ ঃ হামামের পশ্চিমে রয়েছে **মোতি মসজিদ**। এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল অনেক পরে। ১৬৫৯ সালে শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব ব্যক্তিগত মসজিদ হিসেবে এটি নির্মাণ করেন। এটি একটি ছোট, তিন-গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ। এটি পুরো শ্বেতপাথরে নির্মিত। মুক্তার মতো দ্যুতির জন্য এই মসজিদের নাম মোতি মসজিদ হয়েছে। মোতি মসজিদ আগ্রা দুর্গের দেওয়ান-ই-আম কমপ্লেক্স-এর উত্তরে অবস্থিত। এর গম্বুজ সংখ্যা তিন। এগুলো মার্বেল নির্মিত ও লাল বেলেপাথরের দেয়ালের উপর অবস্থিত। মসজিদটি নির্মাণে ১ লক্ষ ৬০ হাজার রুপি খরচ হয় এবং এতে চার বছর সময় লেগেছিল।

মোতি মসজিদ

জামি মসজিদ ঃ দুর্গনগরী শাহজাহানাবাদের গৌরব তথা সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে বৃহত্তম ধর্মগৃহ হিসেবে স্বীকৃত এবং গঠনরত সৌষ্ঠবের জন্য সমাদৃত 'জামি মসজিদের' নির্মাণ কাজ শাহজাহান ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে শুরু করে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন। লালিত্যের অভাব না-থাকলেও এই সৌধের বিশালতা ও গাম্ভীর্যপূর্ণ অলংকরণের মাধ্যমে এর কঠিন ও উদ্ধত রূপ চোখে পড়ে। দিল্লীর জামি মসজিদের প্রায় সমসাময়িক কালে শাহজাহান আগ্রা দুর্গের বাইরেও একটি 'জামি মসজিদ' নির্মাণ করেন। সম্ভবত প্রিয় কন্যা জাহানারাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই তিনি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। দিল্লীর জামি মসজিদের মতো বিশালতা, জাঁকজমক বা চাকচিক্য আগ্রার মসজিদে ছিল না। তবুও এর অবয়বে এমন কিছু সৌন্দর্যশ্রী ও কমনীয়তা ছিল, যা হৃদয়কে স্পর্শ করে।

হায়াত বক্স বাগ ঃ কেল্লার উত্তরে রয়েছে একটি আনুষ্ঠানিক উদ্যান। এর নাম **হায়াত বক্স বাগ** বা *জীবন প্রদায়ী উদ্যান*। উদ্যানটি দুটি পরস্পরচ্ছেদী জলধারা দ্বারা বিভক্ত। উত্তর-দক্ষিণ জলধারাটির দুই প্রান্তে দুটি কক্ষ রয়েছে। ১৮৪২ সালে শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর তৃতীয় কক্ষটি নির্মাণ করেন উদ্যানকেন্দ্রের দুই জলধারার ছেদনস্থলের উপরে।

আজকের লালকেল্লা ঃ লালকেল্লা পুরনো দিল্লীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দর্শনীয় স্থান। প্রতি বছর সহস্রাধিক পর্যটক এই কেল্লাটি দেখতে আসেন। এই কেল্লার প্রাঙ্গণেই প্রতি বছর ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। লালকেল্লাকে পুরানো দিল্লীর বৃহত্তম স্থাপনাও বলা যেতে পারে।

বর্তমানে সন্ধ্যায় 'লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো'র মাধ্যমে কেল্লার মুঘল ইতিহাসের প্রদর্শনী করা হয়। এখানে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে শহিদদের স্মৃতিতে একটি জাদুঘরও রয়েছে। এই জাদুঘর ছাড়াও রয়েছে একটি পুরাতাত্ত্বিক জাদুঘর ও একটি ভারতীয় যুদ্ধস্মারক সংগ্রহালয়।

২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে লস্কর-ই-তৈবা নামক জঙ্গিগোষ্ঠীর আক্রমণে লালকেল্লা প্রাঙ্গণে দুই সেনা জওয়ান ও এক সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়।

এই প্রাসাদের বিশালতা ও উচ্চতা সারা বিশ্বের স্থাপত্যবিদদের বিস্ময় উদ্রেক করে কেবল মুঘল স্বৈরতন্ত্রের নয়; বর্তমান ভারতবর্ষের দৃপ্ত গৌরবের স্মারক হিসেবে আজও এই কেল্লা তার দায়িত্ব পালন করে চলেছে। অধ্যাপক সরস্বতী লিখেছেন ঃ 'It excels the other Moghul palaces in the largeness of its conception, in the uniformity of its arrangements and in the magnificence of its execution.' **অতীতের স্মৃতি, বর্তমান অভিজ্ঞতা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে আজও এই দুর্গ-প্রাকার ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের গৌরব-নিশান বহন করে চলেছে।**

তথ্যসূত্র ঃ ১) The red fort : an account of the siege of Delhi in 1857—James Leaser. ২) Dilli's red fort by Yamuna—N L Batra. ৩) ভারত ইতিহাস পরিক্রমা—প্রভাতাংশু মাইতি। ৪) মুঘল-রাজ থেকে কোম্পানি-রাজ (১৫৫৬-১৮১৮ খ্রিঃ)—গোপালকৃষ্ণ পাহাড়ী। ৫) উইকিপিডিয়া (মুক্ত বিশ্বকোষ)।

মধ্যযুগ

সামন্ততান্ত্রিক যুগে ভারতীয় প্রযুক্তি

মৌসুমী ঘোষ *

প্রখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীরাধাকান্ত সোম এক প্রবাদ-প্রতিম ব্যক্তিত্ব। কত ছাত্র তিনি গড়েছেন তার পরিসংখ্যান দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর কাছে ইতিহাস এক বহমান নদী, যেখানে আমরা উৎস থেকে মোহনায় যাওয়ার বদলে মোহনায় দাঁড়িয়ে উৎসের দিকে যাত্রা করি। তাঁর নানান লেখায় তিনি পুরনো ঘটনাকে নতুন আলোর বৃত্তে এনে নানান তথ্য জানিয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক ভারতের নানান ঘটনা, নানান তথ্য নিয়ে তিনি তাঁর নতুন বই প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাঁর প্রিয় ছাত্র ঋদ্ধিমান তাঁকে জানিয়েছেন যে, বইটিতে কিছু অসংগতি তার চোখে পড়ছে—যা সে নিজে তার গুরুর কাছ থেকে সঠিকভাবে জেনে নিতে চায়। রাধাকান্তবাবু তাই এখন ঋদ্ধির অপেক্ষায়।

সকাল দশটায় কলিংবেল বেজে উঠল। গুরু বুঝলেন ছাত্র আসছে নিজের doubts clear করতে। 'ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের যুগ'—তাঁর খুব প্রিয় অধ্যায়। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামজীবন এই সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এখানে কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তির বিকাশ ঘটে এবং স্থানীয় ভূস্বামীদের হাতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে—কি বলতে আসছে ঋদ্ধি? কোন্ অসংগতি?

সামন্ততান্ত্রিক যুগের কৃষিযন্ত্রপাতি

রাধাকান্তবাবুর মনে পড়ে যায় ঋদ্ধির কলেজ-জীবনের কথা। যে-কোনো ব্যাপারেই কোনো উদ্ধৃতি দিতে গেলে, সে বিদেশী অপেক্ষা দেশীয় পণ্ডিতদের প্রাধান্য দিত। সামন্ততন্ত্র পড়াতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, ঋদ্ধির পছন্দ ছিল এ কে নাজামুল করিম-এর অভিমত, যেখানে তিনি বলেছেন—**'সামন্ততন্ত্র প্রথা বলতে এমন একটি সমাজ ও সংস্কৃতিকে বোঝায়, যেখানে ভূমিই হচ্ছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি।'**

ভারতীয় সামন্ততন্ত্রে যেহেতু কৃষিজমির মালিকানা ছিল সামন্ত-প্রভুদের হাতে, তাই অর্থনৈতিক কাঠামোতে সামন্ত-প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ক্লাস নিতে গিয়ে তিনি দেখেছেন, ঋদ্ধির পক্ষপাতিত্ব সবসময় সামন্ত-প্রভুর পরিবর্তে কৃষকের উপরে। সামন্ততান্ত্রিক যুগে গ্রামজীবনের বিকাশ ঘটেছিল এবং নগরায়ন ব্যাহত হয়েছিল। কৃষি ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নিয়ন্তা এবং শিল্প ও বাণিজ্য ছিল গৌণ। জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল কিন্তু তাতে কৃষকের মালিকানা ছিল না, তা ছিল রাষ্ট্রের অধীনে। যখন থেকে একটির পরিবর্তে দুটি প্রধান ফসল কৃষিজমিতে উৎপাদন শুরু হয়, তখন থেকেই কৃষি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থার গুরুত্ব বাড়ে। এই মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় প্রযুক্তির দিকটি প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়।

প্রফেসারের চিন্তায় ছেদ পড়ে ঋদ্ধি প্রবেশ করায়। অনেক দিন পর প্রিয় ছাত্রকে দেখে তাঁর দুই চোখ আনন্দে চক্‌চক্ করে ওঠে। বলেন, 'বল, কি তোমার doubts ?' ঋদ্ধি তাঁকে প্রণাম করে বলে, 'স্যার, আমি আপনাকে এবিষয়ে আরও কিছু information দিতে চাই, যদি আমার ধৃষ্টতা মনে করেন, তাই doubts বলেছিলাম।'

প্রফেসারের বুক গর্বে ভরে ওঠে। যোগ্য ছাত্র তাঁর। মুখে বলেন, 'বলো, তুমি কি বলবে? আগে জলসেচটা দেখ।' ঋদ্ধি বলে, স্যার আগে আপনার লেখাটা পড়ছি—'মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়ে প্রবহমান নদীতে বাঁধ দেওয়া সহজ। পঞ্চদশ শতকে কর্ণাটকের মদতে তিনটি মাটির বাঁধের মধ্যে একটি ছিল ২৪০ মিটার চওড়া ও তলদেশ থেকে ৩০ মিটার উঁচু, ১৬-২৪ কিমি দীর্ঘ এই হ্রদকে পূর্ণ করতে ২০ টন ওজনের একটি পাথরের উপর ছিল এক বিশালকায় স্লুইস
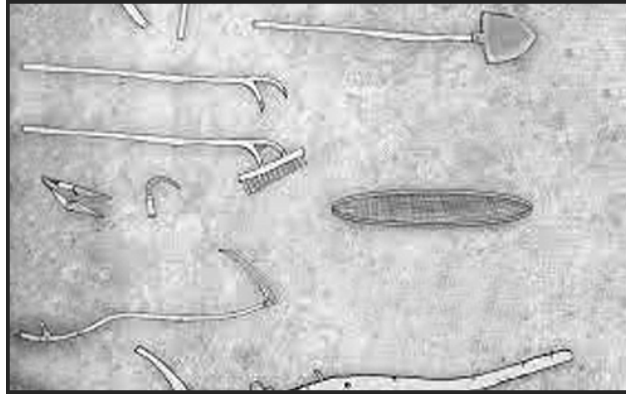
* *আশ্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই শিক্ষিকা গৃহবধূ লেখনীর সুব্যবহারে জনপ্রিয়।*

(জলকপাট)। এছাড়া একাদশ শতকের মধ্যভারতে রাজাভোজ-নির্মিত জলাধার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চোল রাজাদের সময়ে বা তার কিছু পরে কাবেরী নদীর জলসেচের কাজে ব্যবহারের জন্য ৩০০ মিটারের বেশি দীর্ঘ, ১৮ মিটার চওড়া ও ৫.৫ মিটার উঁচু একটি বাঁধ নির্মিত হয়েছিল —যা ''গ্র্যান্ড অ্যানিকাট'' নামে বিখ্যাত। আজকে ভারতের তেহেরী বাঁধ, হীরাকুঁদ বা ভাকরানাঙ্গাল বাঁধের সঙ্গে যদিও এগুলি তুলনীয় নয়, তবে প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা হিসাবে এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও বাঁধ ও সেতু নির্মাণের কথা বলা আছে। ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে পাথর কেটে ধাপ-কূপ বা ধাপ-পুকুর তৈরি করা হতো।'

রাধাকান্তবাবু উৎসুক মুখে ঋদ্ধিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বল, এর সাথে তুমি কি যোগ করতে চাও?'

ঋদ্ধি বলল, 'স্যার, ভারতে কুয়ো ব্যবহার করা হতো সেচের কাজে। আজও ভারতের অনেক জায়গায় কুয়োর সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার হয় জলসেচ করতে।' প্রাচীন কালে বলদ দিয়ে কপিকলের সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা চামড়ার মশক দিয়ে জল তোলা হতো। অবিরাম জল তুলতে ব্যবহৃত হতো 'noria'—যাকে প্রাচীন গ্রন্থে 'অরঘট্ট' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বাণভট্টের হর্ষচরিত্রে এই যন্ত্রটির বিবরণ পাওয়া যায়। তখন 'গিয়ার' ব্যবহৃত না হওয়ায় লোকে হাতে টেনে জল তুলত। এই রকম দৃশ্য দ্বাদশ শতকে সৃষ্ট ম্যান্ডোরের দেয়ালচিত্রে দেখতে পাই।

রাধাকান্তবাবু ঋদ্ধির পিঠ চাপড়ে দিলেন। বললেন, 'দেখ তোমার চারিদিকে কত নজর। আর কি কি নতুন তথ্য পেলে?'

কৃষিপ্রযুক্তির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হলো, বাঁশ বা কোনো দণ্ডের সাথে গরুকে জুড়ে দিয়ে শস্য পেষাই। খ্রিস্টীয় ১১০০ অব্দে বাংলায় রচিত রামচরিত গ্রন্থে বলদের সাহায্যে শস্য পেষাই-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া দশম শতকে শব্দকোষ অভিধান রত্নমালা ও একাদশ শতকে রচিত বৈজয়ন্তী গ্রন্থে এই ধরনের শস্য পেষাই-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময় পাথরের জাঁতার ব্যবহারও প্রচলিত হয়েছিল। এই ধরনের যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় তক্ষশীলার কুনাল সংঘারামে।

এই পর্যন্ত পড়ে ঋদ্ধি বলল, এর সাথে আমি যোগ করতে চাই আর একটি তথ্য—কলুর ঘানি বা আখ পেষাই-এর কাজেও এই সময় বলদের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। খ্রিস্টীয় ৮০৪-এ হিমাচল প্রদেশে একটি মন্দিরে বলদে টানা তৈলনিষ্কাশন যন্ত্র ছিল। এছাড়া গৃহপালিত পশু হিসাবে এক কুঁজ বা দুই কুঁজ-বিশিষ্ট উটকে লাঙল টানা, পণ্য পরিবহন, যাতায়াত প্রভৃতি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হতো। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সিন্ধু অঞ্চলে এই উটের ব্যবহার দেখেছিলেন।

প্রফেসার ছাত্রের ইতিহাসমনস্কতা দেখে মুগ্ধ হচ্ছিলেন। তুলা প্রক্রিয়াকরণের বিষয়টিও তিনি ঋদ্ধির সঙ্গে পুনরালোচনা করতে চাইলেন। ঋদ্ধি বলল, 'এখানেও আমি কিছু যোগ করেছি স্যার, একটু শুনুন।

'যান্ত্রিক উপায়ে তুলাবীজ থেকে তুলা ছাড়ানোর উপায় ভারতেই উদ্ভাবিত হয়েছিল। কাঠের তৈরি এই যন্ত্রের নাম ''চরখি''। অজন্তা গুহাচিত্রে এর নিদর্শন আছে। তুলার তন্তু পৃথক করার যন্ত্রে রোলার থাকায় যোসেফ নিউহ্যাম একে রোলিং মেশিনের পূর্বসূরী মনে করেছেন। Cotton gin খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতক নাগাদ ভারত থেকে চীনে পৌঁছায়। জাতক-এর কাহিনী বা মিলিন্দপন্থ গ্রন্থে ধুনুরির তূণ-এর বিবরণ পাওয়া যায়। সুতো তৈরি প্রযুক্তির অগ্রগতির এক নতুন অধ্যায়।'
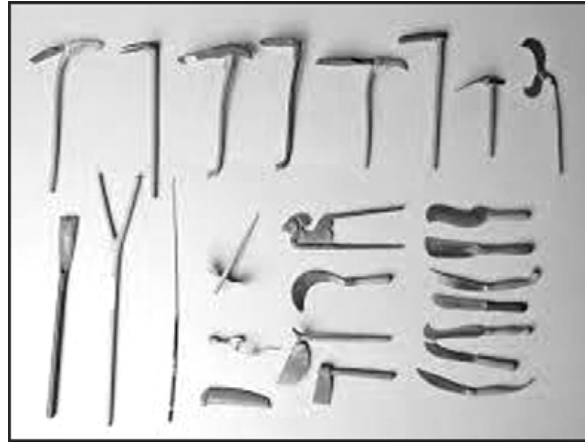
সামন্ত্রতান্ত্রিক মধ্যযুগের কৃষিপ্রযুক্তির যন্ত্রপাতি

এরপর সামন্ততান্ত্রিক মধ্যযুগের সামরিক প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলে, প্রযুক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলিকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে চাইলেন দুজনে। এই সময় ঘোড়ায় টানা রথের পরিবর্তে অশ্বারোহী সেনার গুরুত্ব বাড়ে। ঘোড়ার পিঠে চড়বার উপকরণ বা জিন এবং লোহার রেকাবের ব্যবহারও শুরু হয়েছিল। তবে খাজুরাহোর ভাস্কর্যে কাঠের, কোণারকের বিখ্যাত ঘোড়ার মূর্তিতে চামড়ার রেকাব দেখা গেলেও, নবম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকে ইসলামিক দুনিয়ায় আর দিল্লীর সৈন্যদলে লোহার রেকাবের ব্যবহার ছিল ব্যাপক। ঘোড়ার নালও সুলতানী যুগের আগে ভারতীয় রাজ্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়নি।

(এর পরবর্তী অংশ ৪০৯ পৃষ্ঠায়)

দীর্ঘস্থায়ী জল-কৃষি ও কৃষি প্রশিক্ষণ

সুব্রত গাঙ্গুলী *

প্রান্তিক চাষীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আয় সৃষ্টির জন্য লোকশিক্ষা পরিষদের নিবিড় প্রশিক্ষণ

সাগরদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনার একটি বিপর্যয়প্রবণ এলাকা, যেখানে প্রতিটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়েই স্থানীয় মানুষ, পশু ও কৃষিজমি ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নিদারুণ আর্থিক ক্ষতি ও সেই সঙ্গে লবণের আধিক্যে জমির উর্বরা শক্তির হ্রাস হয়ে যাওয়ার কারণে, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এই সাগরদ্বীপে অসহায় অবস্থায় থাকে; প্রতিটি বিপর্যয়ের পরে তারা আরও দারিদ্র-পীড়িত হয়ে পড়ে। স্থানীয় গ্রাম-পঞ্চায়েত, ব্লক বা প্রশাসনিক প্রয়াস ও সাহায্য চাষীদের এই অসহায় অবস্থা কাটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন আরও সাহায্য ও সহযোগিতা এবং সর্বোপরি ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের। কিন্তু স্থানীয় বেসরকারি উদ্যোগ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগ এক্ষেত্রে প্রায় নেই বললেই চলে।

হাঁস-মুরগির প্রশিক্ষণ

সাগরদ্বীপে অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। জমিতে কৃষিকাজ ও জলে মাছ চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে স্বাভাবিকভাবে এদের জীবন-জীবিকা বহুগুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাস্তবে অন্নসংস্থান যখন ঝুঁকিপূর্ণ, ঠিক তখনই চাষীদের জীবন-মানের আমূল পরিবর্তনের কথা বলা প্রায়ই বাতুলতা মাত্র। তাই সর্বপ্রথম চাষীদের নিয়মিত খাদ্য ও পুষ্টির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এবং এই কাজটি করা যাবে জীবিকা নির্বাহের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমেই।

প্রশিক্ষণের পর হাঁস-মুরগির বাচ্চা প্রদান

এমতাবস্থায়, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, সাগরদ্বীপের চাষীদের ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ তৈরি করে দেবে বলে বিশেষ পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত করে। সেই খসড়াটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পের রূপ পায়। প্রাথমিকভাবে সাগর ব্লকে পাঁচটি গ্রামপঞ্চায়েতে— ১) রুদ্রনগর, ২) সাগর, ৩) ধবলাট, ৪) রামকরচর, ৫) ধসপাড়া-সুমতিনগর-২ থেকে ৩০০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীকেই দীর্ঘস্থায়ী জল-কৃষি ও বিবিধ কৃষি প্রশিক্ষণের আওতায় পাঁচটি বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ২০২১-২২ আর্থিক বছরে। প্রকল্পটি অনুমোদন করেন সুন্দরবন অ্যাফেয়ার্স, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। স্থানীয় চাহিদা ও চাষীদের আয়ের সুযোগের বিষয়টি মাথায় রেখে যে পাঁচটি প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা হলো ঃ

১) দীর্ঘস্থায়ী জল-কৃষি ঃ স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক মিষ্টি জলের রুই-কাতলা-মৃগেল চাষ, নতুন পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের কৌশল।

২) ছাগল ও গবাদি পশুপালন, বিজ্ঞান-সম্মতভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি ও আয় সৃষ্টিকরণ।

৩) হাঁস-মুরগি পালন ও আয় সৃষ্টির কৌশল।

৪) কেঁচো সার-গর্ত নির্মাণ, জৈব সার তৈরি ও পান চাষের ব্যবহারিক প্রণালী।

৫) সবজি চাষ, ঘরোয়া সবজি বাগান ও তার ব্যবস্থাপনা।

---

* *লোকশিক্ষা পরিষদে সেবারত এই তরুণ উদ্যম ও নিষ্ঠার জন্যই সুপরিচিত।*

লোকশিক্ষা পরিষদের নিয়মিত তত্ত্বাবধানে পরিষদেরই অনুমোদিত সাগরমঙ্গল গুচ্ছ সমিতিতে ধারাবাহিকভাবে কৃষি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণ দেন স্থানীয় ব্লকের কৃষি আধিকারিক, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত মৎস্য ও কৃষি আধিকারিক, সরকারি কৃষি দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক, দক্ষ চাষী এবং পরিষদের কৃষি পরামর্শদাতা। মোট ৩০০ জন প্রশিক্ষার্থী ঃ প্রায় অর্ধেক ছিল মহিলা চাষী এবং সকল প্রশিক্ষার্থী পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীভুক্ত। প্রশিক্ষণ শেষে প্রতি চাষীদের কাছ থেকে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বিষয়ে মতামত নেওয়া হয়।

প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন পর্বে দেখা যায়, প্রতি চাষীর কৃষি ব্যবহারিক জ্ঞানের উন্নত বিধান হয়েছে, তারা কৃষি সংক্রান্ত নতুন কৌশল রপ্ত করেছে এবং বাস্তব রূপায়ণে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রশিক্ষণ শেষে, প্রকল্পের তত্ত্বাবধায়ক এবং জন-সংগঠক প্রতি উপভোক্তা বা প্রশিক্ষার্থীর সঙ্গে মুখোমুখি সাক্ষাৎ করে, তাদের বাড়িতে বসে কথাবার্তা বলেন, Survey করেন এবং তাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পরিকল্পনা রূপায়ণের বাস্তবিক পর্যালোচনা করেন। Survey-তে ধরা পড়ে, কীভাবে প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান বাস্তবের জমিতে রূপায়িত হচ্ছে।

প্রশিক্ষণের পর বাড়িতে কেঁচো সার উৎপাদন

পর্যালোচনায় উঠে আসে বিভিন্ন সাফল্যের কথা। যেমন ঃ কেঁচো সার-গর্ত নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেখা যায়, কেঁচো সার প্রস্তুতির কাজ জোর কদমে চলছে। সার প্রস্তুতির ধাপগুলি পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে, যেমন—

১) কেঁচো সার-গর্তের উপর চাষীরা খড়ের ছাউনি দিয়েছে, যাতে সরাসরি রোদ, বৃষ্টি, ঝড় থেকে সার ও কেঁচোকে বাঁচানো যায়।

২) চাষীরা আধ-পচা খাবার তৈরি করেছে গোবর আর জৈব আবর্জনা মিশিয়ে এবং সেই মিশ্রণটিকে ১২ থেকে ১৫ দিন রেখে।

৩) চাষীরা প্রশিক্ষণের থেকে পাওয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতি ১ বর্গ ফুটে ২৫ থেকে ৩০-টে কেঁচো ছেড়েছে এবং তার উপর পাতলা করে ভেজা খড়ের আস্তরণ ও ভেজা চট বিছিয়ে বেডের সর্বশেষ স্তরটি সম্পূর্ণ করেছে। তারা সকলেই আইমেনিয়া কোয়েটিভা প্রজাতির কেঁচো সার-গর্তে ছেড়ে দিয়েছে।

৪) যে সকল চাষীরা কয়েক মাস আগে প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তারা মিশ্রণে কেঁচো ছাড়ার ৪৫ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর সার-গর্তে দানা দানা কালচে-বাদামী রঙের চা-এর মতো সার তৈরি করে ফেলেছে এবং সেগুলি জৈব সার হিসাবে জমিতে ব্যবহার করেছে।

পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে—পাঁচটি গ্রামপঞ্চায়েতে (রুদ্রনগর, গঙ্গাসাগর, ধবলাট, রামকরচর, ধসপাড়া-সুমতিনগর-২) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬০ জন চাষী প্রশিক্ষণ শেষে তাদের পাওয়া মুরগির ও ছাগল বাচ্চাদের সঠিকভাবে লালন-পালন করছে। দেখা যায় যে, বাচ্চাগুলির স্বাভাবিক ধারা মেনেই ওজন ও আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

চাষীরা বর্তমানে গ্রোয়ার ও বড় মুরগির পরিচর্যা শুরু করেছে। যেমন, দৈনিক ১০ থেকে ১৫ গ্রাম ভুট্টা ভাঙা, সবুজ শাকপাতা, রান্নাঘরের ফেলে দেওয়া সবজি খাওয়াচ্ছে। সেই সঙ্গে মুরগির ডিম উৎপাদনের বৃদ্ধির জন্য অ্যাজোলা খাওয়ানো শুরু করেছে। প্রশিক্ষণ শেষে চাষীদের অ্যাজোলা দেওয়া হয়েছিল। চাষীরা সেই অ্যাজোলা ঘরোয়া পদ্ধতিতে পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়ে মুরগির খাবার হিসাবে ব্যবহার করছে।

উপরোক্ত পাঁচটি গ্রামপঞ্চায়েতের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬০ জন চাষী জলের pH পরীক্ষা করে অম্লতা ও ক্ষারত্বের পরিমাণ বুঝে, তাদের নিজেদের পুকুরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রুই, কাতলা ও মৃগেলের চাষ করছে। প্রতিটি চাষী সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছে, পুকুরের স্বাস্থ্য কীভাবে ভালো রাখা যায়, নিচে পলির স্তর কখন কমিয়ে স্বাভাবিক রাখা যায় এবং জলে অক্সিজেনের মাত্রার স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখা যায়।

মার্চ, ২০২২-এর শেষে প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হলো প্রশিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পর্যবেক্ষণ। তবে প্রকল্পের মূল প্রভাব সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া

সম্ভব নয়। আরও কিছু মাস পরে এর মূল প্রভাব ও ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি বোঝা যাবে। তাই পুনরায় নিখুঁতভাবে সম্পূর্ণ তথ্য তুলে আনা দরকার।

লোকশিক্ষা পরিষদের লক্ষ্য ছিল সাগরদ্বীপের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীদের সার্বিক শ্রীবৃদ্ধি। বৃদ্ধি পাবে প্রতি চাষীর ক্ষমতা এবং দক্ষতা। সেই লক্ষ্যে পুনরায় প্রকল্পটির মূল্যায়ন করা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয়, উক্ত প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা করতে হবে শীঘ্রই। যাতে বিগত প্রকল্পটির প্রশিক্ষার্থীদের কাজের অগ্রগতির পরিমাপ নেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে মোট নতুন ৫৮০ জন চাষীকে পূর্বে উল্লিখিত পাঁচ রকমের প্রশিক্ষণ—সর্বমোট ২৯টি প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রকল্প রূপায়ণের কৌশলগুলি এবং সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগিতায় সাগর ব্লকের মোট ৯টি গ্রামপঞ্চায়েতকে কৃষি-সহায়ক আদর্শ গ্রামপঞ্চায়েত হিসাবে গড়ে তোলার কাজটি জোর কদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। নতুন এই কর্মকাণ্ডের আওতায় রাখা হয়েছে সাঁওতাল ও শবর উপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম, বিপর্যয়প্রবণ গ্রামপঞ্চায়েত এবং দারিদ্র-পীড়িত গ্রামসমূহ। এই সবগুলি সাগর ব্লকের অধীনস্থ।

এই আর্থিক বছরের প্রকল্প শেষে লোকশিক্ষা পরিষদ আশা রাখছে যে, সাগর ব্লকের (১) ৯টি গ্রামপঞ্চায়েতের ৮৮০ জন চাষী বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জল-কৃষি ও বিবিধ কৃষিকাজ করতে সক্ষম হবে ও নিজেদের আয় বৃদ্ধি করবে। (২) প্রকল্প শেষে কৃষির মাধ্যমে চাষীদের জীবন-মানের উন্নতি ও তাদের আর্থিক উপার্জনের জন্য বাধাসমূহের স্থায়ী সমাধান হবে। (৩) সামগ্রিকভাবে সাগর ব্লকে 'উন্নত কৃষি-উপযোগী' মডেল ব্লক হিসাবে গড়ে তোলা যাবে। (৪) পরিষদের কৃষি-সহায়ক কার্যাবলী সুন্দরবন delta অধ্যুষিত অন্যান্য ব্লক ও গ্রামপঞ্চায়েতে একই কৌশলে সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত করা যাবে।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয়, স্বামীজীর সেই কথাটি ঃ 'জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভর হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত হবে না।'

তাই কৃষি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রতি কৃষককে মানসিকভাবে প্রাণোচ্ছল, দক্ষ চাষী, Resilient and skilled farmer হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তাই সমগ্র কর্মকাণ্ডটি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং প্রতিযোগিতামূলক। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিজের সঙ্গে নিজের, পুরানো দক্ষতার সঙ্গে নতুনভাবে অর্জিত বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রতিযোগিতা। লোকশিক্ষা পরিষদের কৃষি ও কৃষক উন্নয়নের এই প্রচেষ্টা প্রাণান্তকর। ভবিষ্যতে লোকশিক্ষা পরিষদ, গ্রামসংগঠন ও গ্রামের উপভোক্তা একযোগে কাজ করলে সাফল্য আসবেই। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে কৃষিই হতে পারে সাগরদ্বীপের নতুন ভবিষ্যৎ।

(৪০৬ পৃষ্ঠায় 'সামন্ততান্ত্রিক যুগে ভারতীয় প্রযুক্তি'র শেষাংশ)

মার্কোপোলো জানাচ্ছেন, ১২৯০-এর দশকে দক্ষিণ ভারতে ঘোড়ার নাল বানানোর কামার না থাকায় আমদানী করা ঘোড়ার কার্যকারিতা সঙ্কুচিত হয়ে যেত। অবশ্য হোরসল ভাস্কর্যে ঘোড়ার নালের প্রতিরূপ উপস্থাপিত হয়েছে। প্রফেসার বলে ওঠেন 'ম্যাংগোনেলের' কথাও বাদ দিইনি। সিন্ধু আক্রমণকারী আরবেরা শত্রুদের পরাস্ত করতে গ্রীক আগুন (ন্যাপথা) ও পাথর ছোঁড়ার সামরিক যন্ত্র ম্যাংগোনেলের ব্যবহার করত—যা তাদের শত্রুদের অপরিচিত ছিল।

ঋদ্ধি বলে উঠল, 'স্যার, এই শেষের দিকে আর কটা তথ্য আপনাকে দিই। রাজাভোজের লেখা ''সূত্রধারা'' নামক একটি গ্রন্থে যান্ত্রিক মৌমাছি ও পাখির কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া যান্ত্রিক পুরুষ ও মহিলার কথাও বর্ণনা করা হয়েছে। এইসব স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র প্রযুক্তির অগ্রগতির পরিচায়ক। এই সময়কার ''মসলিন'' শাড়ি, পশমিনা শাল, রঞ্জক হিসাবে নীলের বহুল ব্যবহার, চিনি, মিছরি তৈরি, দিল্লীতে লৌহস্তম্ভ তৈরি, দামাস্কাস ইস্পাত প্রভৃতি সামন্ততান্ত্রিক কৃষিনির্ভর সমাজব্যবস্থায় শিল্পের অগ্রগতির পরিচয় দেয়।'

প্রফেসার তার ছাত্রকে বলেন, 'ঋদ্ধি, পরের প্রকাশনায় তোমার ও আমার মিলিত এই প্রয়াস, প্রকাশ করব। যদি তোমার সাহায্য পাই, তাহলে এই বৃদ্ধ শিক্ষক, তার রচনাকে আরও বেশি সম্পূর্ণ ও সুসজ্জিত করে প্রকাশ করতে পারবে।'

ঋদ্ধি বলে, 'স্যার, চিরদিনই আমি একবগ্গা। আপনিই তো বলতেন আমায়। যা বলব ভাবি, বলে ফেলি। আজ যদি বলি, সেই মুখ-আলগা ছেলেটা সেই কলেজ-জীবন থেকে এই একটা কথা চেপে রেখেছিল, আপনাকে assist করার ইচ্ছা। আজ অনেক সুকৃতিতে সেই ইচ্ছা পূর্ণ হলো। আশীর্বাদ করুন স্যার। আপনার মর্যাদা যেন কখনও ক্ষুণ্ণ না হতে দিই।'

প্রবীণ ও নবীনের এই মিলন শিক্ষাক্ষেত্রে বোধহয় এক নতুন ইতিহাস রচনা করবে।

সুসংহত শিশু বিকাশ সেবাপ্রকল্প

অঙ্গনওয়াড়ী ও মুখ্য সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র *

সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প (আই.সি.ডি.এস) ভারত সরকারের একটি জনপ্রিয়, জনহিতকর প্রকল্প। বর্তমানে ০–৬ বছরের শিশুর সংখ্যা ১৫৮.৭ মিলিয়ন। ০–৬ বছরের শিশুদের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যগত উন্নয়নের জন্য এই প্রকল্পটি চালু হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ২ অক্টোবর এই প্রোগ্রামের সূচনা হয়। ভাবনা ছিল—(১) ০–৬ বছর পর্যন্ত শিশুর সার্বিক বিকাশ; (২) গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়ের বিশেষ যত্ন; (৩) ৩ বছরের নিচের শিশুকে বিশেষ যত্ন।

পুতুলনাচের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেগুলি হলো ঃ (১) অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা কমানো ও অপুষ্টি রোধ। (২) শিশুর শারীরিক, বৌদ্ধিক, ভাষাগত, সামাজিক, আবেগ ও নান্দনিক বিকাশের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটানো। (৩) ৩ বছরের নিচের শিশুদের বিশেষ যত্ন। (৪) এলাকার জনগোষ্ঠীর চাহিদা অনুযায়ী পরিবারের কাছে পরিষেবাগুলি পৌঁছাতে উৎসাহ দান। (৫) জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত শিশুকে আই.সি.ডি.এস–এর আওতায় আনা।

শিক্ষা–সহায়ক উপকরণ প্রস্তুতি

(৬) মা, কন্যাশিশু ও কিশোরীর মধ্যে সমন্বয় ঘটানো। (৭) নারীর অধিকার সুরক্ষিত ও ক্ষমতায়ন ঘটানো ও আই.সি.ডি.এস পরিষেবার গুণগত মান, সার্বজনীনতা ও পরিচালন পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

উপরি–উক্ত লক্ষ্য পূরণের জন্য ২০১১ সাল থেকে আই.সি.ডি.এস প্রকল্প কতকগুলি উদ্দেশ্য রাখে। সেগুলি হলো ঃ (১) পরিষেবাগুলির সক্রিয়তা বৃদ্ধি; (২) সব স্তরে কাজের দক্ষতা তৈরি; (৩) বিভিন্ন দপ্তরের সাথে আই.সি.ডি.এস–এর সংযোগ বৃদ্ধি; (৪) জনগণকে আরও সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা; এবং (৫) তথ্য সংরক্ষণ করা।

১৯৭৪ সালে National Policy of Children ভারত সরকার তৈরি করে। এই নীতি অনুযায়ী Integrated Child Development Services Scheme (ICDS) বা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প শুরু হয়।

১৯৭৫ সালে ভারতবর্ষে মাত্র ৩৩টি প্রকল্প নিয়ে যে পথ চলা শুরু, আজ তা বেড়ে প্রায় ৮০০০ (আট হাজার) প্রকল্প চলছে এবং ২৮ লক্ষ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী এতে নিযুক্ত আছেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ৫৫০টির বেশি প্রকল্প এবং ১ লক্ষ ১৬ হাজার অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র এই মুহূর্তে চলছে। গড়ে ৩০০ থেকে ৭০০ জনসংখ্যা পিছু Urban, Rural, Tribal এলাকায় একটি করে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র রয়েছে।

এই অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিতে যে পরিষেবাগুলি দেওয়া হয়, তা হলো ঃ (১) পরিপূরক পুষ্টি; (২) স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি সম্পর্কিত তথ্য; (৩) স্বাস্থ্য পরিদর্শন; (৪) প্রয়োজনে স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে প্রেরণ;

* *পরিষদের সেবা বিভাগ।*

(৫) টীকাদান; (৬) বিধিমুক্ত প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা; (৭) স্তন্যদানকারী মহিলা এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা।

২০১১ সাল থেকে পরিষেবাগুলিকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—(১) প্রাক্ শৈশব যত্ন, শিক্ষা ও বিকাশ; (২) যত্ন ও পুষ্টির পরামর্শদান; (৩) স্বাস্থ্য পরিষেবা; (৪) জনগোষ্ঠীর মধ্যে সচেতনতা ও প্রচার।

বর্তমানে তিন ধরনের প্রশিক্ষণকেন্দ্র সারা ভারতবর্ষে রয়েছে ঃ

➲ রাষ্ট্রীয় জনসহযোগ ও বালবিকাশ সংস্থান (NIPCCD) National Institute of Public Cooperation and Child Development. সারা ভারতবর্ষে ৫টি এই ধরনের Training Institute আছে।

➲ পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যসেবিকা (Supervisors) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩টি।

➲ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী (AWWs) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ২৪টি।

এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে Job Training (৩২ দিন) Refresher Training (৭ দিন) এবং Orientation Training (৮ দিন) চলে।

অঙ্গনওয়াড়ী কর্মিদের প্রশিক্ষণ

কেন্দ্রীয় সরকারের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের অনুমোদিত পাঠক্রম অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষিত প্রশিক্ষক দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। Lecture, Group discussion, Use of Audio-Visual Aids, Quiz, Mock-session এবং Placement ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়াও বহিরাগত বক্তা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিকগণ রয়েছেন।

বর্তমানে শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এর ভিত্তিতে জাতীয় প্রাক্-প্রাথমিক শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার পাঠক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও প্রকল্পগুলি চলছে—যেটির সূত্রপাত ঘটে ২০১১ সালে। এখানে NCERT ও বিভিন্ন স্তরের বিশেষজ্ঞরা মিলে পশ্চিমবঙ্গের জন্য এই প্রশিক্ষণের পাঠক্রম তৈরি করেন। শিশুর শিক্ষাকে আনন্দদায়ক করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রগুলিকে শিশু আলয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ভাবমূলভিত্তিক, বয়স উপযোগী ও ক্রিয়ার মাধ্যমে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুদের শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ (TLM) ও Activity book ব্যবহার করে অঙ্গনওয়াড়ী কর্মিদের পাঠ্যক্রম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়—যাতে শিশুর শারীরিক, মানসিক, আবেগজনিত, সামাজিক, বোধাত্মক, ভাষাজনিত ও নান্দনিক চেতনার বিকাশসাধন করা যায়। অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী ৪ ঘণ্টার রুটিন অনুসরণ করেন এবং ২৩ সপ্তাহের ভাবমূলভিত্তিক (Theme based) কর্মসূচী সম্মিলিত পুস্তিকা তারা ব্যবহার করেন। এছাড়াও ৫ থেকে ৬ বছরের শিশুদের জন্য বিদ্যালয় প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ভাষা (বাংলা, ইংরাজী), গণিত, বিজ্ঞান চেতনা ও পরিবেশ চেতনার জন্য পুস্তিকা রচনা করা হয়েছে।

শিশু আলয় তৈরি ও শিক্ষা কীভাবে পরিচালিত হবে এবং শিশুদের মূল্যায়ন কীভাবে হবে, সেই সম্পর্কিত বিস্তারিত প্রশিক্ষণ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মিরা পেয়ে থাকেন।

০-৩ বছরের শিশুদের বাড়িতে থেকে কীভাবে সার্বিক বিকাশের জন্য পৌঁছানো যায়, তার পরামর্শ শিশুর পিতামাতাকে কীভাবে দেবেন, সেই বিষয়েও কর্মিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ প্রাঙ্গণে একটি Middle Level Training Centre (MLTC) মুখ্যসেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও একটি Anganwadi Training Centre (AWTC) অর্থাৎ অঙ্গনওয়াড়ী কর্মিদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র রয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র দুটি সম্পূর্ণ আবাসিক। যেহেতু প্রশিক্ষণগুলি মহারাজদের তত্ত্বাবধানে চলে, তাই প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রতি course এই মহারাজদের আশীর্বাণীসহ প্রশিক্ষার্থীদের নিজের এবং তার কাজের এলাকার মানুষের জীবনধারা কীভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে তাঁরা অবগত করেন। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বিশেষ কিছু প্রাপ্তি নিয়ে প্রশিক্ষণ সমাপনে প্রশিক্ষার্থীগণ বাড়ি ফিরে যান।

যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ

অংশুমান ভট্টাচার্য *

দেবতা নেই যে ঘরে ঃ কোন্ দেবতা? ভগবান বুদ্ধ বা তথাগত। ঘরে? কবেই তো তিনি ছেড়েছেন ঘর। তা হলে কি মন্দিরে? কিন্তু তিনি তো তৈরি করেননি কোনও মন্দির। তবে? গাছতলায়, কিংবা উদ্যানে? না। সেদিন বুদ্ধ চলেছেন দক্ষিণগিরির একনালা গাঁয়ের পথে। কী হলো তখন? কেউ বা ওঁকে চেনে, কেউ চেনে না। ওখানে প্রায় সবাই দেখেনি, এমনকী কেউ চেনেও না। পথে ছিলেন কোনও ব্রাহ্মণ। নাম ওঁর ভরদ্বাজ। বিশাল ধনী। প্রচুর জমিজমা। প্রচুর আয় কৃষিকাজ থেকে। লোকজনেরা খাটে দিনরাত। বুদ্ধ ওঁর কাছে অচেনা।

প্রথম প্রশ্ন—'কে আপনি?'

বুদ্ধ বললেন—**'আমি কৃষক'**।

দু-চার কথার পরই ভরদ্বাজ বললেন—'লেগে পড়ুন আমার খামারে কাজে। বেশি বেশি মূল্য দেব।'

ভরদ্বাজের প্রশ্ন ভগবান তথাগতকে

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বুদ্ধদেব জবাব দেন—'আমার কৃষিকাজ অন্যরকম।'

—'সে আবার কী?'

বুদ্ধদেব বললেন—**মানবজমিন আবাদে লেগেছি।**

ভরদ্বাজ বললেন—'হেঁয়ালি রাখুন। ভালো করে বলুন তো!'

—**'মানুষের হৃদয়-ই আমার জমি।'**

—তাতে কী বীজ বুনেন?

—**হ্যাঁ, আমার বীজ হলো 'শ্রদ্ধা'**।

—'লাঙল'?

—**'বিনয়' আমার লাঙল।**

—'সেই লাঙলে ফলা আছে?'

'আছে, সেটি হলো ''ধারণা''। বিশেষভাবে জীবনে উন্নত হতে কত যে উপদেশ দিয়ে থাকি। সেগুলো বুঝতে হয়। যার যত স্পষ্ট, শক্ত ধারণা, সে তত উন্নত, তত সুখী।'

—অদ্ভুত। 'জোয়াল কোথায় থাকবে আবার?'

—**আছে, জোয়াল তো 'মন'**।

—'বলদ নিশ্চয়ই নেই।'

—**থাকবে না কেন? 'বীর্য'-ই হচ্ছে বলদ।**

—'এ কী বলছেন? চাষের ফসল কোনওদিন পেয়েছেন কেউ?'

—**চাষের ফসল তো 'নির্বাণ'**। জরা, মৃত্যু, ব্যাধি—মানুষকে দুঃখ দিচ্ছে। তা থেকে মুক্তি পেতেই হয়। মুক্তির অপর নাম 'নির্বাণ'।

একের পর এক উত্তর শুনে শুনে ভরদ্বাজ বিমূঢ়। তিনি বুঝতে পারছেন না—কী করবেন? কিন্তু যত ভাবছেন, তত মন বলছে—**'এবার পেয়েছ আসল চাষা।'** যেই না ভাবা, দুম করে বুদ্ধের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন।

—'এ কী, এ কী', বলে বুদ্ধ ওঁকে ধরে ওঠালেন। শান্ত করলেন। কাঁদতে লাগলেন ভরদ্বাজ। হাতজোড় করে বললেন—**'ক্ষমা করুন। আমায় দীক্ষা দিন।'** সেদিন ঘটল এক অপূর্ব ঘটনা। মাটি ভেঙে যে চাষা করছে চাষ, তারই শরিক তথাগত।

আমরা চাষ করি আনন্দে ঃ তা হলে বোঝা যাচ্ছে বুদ্ধের আমলেও চাষবাস হতো। হতো বৈ কী। কৃষিকাজের নমুনাটা দেখা যাক।

অনেকেরই জানা যে, ভারতবর্ষ মূলত গ্রামপ্রধান দেশ। গৃহ এবং কুল (পরিবার) নিয়ে তৈরি হয় গ্রাম। গ্রামের বাইরে যে জমি থাকত, ওখানেই চাষবাস হতো। এক একটি পরিবার নিজ নিজ জমি চাষ করতেন। কিন্তু জমির পরিমাণ বেশি হলে, দাস ও দিনমজুর রাখা হতো। পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য নির্ধারিত হতো জমির পরিমাণ (ছয়

** প্রবীণ সুপণ্ডিত এই বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বটি গোলপার্ক ও নরেন্দ্রপুর মিশনের সঙ্গে হার্দিক সম্পর্কে আবদ্ধ।*

নিবর্তন জমি)। কৃষিজমি নির্ধারণ করে দিতেন 'ক্ষেত্রকর' বা 'রজ্জুগাহক অনচ্চ' কর্মচারী। খুব বেশি জমির মালিক-কে বা কর্ষক-কে বলা হতো 'গৃহপতি'। সাধারণত ওঁরা মধ্য গাঙ্গেয় অববাহিকার কিছু কিছু অংশে বাস করতেন। বর্ণে ওঁরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়। ধনী কৃষককে 'কুটুম্বিক'-ও বলা হতো।

উল্লেখযোগ্য কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ছিল শালি ধান্য, যব, মুদ্গ, মাষ, মসুর, তুলা, ইক্ষু প্রভৃতি। একাধিকবার কোথাও ধান রোপণ করা যেত। তবে বিভিন্ন কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগিতা বুঝে জমি বাছাই করারও চল ছিল। এমনকী জমির উর্বরতা লক্ষ্য করে কখনও বা নতুন নতুন আশ্চর্যজনক পদ্ধতি উদ্ভাবনেরও নজির রয়েছে। ভাবা যায়!

গঙ্গা উপত্যকার মাঝামাঝি জায়গায় প্রচুর বৃষ্টি হতো। ফলে ভীষণ রকম অরণ্য তৈরি হলো। তখন? অরণ্য থেকে চাষের জমি বের করা চাই। আগুনের ব্যবহার হলো। আবার, শাণিত লোহার যন্ত্রও উদ্ভাবিত হয়েছিল। কোশল, মগধ-র মাটিতে কাঠের লাঙল ব্যবহারে অসুবিধা হলো। তখন লাঙলের সঙ্গে লোহার 'ফলা' (ফাল) ব্যবহার করা হতো। বিহারের খনিগুলি ছিল কাছেই। ফলে লোহা পাওয়া যেত। আবার মধ্য গাঙ্গেয় ভূমিতে অম্লতা ছিল বলে লোহার যন্ত্রে মরচে পড়ত। সুতরাং খনি থেকে লোহা পাওয়া এবং মরচে থেকে রক্ষা পাওয়ার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিশ্চয়ই জানা ছিল। কারিগরি বিদ্যার অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়। মোট কথা, কৃষিজ দ্রব্যের উৎপাদন প্রচুরভাবে বাড়ল।

কখনও বা কিছুটা সময় কোনো কোনো জমিতে কর্ষণ বন্ধ রাখা হতো। তাতে জমির উর্বরতা বাড়ত। জলসেচ ব্যবস্থাও চালু ছিল। যে-সব জমিতে জলের প্রবেশ, ধারণ এবং নির্গমন সম্ভব ছিল, ওগুলোতে হতো ধান চাষ। কৃষির প্রতি প্রবল অনুরাগবশত উঁচুদরের বৈজ্ঞানিক ভাবনার প্রচলন ছিল বলেই ছয় ঋতু ও সাতাশ নক্ষত্রের ভিত্তিতে 'কৃষিবৎসর' গণনা শুরু হলো। 'কৃষিবর্ষ' শব্দটি পেলাম। কে না বলবে সেকালেও একালের মতো নিছক অবৈজ্ঞানিক পথ ছেড়ে বিজ্ঞানসম্মত পথে চাষবাসের প্রচলন দেখে মুগ্ধ হতে হয়! কখনও জলাজমিতেও করা হতো ধান চাষ।

হে করুণাঘন, অনন্ত পুণ্য ঃ গ্রামের বাইরে ছিল গো-পালন ভূমি এবং বনভূমি। তাতে সকলের সমান অধিকার থাকত। এখন প্রশ্ন উঠবে—যজ্ঞের প্রয়োজনে গো-নিধন প্রচলিত ছিল যখন, তখন চাষের জন্য গো-ধন মিলল কিভাবে? কিন্তু সেটি তো ছিল বৌদ্ধযুগ। বৌদ্ধধর্মের অহিংসা মূল নীতি। বুদ্ধ যজ্ঞের নিন্দা করতেন এই জন্য যে—তিনি বলতেন, 'পশু আমাদের বন্ধু—পিতা, মাতা, আত্মীয়।' বুদ্ধের ব্যাপক প্রভাবে গো-বৎস, গাভী, ষণ্ড (গো-ধন)-এর বলিদান বহুমাত্রায় কমে গেল। চাষীরা রক্ষা পেল।

বৌদ্ধ যুগের লাঙল

কৃষিক্ষেত্রের ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষায় প্রহরী রাখা হতো ('খত্তিয়')। সমাজই তার ব্যবস্থা করত।
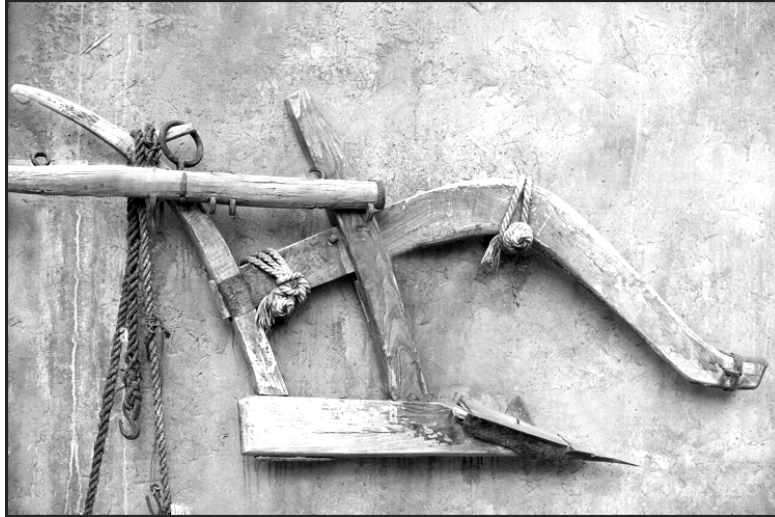
থালা যে ভরেছে আজ পাকা ফসলে ঃ কোশল, মগধ, উত্তর-পূর্বাংশ বিহার (মজ্ঝিমদেশ), কুরু, পাঞ্চাল, শূরসেন, অবন্তী, বিদিশা, বঙ্গ, কলিঙ্গ পর্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব ছিল। ফলে কৃষিকাজের বিস্তার এবং প্রচুর উৎপাদন দেশকে সমৃদ্ধ করল। যেন একালের মতো গ্রিন রিভোলিউশন, কিংবা সবুজায়ন ইত্যাদির মতো তখনও 'কৃষি বিপ্লব' হতো। গ্রামকে কেন্দ্র করে বহু নগরের পত্তন হলো। গাঁয়ের উদ্বৃত্ত সম্পদ নগরবাসীদের পুষ্ট করত। ৬০টি নগর গড়ে উঠল। শ্রাবস্তী, এমনকী চম্পা, রাজগৃহ, সাকেত, কৌশাম্বী, বারাণসী, কুশীনারা নগরে সমৃদ্ধ। ভিক্ষু, ভিক্ষুণীরা (নগর) শহরের প্রান্তে থাকলেও গাঁয়েও ঘুরে বেড়াতেন। ওঁদের ভরণ-পোষণ হতো উদ্বৃত্ত উৎপাদন থেকে। এমনকী নগরের শিল্পী, বণিক, সৈনিক, শাসকেরা তা ভোগ করতেন। তুলো থেকে সূতিবস্ত্র

নগরের কারিগর তৈরি করলেও গাঁয়েও সরবরাহ করা হতো। কৃষকেরা সরাসরি রাজাকে কর দিত। তবে ভূমিদান, বিক্রয় বা গচ্ছিত রাখার অধিকার সাধারণত কারও ছিল না। ভিক্ষুরূপে ১ জন ধনী-কৃষক প্রথম বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগ দিয়েছিলেন। দেখুন 'কৃষকের মর্যাদা'।

বাণিজ্যের জন্য বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হলো। উদ্বৃত্ত পণ্য বিদেশেও রপ্তানি হতো। বারাণসী ও শ্রাবস্তী থেকে তক্ষশীলা, সেখান থেকে গোদাবরী নদীর তীর; আবার রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তী এবং রাজপুতানা (মরুভূমি) ও সিন্ধুনদীর উপত্যকা—নর্মদা নদীর মোহনা, এসব স্থান দিয়ে বিদেশে পণ্য যেত। অর্থ ধার দেওয়া যেত। কিন্তু অঋণী না হলে বৌদ্ধসঙ্ঘে যোগ দিতে কেউ পারত না। ঋণমুক্ত মানে 'সুখী'। সমুদ্রযাত্রাও অনুমোদিত ছিল (পালি গ্রন্থের বিবরণ)।

প্রশ্ন হতে পারে, কৃষিকাজে সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেল কিভাবে? প্রথমত, বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে,—যেমন সুত্তপিটক, দীর্ঘ নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, ধর্মসূত্র, খুদ্দক নিকায়, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, অথর্ববেদ, মৈত্রায়নী সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে, গৃহ্যসূত্র, মহাবগ্গ, আপস্তম্ব ইত্যাদি। তা ছাড়া বিভিন্ন খননকার্য থেকে যে-সব নমুনা পাওয়া গেল, তা দিয়ে অনেকাংশে অনুমান সম্ভব হলো। আমরা শব্দ পেলাম—নগর, নিগম, নগরক, মহানগর, রাজধানী, বার্ধুষিক (কুশীদজীবী) ইত্যাদি। এগুলো যেকোনো মত-কে প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি জোগাচ্ছে। কৃষির উন্নতি থেকেই নানা মুদ্রার ব্যবহার বাণিজ্যের সম্প্রসারণ অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক উন্নতি ঘটল। তক্ষশীলার রাজা অম্ভি আলেকজান্ডারকে ২০০ রৌপ্যমুদ্রা উপহার দিলেন। 'যে ধনে হয়ে ধনী' তার পেছনে ছিল কৃষকের শ্রম ও অনুরাগ।

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ঃ নমো হে নমো ঃ রামকৃষ্ণ মিশন, নরেন্দ্রপুরে কোনও মহারাজ ছাত্রদের বলেছিলেন—ভাত খেতে বসে সবজি বা কিছু ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে থালার উপর তিনবার হাত উপুড় করে ঘুরাও, আর বলো—'অন্নদাতা সুখী ভব'। মানে, যা খাচ্ছি তার জন্য কত দূরের কৃষক তথা অন্যান্য লোকের কাছে ঋণী। বলতে কী, মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনও এক পেয়ালা চা খেতে গিয়ে অজানা মানুষদের উদ্দেশে বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ 'হলকর্ষণ' উৎসবের সূচনা করেন। বৌদ্ধ যুগেও 'হলকর্ষণ' উৎসব হতো। রাজা স্বয়ং সোনার হল চালাতেন। স্বর্ণশৃঙ্গ বলীবধও থাকত। গৌতম (সিদ্ধার্থ) লক্ষ্য করেছিলেন, হল চালনার ফলে প্রচুর কীট বেরোল, পাখিরা খেয়ে নিল, ব্যাঙও খাচ্ছিল, সাপেরা ব্যাঙ খেল—এতে সিদ্ধার্থ দূরে এক গাছতলায় বসে দেখতে দেখতে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। পরবর্তী কালে, সেই সিদ্ধার্থ বোধি লাভ করে 'বুদ্ধ' যখন হলেন, যজ্ঞের নিন্দা, পশু হত্যার নিন্দা করতেন। সদয়-হৃদয় বুদ্ধের ধর্ম নিশ্চয়ই কৃষকদের জীবনকেও অহেতুক কষ্ট বা অজানিত দুঃখ থেকে রক্ষা করত। সমাজজীবন রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন পড়ে ধর্মের।

নরেন্দ্রপুরে কোনো একদিন কোনও মুসলমান অভিভাবক বিকালে পাশের মসজিদে গিয়ে 'আজান ও নামাজ'-এর পর ফিরে এলেন ছোট্ট ছেলেকে দেখতে। কিন্তু পথে অসংখ্য মরা লাল-পিঁপড়ের সারি দেখে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। বললেন—'ছেলেদের দেখার আবেগে অভিভাবকেরা বুঝি উপর দিকে তাকিয়ে পথ চলেছিলেন। স্নেহ তো পিঁপড়েরাও আশা করে! তবে?' তাতে অনুমান করতে পারব, বুদ্ধ 'ভালোবাসা', 'করুণা' ইত্যাদির উপর কেন জোর দিতেন।

গ্রাম তথা ভারতের উন্নতির কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ উন্নত ও বৈজ্ঞানিক প্রথার কৃষিকাজ শেখার জন্য নিজের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধুপুত্র সন্তোষ মজুমদারকে ইলিনয় (আমেরিকা) বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠালেন। শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যক্ষ লেনার্ড এলমহার্স্ট সকলকে বলতেন, 'আমি চাষা'। লোকে বলে—'য্যায়সা অন তেয়সা মন', বলে—'ফুড ইজ গড'। উপনিষদ বলেন, 'অন্নং ব্রহ্ম'। ঠাকুর বলতেন, 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'। পেটে খেলে বুদ্ধি খুলে। আমরা উত্তম চাষা, ভগবান বুদ্ধের শরণ নিলাম। বৌদ্ধযুগে কৃষির ব্যাপক ও বৈজ্ঞানিক ধারণা থেকে অবশ্যই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ, বৌদ্ধ অনুগামিগণ এবং ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে আমাদের বলতেই হয়—**নমো, হে নমো!!**

তথ্যসূত্র ঃ (ক) জগতের ধর্মগুরু—রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর। (খ) Rhys Davis—Buddhism in India। (গ) ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (প্রাচীন যুগ)—ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়।

'এক পৃথিবী-এক স্বাস্থ্য'—এই মন্ত্র

অনন্য ধর *

'এক পৃথিবী–এক স্বাস্থ্য' এই মন্ত্রেই আধুনিক কৃষিকাজের সফলতার মূল চাবিকাঠি। আমাদের সুস্বাস্থ্য, পরিবেশের সুস্বাস্থ্য এবং ফসলের সুস্বাস্থ্য একে অপরের সঙ্গে পরস্পর সংযুক্ত। এর উপরে ভিত্তি করে বিভিন্ন বিভাগীয় বিশিষ্টজনেরা এক ছাতার তলায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগত বিষয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেন।

'এক স্বাস্থ্য' একটি আন্তঃবিভাগীয় দৃষ্টিকোণ—যা বিশ্বাস করায় যে, পৃথিবীর সমস্ত জীবজগতের জীবন প্রক্রিয়া একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। গাছপালা, মানুষ ও পশুপাখিদের জীবন–ব্যবস্থা একটি ভেনচিত্রের মতো মিশে যায়। জীবজগতের সকলেরই স্বাস্থ্য এক সূত্রে বাঁধা এবং কোনো একটি উপাংশের স্বাস্থ্যের উপর সমস্যা বা বিপদ নেমে আসে, তাহলে বাকি উপাংশগুলিকেও এর পরিণাম ভোগ করতে হয়। আমরা মানুষরাই এই সুস্বাস্থ্যের অবনতির মূল অগ্রদূত, কিন্তু এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব মানুষকেই ভোগ করতে হয়। আদর্শ পুষ্টিগত মানের ফলনের জন্য যদি কোনো কৃষক অস্বাস্থ্যকর এবং অনুন্নত কৃষিপ্রযুক্তি সমন্বিত জমি নির্বাচন করে; ফসল ব্যবহারকারী মানুষেরা একদিকে যেমন সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অপরদিকে যে সকল প্রাণিরা এটি গ্রহণ করবে, তাদেরকে গ্রহণ করে পরোক্ষভাবে মানুষেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

আমরা মানুষেরা খুবই স্বার্থপর হয়ে উঠেছি, সবসময় নিজেদের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন থাকি। কিন্তু একবারের জন্যও এটা উপলব্ধি করে উঠতে পারি না যে, অন্যান্য জীবজগতের স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমরাই ভুক্তভোগী হব।

ENVIRONMENTAL HEALTH

ONE HEALTH

HUMAN HEALTH

ANIMAL HEALTH

'এক স্বাস্থ্যের'—গুরুত্ব ঃ ১) ইউনাইটেড নেশনস্ এনভাইরনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP)–এর ২০১৬–র রিপোর্ট অনুযায়ী জুনোতিক (ZOONOTIC) মহামারী বেড়েই চলেছে। জুনোতিক রোগ হলো এমন একটি রোগ—যা কিনা পশুপাখির থেকে মানবদেহে সংক্রমণ হয়। প্রত্যেক ৪ (চার) মাস অন্তর–অন্তর একটি করে নতুন নতুন সংক্রামক রোগ জন্ম নিচ্ছে এবং এদের মধ্যে ৬০ শতাংশও হচ্ছে জুনোতিক।

২) পরিবেশগত স্বাস্থ্য মানুষ এবং পশুজগতের স্বাস্থ্যের সংক্রমণ ও দূষণের মাধ্যমে হানি করে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের দরুন নতুন নতুন সংক্রামক জীবাণু বেড়ে চলেছে।

৩) বাড়ন্ত জন–সংখ্যাকে ভালো এবং উপযুক্ত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা, পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার, পানীয় জল ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করার জন্য স্বাস্থ্য–সম্পর্কীয় পেশার সঙ্গে জড়িত সমস্ত কর্মিদের একসাথে কাজ করতে হবে।

'কৃষক এবং শস্যবিজ্ঞানীদের (Agronomist) এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী'—একজন কৃষক ও শস্যবিজ্ঞানীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের ফলিত ফসলই খাদ্যশৃঙ্খলের প্রাথমিক উপাদান। ফসলের গুণগত মান খারাপ হলে
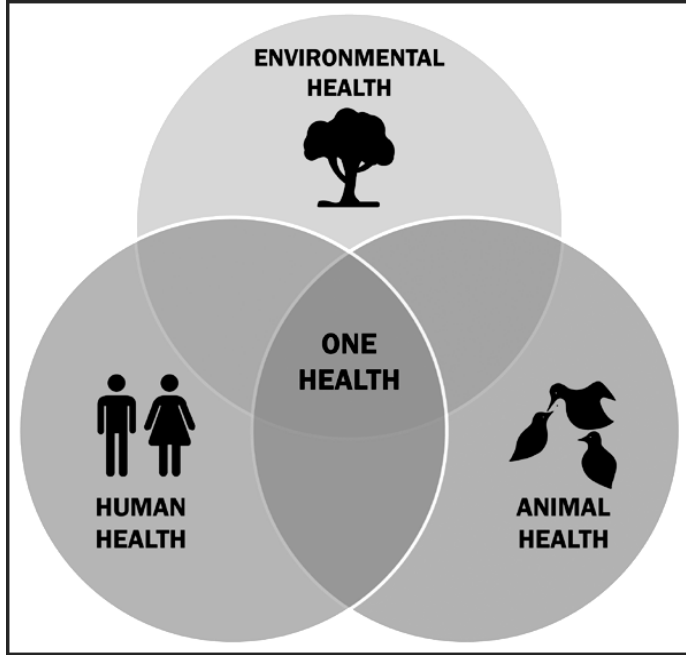
* *শস্য বিজ্ঞান বিভাগ, রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা–৭০০ ১০৩।*

খাদ্যশৃঙ্খলের মধ্যে থাকা প্রত্যেকেই এর প্রভাব অনুভব করবে।

এখানে নিম্নে বর্ণিত কিছু উল্লেখযোগ্য অনুকরণীয় পদ্ধতি বা ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষক ও শস্যবিজ্ঞানীর যৌথ পরিকল্পনার সঠিক ও সার্বিক গুণগত ফসল ফলানোর দিক তুলে ধরা হলো ঃ

১) স্বাস্থ্যকর ফসল উৎপাদন (Healthy crop harvest) ঃ পুষ্টিগত দিক দিয়ে স্বাস্থ্যকর ফসল কাটা বা তোলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক সময়ে এবং সঠিক পদ্ধতিতে ফসল কাটলে আমরা খুবই উন্নতমানের ফসল পেতে পারি। এর ফলে এই সমস্ত ফসলের পুষ্টিগত মানের বিকাশ ঘটবে এবং সেই সঙ্গে ফসলে রোগ ও পোকামাকড়ের প্রকোপও কম থাকবে। যেহেতু এই সমস্ত ফসলের একটি স্তর থেকে অন্য একটি স্তরে খাদ্যশৃঙ্খলের (food chain) মাধ্যমে রূপান্তরিত হয়ে থাকে, তাই প্রাথমিক অবস্থায় এর গুণাবলী শ্রেষ্ঠ হওয়াই শ্রেয়। একজন শস্যবিজ্ঞানী এক্ষেত্রে সঠিক সময় ও সঠিক পদ্ধতি কৃষককে অবগত বা সচেতন করে থাকেন।

২) বৈচিত্রময় কৃষি অনুসরণ করা (Adoption of diversified farming) ঃ একজন শস্যবিজ্ঞানীর কাজ হলো কৃষককে একই প্রজাতির ফসলের চাষ থেকে বিরত করে, ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ বৈচিত্রময় ফসলের চাষ করতে উৎসাহিত করা। বাস্তুতন্ত্র যতই বৈচিত্রময় হয়ে উঠবে, পোকামাকড় ও সংক্রমণকারী রোগজীবাণুর প্রকোপ বা ছড়ানোর বৃদ্ধি হ্রাস পাবে। এতে করে রোগজীবাণু ও পোকামাকড়ের প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যাবে, ফলে ফসলের উপরেও এদের অত্যাচার কমবে এবং আমরা ভালো গুণমানের ফসল পেয়ে থাকব।

৩) সেচের জন্য ভালো গুণমান জল ব্যবহার করা (Maintaining good quality irrigation water) ঃ সেচকার্যের জন্য ভালো গুণমান জল ব্যবহার করার কথা চাষীর মাথায় থাকা উচিত। ব্যবহৃত জল যেন লবণাক্ত না হয় এবং তাতে যেন আগাছার বীজ না থাকে। জলে লবণের মাত্রা বেশি হলে গাছে লবণ জখম (Salt injury) হতে পারে। সেচের জন্য ব্যবহৃত জলের বিভিন্ন স্থিতিমাপ আছে, সেগুলো মানা উচিত।

৪) ভালো গুণমানের ফসলের অবশিষ্টাংশ গবাদি পশুর খাবার হিসেবে ব্যবহার (Good quality crop residue as feed for livestock) ঃ গবাদি পশুর খাবার হিসেবে ব্যবহৃত ফসলের অবশিষ্টাংশ যেন বিষাক্ত না হয়। খাবার যেন ফসলের বীজ বা দূষণকারী পদার্থ থেকে মুক্ত থাকে। ফসলের অবশিষ্টাংশ যেন খুব বেশি ভেজা বা খুব বেশি শুকনো না হয়। বেশি ভেজা হলে ছত্রাকের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়, ফলে খাবারের জন্য অনুপযোগী হয়ে ওঠে। একজন কৃষকের সবসময় ভালো পুষ্টিগত ফসলের অবশিষ্টাংশই পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা উচিত।

৫) জৈব পদ্ধতিতে চাষ (Adoption of organic farming) ঃ জৈব পদ্ধতিতে চাষের মাধ্যমে আমরা রাসায়নিক-মুক্ত ফসল পেয়ে থাকি। জৈব পদ্ধতিতে চাষ করলে মাটির স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। মাটিতে বসবাসকারী উপকারী অনুজীবদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই বাড়ন্ত জনসংখ্যাকে শুধুমাত্র জৈব কৃষির দ্বারা খাদ্য জোগান দেওয়া সম্ভব নয়, তাই আমাদের সমন্বিত চাষ পদ্ধতিকে অবলম্বন করতে হবে—যা পুরোপুরি রাসায়নিকের উপর নির্ভরশীল নয়।

৬) খড়/ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানো রোধ করা (Not to stubble burning) ঃ একজন শস্যবিজ্ঞানীকে চাষীভাইদের মধ্যে ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর অপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন করা উচিত। ফসলের অবশিষ্টাংশ পোড়ালে বায়ু দূষণের পাশাপাশি অনেক রকমের শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতা বেড়ে যায় মানুষ ও পশুদের মধ্যে।

৭) বৃষ্টির জল সংগ্রহ করা (Rainwater harvesting should be followed) ঃ বৃষ্টির জলকে সংগ্রহ করে, সংরক্ষণ করে, ফসলের সেচ-কাজে লাগানো উচিত। বৃষ্টির

জলে ভালো মাত্রায় সালফার থাকে—যা ফসলকে চুষীপোকা ও ছত্রাকের থেকে প্রতিরোধক করে তোলে।

৮) রাসায়নিকের ব্যবহার কমানো (Reduction of use of agricultural chemicals) ঃ কৃষি রাসায়নিক—যেমন রাসায়নিক সার, ছত্রাকনাশক, কৃষিবিষ, আগাছানাশক খুবই কম মাত্রায় ব্যবহার করা উচিত। এই সব রাসায়নিক মাটির স্বাস্থ্যকে ক্ষতি করার পাশাপাশি মাটিতে অবস্থিত মিত্র-কীটদের সংখ্যাও কমায়। রাসায়নিকদের অধঃপাতনের হার অনেক কম বলে, এরা মাটিতে অনেক দিন অটল থাকতে পারে। আবার অনেক সময় এই রাসায়নিক সেচ জলের সঙ্গে মিশে নিকটবর্তী জলাশয়ে গিয়ে ইউট্রোফিকেশন (Eutrofication) ঘটায়, যার জন্য অনেক জলজপ্রাণী মারা যায়। চাষীদের সমন্বিত পদ্ধতিতে আগাছা, পোকামাকড় ও খাদ্য উপাদান ব্যবহারের ব্যাপারে সচেতন করা এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

৯) মাটিকে খালি ফেলে না রাখা (Do not keep the soil bore) ঃ একটি সুস্বাস্থ্যকর মাটিকে কখনও খালি ছাড়তে নেই। এতে গুরুত্বপূর্ণ অনুজীবীদের জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়। ফসলহীন জমি জল এবং বায়ু দূষণের শিকার হয়। তাই ফসলহীন জমিকে খড় অথবা ফসলের অবশিষ্টাংশ দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত।

১০) ভূগর্ভস্থ জলের পরিবর্তে জলাশয়ে সংগৃহীত জলের ব্যবহার (Use of more surface water than ground water) ঃ একজন শস্যবিজ্ঞানীর চাষীভাইদের সচেতন করা উচিত যে, সেচকার্য ভূগর্ভস্থ জলের পরিবর্তে সাধারণ উপায়ে সংগৃহীত জল—যেমন পুকুর, খাল, বিল, বৃষ্টির জল ব্যবহার করা উচিত। ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহারে আর্সেনিক এবং ভারী ধাতুর পরিমাণ মাটিতে এবং সেই সঙ্গে ফসলেও বৃদ্ধি পায়। সেই ক্ষেত্রে সাধারণ সংগৃহীত জল অনেকটাই নিরাপদ।

অতএব একজন শস্যবিজ্ঞানীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হলো ভূমির স্বাস্থ্য, ফসলের স্বাস্থ্য এবং মানবজাতির সুস্বাস্থ্যকে বজায় রাখা। কারণ, মানবজাতির জীবন-ধারণের জন্য স্বাস্থ্যকর ফসলের গুরুত্ব অপরিসীম। শস্যবিজ্ঞানীর অবশ্যই **চাষীভাইদের সচেতন করা উচিত এমন কিছু নেতিবাচক প্রযুক্তির উপরে, যেগুলো মাটির স্বাস্থ্যকে অবনমিত করার পাশাপাশি ফসলের গুণাবলী হ্রাস করে। যদি ফলন স্বাস্থ্যকর এবং সংক্রমণহীন হয়, তাহলেই 'এক পৃথিবী—এক স্বাস্থ্যের' উপরে আসা বেশির ভাগ সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।***

** ডঃ কাজল সেনগুপ্ত এই বিষয়টি রচনার জন্য নির্দেশ ও পরামর্শ দানে বাধিত করেছেন।*

(৪২৬ পৃষ্ঠায় 'বাণিজ্যিক কমিউনিকেশন নিয়ে দু-চার কথা'র শেষাংশ)

এই বিষয়ে আমাদের উচিত কয়েকটা বিষয় মনে রাখা। যেমন হলো ঃ

- সব রসিকতা সবার ভালো নাও লাগতে পারে
- খুব চিন্তাভাবনা করে রসিকতা করা উচিত
- দরকার হলে নিজেকে নিয়ে মজা করা উচিত। এতে শ্রোতারা মনে করবে, বক্তা তাদেরই মতো কেউ একজন।

'কনভারসেশন স্কিলস্' বা 'বাকপটুতা' ব্যবসার ক্ষেত্রে খুবই দরকার। এটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে ফেলেছেন। খুবই ছোট কিন্তু দরকারি কথা বলে শেষ করব।

- ❑ প্রথমেই যেটা বলা দরকার, তা হলো সংলাপ শুরু করার সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো শ্রোতার হাল-হকিকত চট করে জেনে নেওয়া। শরীর ভালো আছে কিনা, বাড়িতে সবাই ভালো আছে কিনা, ইত্যাদি।
- ❑ 'লাইক', 'অ্যাকচুয়ালি', 'বেসিক্যালি'—এই সব শব্দ ব্যবহার না করলেই ভালো। 'আহ্', 'ওহ্', এ সমস্ত আওয়াজ করা, বা বারেবারে জিজ্ঞেস করা 'বুঝতে পারছেন তো ব্যাপারটা?', 'ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?' এই ধরনের কথা মানে শ্রোতাদেরকে হেয় করা।

ব্যবসা ক্ষেত্রে এরকম অনেক সময় হয়, যখন বহু মানুষের মুখোমুখি হতে হয়, যারা আমাদের সাথে সহমত হন না এবং তাঁদের অসম্মতি খোলাখুলিই প্রকাশ করেন। একজন পারদর্শী কথোপকথনচারী জানেন, কীভাবে সেই বিতর্কিত বিষয়টি পাল্টে অন্য বিষয়ে নিয়ে যেতে হয়।

- ✸ আত্মবিশ্বাস একটা বিরাট জিনিস। আত্মবিশ্বাস থাকতেই হবে একজন বক্তার।
- ✸ আই কন্টাক্ট করা খুবই দরকারি।

ভাববিনিময় সঠিক হলে যে-কোনো আলোচনার ফল ভালো হয়। এটি একটি skill যা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। কবি রুডইয়ার্ড কিপলিং বলছেন, **'মানুষের ইতিহাসে সব চাইতে শক্তিশালী মাদক দ্রব্য তার শব্দভাণ্ডার।'**

কিশোর-কিশোরীর অঙ্গনে

মা আসছেন ... সুনীতি মুখোপাধ্যায় *

মা আসছেন..., মা আসছেন...
সাত-সকালের সূর্যে,
ঘুম-ভাঙানো পাখির গানেও
আগমনী-সুর যে!

মা আসছেন..., মা আসছেন...
দীঘির জলে পদ্ম—
কুঁড়ির পোশাক ছড়িয়ে দিয়ে
উঠলো ফুটে সদ্য,

ভ্রমর তা'কে গুন্‌গুন্ গান
শোনায়—অনবদ্য।

মা আসছেন..., মা আসছেন...
কাশের চামর দুলছে,

কুল্-কুল্-কুল্... ছোট্ট নদী
ঢেউয়ের বেণী খুলছে,
রোদের গুঁড়ো সাত-রঙা ওই
রামধনু-রঙ গুলছে!

মা আসছেন..., মা আসছেন...
শুনছি ঢাকের বাদ্যি,
মেলায় দোকান হর-রকমের,
কোন্‌টা কেনা বাদ দি'!

ব্যস্ত শীতল চট্টোপাধ্যায় *

পুজো আসছে ঘর নিকানোয় ভীষণই ব্যস্ত মা,
নিকানোর পরে বাড়িরও পুজোর সাজেতে গা।
পুজো আসছে তাই কুমোরের কাজেও ভীষণ তাড়া,
পুজো হয় না যে, তার তৈরি ঘট বা প্রদীপ ছাড়া।
পুজো আসছে ভীষণ ব্যস্ত শোলা শিল্পীও তাই,
দুর্গা সাজাতে তার তৈরি ডাকের সাজই যে চাই।

পুজো আসছে ব্যস্ত ভীষণ তাই তো গ্রামের ঢাকি,
ঢাক, লুঙ্গি, গেঞ্জি গুছিয়ে শহরের পথ বাকি।
পুজো আসছে বলেই ব্যস্ত সাঁওতালি সব মেয়ে,
উপায় করতে মাদল তালিম নিচ্ছে নেচে-গেয়ে।
পুজো আসছে বলে ব্যস্ত সবচেয়ে বেশি তারা,
মন সাজানোর কিশোর বেলা এই পুজোটায় যারা।

এবার শরতে রামচন্দ্র ধাড়া *

সাদা মেঘের কই সে ভেলা, কই সে নীলাকাশ?
কোন্ সুদূরে ভেসে গেল শিউলি ফুলের বাস?
হৃদয়হরণ রূপ দেখি না বাংলা মায়ের আজ,
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ে, গুড়গুড়িয়ে বাজ।
নদীর কূলে কাশের বনে শ্বেতপতাকা কই?
শরৎরানী এলো তবু দেখি না হৈচৈ।

বন্যা হলো জেলায় জেলায়, ভাসলো কত গ্রাম,
হায়, মানুষের কী দুর্দশা! এবার বিধি বাম।
দুর্গামায়ের আগমনী গাইছে না কেউ সুখে,
মায়ের পূজা করতে হবে এবার মলিন মুখে।
বাপের বাড়ি এলে মাগো, মনে যে সুখ নাই!
দুঃখ ঘুচাও মা শিবানী, আর কিছু না চাই!

রাজ দর্শন ❀ মন্দিরা চট্টোপাধ্যায় *

আজ গ্রামে হুল্লোড় এসেছেন রাজা,
জনতার মাঝে রব পড়ে যায় সাজা।
রচা হলো মঞ্চ এক অমরাবতীবৎ,
ঝুলানো হলো তাতে মণিমরকৎ।
বহুমূল্য ভেট দেয় রাজাকে সবাই,
রাজা বলে ধরে আন করব জবাই।

তর্জনী তুলি রাজা দেখাল পলকে,
শীতে কাঁপা শীর্ণকায় ভিখারি বালকে।
মঞ্চ হতে নামি রাজা দিল নিজের শাল,
সবাই-অবাক, রাজার লাজে মুখ লাল।

সজোরে (রাজা) করেন ছিন্ন কণ্ঠমালা যত,
রাজা বলেন আমি হীন পালি নাই ব্রত।
আমার শাসিত দেশে নাই অন্ন বস্ত্র,
আমারে বিনাশ কর হাতে ধর অস্ত্র।
মুণ্ড মোর ছিন্ন কর সেও নয় মন্দ,
কণ্ঠে বড় বেমানান এই দাম কুন্দ।

** সমাজশিক্ষার এই কবিরা পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী।*

ফুল ফোটে বনে নয়, মনে ❀ নিতাই মৃধা *

ফুল ফোটে বনে নয় গো
ফুল যে ফোটে মনে,
শরত এলে ফুল যে ফোটে
শিউলি-কাশের বনে।

ফুল যে ফোটে মায়ের কোলে
ছোট্ট শিশুর মুখে,
ফুল যে ফোটায় দুরন্ত ঢেউ
দেখ সাগর বুকে।

ঘরের থেকে বাইরে এসে
ঘাসের পরে বিন্দু,
মনের মধ্যে ফুটে ওঠে
আনন্দের সিন্ধু।

ভোরের বেলা উঠি জেগে
মিষ্টি কুহুতানে,
মনের মধ্যে ফোটে যে ফুল
বসন্তের-ই গানে!

মা ❀ মিতালী সরদার *

দুঃখ পেলে সবার আগেই
মাকে মনে পড়ে,
করলে আদর নয়ন থেকে
আপনাতে জল ঝরে।

ঘুম যদি না আমার আসে
জেগেই থাকি বসে,
হাত বুলিয়ে মাথায় আমার
আদর করে হেসে।

দুঃখ পেলে তুমি মাগো
কাতর হয়ে যাও,
আমার সুখে সবচেয়েতে
তুমিই সুখী হও।

তাই তো শুধু তোমার স্নেহে
আমার বেঁচে থাকা,
তোমায় ছাড়া আমার জীবন
একেবারেই ফাঁকা।।

ফন্দি ❀ বিকাশ পণ্ডিত *

দোতলাতে সিংহ থাকে, তেতলাতে বাঘ;
তাই না দেখে ভালুকভায়ার হলো ভীষণ রাগ।
রাগের কারণ জানতে চেয়ে অখিলদাসের নাতি;
আনল কিনে বিশ হাজারে কোচবিহারের হাতি।
শুঁড় দুলিয়ে এলেন হাতি সঙ্গী হাজার ছাগ;
সোঁদরবনে সাত সকালে উঠল বেজে ঢাক।
ঢাকের বোলে উঠল নেচে গড়ুচুমুকের ফেউ;
বললে হেসে—গাইব খেয়াল শুনবে নাকি কেউ?
দিল্লী থেকে বিল্লি এলো, আলিপুরের হিপো;
শ্যামবাজারে বসবে আসর ফাঁকা ট্রামের ডিপো!
ঠিক ধরেছে জাকির আলি—এ সবই ফন্দি;
সাঁতরাগাছির পরিযায়ী খাঁচায় নাকি বন্দী!
ফ্ল্যাট বানিয়ে বিক্রি করে নফর মিঞার দাদা;
মার্কেটিং-এ বেরিয়েছে আজ হাজার দশেক গাধা।

বাঁচতে গেলে ❀ দীনেশচন্দ্র আচার্য *

বাঁচতে গেলে স্বাস্থ্য চাই
খাদ্য আবাস বস্ত্র চাই।
বাঁচতে গেলে স্বচ্ছ জল-ও
মুক্ত বাতাস-আলো চাই।

বাঁচতে গেলে বন্ধু চাই
গুল্ম-লতা-বৃক্ষ চাই।
বাঁচতে গেলে পশুপাখি
সকল জীবের রক্ষা চাই।

বাঁচতে গেলে শান্তি চাই
মায়াপ্রেমের গন্ধ চাই।
বাঁচতে গেলে বাইরে ঘরে
উপকারে মানুষ চাই।

বাঁচতে গুরুর দীক্ষা চাই
মন্দ ভালোর শিক্ষা চাই।
বাঁচতে গেলে সবার তরে
প্রেমের খুশি ভিক্ষা চাই।

আমার গাঁ ❀ বদ্রীনাথ পাল *

গাঁয়ের মানুষ আমি যে ভাই, গাঁয়েই করি বাস
কান্না-হাসি, দুঃখ-সুখে কাটাই বারো মাস।
স্নিগ্ধ বাতাস, নির্মল জল, সতেজ ফুল ও ফল
খুব সহজেই পাই যে খুঁজে অমৃত অবিকল!
দিক্ সীমানা জুড়ে আছে শস্য শ্যামল মাঠ
শাপলা শালুক জল টলটল ভরা পুকুর ঘাট।
বোশেখ ঝড়ে আম কুড়োনো, জলছবি বর্ষায়
শরতে কাশ আর নবান্ন হেমন্ত সন্ধ্যায়।
পার্টিসাপটা চড়ুইভাতি যেই না আসে শীত
বসন্তকে দেয় মাতিয়ে কোকিল কুহুর গীত।
সবই আছে আমার গাঁয়ে, দেখবে যদি ভাই
ওই যে দূরে আলপথটি, পেরিয়ে আসা চাই!

শব্দ শুনে ❀ মুকুল মাইতি *

কুল কুল কুল শব্দ শুনে
ভাবতে পার বইছে নদী।
ঝির ঝির ঝির শব্দ যখন
ঝরনা নামছে নিরবধি।
শন শন শন বইছে বায়ু
উঠতে পারে ঝোড়ো বাতাস।

কড় কড় কড় করছে মেঘ
ভেবো না এ-সুনীল আকাশ।
শুনছ যখন ছলাৎ ছলাৎ
ভাবতে পার তখন তুমি।
কাছে পিঠেই পেয়ে যাবে
সোনালি এক বেলাভূমি।

হুতোম পেঁচার ডাকটি শুনে
ভাববে তুমি গভীর রাত।
কিচির মিচির পাখির ডাকে
রাত্রি গিয়ে হলো প্রভাত।
ঝনাৎ শব্দে ফাটাল কান
ভেবেই নাও ভাঙল কিছু।

কুটুর কুটুর হচ্ছে যখন
ঘুনপোকারা লাগছে পিছু।
শব্দগুলো কানে এলেই
বুঝেই নিই অনেক কথা।
কান্নার রোল জানিয়ে দেয়
প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথা।

* *সমাজশিক্ষার এই কবিরা পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী ও শুভাকাঙ্ক্ষিণী।*

কুইজ

তুমি কি জানো?

কুইজমাস্টার *

১. অর্ঘ্য তৈরি করার সময় দূর্বাগুলিকে—এই পাতা দিয়ে বাঁধা হয়, কোন্ সে পাতা?
ক) আলতাপাতা খ) বেলপাতা গ) সিঁদুরপাতা

২. চালের গুঁড়া দিয়ে থালার উপর মঙ্গলকারী রঙ-বেরঙের চূড়া তৈরি করা হয়, একে চলতি কথায় কি বলে?
ক) চূড়া খ) শ্রী গ) পীট

৩. মা দুর্গার গাত্রবর্ণ কোন্ ফুলের রঙের?
ক) কলকে খ) সূর্যমুখী গ) অতসী

৪. দুর্গা প্রতিমার চালচিত্রের শীর্ষের কেন্দ্রবিন্দুতে কোন্ দেবতার প্রতিকৃতি থাকে?
ক) ব্রহ্মা খ) বিষ্ণু গ) মহেশ্বর

৫. শ্রীশ্রীমা দুর্গার মহাস্নান কোন্ তিথিতে শুরু হয়?
ক) ষষ্ঠী খ) সপ্তমী গ) দশমী

৬. বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার সংকল্প কার নামে করা হয়?
ক) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খ) স্বামী বিবেকানন্দ গ) মা সারদা

৭. পিতৃতর্পণ কোন পক্ষে করা হয়?
ক) শুক্লপক্ষ খ) দেবীপক্ষ গ) কৃষ্ণপক্ষ

৮. নবমীতে বেলুড় মঠে পশুবলির বদলে কি বলি দেওয়া হয়?
ক) কুষ্মাণ্ড খ) ফুলকপি গ) লঙ্কা

৯. ঠাকুরের কোন্ সন্তান নগ্নপদে কৈলাস ও মানস পরিক্রমা করেছিলেন?
ক) স্বামী বিবেকানন্দ খ) স্বামী অভেদানন্দ গ) স্বামী অখণ্ডানন্দ

১০. গোমূত্র দুর্গাপূজার কোন্ উপচারের একটি অংশবিশেষ?
ক) পঞ্চশস্য খ) পঞ্চগব্য গ) পঞ্চামৃত

১১. দার্জিলিং-এর রামকৃষ্ণ ভাবধারার প্রথম প্রধান প্রবর্তক কে?
ক) বিবেকানন্দ খ) অভেদানন্দ গ) সারদানন্দ

১২. ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতি-সমাধিমন্দির কোথায় আছে?
ক) আয়ারল্যাণ্ড খ) বাগবাজার গ) দার্জিলিং

১৩. 'প্রকৃতিং পরমাং' মন্ত্রটি কে রচনা করেছেন?
ক) স্বামী অভেদানন্দ খ) স্বামী বিবেকানন্দ গ) স্বামী সারদানন্দ

১৪. পশ্চিমবঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সেবাকার্য কোথায় শুভারম্ভ হয়?
ক) বরানগর খ) বেলুড় মঠ গ) মহুলা (সারগাছি)

১৫. মা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দের দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে কাকে বলেছিলেন 'তোমাকে আমার সর্বস্ব দিলাম'?
ক) স্বামী সারদানন্দ খ) স্বামী অখণ্ডানন্দ গ) স্বামী প্রেমানন্দ

১৬. স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম কুমারীপূজা কোথায় করেন?
ক) বেলুড় মঠ খ) কাশ্মীরের ডাল লেক গ) গাজীপুরে গগনবাবুর বাটীতে

১৭. পদ্মগাছের কোন্ অংশ বংশবৃদ্ধির সহায়ক?
ক) কন্দমূল খ) গ্রন্থিমূল গ) গ্রন্থিকাণ্ড

১৮. গম গাছ কখন কাটা হয়?
ক) শ্রাবণ মাসে খ) মাঘ মাসে গ) বৈশাখ মাসে

১৯. ঝিঙের বীজ রোপণ করার উপযুক্ত সময় কখন?
ক) ফাল্গুন থেকে চৈত্র খ) মাঘ থেকে চৈত্র গ) অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ

২০. এক একর জমি মানে কত কাঠা?
ক) ২০ কাঠা খ) ৬০ কাঠা গ) ৪৫ কাঠা

২১. কোন জাতীয় ঘাস খাওয়ালে গরুর দুধের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়ক?
ক) ফোডার খ) উলু গ) ক্রিপার

২২. গরুর দুধে একটি নাইট্রোজেনঘটিত উপাদান বিশেষভাবে পাওয়া যায়, সেটি কি?
ক) অ্যামোনিয়া খ) নিউক্লিক অ্যাসিড গ) অ্যামাইনো অ্যাসিড

২৩. স্বামীজীর ধ্যানমূর্তি ছবিটি কোথায় তোলা হয়েছিল?
ক) বেলগাঁও খ) লণ্ডন গ) মহীশূর

২৪. 'ভারত' শব্দের অর্থ কি?
ক) ভরতের পুত্র খ) (ভা) জ্ঞানে মগ্ন দেশ গ) ভরত মুনি

২৫. 'দুর্গা' শব্দের অর্থ কি?
ক) দুর্গ-এর স্ত্রীলিঙ্গ খ) দুঃখ প্রাপ্যা গ) দুর্গম অসুর নিধন

* *সমাজশিক্ষার এই কুইজমাস্টার পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী।*

ধাঁধা মজারু *

১) পূজার আগে চেয়ে থাকি রান্নাঘরের পানে
ভেসে আসে মিষ্টি সুবাস পাক লেগেছে কিসে?
নৈবেদ্য–এর থালায় সে যে গড়াগড়ি যায়,
বলতে পারো সে কি জিনিস? সবাই খেতে চায়।

২) এমন এক বীজশস্য আছে জানি,
তার তৈরি তৈল যে মহৌষধি গুণী।
কালোরূপে শ্রাদ্ধাদিতে আর পূজার উপচার,
সাদারূপে গুড়ের সাথে মিষ্টি সে আহার।

৩) আয়রন আর রাফেজ ভরা, বিশেষ এক ফুল।
সর্বঘটে অবস্থান তারই, এই ফুলেরই বেটা তিনিই।

৪) চোখ নেই, মুখ নেই, সিঁদুর দিয়ে আঁকা
হাত পা দিয়ে তার চারদিকটা দেখা,
বলতে পারো কোন্ সে চিহ্ন, পূজার সময় আনি
ঘটের সাথে লেপটে থাকে, অতি শুভ মানি।

৫) তার কায়দা করেছে ওই অশিক্ষিত কুমোর,
কোন্ সে পাত্র ভেঙে দিল ইঞ্জিনিয়ারের গুমোর।

৬) তিন অক্ষরের নাম যে তার, গর্ত খুঁড়তে জুড়ি মেলা ভার,
মাঝের অক্ষর উড়িয়ে দিলে, খুব দামি এক গাছ মিলে।

৭) হোমেও লাগে, যজ্ঞেও লাগে
দুধের সাথে আছে মিলে,
ব্যঞ্জনেতে দিলে পরে
স্বাদে গন্ধে মন যে ওড়ে।

৮) এমন এক শস্য সে শুঁটির মধ্যে থাকে যে,
এটি চাষে বাড়বে জেনো, নাইট্রোজেনটি জমির মেনো
ভাতের পাতে প্রথমে আসে প্রোটিনভরা শস্য হেন।

৯) ভোগের শেষে আবশ্যক যে, মিষ্টান্নরূপে পরম সে।
মাতৃত্বের নির্যাসে ভরা, স্বাদে গুণেও মনোহরা।

১০) শরৎকালে রেলের ধারে, সাদা চুলে মাথা নাড়ে।
ঘাসজাতীয় গাছের ফুল, চিনতে কারোর হয় না ভুল।

১১) মহাষ্টমীর সেই বিশেষ ক্ষণ, উত্তেজনায় ভরা মন।
মা দুর্গার তখন বিশেষ রূপে, চণ্ডমুণ্ড বধে ভীষণ রোষে,
ওই রূপের কি সে নাম, বলতে পারো গুণধাম?

১২) ভারতের জাতীয় রান্না যে,
ভোগের থালার অবশ্যম্ভাবী সে।
পুষ্টিভরা সহজপাচ্য, বালক–ভোজনে অপরিহার্য।

১৩) তারবিহীন নাম যে তার, দৃশ্যবিহীন গান ও কথায়,
মন ভরানো কাজটি যার।

১৪) 'আলোর বেণু' বাজার গান, শুনলে পরে নাচে প্রাণ,
বীর ইন্দ্রের কণ্ঠস্বরে, যে অনুষ্ঠান সবাই স্মরে।

১৫) গঙ্গাকে যে ধারণ করে, পদবীতেও তাকে রাখে।
খণ্ড নয় সে, একাত্ম ইষ্ট সনে
কোন্ সে সাধু পড়ে কি মনে?

১৬) টাক মাথা দণ্ডীধারী, খাটো কাপড় চশমা পরি,
উকিল হয়েও সব ত্যাজিল,
দেশের চিন্তায় প্রাণটি গেল। কে?

১৭) ফল–ফলাদির সমাহার, মিষ্টান্নাদিও শোভা তার।
পূজায় তারে নিবেদন, বলতে পারো সে কোন্ জন?

১৮) কাজে, ব্যবহারে যদি হও শান্ত স্বভাব,
নামের আগে জুটবে তোমার সেই দেবীর ভাব।
নিশাচরটাকে না হয় বাদই দিলে,
উপাধিটি পেয়ে মজেই গেলে।

১৯) শিশুকাব্যের ছড়ায় আসে, ওই গাছেতে তোতা বসে,
পাকা ফলকে ভাঙলে তবে, ক্ষীরের মতো শাঁস যে পাবে।
কালো কালো লম্বা দানা, খোসার পাহাড় না যায় গোনা।

২০) দুর্গা পূজায় দেখি তাকে, গণেশেরই পাশে থাকে।
এত বড়ো ঘোমটা টেনে, নামটি বলো শাস্ত্র মেনে।

২১) হুগলী জেলার রাজ ফসল, রান্নাঘরটি তারই দখল।
মাটির তলায় বাস তার, বলতে পারো নামটি কার?

২২) দেওয়াল ধরে রয় ঝুলে, দিনাতিপাত কাল গুণে।

২৩) গ্রামের অর্থনৈতিক পন্থা সেটি, চার অক্ষরের নাম যেটি।
শেষের অক্ষর বাদ দিলে, নন্দের ছেলের নামটি মেলে।

২৪) প্রথম অক্ষরে আকাশ বোঝ,
পরের দুটি ধরে, কনের পাশে খোঁজ।
তিনটি জুড়ে যেটি হয়, বার্তারই মানে রয়।

* সমাজশিক্ষার এই মজারু পরিষদের শুভাকাঙ্ক্ষী।

সেপ্টেম্বর (পূজা সংখ্যা) ২০২২-র ক্যুইজ ও ধাঁধার সমাধান ৩৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন।

খেলা

স্বপ্নের মতো

সায়ন্তন দাস *

১৯৮০ সালে ভারতবর্ষে বেশ কিছু ঘটনা ঘটে গেছে, যার কারণে এমন কিছু একটা হওয়া দরকার ছিল—যা ভারতের টালমাটাল সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে শান্ত করতে পারে। জাত-পাতের তোয়াক্কা না করে সবাইকে এক সুতোয় বাঁধতে বোধহয় খেলাধুলাই পারে। ১৯৮৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ সেই কাজটাই করে দেখিয়েছিল। বিশ্বকাপ নিয়ে কিছু লেখার পূর্বে বিশ্বকাপের আগের চিত্রটা একটু তুলে ধরা দরকার।

সদ্য বিয়ে করেছেন ভারতীয় দলের খেলোয়াড় কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। বিশ্বকাপে প্রথম পর্বেই ভারত ছিটকে যাবে এই ভেবে তিনি হনিমুনের টিকিট কেটে ফেললেন মার্কিন মুলুকে যাওয়ার। যাওয়া শেষ পর্যন্ত হয়নি। তিনি এবং আরও অনেক মানুষই ভারতের কোনো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, ঈশ্বর করেন আরেক। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, ভারতের অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, কেউ ভাবতেও পারেনি ২৫ জুন ১৯৮৩ কপিলের দল ইতিহাস তৈরি করতে সক্ষম হবে। বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক আয়াজ মেনন লিখছেন, 'I still recall the good-humoured immigration officer at Heathrow Airport, London, ribbing me when I told him I had come to cover the cricket.' সেই ভদ্রলোক সরাসরি বলেন, **ভারতে হয়তো ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতি আছে, তবে সীমিত ওভারের ক্রিকেট খেলতে পারবে না**। এই ধারণা তৈরি হওয়াটাও একেবারে বিস্ময়কর নয়। আগের দুটি বিশ্বকাপে ভারত খুবই খারাপ ফল করেছিল। ১৯৮৩ বিশ্বকাপে জয়ের পর অনেক কিছু বদলে যায়। সারা ভারতে খুশির মুহূর্ত নিয়ে আসে এই ঐতিহাসিক জয়। মানুষ অনেকদিন পর সব ভুলে গিয়ে এক সাথে এই জয় উদ্‌যাপন করে।

মাঠের বাইরে বল পাঠাচ্ছেন ভারতের অধিনায়ক কপিল দেব

গ্রুপ পর্বে প্রথম দুটি ম্যাচে জয় দিয়ে শুরু করলেও, পরের দুটি ম্যাচ বড় ব্যবধানে পরাজিত হয় ভারত। পঞ্চম ম্যাচটি অনেকগুলি কারণে ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে ১৮ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে যখন ভারত ধুঁকছে, ঠিক এই সময় ব্যাট হাতে ক্রিজে আসেন কপিল দেব। ভগবান বোধহয় নিজে স্ক্রিপ্ট লিখেছিলেন সেদিন। সেই দিন আরেকটি ঘটনার জন্যও তাৎপর্যপূর্ণ। BBC (বি বি সি) সেই দিন স্ট্রাইক করায় খেলাটি সম্প্রচারিত হয়নি, এমনকী কোনো রেকর্ডিংও নেই। কিন্তু সেই দিন যে মহাকাব্যিক ইনিংসটি ভারত অধিনায়ক খেলেছিলেন, তা এশিয়ার ক্রিকেটের হালচাল বদলে দিয়েছিল। ১৩৮ বলে ১৭৫ রানের অপরাজিত ইনিংসটি বুঝিয়ে দিয়েছিল ভারত ১৯৮৩ বিশ্বকাপে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হতে চলেছে। এই ইনিংসটি ভারতীয় টিমের মনোবলকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়।

কপিল ভারতীয় দলের অধিনায়ক হন যখন সেই সময় দলে সুনীল গাভাস্কার, মহিন্দর অমরনাথের মতো অভিজ্ঞ তারকারা ছিলেন। কপিলের পক্ষে এইরকম একটি দলকে নেতৃত্ব দেওয়াটাও কিন্তু সহজ ছিল না। কপিলের কথায় '**একটু বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিলাম। সারা জীবন যাদের নায়ক ভেবে এসেছি, এখন তাদের অধিনায়কত্ব করতে হবে আমাকে**।' এমনকী টিম মিটিংয়েও কপিল একটু ঘাবড়ে যেতেন। কিন্তু নেভিল গ্রাউন্ডে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে যে ইনিংসটি উপহার দিয়েছিলেন তাতে অনেক কিছুই বদলে গেছিল।

প্রত্যাশাহীন বিশ্বকাপে শেষ চারে জায়গা করতে পেরে

** আশ্রম মহাবিদ্যালয়ের এই তরুণ প্রাক্তনী শিশু বিদ্যাবীথির একজন নির্ভরযোগ্য শিক্ষক।*

খুশি ছিল ভারত। ইংল্যাণ্ডকে ছয় উইকেটে হারিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবেই তারা ফাইনালে উঠে যায়। অন্য দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ফাইনালে ওঠা প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছিল। যদিও গ্রুপ পর্বের ম্যাচে কপিল দেবের দল জিতেছিল ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে। তবে তখন সেটিকে অঘটন হিসেবেই দেখা হয়। ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম দুটি বিশ্বকাপ জেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বোলিং লাইন আপ এবং কিছু যুগ নির্ধারণকারী ব্যাটস্ম্যানের দক্ষতার ওপর ভর করে, প্রায় দু–দশক বিশ্বক্রিকেট শাসন করেছে এই ক্যারিবিয়ান দল। ক্লাইভ লয়েডের নেতৃত্বাধীন দলে ছিলেন জেফ দুজন, জোয়েল গার্নার, গর্ডন গ্রীনীজ, ডেসমন্ড হেইনেস, ভিভ রিচার্ডস, মাইকেল হোলডিং, ম্যালকম মার্শাল মতো খেলোয়াড়রা।

২৫ জুন ১৯৮৩, এই দিনটা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে জ্বল জ্বল করবে। এই দিনেই ভারত লর্ডসের মাঠে গোটা বিশ্বকে চমকে দিয়ে প্রথমবার বিশ্বকাপ জেতে। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো একটা হেভিওয়েট দলকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতবে। এও এক স্বাধীনতা। কঠিন লড়াইয়ের পর স্বাধীনতা। গোটা বিশ্বের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যে, ভারতও পারে। ১৯৮৩ বিশ্বকাপে ফেভারিট ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আন্ডারডগ ছিল ভারত। হোল্ডিং–এর কথায়, **‘আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছি। এত কম রানে আটকে রাখার পর মনে হয়েছিল সহজেই জিতে যাব।’** সেই হারের স্মৃতি আজও হয়তো তাড়া করে বেড়ায় লয়েড, মার্শাল, গার্নারদের। এবং এটি অনেকেরই ধারণা, অতিরিক্ত আত্মতুষ্টির জন্য ডুবতে হয় ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

টসে জিতে ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড ভারতকে ব্যাট করতে পাঠান। সুনীল গাভাস্কার মাত্র ২ রানে প্যাভিলিয়নে ফেরেন। কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত এবং মোহিন্দর অমরনাথ দলের হাল ধরার চেষ্টা করেন। এই ’৮৩–র বিশ্বকাপে মোহিন্দর অমরনাথের অবদান ভোলার নয়। ফাইনাল এবং সেমি ফাইনালে ‘ম্যান অফ দি ম্যাচ’ হন তিনি। গ্যাটিং এবং গাওয়ারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেমি ফাইনালে এবং ব্যাট হাতেও রান পেয়েছিলেন। ফাইনালেও তিনি বড় ভূমিকা পালন করেন। ৫৪.৪ ওভারে ভারত ১৮৩ রানে অল আউট হয়ে যায়। ম্যাচের ভাগ্য নিয়ে আর কারোর মনে কোনো সংশয় ছিল না। ব্যাট করতে নেমে প্রথমেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের উইকেট পতন হয়। বলবিন্দর সিংহ সান্ধুর ইনসুইং ডেলিভারিতে গর্ডন গ্রীনীজ বোল্ড হয়ে যান। তবে ভিভিয়ান রিচার্ডস কিন্তু বেশ আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করছিলেন। এক সময় মনে হচ্ছিল, ভিভ একাই ম্যাচ বের করে দেবে। তবে ক্রিকেট হচ্ছে ‘Game of uncertainty’ জীবন এবং ক্রিকেট, দুটিই অনিশ্চিয়তায় ভরা। মদন লালের বলে ওভারবাউন্ডারি মারতে গিয়ে আউট হয়ে গেলেন। আউট হলেন এবং ম্যাচে ফিরল ভারত। কপিল দেব আবার বসলেন নায়কের আসনে। কপিল দেব অনেকটা পেছনের দিকে দৌড়ে ধরলেন সেই ঐতিহাসিক ক্যাচ। ক্লাইভের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন রজার বিনি। জেফ দুজন এবং ম্যালকম মার্শালের ব্যাটে ভর করে ক্যারিবিয়ানরা ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করে। শেষে ১৪০ রানে গুটিয়ে যায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ভারত প্রথমবার বিশ্বকাপ জেতে এবং পুরোটাই রূপকথার মতো।

বিশ্বকাপ ফাইনালের একটি মুহূর্ত

১৯৮৩ বিশ্বকাপ জয়ের লগ্নে ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের তদারকিতে বিশ্বকাপ উপমহাদেশে অনুষ্ঠিত হলো ১৯৮৭ সালে। ইংল্যাণ্ডের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করলেন এন কে পি সালভে, জগমোহন ডালমিয়া এবং আই এস বিন্দ্র। ১৯৮৩–তে বিশ্বকাপ জেতার পরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ঘটনা ঘটল, তা হলো ভারত ক্রিকেটের উপকেন্দ্র বা epicentre হয়ে উঠল। সব শেষে যেটা বলা দরকার, তা হলো ভারত পরবর্তী কালেও বিশ্বকাপ জিতেছে। কিন্তু ১৯৮৩–তে জয়টা ছিল অন্য রকমের। এই জয় অনেক কিছু বদলে দিয়েছিল। মেনন তার একটি লেখায় লিখছেন, **‘It took twenty-eight years for India to win the World Cup again. India’s triumph in 2011 was spectacular, but for its sheer impact on the Indian psyche and the game, 1983 victory remains unsurpassed.’**

এ যুগের দধীচি

সমাজশিক্ষার হিতৈষিণী *

আজ ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সাল, ইতিহাসের পথ ধরে প্রায় ১০০ বছর পেছনে চলে এসেছি আমরা। সারা ভারত আজ শোকস্তব্ধ। খিদে, তৃষ্ণা সবাই ভুলে গেছে। ছোট্ট শিশুটিও আজ খিদের কথা বলছে না। আজ যতীন নামের ছেলেটি দেখিয়ে দিয়েছে ৬৩ দিন অনশন করে, মাত্র ২৪ বছর বয়সে সমস্ত খিদে তৃষ্ণার কষ্টকে জয় করে, কেমন করে প্রতিবাদ করতে হয়। ক্ষুধার যন্ত্রণায় শরীরের সমস্ত যন্ত্রগুলি আস্তে আস্তে বিকল হয়ে পড়লেও মানুষ অন্যায়–এর কাছে নত হয় না। এ যেন **নিজেই নিজের সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার গল্প, মানব থেকে মহামানব হয়ে ওঠার এক আখ্যান।**

লালা লাজপৎ রায়

পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপৎ রায়ের লাহোরের রাজপথে পুলিশের অত্যাচারে মৃত্যু হলে, ভারতের বিপ্লবীদল প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। ১৭ ডিসেম্বর ১৯২৮, বিপ্লবীদের গুলিতে অত্যাচারী জে.পি. স্যান্ডার্স নিহত হন। লাহোরের সমস্ত রাস্তা পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ দেশবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপ ১৯২৯ সালের ৬ জুন বিপ্লবী ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত অ্যাসেমব্লি হলে একটি উন্মুক্ত স্থানে কোনো মানুষকে হত্যা না করে সজোরে একটি বোমা নিক্ষেপ করে ইংরেজ সরকারকে সচকিত করে এর প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এই ঘটনায় আতঙ্কিত ইংরেজ সরকার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করে। ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও আরো অনেক বিপ্লবীরা গ্রেপ্তার হন। কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় যতীন দাসকে, কারণ বোমা বানানোর কারিকুরি শেখানোয় তিনি মাস্টার।

ভগৎ *সিং*

লাহোর জেলের গেটের সামনে যখন প্রিজন ভ্যান থেকে তাকে নামানো হলো, কাঠগড়ার মধ্য থেকে চিৎকার করে উঠলেন বটুকেশ্বর, 'আরে যতীনদা যে, একেবারে সাতপাকে বেঁধে জামাই আদরে আনল যে। কেমন আছো দাদা!' **ভগৎ সিং জানালেন তাঁর শ্রদ্ধা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, যতীন দাস জিন্দাবাদ'**। সমস্ত বিপ্লবীরা সমবেতভাবে স্বাগত জানালেন যতীন দাসকে।

কিন্তু লাহোর জেলের পরিবেশ দেখে বিপ্লবীরা বাকরুদ্ধ। বন্দীদের পোশাক অপরিচ্ছন্ন, পচা খাদ্য দেওয়া হচ্ছে, খাবারে ইঁদুর, আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সাধারণ চোর ডাকাতদের সাথে থাকতে হচ্ছে তাঁদের। এই অমানবিকতার প্রতিবাদ জানিয়ে ভগতের সাথে পরামর্শ করে যতীন দাস স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যতদিন তাঁদের পরিষ্কার খাবার ও রাজবন্দীর মর্যাদা দেওয়া না হয়, তাঁরা অনশন চালিয়ে যাবেন। পুলিশ সুপার ব্যঙ্গের হাসি হাসেন।

প্রথম দু–একদিন সরকার তাঁদের উপেক্ষা করল। কিন্তু যত দিন গড়াতে লাগল, দাবানলের মতো খবর ছড়াতে লাগল বাইরে। মিছিল, বিক্ষোভ শুরু হলো পাঞ্জাব, লাহোর, বাংলা জুড়ে। প্রথমে কর্তৃপক্ষ জোর করে তাঁদের খাওয়াতে চেষ্টা করল। চাবুক, লাঠির আঘাতে তাঁদের জর্জরিত করল। ক্ষতবিক্ষত বিপ্লবীদের জল দেওয়া বন্ধ করল। আগে খাদ্য নে, তারপর জল। সাঁড়াশি

* *এই ভক্ত গৃহবধূ বিচিত্র বিষয় লেখায় পারদর্শী ও জনপ্রিয়।*

দিয়ে মুখ খুলে ঢুকিয়ে দিল খাবার। তাঁরা থু থু করে ফেলে দিলেন। অনশন ভঙ্গ করলে মুক্তি দেওয়ার লোভ দেখালো। কিন্তু তাঁরা অটল। ভারতের গণ্ডি পেরিয়ে ইংল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল এই খবর। বড়লাট অরউইন ছুটে এলেন লাহোরের কমিশনারের সাথে কথা বলতে। কিন্তু ততদিনে পেরিয়ে গেছে ৫০ দিন। সুভাষচন্দ্র বার্তা পাঠালেন তাদের সমর্থন করে। সারা ভারত জুড়ে সুভাষের নেতৃত্বে শুরু হলো ধিক্কার মিছিল। এই অবস্থাতেও স্ট্রেচারে করে আদালতে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁদের।

লাহোর সেন্ট্রাল জেল

২১ আগস্ট ১৯২৯ তারিখে ডাঃ গোপীচাঁদের সাথে পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন এসেছিলেন যতীন দাসকে দেখতে। তাদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি ওষুধ বা পুষ্টিকর কিছু খেতে রাজী হননি। তিনি জানান, খাদ্য নয় নিজের ইচ্ছাশক্তি দিয়ে তিনি বেঁচে আছেন। এই গভর্নমেন্টকে তিনি একটুও বিশ্বাস করেন না। ভগৎ সিং-ও তাঁকে অনুরোধ করেন। কিন্তু যতীন দাস এতে রাজী হন না। ভগৎ সিং তাঁকে আরও ১৫ দিন বেঁচে থাকার জন্য কিছু খেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু **যতীন দাস অভিমানে ভরা গলায় ভগৎ সিংকে বলেন, 'আপনাকে গায়ের জোরে খাওয়ালো কী করে?'** ভগৎ সিং বলেন, 'আমি যতক্ষণ পেরেছি, প্রতিরোধ করেছি। আমার অনুরোধ আপনি রোজ একপোয়া করে দুধ খান।' যতীন দাস মাথা নাড়লেন।

বিপ্লবী যতীন দাস

৩০ আগস্ট, ডাঃ গোপীচাঁদ তাঁকে অন্তত একটু ওষুধ খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন। তিনি বললেন, যতীন দাসের মৃত্যু হলে সব নষ্ট হয়ে যাবে। একজন ছাড়া কমিটির সবাই সব দাবি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু তবু যতীন দাস অনড়। তার শরীর তখন প্রতিরোধ করার ক্ষমতায় আর নেই। ইউরিনে আসছে রক্ত। কিটোন বডি বিপদ সীমা পার করেছে। ক্ষয়রোগ বাসা বেঁধেছে, কাশির সাথে রক্ত উঠছে। সকলের অনুরোধে তিনি সোডা দিয়ে একটু ওষুধ খেলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে ছাড়বে না। তিনিও তাঁর সঙ্গীদের ফেলে বাইরে যাবেন না। ভগৎ তাঁকে অনুরোধ জানালেন অনশন ভেঙে দিতে। দপ্ করে জ্বলে উঠল তাঁর চোখ। দাবি না মানা পর্যন্ত অনশন তিনি ছাড়বেন না। সবার চোখে জল কিন্তু তাঁর মুখে অম্লান হাসি।
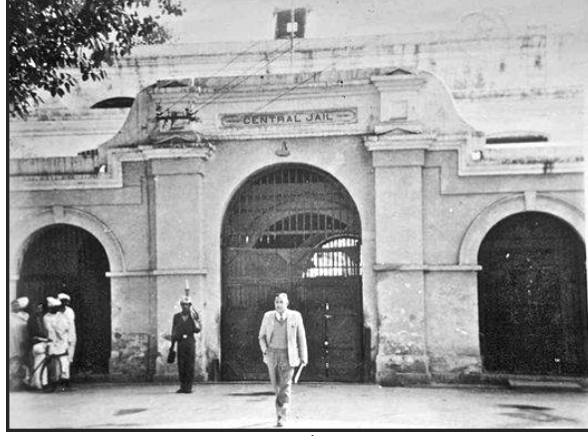
১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ —অনশনের ৬৩-তম দিন। আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন যতীন দাস। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে। হঠাৎ চোখ খুললেন। ভগৎ, সুখদেব, বটুক সহ সমস্ত বিপ্লবীদের বললেন, 'আমি চললাম। তোমরা থেকো। জয় আমাদের হবেই।' মাত্র ২৪ বছর বয়সে ঝরে গেল একটি তাজা প্রাণ।

সারা দেশে এই খবরে আগুন জ্বলে উঠল। **লাহোর থেকে হাওড়া আসার পথে ৫৭ বার জনগণ থামিয়ে দিল ট্রেন। আবেগে ভেসে গেল ভারতবর্ষ।**

হাওড়া থেকে জনতার কাঁধে চড়ে শুরু হলো শ্মশান যাত্রা। সমস্ত বাধা ভয় দূর করে ২ লক্ষ মানুষ সামিল হলেন মিছিলে, পুরোভাগে রইলেন সুভাষচন্দ্র।

শ্মশানে এলেন পিতা বঙ্কিমবিহারী বাবু। হাঁটু মুড়ে বসলেন পুত্রের সামনে। আদরের খাঁদুকে মুখে, মাথায় হাত বুলিয়ে পরম যত্নে আদর করলেন। অকম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'ওঁ নারায়ণঃ, **যে দেশদ্রোহীরা মাতৃভূমিকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করেছিল, তাদের সকলের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমার আদরের খাঁদুকে অশ্রু অর্ঘ্যসহ তোমার চরণে সমর্পণ করলাম। ওর স্বপ্ন যেন পূর্ণ হয়।'**

নেতাজী তাঁকে বলেছেন 'এ যুগের দধীচি'। তিনি যেন জন্মেই ছিলেন সমস্ত সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্য। আত্মত্যাগ, দেশভক্তি এইসব শব্দগুলি যখন আমাদের কাছে শুধুমাত্র শব্দ, সেগুলিকে সত্য করে নিজের জীবনে প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন তিনি।

শব্দ–ব্যবহার

বাণিজ্যিক কমিউনিকেশন নিয়ে দু-চার কথা

প্রদোষ দাস *

যে–কোনো ক্ষেত্রেই আমাদের কথা বলার ধরন আমাদের পরিচয় প্রদান করে। ভাব বিনিময় একটা শিল্প। ভালো বক্তা হওয়ার জন্য সবার প্রথম যেটা জরুরী, তা হলো ভালো শ্রোতা হওয়া। তথাকথিত মানুষ গড়ার কলেজে পড়ার দরুন নানা অনুষ্ঠান দেখেছি এবং অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্বদের ভাষণ শোনার সৌভাগ্য হয়েছে। একটা জিনিস সর্বদা লক্ষ্য করেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই ভালো বক্তা হওয়ার সাথে সাথে ভালো শ্রোতা। **'কমিউনিকেশন'** কখনও এক তরফা হয় না।

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রয়োজন হয় বিভিন্ন জিনিসের। বিজনেস কমিউনিকেশন একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যা অত্যন্ত সুচারু না হলে তা মানুষের মনোগ্রাহী হবে না এবং একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হবে। আজকের দিনে মানুষের সাথে কমিউনিকেট করা খুব কঠিন কাজ নয়। কিন্তু কমিউনি-কেশন টুলস থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় এই কাজটা সঠিকভাবে হয়ে ওঠে না।

সেলসম্যান বোঝাতে চেষ্টা করছেন

যে-কোনো মুখোমুখি আলোচনার সময়ে যেটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়, তা হলো আপনি কী বলছেন। **শব্দের সঠিক প্রয়োগ**। একজন ভালো Salesman বা বিক্রেতার মূল হাতিয়ার হলো সে কী শব্দ ব্যবহার করছে। তার শব্দের ব্যবহার তাকে অনেকটা এগিয়ে দিচ্ছে এবং মানুষকে বাধ্য করছে তার থেকে পণ্যটি কিনতে।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয়কেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন, তা হলো **কণ্ঠস্বর**। ব্যবসা-ক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত কণ্ঠস্বর মানুষের মনে আস্থা জাগায়, আগ্রহ সৃষ্টি করে শ্রোতার, শরীরী ভাষা আর মুখের ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখে। আমাদের কয়েকটি দরকারি বিষয় মাথায় রাখা দরকার।

- **শব্দ নির্বাচন** ঃ স্থান, কাল, পাত্র দেখে আমাদের শব্দের নির্বাচন করা উচিত। আমি নিশ্চয়ই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে যেভাবে বোঝাবো, একটি বাচ্চাকে সেই একইভাবে বোঝাবো না।
- **বাচনভঙ্গি** ঃ পরিষ্কার বাচনভঙ্গি থাকলে শব্দগুলো ভালো করে বোঝা যায়। গলার স্বর এবং বাচনভঙ্গি শ্রোতার আকর্ষণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।
- **নির্দিষ্ট স্বরগ্রাম বা পর্দা** ঃ উঁচু-পর্দার আওয়াজ অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, নিচু-পর্দার আওয়াজ অনেক বেশি স্থিতধী। ভালো বক্তা জানেন, কখন স্বর উঁচু এবং নিচু করতে হবে।
- **উচ্চারণ** ঃ উচ্চারণ সঠিক হওয়া প্রয়োজন। উচ্চারণ নিয়ে সন্দেহ থাকলে অভিধানের সাহায্য নেওয়া জরুরী।

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কথা বলার দরকার হয় সর্বদা। অনেকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। নিজের মনের ভাব প্রকাশ করা একটা শিল্প। আমাদের বক্তব্য মানুষের কাছে তখনই গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তাতে কৌতুক মিশে থাকে, নয়তো পুরো বিষয়টা রস-কষ-হীন মনে হতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, অতিমাত্রায় কোনো জিনিসই ভালো নয়। 'বিজনেস এটিকেট ফর দ্য নিউ ওয়ার্কপ্লেস' বইতে কানেক্টিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রেজিনা ব্যারেকা বলেছেন, 'হাসি-তামাশা হলো প্রেসক্রিপশনের ওষুধের মতো। সঠিক ক্ষেত্রে, সঠিক ডোজে, এই সঠিক ওষুধের প্রয়োগ একদম সঠিক এবং চমৎকার কাজ দেয়। কিন্তু প্রয়োগ বেঠিক হলে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যেতে পারে।'

(এর পরবর্তী অংশ ৪১৭ পৃষ্ঠায়)

---
* *আশ্রমের একজন তরুণ শুভাকাঙ্ক্ষী।*

সাহিত্য-গাথা

পথের পাঁচালী—এক নৈসর্গিক উপাখ্যান

যুধাজিৎ গাঙ্গুলী *

বাংলা সাহিত্যের এক যুগান্তকারী সংযোজন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'। আমরা প্রত্যেক বাঙালি কোনো না কোনো সময় 'পথের পাঁচালী'র রস আস্বাদন করেছি। তারপর সত্যজিৎবাবুর অসাধারণ চিত্রায়নের মধ্য দিয়ে আরো গভীরে ঢোকার চেষ্টা করেছি। বিভূতিবাবুর ৫৬ বৎসর জীবনকালে বহু অনবদ্য রচনা রেখে গেছেন। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে তাঁর প্রথম ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হয়। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটির তিনটি পর্ব—বল্লালী বালাই, আম আঁটির ভেঁপু, অক্রূর সংবাদ।

বিভূতিভূষণ, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন লেখকের মতো প্রকৃতি ও মানুষ নিয়েই তাঁর যা কিছু বলবার, তা বলে গিয়েছেন। এই প্রকৃতি ও মানুষের পিছনে বিশ্বপ্রপঞ্চের উপস্থিতি বিভূতিবাবুর হৃদয়ে বিরাজ করত। তিনি আজন্ম বাংলার পল্লীর মধ্যে এমনভাবে বড় হয়েছেন যে, তাঁর লেখা পড়লেই বোধ হয়, তাঁর সত্তার অন্তর্নিহিত মাধুর্যকে তিনি বনের গাছপালা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, ঝরনা, টিলার মধ্যে যেন ঢেলে দিয়েছিলেন।

কাশ জঙ্গলের ওপারে ট্রেন দেখতে দৌড়াচ্ছে অপু-দুর্গা

বিভূতি সাহিত্যে প্রকৃতির বর্ণনা এক বিরাট জায়গা জুড়ে যেভাবে অবস্থান করে, তা কোনোভাবেই অতিরঞ্জিত হয়ে ওঠেনি বা অহেতুক নয়। গল্পের ঘনঘটার সঙ্গে ও চরিত্রের বিভিন্ন টানাপোড়েনের সাথে প্রকৃতির রূপ-বর্ণনা একটি অনবদ্য প্রতীকী হয়ে ধরা দেয়।

আমরা এখানে 'পথের পাঁচালী'র প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলিকে পর্যালোচনা করে তার গ্রাম্য প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীকে নিয়ে আঁকাবুকি কাটার চেষ্টা করব। স্বাধীন প্রাকৃতিক আবহাওয়া একটি সদ্যোজাত শিশুর চিত্তকে কীভাবে ধীরে ধীরে সংসারের সংগ্রামের উপযোগী করে তুললো তারই বিচিত্র গমক, তাকে অপরূপ ভঙ্গিতে লেখক এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। একবার কবি কালিদাস রায় এই উপন্যাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসু হয়ে বিভূতিবাবুকে চিঠি লিখলে, বিভূতিবাবু তার উত্তরে লেখেন—'পথের পাঁচালীর গ্রাম্য চিত্রগুলি সবই আমার স্বগ্রাম বারাকপুরের। জেলা যশোহর। গ্রামের নিচেই ইছামতী নদী।' এই রচনায় গ্রাম্য মানুষের দারিদ্র্যের সঙ্গে অন্তরের সৌন্দর্যের চিত্র জ্বলন্ত ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। গ্রামের খুব সামান্য জিনিসও লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি।

'পথের পাঁচালী'র প্রথম পর্বে অর্থাৎ 'বল্লালী-বালাই'তে ইন্দির ঠাকরুণ-ই প্রধান চরিত্র। বাল্যবিধবার জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কী করুণ অবস্থা হতো, তারই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গ্রামের বাঁশ কাঠি মাটি দিয়ে প্রায় কুঁড়েঘরের চিত্র। তার ভিতরে গ্রাম্য আলনা—বাঁশের দু-প্রান্তে দড়ি দিয়ে ঝুলানো। কাঁথার ব্যবহার। বাসন বলতে কয়েকটি মাটির সরা, হাঁড়ি ইত্যাদি। খেজুর-গুড়ের মিষ্টি সুবাস, মাটির ছোঁয়া, বাঁশবনের মধ্য দিয়ে পথ প্রভৃতি প্রকৃতির রূপের দৃশ্য লেখক সুন্দরভাবে এনেছেন। আমবাগান, ডালিম ফল, পেয়ারা গাছ গ্রামে ফলের সমারোহকে তুলে ধরে। গ্রামে ঠ্যাঙাড়ে দস্যুর তাণ্ডব এই পাঠে ধরা পড়েছে। গরমের মধ্যাহ্নের অলস আমেজ শীতল বটবৃক্ষের ছায়া, ছোট শিশুর কাদামাখা শরীর, মুখে ভর্তি মাটির ঢেলা, নালসে্ পিঁপড়ে, চড়ুইপাখি সবই যেন রূপকথার মতো, স্বপ্নের মতো। সজনে গাছে রাতজাগা পাখির ডাক, জ্যোৎস্না-ঝরা রাতে নারিকেল শাখার মৃদু কম্পন দেখতে দেখতে সুখের ঘুম এখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। লেখকের ভাষার মায়াজালে আজও জীবন্ত হয়ে ওঠে। মুড়কি, কদমা, নীলকণ্ঠ পাখি, ভাটগাছ, বৈঁচিগাছ প্রাকৃতিক স্বাভাবিক দৃশ্যাবলীর রূপ লেখকের লেখনী থেকে অঝোরে ঝরে পড়েছে।

** প্রাক্তন পরিষদ কর্মী এই ভাবানুরাগী ব্যক্তিত্ব এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক।*

পথের পাঁচালীর মধ্যম পর্বের আগের পর্বে, সদ্যোজাত শিশুর ক্রমশ বালক থেকে কৈশোরের দিকে যাত্রার অলঙ্করণ। গ্রামবাংলার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শুকনো আমের আঁটির শক্ত অংশ ফাটিয়ে, তার ভিতরের কুশিটি বের করে, তা দিয়ে বাঁশি বানায়। এটি গ্রাম্য ছেলেমেয়েদের একটি নিখরচায় আনন্দ। অপুও দারিদ্র্যের মধ্যেও কীভাবে নিজের ভিতরের আনন্দকে বিকশিত করতে পেরেছিল, তারই গল্প এই পর্বে। তাই 'আম আঁটির ভেঁপু'। এখানে অপু তার বাড়ির গণ্ডি ছেড়ে ধীরে ধীরে বাইরে দূরে যেতে শুরু করেছে। উলুখড়, বনকলমি, কুলগাছ অপুর অভিজ্ঞতার রসদ জুগিয়ে চলেছে। প্রকৃতির সবকিছু তার দেখা বা জানা শেষ হয়নি। সে বনের মধ্যে মুক্ত খরগোসকে দেখে অবাক হচ্ছে। আল্‌কুশি গাছ কি? কেন হাতে লাগলে চুলকায়? ইত্যাদি শিখছে। সে লক্ষ্মীর কড়ির মূল্য বুঝতে শিখছে। গ্রাম্য কিশোর-কিশোরীদের আমের গুটি কুচিয়ে তেল-নুন দিয়ে খাওয়া, এ দৃশ্য বহু মানুষের চেনা হলেও তা শুধু স্মৃতিপটেই অঙ্কিত। ক্রমশ জীবন প্রাকৃতিক পালা বদলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। একদিন দুর্গা অসুস্থ হয়, গ্রাম্য পরিবেশে বাস—ডাক্তার, বদ্যি, পথ্য কিছুই ঠিকমতো জোটে না। এইভাবে দুর্গা অপুর জীবন থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যেতে থাকে। একদিন দুর্গার জীবনপ্রদীপ নিভে যায়। অপুর জীবনে এক বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়। তার ভিতরের অন্ধকারকে বোঝাতে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের ব্যবহার লেখকের গভীর চিন্তার প্রকাশ ঘটায়।

দুর্যোগের সময় গাছের আড়ালে অপু-দুর্গা

'পথের পাঁচালী'র শেষ পর্ব 'অক্রূর সংবাদ'-এ অপুর বাবা-মায়ের হাত ধরে জন্মভিটা ছেড়ে কাশীর উদ্দেশে রওনা। প্রথম ট্রেনে ওঠা, কাশ বাগানের মধ্য দিয়ে গিয়ে দূরে দিদির সঙ্গে রেলগাড়ি দেখার দৃশ্য তার মনে পড়ে। ক্রমশ নগরকেন্দ্রিক পরিবেশের মধ্যে অপুর প্রবেশ। পথে রেলগাড়িতে ভারতের বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতিময় মানুষদের দেখা। অপু তার ছোট্ট গ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তের সাথে যুক্ত হচ্ছে। নিশ্চিন্দিপুরে খোলা মাঠ, বন, স্বাধীন বিচরণ কিছুটা হলেও বড় বড় বাড়ি, সরু গলিময় নগরের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তবুও তাকে মানিয়ে নিতে হয়। জীবনযাত্রার হাত ধরে গ্রাম্য পরিবেশকে, প্রকৃতিকে স্মৃতিপটে রেখে নগরকেন্দ্রিক প্রকৃতিকে আপন করে নিতে হয়।

'পথের পাঁচালী'র পথ হলো ছোট্ট অপুর জীবনপথ। গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ তার জীবনপথের পাঁচালীকে করেছে রসময়। নগরকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশ তাকে জীবনযুদ্ধে ঠিক থাকার লড়াই শিখিয়েছে। অপুর জীবনপথের পাঁচালীতে গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ ও নগরকেন্দ্রিক প্রাকৃতিক পরিবেশ বৈচিত্র্য ও জীবনবোধের পাঠ দৃঢ়ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

প্রকৃতি ও মানুষ একে অপরের পরিপূরক। বিশ্বপ্রপঞ্চ ও অন্তরাত্মা সবই একই ব্রহ্মের ভিন্ন প্রকাশ। আমরা ঋষি-মুনিদের মতো অতো সূক্ষ্মবুদ্ধি ধারণে যত অক্ষম হচ্ছি, তত বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই যে আমরা মিশে আছি, তা ধারণা করতে পারছি না। কবি, সাহিত্যিক, উচ্চ চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ মাঝে মাঝে তার আভাস পান বটে, কিন্তু ঋষি, যোগিরা তো এই চিন্তায় মগ্ন থাকেন। প্রকৃতিসাধক ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামবাংলার মেঠো জল-আবহাওয়ার সঙ্গে মানুষের অন্তরের মাধুর্যের অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। এই কারণেই তিনি বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন।

একশ বছর আগে

ঠিক একই সময়ে একজন যখন বউকে ঘরে তুলছেন, আরেক স্কুলমাস্টার তখন স্ত্রীকে কলেরায় হারিয়ে শোকে কাতর। স্ত্রী তারাদেবীকে হারিয়ে কাতর হুগলীর জাঙ্গীপাড়া স্কুলের এই শিক্ষকটির নাম বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনেই পথের পাঁচালী খুলতে ভারতের পথে প্রান্তরে নামছেন যিনি।

বিজ্ঞান-সাধক

মনের দুয়ার খুললেন যিনি !

শম্পা ত্রিপাঠী *

আমরা জানি ছত্রাক দু-ধরনের হতে পারে—(১) উপকারী ছত্রাক, (২) অপকারী ছত্রাক। কিন্তু ছত্রাক যা-ই হোক, ছত্রাক সাধারণত খারাপই হয়ে থাকে বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু ছত্রাক দ্বারাও যে কঠিন কঠিন রোগ নিরাময় করা যায়, সে বিষয়ে একটি ছোট্ট গল্পের দ্বারা বলার চেষ্টা করছি। তবে এটি কোনো সাধারণ মানুষের গল্প নয়, এক বিখ্যাত বিজ্ঞানীর জীবন-কাহিনী অবলম্বনে লেখা—

একটি বৃন্তে দুটি কুসুমের মতো দুটি ভাই ও বোন। দুজনের মধ্যে যত মিল, তত খুনসুটি আর চুলোচুলি। বাবা থাকেন বাইরে। মা খুব লেখাপড়া জানা মেয়ে। ওনাকেই সমস্ত কিছু একা সামলাতে হয়। দুই ভাই বোনের মধ্যে ঝগড়ার বিষয় ছিল, কে বেশি মায়ের ভালোবাসা পাচ্ছে। তখন মা দুজনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন—**'মায়ের ভালোবাসা পেতে লালায়িত হতে হয় না, বুঝলি! বড় হয়ে পৃথিবীর সব মায়ের ভালোবাসা কুড়াতে পারলে জীবন সার্থক হয়।'** তখন এই সমস্ত কথার মানে হয়তো ওই দুটি ছোট ফুলের মতো শিশু বুঝতে পারেনি। এইভাবে দিন কাটতে থাকে তাদের আদর, আবদার ও বায়নায়। কিন্তু একদিন ঘটল এক বিপত্তি। দুই ভাই-বোনের মধ্যে বড় দিদিটির শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাকে ধরল ডিপথেরিয়া নামক এক মারণরোগ, যার তখনকার দিনে কোনো ঔষধ ছিল না। চোখের সামনে বোনটি একরকম বিনা চিকিৎসায় শুকিয়ে শুকিয়ে মারা গেল। দুঃখে কাতর হয়ে মা ও ছেলে খুব কাঁদল। তারপর মা ধৈর্য ধরে ছেলেকে বললেন, 'কেঁদে তো আর বোনকে ফেরাতে পারবি না! তার চেয়ে পৃথিবীর কোনো বোন যাতে অকালে মরতে না পারে, তার জন্যে শপথ নে! তাহলে দেখবি, শুধু একটা নয়, হাজারে হাজারে-লাখে লাখে বোনকে কাছে পাবি।' কি ভেবে ছেলেটি বলল—ঠিক বলেছ মা!

উপকারী ছত্রাক

অনেক দিন কেটে গেছে। বোনের স্মৃতিটা ততদিনে ফিকে হয়ে গেছে। ছেলেটির স্কুলে পড়া শেষ হয়ে গেছে। এবার কলেজে ভর্তি হবে, ঠিক এমন সময় তার স্নেহময়ী মা চিরকালের মতো বিদায় নিলেন। বাড়িটা তার কাছে মরুভূমির মতো মনে হলো। তাই সে সাত সমুদ্দুর তের নদী পেরিয়ে ধনীর দেশ আমেরিকায় হাজির হলো। সেখানে তার কাকা তাকে ফিরিয়ে দেয়নি। তিনি তাকে কলেজে পড়তে পাঠালেন, নিরালা খামারের একপাশে পড়াশোনা আর থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। খামারে ফসলের দিকে নজর রাখার ভারও দিলেন তাকে। পড়াশোনার মাঝে মাঝে দুটি চোখে যেন আতস কাচ এঁটে নজর রাখল খামারের দিকে। খামারটি খুবই ভালো লেগেছিল তার। ছেলেটি দেখল, খামারের সব জায়গায় গাছের চেহারা সমান নয়। কোথাও খুব ভালো—গাঢ় সবুজ রঙের, কোথাও বা মাঝারি ধরনের গাছ, আবার কোথাও হলদেটে হয়ে লেপটে আছে মাটির সাথে। অবাক হলো ছেলেটি। একটাই তো খামার, আর একই জাতের ফসল, তবু গাছগুলোর ভেতরে এত তফাৎ কেন? প্রথমে লোকজনদের শুধালো, তারা বলল, ফসলের উপর শয়তানেরও নজর পড়ে। লোকের কথায় সে তার কাকাকে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন—'ফসল মানেই কৃষকের কপাল আর ঈশ্বরের দান। ঈশ্বর যে বছর সদয় হন, সে বছর কপালে ভালো ফসল জোটে।' কিন্তু ছেলের কোনো কথায় মন ভরে না। তখন তার মায়ের কথা মনে পড়ল, **'মনের দুয়ারকে ভালোভাবে খুলে রেখে তবেই দেখবি। বারে বারে দেখবি। মনকে শুধোবি—কেন? কেন? পরের কথায় মনের দোর বন্ধ করবি না। দরকার হলে পরীক্ষা করবি।'**

** আশ্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাতঃকালীন বিভাগের শিক্ষিকা।*

তাই ছেলেটি পরীক্ষায় বসে গেল। ফসলের গাছ, পাতা, খামারের মাটি, কোনো কিছুকেই বাদ দিল না। শেষে বুঝতে পারল, ফসলের গাছ ভালো-খারাপের মূলে শয়তানের নজর কিংবা ঈশ্বরের করুণা—কোনোটি কাজ করে না। মাটিতে নাইট্রোজেনঘটিত খাবার প্রয়োগ করল। দেখতে দেখতে সারা খামার ফসলে থৈ থৈ বন্যায় ভরে গেল। এই অসামান্য পরীক্ষার জন্য সরকারও ছেলেটিকে সে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'ফ্রাঙ্কলিন স্বর্ণপদক' দান করল। অচিন দেশের রাজকুমারের মতো ছেলেটি সবার কাছে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। অনেক আগে পৃথিবীর এক দার্শনিক বলেছিলেন, পৃথিবীর জমি বাড়ছে না, অথচ মানুষ বাড়ছে লাগামছাড়া ভাবে। জমির ফসল আবার প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভর করে। তাই এমন একদিন আসবে—যেদিন দুটো অন্নের জন্যে মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াবে। আর দুর্ভিক্ষে দুর্ভিক্ষে প্রতি বছর লাখো লাখো মানুষ প্রাণ হারাবে।

সেলমন ওয়াক্সম্যান

তরুণটির নাম সেলমন ওয়াক্সম্যান। ডিপথেরিয়ার প্রতিষেধক তিনি আবিষ্কার করেননি বটে, তবে তার চেয়েও শত শত গুণে প্রয়োজনীয় ওষুধ তিনি পৃথিবীর ভাইবোনদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। সেটি যক্ষ্মারোগের প্রতিষেধক। সেই তরুণ বয়সে খামারে মাটি পরীক্ষা করতে গিয়ে লাভ করেছিলেন একজাতীয় বিরল ধরনের ছত্রাক। সেদিন ছত্রাকটির পরিপূর্ণ বিবরণও সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পেনিসিলিন নোটেটাম নামের এক-জাতীয় ছত্রাক থেকে নিষ্কাশিত হয় আশ্চর্য ফলপ্রদ ওষুধ পেনিসিলিন। তরুণটি তখন এক প্রৌঢ় বিজ্ঞানী। তাঁর ধারণা হলো, তাঁর আবিষ্কৃত ছত্রাকটিতেও কোনো ভেষজগুণ থাকলেও থাকতে পারে।

শুরু করলেন গবেষণা, দীর্ঘ গবেষণার পর লাভ করলেন স্টেপটোমাইসিন। পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, এটি যক্ষ্মারোগের একমাত্র প্রতিষেধক। সেদিন যক্ষ্মারোগটা ছিল পৃথিবীর এক আতঙ্ক। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী এই রোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করত। শোনা যায়, কোনো একটি ওষুধ কোম্পানি তার আবিষ্কারটিকে কিছু দিনের জন্য চেপে রাখতে বলেছিল। বিনিময়ে অঢেল অর্থ দিতে চেয়েছিল। ওয়াক্সম্যান সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর আবিষ্কারের কথা। বিজ্ঞানীরা এমনই নির্লোভ।

ওয়াক্সম্যানকে সেদিন নোবেল পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়েছিল। কিন্তু সবাই স্বীকার করেন, ওয়াক্সম্যানের অবদানকে নোবেল পুরস্কারের মাপকাঠিতেও মাপা যায় না। তাঁর স্থান পৃথিবীর সব মানুষের হৃদয়ের একেবারে মাঝখানটিতে। সেই থেকে পৃথিবীর আর কোনো বোনকে কেঁদে কেঁদে বলতে হয় না, 'দাদা, আমি যে বাঁচতে চেয়েছিলাম।'

ওয়াক্সম্যান আজ আর নেই। তাঁর কথাও আমরা কেউ বড় একটা জানি না। দৈবাৎ তাঁকে স্মরণ করা হয়। কিন্তু তাঁর অবদান পৃথিবীর প্রতিটি 'মানুষ' গ্রহণ করে। সুযোগ্য মাতৃভক্ত সন্তান ও আদর্শ ভাই জগতে একেবারে বিরল। আর কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা যে মানুষকে কত বড় করতে পারে, তারও প্রমাণ মহাত্মা ওয়াক্সম্যান। নিজের বোনকে হারিয়ে পৃথিবীর কোটি কোটি বোনের মুখে হাসি এনে দিয়েছেন। এমন প্রতিজ্ঞা কি কোনো ভাই করতে পারে না?

একশ বছর আগে

এদিকে বাবা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মৃত্যুর পর সন্দেশ পত্রিকার হাল ধরেছেন সুকুমার রায়। একের পর এক গল্প আঁকিবুকি ছড়া দিয়ে প্রাণ মাতাচ্ছেন শিশু থেকে বুড়ো সবার। আর ক'বছর পরেই স্ত্রী সুপ্রভা রায়ের কোলে আসতে চলেছে এক ক্ষণজন্মা ছেলে, তাঁর নাম সত্যজিৎ রায়।

মানবিক মুখ
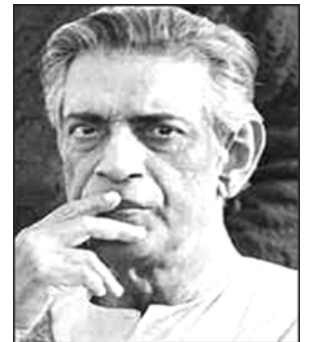
‘ছোট যারে মনে কর, বড় সেই হয়’

অরুণ কুমার বসু *

বেশ অনেকদিন হয়ে গেল। তা প্রায় বছরখানেক তো হবেই। আজ এই করোনাকালে অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়ল। একটি কলেজ-ছাত্রীর কথা। ছাত্রীটির মহানুভবের কথা। ছাত্রীটি একটি ঔষধ দোকান থেকে ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপশন মতো প্রয়োজনীয় ঔষধ কিনেছিল। ঔষধ দোকানী প্রেসক্রিপশন মতো ঔষধ দিয়েছিল। ঔষধের মূল্য যত তা ছাত্রীটি যথাযথভাবে দিয়েছিল। ঔষধের দাম হয়েছিল তিনশত ষাট টাকা। ছাত্রীটি পাঁচশত টাকার একটি নোট দিয়েছিল। দোকানের মালিক ছাত্রীটিকে দাম কেটে বাকি টাকা ফেরত দিয়েছিল। তারপর ছাত্রীটি ফেরতের টাকা ও ঔষধ নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিল। দোকানে ছাত্রীটি ফেরতের টাকা আর দেখেনি। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখে—তাকে দোকানের মালিক বেশি টাকা ফেরত দিয়েছে। নেবার কথা তিনশত ষাট টাকা। নিয়েছে দুইশত ষাট টাকা। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীটি প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে ঔষধ দোকানে এসেছিল। এসে দেখে দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সে হতাশ হয়ে বাড়িতে ফিরে আসে। ছাত্রীটির সারারাত চিন্তায় ভালো ঘুম হয়নি। পরের দিন ছাত্রীটির কলেজ, সময় মতো যেতে হবে। কিন্তু যতক্ষণ না বাড়তি টাকাটা ফেরত দিচ্ছে, তার কলেজ যাওয়া হচ্ছে না। ছাত্রীটি বাড়ি থেকে এসে ঔষধ দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াবার পর ঔষধ দোকানের মালিক এলেন। দোকান খুললেন, ধূপ-ধুনো দিলেন। মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে দোকানের সামনে। অবাক হয়ে দোকানের মালিক বলল—তুমি কি আমাকে কিছু বলবে? গতকাল রাতে তুমি না ঔষধ নিয়ে গিয়েছিলে? হ্যাঁ, মেয়েটি বলল। কেন দাঁড়িয়ে আছি—তার কারণটা বলল। বাড়তি টাকাটা ফেরত দিল এবং বলল, আপনি ভুল করে বেশি টাকা দিয়েছেন। সেই জন্য সারারাত ভালো করে ঘুম হয়নি। কলেজ যাব। আপনার টাকাটা না দিয়ে তো কলেজে যেতে পারছি না। ঔষধ দোকানের মালিক অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ভাবতে লাগল একটি কলেজ ছাত্রীর মানবিকতার কথা। ছাত্রীটি চিন্তা থেকে রেহাই পেল এবং সুস্থ মনে কলেজে চলে গেল। ঘটনাটি আমি ঐ দোকানে ঔষধ নেবার সময় শুনেছি। দোকানের মালিক ঐ ঘটনাটি আমাকে শুনিয়েছিল।

এই ঘটনার কথা লিখতে লিখতে আমার উপলব্ধি হলো—বর্তমানে ছাত্র/ছাত্রীদের অভিভাবকেরা যদি ঠিকঠাকভাবে শিক্ষা দেন, চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন, তাহলে সমস্ত্র ছাত্র/ছাত্রীরা মানবিকতার উচ্চস্থানে যেতে সক্ষম হতে পারে।

দোকান থেকে ঔষধ কিনছে ছাত্রী

পরে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম, মেয়েটির নাম মৌ। ভালো নাম মৌছন্দা। ঐ মেয়েটির আরও কতকগুলি বিশেষ মানবিকতার কাজ জানতে পারলাম। রাস্তার কুকুরের সেবা করা, আদর করা। মানুষের মতো প্রাণীরও খিদে আছে। ভালোবাসা পেতে চায়। মৌছন্দা বর্তমানে চাকরি করে। জানলাম, সে একজন ম্যানেজমেন্ট-পড়া মেয়ে। H.R অর্থাৎ Human Resource নিয়ে পড়াশুনা করেছে। প্রতিদিন অফিস থেকে ফেরবার সময় সে তার বাড়ির কাছে অনেকগুলো কুকুর এক সাথে থাকে, সেগুলিকে আদর-যত্ন করে এবং খাবার দিয়ে বাড়িতে ঢোকে।

(এর পরবর্তী অংশ ৪৪৮ পৃষ্ঠায়)

** পরিষদ সেবক এই প্রবীণ ব্যক্তিত্ব নিজ কর্মগুণেই সর্বজনপ্রিয়।*

গ্রামীণ শিক্ষায় বিদেশীয় সংস্কার

পরেশ চন্দ্র দাশ*

স্বামীজীর একটা বাণীর অংশ আমার মনে চিরকাল ধরে প্রতিধ্বনিত হয়। উনি বলেছিলেন, আমরা সেই শিক্ষা ব্যবস্থা চাই, যেটা মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে। আমি এই মহাবাণীর গুরুত্ব আমার ও আমার অন্যান্য বন্ধুদের চাকরি–জীবনের হতাশাপূর্ণ গতিপথ দিয়ে তিলে তিলে ও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি।

স্বামী বিবেকানন্দ দেখতে চেয়েছিলেন যে, নূতন ভারত বেরিয়ে আসুক দরিদ্র, নিপীড়িত, নীচ জাত ও আর্তজনের মধ্য থেকে। বলতে বাধা নেই, স্বামীজীর ঈপ্সিত আমজনতার গরিষ্ঠ অংশ গ্রামে বা অনুরূপ স্থানে বাস করে। দারিদ্র্য ও অন্যান্য কারণবশত এদের বেশির ভাগেরই ক্ষমতা থাকে না—উচ্চশিক্ষা তো দূরের কথা, এমনকী স্কুলে যাবার। যদিও কিছু অংশের ভাগ্যে সাধারণ বা উচ্চশিক্ষা লাভের সৌভাগ্য হয়, তারা অনেকেই পড়ে চাকরি–হীনতার কবলে। তাই গ্রামে অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও শিক্ষিত সবার জন্যে কর্মসংস্থান করার বিশেষ প্রয়োজন। আধুনিক প্রগতিশীল চিন্তাধারায় বিশ্বাস রাখলে গ্রামে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে, যদিও বর্তমানে অধিকাংশ গ্রামের মানুষের কাছে তার প্রভাব অতি সামান্যই। এই সীমিত প্রভাব রয়েই যাবে—যদি না গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনমুখী করা হয়। জীবনমুখী শিক্ষার ও কর্মসংস্থানের কিছু উদাহরণ ঃ

পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দূষণ রোধ করে

কৃষি প্রকল্প ও অন্যান্য ঃ ❍ চিংড়ি ও অন্যান্য মাছের চাষ; ❍ মুরগি, ছাগল ও ভেড়ার চাষ; ❍ ভেষজ বা আয়ুর্বেদিক গাছপালার চাষ; ❍ ফুলের চাষ; ❍ ডিম ও দুগ্ধ প্রকল্প; ❍ পাউরুটি ও কেক তৈরি; ❍ মৌমাছির চাষ; ❍ দুর্লভ সবজি ও ফলের চাষ; ❍ আরো কিছু।

টেকনিসিয়ানের ট্রেনিং ঃ ❍ কাঠ, বিদ্যুৎ, প্লাম্বারিং ইত্যাদির।

স্বাস্থ্য প্রকল্প ঃ যোগব্যায়াম ও খাদ্য নিয়ন্ত্রণে শরীরকে বেশ ভালোভাবেই সুস্থ রাখা যায়—এটা অবশ্যই তরুণ ছাত্রদের মাথায় ঢোকাতে হবে ও নিয়মমতো তালিমে রাখতে হবে। তাই এটা গ্রামীণ শিক্ষার তালিকায় সব সময়ের জন্যে।

দেশে সাধারণভাবে লোকসংখ্যার তুলনায় ডাক্তার বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাহায্য (রোগী ও ডাক্তার অনুপাত) খুবই দুর্বল। গ্রামে এটার অনুপাত (Ratio) প্রকৃতই infinity বা অপরিসীম। বেশিরভাগ গ্রামে ডাক্তার নেই। তাই অধিকাংশ রোগের আরোগ্যই প্রকৃতির হাতে, রোগজনিত কষ্ট সয়ে সয়ে এমনকী সেটা অসহ্য হলেও। একান্তই বিপদে পড়লে ৮–১০ কিলোমিটার দূরের শহরের হাসপাতাল সম্বল। অর্থবান ব্যক্তি ছাড়া গ্রামের মানুষের General Practitioner–এর চিকিৎসা—পকেটের বাইরে। এটাতে হাত দিতে হবেই এবং এতে অনেক কর্মসংস্থান হবে। চিন্তা করুন গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি ও তার উপযুক্ত ব্যবহারে কত মানুষের অবদানের দরকার।

Sanitary ও দূষণ প্রকল্প ঃ গ্রামে Sanitary system একেবারেই অবহেলিত। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে

** অবসরপ্রাপ্ত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, জেকবস্, কানাডা।*

সাথে এটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিশেষত ছোট বড় মায়েদের জন্যে। শুধু গ্রামে বলি কেন—ছোট শহরের দূরপাল্লার বাস, স্টেশনগুলোর দিকে একটু তাকালেই বুঝতে পারবেন সমস্যার গভীরতা।

গ্রামে যারা ধনী ব্যক্তি তারা বাড়িতে টিউবওয়েল বা শুদ্ধ পানীয় জলের জোগান ও Sanitary system বানিয়ে নিয়েছে। কিন্তু Sanitary system-এর বর্জ্য পদার্থগুলো ফেলছে স্থানীয় পুকুরে, যেখানে সাধারণ গ্রামবাসীরা থালা-বাসন ধোয়। এই দূষণে কারও নজরই নেই। কৃষিতে ব্যবহৃত কীটনাশক ওষুধ, এমনকী মূল্যবান সারের (Fertilizer) ব্যবহারও দূষণ তৈরি করে চলেছে, তাও অবহেলিত। এদের সবার বর্তমান ও দীর্ঘকালীন সমাধানে ধ্যান লাগানোর একান্তই প্রয়োজন।

গ্রামীণ হোটেল ঃ যেখানে শহরের লোকেরা এসে গ্রামের খোলামেলা হাওয়াতে কিছুটা জুড়োতে পারে। এতে নিঃসন্দেহে কর্মসংস্থান হবে কিন্তু তার জন্যে প্রাথমিক অর্থ বিনিয়োগ ও ভ্রমণপ্রিয়দের পছন্দের পরিকাঠামো দরকার। তাই গ্রাম একটু না এগোলে এটা সম্ভব হবে না, কিন্তু এটা গ্রামের কর্মসংস্থান লিস্টে থাকার ক্ষমতা রাখে।

সমাধান—ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতি ও গ্রাম ঃ এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রচলিত শিক্ষার সাথে উপরের শিক্ষা ও কাজগুলোর কিভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায়? উত্তরটা খুব সহজেই দেওয়া যায়। স্বাস্থ্য, Sanitary ও দূষণ প্রকল্প নিয়ে যা বলেছি তা নিয়ে ছোট করেই বলছি, কারণ এই প্রবন্ধটি অনেকটাই কৃষিভিত্তিক। তবু বলছি—গ্রামে ডাক্তারের অভাব, কারণ ডাক্তাররা জানে গ্রামের লোকের পয়সা নেই। তাই এ-ব্যাপারে সরকারের প্রাথমিক সাহায্য দরকার। ভবিষ্যতে যদি স্বপ্নের বর্ধিত কৃষি উৎপাদন বাস্তবায়িত হয়ে গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে, তা হলে গ্রামের লোকের হাতের লক্ষ্মী ডাক্তারদের সহজেই গ্রামে আকৃষ্ট করবে। Sanitary ও দূষণ প্রকল্প—এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হবার প্রয়োজন গ্রামীণ শিক্ষায় রাখতে হবে। এবার আসি মুখ্য আলোচনায়।

তলিয়ে দেখলে এটি সহজেই বোঝা যায়, আমাদের শিক্ষার কাঠামো এখনও সেই পুরানো ব্রিটিশ আদলে। কিছু ইঞ্জিনিয়ার, কিছু ডাক্তার আর কিছু শিক্ষিত মানুষ অফিস আদালত সামলানোর ছকে। বেশ খানিকটা শহর ঘেঁষা—শস্য-শ্যামলা ভারতমাতার গ্রামের বিস্তীর্ণ উর্বর জমির উপযুক্ত ব্যবহারের কথা ঠিকমতো ভাবা হয়েছে কি? ভাবা হয়েছে কি অন্যান্য গ্রামীণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, জনস্বাস্থ্য ও সমস্যার কথা? উত্তর বিনা দ্বিধায় 'না'।

তবুও সময়ের সাথে সাথে জলসেচনের উন্নতি, কিছুটা সরকারি সহায়তায় ও ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণায় বেশ কিছু উন্নতি যে গ্রামে হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। তবু বেশ কিছু গ্রামে আমার শেষ ভ্রমণ-এর (Year 2012) মন্তব্য, আগেই বলেছি তবু প্রয়োজনীয় বলে—'অধিকন্তু ন দোষায়'। গ্রামের অধিকাংশ মানুষের কাছে এর প্রভাব খুবই সীমিত। এই প্রভাব সামান্যই রয়ে যাবে যদি না গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনমুখী করা হয়। জীবনমুখী করতে গেলে গ্রামের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে উপরোক্ত শিক্ষাগুলির সমন্বয়, যাতে কোমলমতি শিশুরা জীবনের প্রথম থেকেই বুঝতে পারে যে, তাদের গ্রামেই অনন্ত কাজ সৃষ্টির সুযোগ রয়েছে। এই সংযোগ স্থাপন সহজ নয় কিন্তু অসম্ভব কি?

বিভিন্ন প্রকার ওষধিবৃক্ষ

স্কুলের ছাত্রদের এমন প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে স্কুলের শিক্ষার শেষে তারা নিজেদের জন্যে কাজ সৃষ্টি করতে পারবে বা চালু কাজে সাহায্য করতে পারবে। বুঝতে পারবে সবার ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার বা IT হবার পিছনে ছোটার কোনো যুক্তি নেই। বরং গ্রামের কাজের মাধ্যমে তারা ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারদের চেয়ে আরো উচ্চমানের জীবনযাপন করতে পারবে, কারণ গ্রামে তারাই হবে তাদের কাজের মালিক। ছেলেদের উৎসাহ দেবার জন্যে কিছু উদাহরণ তাদের সামনে রাখতে হবে। দার্শনিক কনফুসিয়াস-এর বাণী এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—'Do not give them fish, teach them how to catch fish.'

অর্থের জোগান ঃ গ্রামীণ শিক্ষার প্রবর্তনে অবশ্যই টাকার প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমাদের নোবেলজয়ী অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনিসের তত্ত্বকে কাজে লাগাতে হবে। 'মাছের তেলে মাছ ভাজো'—তাঁর মতে নূতন সৃষ্ট শিল্পগুলির আত্মনির্ভরশীল বা self-sustaining হওয়া একান্ত দরকার। অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনিসের এই তত্ত্বে কোনো নূতন ব্যবসা শুরু করার সময় ব্যাঙ্ক টাকা ধার দেবে একটা শর্তে। নূতন ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্ক নির্ধারিত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধার নেওয়া টাকা ফেরত দেবে। কোনো উদারচিত্ত ব্যক্তি বা সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে Guarantor হিসাবে। অধ্যাপক মুহম্মদ ইউনিসের এই তত্ত্বের প্রয়োগে বাংলাদেশে এক নূতন যুগের সূচনা হয়েছে। আমি কুয়েতে বাংলাদেশি মাছ, মাংস ও শাকসবজির আমূল রপ্তানিতে সেই স্বর্ণ যুগের নমুনা দেখেছি। শুনেছি সমস্ত Middle East-র দেশগুলিতে বাংলাদেশের একাধিপত্য।

পরিকল্পিত নীতিনির্ধারণ (Policy Making) ঃ ভারতবর্ষেও কেউ কেউ এই তত্ত্বের প্রয়োগ করছেন। রামকৃষ্ণ মিশন পল্লীমঙ্গলও অন্যান্য উপায়ে এবং সঙ্গে আরো কিছু মানবদরদী দেশী ও বিদেশী সংস্থা (NGO) গ্রামীণ দারিদ্র্য দূর করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কেউ মূল সমস্যার দিকে নজর দিচ্ছেন না। আমার মতে, ব্রিটিশ সৃষ্ট শিক্ষার সংস্কার করে বিশেষত গ্রামে যতটা সম্ভব জীবনমুখী শিক্ষার প্রচলন করা। আমি গ্রামের ছেলে বলে এটা এত জোর দিয়ে বলতে পারছি। সরকারের অনুমোদন বা সাহায্য ছাড়া গ্রামের জীবনমুখী শিক্ষার প্রচলন অসম্ভব বললে বেশি বলা হবে না। তাই সরকারের Policy Maker-দের এই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যন্ত জরুরী।

একমাত্র Policy Maker-এর মাধ্যমে একে ত্বরান্বিত করা যায় এবং এর জন্যে যা যা দরকার তার দ্রুত ব্যবস্থা করা যায়। Policy Maker-রা স্কুলের শিশু শ্রেণী হতেই 'প্রগতি' বা এই জাতীয় কোনো নাম দিয়ে একটা Course চালু করতে পারে, যাতে পূর্বোক্ত Trade-গুলো সম্বন্ধে ছাত্ররা অবগত হতে পারে। অর্থের অভাবে কিছু আটকায় না—অভাব বলবতী ইচ্ছার এবং দিক নির্দেশের বা Guidance-এর। সরকার থেকে গ্রামীণ শিক্ষার সংস্কার হলে এই দুটি মূল্যবান জিনিসের অভাব কাটিয়ে গ্রামেই নূতন যুগের সূচনা করা যাবে। ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতে মিলবে সর্বত্র আধুনিক গ্রাম যেখানে খাদ্যের অভাব নেই, ডাক্তার স্বাস্থ্য রক্ষা করবে, উন্নত Sanitary system নিয়ে দূষণমুক্ত রাখবে আর তার সাথে অতিরিক্ত উৎপাদন বিদেশী মুদ্রা এনে দেশকে সমৃদ্ধ করবে।

সবকিছু বিবেচনা করলে ভারতবর্ষ জুড়ে স্বপ্নের আদর্শ গ্রাম আনতে আমাদের একটা মহাযুদ্ধ করার দরকার এবং তার প্রয়োজনও আছে। আমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং উন্নত মানের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র সবই আছে, আমরা তাদের ব্যবহার না করে, তাদের অবক্ষয় করে এখনকার চলতি খণ্ডযুদ্ধ করে সময় নষ্ট করব কেন? তাই বলি আসুন, 'আমরা Policy Maker-দের convince করে, তাদের সহযোগিতা নিয়ে গ্রামীণ শিক্ষার সংস্কার করে, গ্রাম তথা দেশের উন্নতির মহাযুদ্ধে সামিল হই।'

ভারত ও খাদ্য সমস্যা ঃ এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়, তাই আলোচনার দাবি রাখে। পৃথিবীতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হচ্ছে খুবই দ্রুত এবং সমস্ত পৃথিবীকেই Covid 19-এর মতো সঙ্কটের দিকে ঠেলবে। সেই সময়ের জন্যে ভারতের মতো দেশের যেখানে প্রাকৃতিক জল ও উর্বর মাটি আছে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। Policy Maker-দের এখানে কোন কোন খাদ্যের প্রয়োজন বাড়বে ভারতে ও বাইরে, তার পর্যালোচনা করে ভারতবর্ষব্যাপী খাদ্য উৎপাদনের তুলনামূলক সিদ্ধান্ত নিতে হবে বা তৈরি থাকতে হবে। তাই গ্রামীণ শিক্ষার বিস্তার যত বেশি ও যত দ্রুত ঘটে ততই মঙ্গল ও সাহায্যকারী হবে।

বিদেশবাসী স্বেচ্ছাসেবকদের আহ্বান ঃ আমরা যারা বিদেশে এসেছি তাদের একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা অতি ভাগ্যবান এবং এই ভাগ্য সৃষ্টির প্রাথমিক অবদান কিন্তু দরিদ্র ভারত মাতার। অথচ তার বিনিময়ে আমরা তাকে কি দিচ্ছি বা দিতে পেরেছি। রবি ঠাকুরের ভাষাতেই বলি—'তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জুড়াইলে ... জানি না তোমায় কি যে দিয়েছি মা'—মাঝে মাঝে মনে হয় দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ছুটে গিয়ে মায়ের শিক্ষার সংস্কার মহাযজ্ঞে ঝাঁপ দিই ও একে বাস্তবায়িত করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করে মাতৃঋণ শোধ করি, যাতে **'আমার জন্ম গেল বৃথা কাজে, আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে'** মিথ্যা প্রমাণ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি।

ফিরে দেখা

কলকাতার জমিদার

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় *

পলাশীর যুদ্ধের অনেক আগের কথা। ইতিমধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর তৎকালীন বাদশা ঔরঙ্গজেবের নাতির ছেলে ফারুখশিয়ারকে খুশি করে কলকাতা সুতানুটি গোবিন্দপুরের জমিদারি স্বত্ব পেয়ে পুরো মালিক বনে গেছে। কোম্পানির দলে ছিল এক সাহেব ডাক্তার, নাম হ্যামিলটন। তিনি ওই বাদশা ফারুখশিয়ারের দুরারোগ্য রোগ অস্ত্রোপচার করে সারিয়ে দিয়েছিলেন। তাতেই বেজায় খুশি হয়ে এই কলকাতা জমিদারির স্বত্ব প্রদান।

কলকাতায় তখন মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কলকাতার শাসক হতেন একদল জমিদার। তিনি লালমুখো সাহেব—তিনিই দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। কলকাতার লোকেদের ট্যাক্স বসানো, ট্যাক্স আদায়, ল অ্যাণ্ড অর্ডার দেখা, বিবাদ বিসংবাদ মেটানো, সব কাজের দায়িত্ব তার। মাস মাইনেও মোটা—তৎকালীন যুগে মাসে দু'হাজার টাকা। কিন্তু সমস্যা ছিল একটাই—কেউ এ-পদে স্থায়ী হতেন না, বছর বছর বদলী। এমনও সাহেব জমিদার এসেছিল—যাদের অঞ্চল সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই, ফলে ডামাডোলের সৃষ্টি হতো। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এবার ভাবল—দেশীয় ভাষা জানা একজন নেটিভকে সহকারী হিসেবে রাখা দরকার—যে আদায় উশুল দেখবে, বিবাদ বিসংবাদগুলো শুনবে, বুঝবে। তাই রাখা হলো একজন ব্ল্যাক জমিদার। তার মাসিক মাইনে হবে তিরিশ টাকা।

গোবিন্দরাম মিত্র হলেন সেই ব্ল্যাক জমিদার। অতি বুদ্ধিমান ও ধুরন্ধর মানুষ। তিনি খুব সুচারুভাবে তার কাজকর্ম করে যেতে লাগলেন। বছর কয়েক বাদে কাজে খুশি হয়ে সাহেবরা তার মাইনে বাড়িয়ে পঞ্চাশ টাকা করে দিলেন। বেশি কিছু সমস্যা তিনি সাহেব জমিদারের কাছে আনতেই দেন না, এমনই তাঁর কৌশল। কলকাতায় পয়সা বরাবরই ওড়ে, শুধু কুড়িয়ে নিতে জানা চাই। ব্ল্যাক জমিদার গোবিন্দরাম সেটি উত্তমরূপে জানতেন, ফলে অচিরেই তার সিন্দুক ভরে উঠল। বানালেন পাশাপাশি দু-দুখানা বাগানবাড়ি। সবাই বুঝল, গোবিন্দরাম টাকার কুমির হয়ে উঠেছেন। প্রভাবশালী যাকে বলে একেবারে তাই।

পুরানো কলকাতায় গোবিন্দরাম মিত্রের নবরত্ন মন্দির

হঠাৎ তাঁর ওপর পড়ল শনির দৃষ্টি। হলওয়েল সাহেব জমিদার হয়ে এসে গোবিন্দর বাড়বাড়ন্ত দেখে বললেন—'হিসেব দাও, কি করে এত সম্পত্তি করলে?' গোবিন্দ মিত্র চতুর মানুষ, ঘাবড়ালেন না। সাহেবদের ওপর মহলে তাঁর বিস্তর জানা শোনা—যতই হোক, কাজের লোক তো। শেষে তাঁকে অবশ্য জেলে পোরা হলো না, শুধু বরখাস্ত হলেন।

গোবিন্দ মিত্রের অগাধ সম্পত্তি। বরখাস্তের পরে একটু ধর্মকর্মে মন দেওয়া দরকার। তিনি বানালেন আকাশছোঁয়া প্রকাণ্ড নবরত্ন মন্দির। মনুমেন্টের চেয়েও যা উঁচু। কলকাতার গ্রামবাসী অবাক চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার ন'খানা চূড়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। বহুদূর থেকে দেখা যায় তার চূড়ার সোনার কলস, ধ্বজা। গোবিন্দরামের নামে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেল। এরই মধ্যে পরিণত বয়সে ধরাধাম ত্যাগ করলেন তিনি। কিন্তু কলকাতার দুর্ভাগ্য, এমন প্রকাণ্ড দর্শনীয় ওই মন্দির ১৭৩৭ সালের এক ভয়ঙ্কর আশ্বিনের ঝড়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

** বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনায় অভিজ্ঞ এই ব্যক্তিত্বটি সমাজশিক্ষায় সুপরিচিত।*

মহাদেশের এক আবিষ্কারক !

চম্পা ভট্টাচার্য *

মধ্যযুগে ইউরোপীয় সাহসী নাবিকেরা জাহাজ নিয়ে নতুন নতুন দেশ ও জলপথ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে অভিযান চালাত। কলম্বাস ছিলেন তাদেরই মধ্যে একজন সাহসী নাবিক। কথিত আছে যে, ১৪৫১ সালের ৩১ অক্টোবরের আগেই ইতালির জেনোয়া শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কলম্ব এবং তাঁর পুরো নাম ছিল ল্যাটিন ভাষায় ক্রিস্টোফার কলম্বাস। ইংরাজিতে ক্রিস্টোফার কলম্বাস হিসেবেই পরিচিত। তাঁর বাবা ছিলেন ডোমেনিকো কলম্ব আর সুজানা ফনটানারোজা ছিলেন তাঁর মা। তাঁর বাবা ছিলেন মধ্যবিত্ত উল ব্যবসায়ী। মধ্যবিত্ত হওয়ার কারণে বালক কলম্বাসকে পনীরের দোকানে কাজও করতে হতো। মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি প্রথম সমুদ্রযাত্রায় যান তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে। ১৪৭৩ সালে যোগ দেন এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে। এই প্রতিষ্ঠানের কাজে বিভিন্ন সময় সমুদ্রযাত্রায় যেতে যেতে তিনি একসময় নেশায় পড়ে যান।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস

সেই সময় ধর্মীয় নেতা ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে পৃথিবীর আকৃতি কেমন, গোল না চ্যাপ্টা—তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। পৃথিবী যে গোল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যেও নানা মতবাদ ছিল। নানা মতবাদ ও নানা চিন্তাভাবনা নিয়ে কলম্বাস নিজেই চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছিলেন পৃথিবীর আকৃতি কেমন তা প্রমাণ করার বিষয়ে।

তার ধারণা ছিল যে, আটলান্টিক মহাসাগর দিয়ে ক্রমাগত জাহাজ চালিয়ে গেলে ভারতের পশ্চিম উপকূল বা জাপানের কাছাকাছি কোথাও পৌঁছানো যাবে। কোন পথে, কিভাবে, কখন যাত্রা করতে হবে, সেটা নিয়ে তিনি একটা নিজস্ব প্রকল্প বা তথ্য দাঁড় করিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিযান চালাতে জাহাজ ও যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন ছিল। এর মধ্যে কোনোটাই তাঁর ছিল না। তিনি তাঁর অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য ইউরোপের রাজদরবারে আর্জি জানিয়েছিলেন। কিন্তু রাজদরবার তাঁর আবেদন নাকচ করে দেয়। স্পেনের রাজদম্পতি আরাগনের দ্বিতীয় ফার্ডিনান্ড এবং কাস্টিলের রানী প্রথম ইসাবেল্লা তাঁকে অর্থ সাহায্য করতে রাজী হলেন। বিশেষ করে কলম্বাস–এর পক্ষে ছিলেন ইসাবেল্লা। ১৪৮৬ সালে ১ মে তিনি অনুমতি পেলেন আর ১৪৯২–এর জানুয়ারিতে চূড়ান্ত অনুমোদন পেয়েছিলেন। ১৪৯২ সালের ৩ আগস্ট কলম্বাস তিনটি জাহাজ নিয়ে সমুদ্রযাত্রা শুরু করেছিলেন।

যে জাহাজে তিনি নিজে ছিলেন, সেটির নাম ছিল সান্তামারিয়া। অন্য দুটি জাহাজের নাম ছিল নিনা ও পিন্টা। এটাই ছিল তাঁর প্রথম অভিযান। এই অভিযানে তাঁকে নানা বিপত্তির মধ্যে পড়তে হয়েছিল। নাবিকরা বিদ্রোহ করার উপক্রম করে। এই অবস্থায় কলম্বাস কিন্তু হতাশ না হয়ে ১৪৯২ সালের ১২ অক্টোবর আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন। কলম্বাস এবং তাঁর সঙ্গীরা ভেবেছিলেন, তারা ভারতের কোনো দ্বীপে পৌঁছেছেন। তিনি তার নাম দেন সান সালভদর। প্রকৃতপক্ষে তিনি পৌঁছেছিলেন বাহামাতে।

প্রথম অভিযানের পর বাহামাতেই 'সান্তামারিয়া' জাহাজটি পরিত্যাগ করা হয়। এই বিখ্যাত জাহাজটি সেইখানেই কোথাও ডুবে যায়। ১৪৯৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর কলম্বাস আবার বেরোলেন সমুদ্রযাত্রায়। এবার সঙ্গে নিলেন সতেরোটি জাহাজ আর দেড় হাজার

* *আশ্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই শিক্ষিকা গৃহবধূ অঙ্কন বিভাগের প্রধান।*

নাবিককে। এবার তিনি ডমিনিকা দ্বীপ আর জামাইকা দ্বীপ আবিষ্কার করলেন। ১৪৯৬ সালে ফিরে এলেন স্পেনে।

তাঁর তৃতীয় অভিযান শুরু হয় ১৪৯৮ সালে। এবার উপস্থিত হলেন দক্ষিণ আমেরিকায়। এবারেও নানা বিপত্তি আর রোগভোগের কারণে স্পেনে ফিরে আসেন।

কলম্বাসের শেষ অভিযান শুরু হয় ১৫০২ সালে। তিনি মোট চারবার স্পেন থেকে আমেরিকা মহাদেশ অভিযান চালান। তিনি মহাদেশের মূল ভূ-খণ্ডে পৌঁছান কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেননি নতুন এক মহাদেশে পৌঁছেছেন। সে কথাটি বের করেন আমেরিগো ভেসপুচি নামে আরেক নাবিক। তার নাম অনুসারেই হয় আমেরিকার নাম।

কলম্বাস সত্যিই ছিলেন দুর্ভাগা। মহাদেশের আবিষ্কারক হয়েও তাঁর নামে এটির নামকরণ হলো না। তাঁর শেষ জীবনও সুখের হয়নি। দেশের জন্য প্রচুর সম্পদ বয়ে আনার পরও শেষজীবনে রাজরোষে পড়ে জেল খাটতে হয় তাঁকে এবং জীবনও কাটে দারিদ্র্যের সঙ্গে।

ঐতিহাসিকবিদ্‌রা বর্তমানে বলেছেন যে, আমেরিকা মহাদেশে পা রাখা প্রথম ইউরোপীয় কলম্বাস নন। তাঁর আগে একাদশ শতকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার নাবিকরা আমেরিকায় যাওয়ার পথ জানতেন।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের কৃতিত্ব কলম্বাসকেই দেওয়া হয় এবং তাঁকে বলা হয়, নতুন পৃথিবীর পথ প্রদর্শক বা দিগ্‌দর্শক। নতুন পৃথিবীর এই বিখ্যাত অভিযাত্রী ও মহান আবিষ্কারকের ১৫০৬ সালে জীবনাবসান হয়।

প্রচ্ছদ পরিচিতি

মায়ের আগমন বার্তাকে হৃদয়মুকুরে চিরউজ্জ্বল রাখার উদ্দেশেই বর্তমান প্রচ্ছদ ভাবনা। প্রথমেই দুর্গানন্দন গণপতি মঙ্গলশঙ্খ বাদন করতে করতে মেঠো আলপথ দিয়ে চলেছেন। সকল ঋদ্ধি ও সিদ্ধি বিতরণ করতে করতে তিনি পথ দেখিয়ে সকল শুভ ও সৎ ভাবনাকে নিয়ে আসছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মূষিকপ্রবর সর্বাগ্রে সকল মন্দ ও অশুভ চিন্তার অবসান করতে প্রেরণা জোগাচ্ছেন। আর তার ঠিক পরেই ত্রিনয়নী মা দুর্গা সকল শুভ শক্তির মূর্তবিগ্রহ হয়ে আমাদের আসুরিক ভাবনার উপর বিজয়ী হয়ে মর্ত্যধামে সকলকে দৈবী ভাবনায় সমৃদ্ধ করছেন। পেছনে পশুরাজ সিংহ দৃশ্যমান। আমাদের অনিয়ন্ত্রিত পাশবিক গুণগুলি যেমন—রাগ, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, লোভ, ঈর্ষা ইত্যাদির প্রতীক। এই সিংহকে পোষ মানিয়ে মা দুর্গা বোঝাতে চেয়েছেন—এই অনিয়ন্ত্রিত পাশবিক গুণগুলিকে আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

মা দুর্গা লক্ষ্মী মায়ের মাথায় হাত দিয়ে যেন বলছেন—এবারে সৌভাগ্য ও ধনসম্পদে মর্ত্যবাসী ঐশ্বর্যশালী হবেন। পেচক বাবাজী ধর্ম ও জ্ঞানের প্রতীক হয়ে জুলজুল করে তাকাচ্ছেন। দুর্গা-মা বাম হস্ত দিয়েছেন মা সরস্বতীর মস্তকে। উদ্দেশ্য এবারেও ভাষা, জ্ঞান, সৃজনশীলতা ও শিক্ষার বহুল প্রচারে বাঙালি তথা ভারতবাসী সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। সরস্বতী-বাহন হংসরাজ দুধে-জলে অর্থাৎ ভালো-মন্দ বা সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ থেকে দুধ, ভালো এবং সত্য আহরণের উপায় শেখাচ্ছেন।

একদম শেষের বামদিকে দেবসেনাপতি কার্তিকেয় 'যুদ্ধং দেহি' মনোভাব নিয়ে সকল কু অর্থাৎ অসৎ ব্যক্তি ও বস্তুকে সংহার করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। আর তার সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর-ভায়া সততার বীজ বপন করতে করতে চলেছেন।

এককথায় বর্তমান প্রচ্ছদে স্বামীজীর 'Each soul is potentially divine'—ভাবনাটির কার্যকরী রূপ দানের জন্য 'মাতৃ আগমনের' লগ্নটি গ্রহণ করা হয়েছে। তাই স্বামীজীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে পরিবারসমন্বিত প্রচ্ছদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠি—'মা আমাদের মানুষ কর!'

(অঙ্কন ঃ দেবনারায়ণ সাউ; প্রচ্ছদ ভাবনা ও লিখন ঃ সমাজশিক্ষা দপ্তর; অলঙ্করণ ঃ কমল রথ)

'দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার'

কাশীনাথ হালদার *

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়চিত্ততা ছিল গগনচুম্বী। কোনোদিন তিনি ঐশ্বর্য অথবা অন্য কারোর ক্ষমতার কাছে মাথা নোয়াননি। তাই তো কবি সত্যেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—**'কোথাও তুমি নোয়াওনি কো তোমার উচ্চশির।'** আবার বিদ্যার সাগর কিংবা দয়ার সাগর যিনি, তিনি দীর্ঘদেহী ছিলেন না। ছিলেন বেঁটে-খাটো মানুষ। তাঁর বিশালতা বোঝাতেই কবি সত্যেন্দ্রনাথের কলম থেকে বেরিয়েছে—**'দয়ার স্নেহে ক্ষুদ্র দেহে বিশাল পারাবার।'** সত্যিই তাই, এই বিশাল মানুষটির জীবন ছিল ঘটনাবহুল। সেই ঘটনাগুলো কেউ কেউ জানেন আবার কারো কাছে অজানা। সেই জানা-অজানা কয়েকটা ঘটনার অবতারণা এখানে করা যাক।

১২২৭ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন মঙ্গলবার, দুপুর ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ১২টা। ভগবতী দেবীর কোল আলো করে জন্ম নিলেন এক শিশু। আঁতুড়ঘরেই মায়ের কোলে শিশুটিকে দেখেই শিশুর পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ বুঝলেন, শিশুটি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। সেখানেই আলতা-গোলা রঙ নিয়ে শিশুটির জিভের তলায় এক মন্ত্র লিখে দিলেন। সেই আঁতুড়ঘরেই শিশুটির নামকরণ করলেন 'ঈশ্বরচন্দ্র'। এরপর ছেলে ঠাকুরদাসকে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ 'ওরে ঠাকুরদাস, তাড়াতাড়ি আয়। দেখে যা আমাদের একটা 'এঁড়েবাছুর' হয়েছে। ঠাকুরদাস ছুটলেন গোয়ালঘরে। কিন্তু সেখানে এঁড়েবাছুর পাওয়া গেল না। অগত্যা রামজয় তর্কভূষণ বললেনঃ 'ওরে এঁড়েবাছুর দেখবি যদি আমার সঙ্গে আয়।' —বলেই দু' বাপ-ব্যাটায় পা বাড়ালেন আঁতুড়ঘরের দিকে।

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন ৯ বছর। বাবার সঙ্গে থাকতেন বড়বাজারের বাসায়। ওই বয়সেই তাঁকে ভর্তি করা হলো দু'মাইল দূরের সংস্কৃত কলেজে। প্রথম প্রথম বাবা ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে কলেজে দিয়ে আসতেন এবং কাজের শেষে ফেরার পথে সঙ্গে নিয়ে আসতেন। তারপর একা একা যাতায়াত করতেন। **ছাতা মাথায় দিয়ে যাতায়াত করার সময় মনে হতো যেন একটা ছাতা হেঁটে চলেছে,** এতটাই বেঁটেখাটো ছিলেন তিনি। আবার দেহের তুলনায় ঈশ্বরচন্দ্রের মাথাটি ছিল বড়। সহপাঠীরা তাঁকে দেখে হাসি-মস্করা করে বলত, 'যশুরে কৈ'। (তখনকার দিনে যশোর থেকে নৌকো করে কৈ মাছ আনা হতো কলকাতায়। বেশ কিছুদিন অল্প জলে থাকায় কই মাছগুলোর মাথা একটু বড় হয়ে যেত। এজন্যই সহপাঠীরা 'যশুরে কৈ' বলে রাগাতো)। আবার বেশি করে রাগানোর জন্য কেউ কেউ বলত 'কসুরে যৈ'। ঈশ্বরচন্দ্র একটু তোতলা ছিলেন। প্রচণ্ড রেগে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাদের গালাগালি দিতেন। তোতলা কথায় গালাগালি, সহপাঠীরা যথেষ্ট উপভোগ করত। আর সেই ছোট, ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকত না।

* *লোকশিক্ষা পরিষদের এই অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সাহিত্য জগতের সুপরিচিত নাম।*

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ঈশ্বরচন্দ্র কতটা পিতৃভক্ত ছিলেন তা একটা ঘটনা থেকে জানা যায়। সে-সময় সংস্কৃত কলেজের নিয়মানুযায়ী অলংকারের পাঠ শেষ হলে পড়তে হতো ন্যায়, বেদান্ত এবং স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্রে পাশ করলেই তবে কেউ 'জজ পণ্ডিত' পদে আবেদন করার সুযোগ পেত। ঈশ্বরচন্দ্র তখন অলংকার শ্রেণীতে পড়ছেন। জজ পণ্ডিত হবার ইচ্ছায় কলেজের অধ্যক্ষের কাছে অলংকারের সঙ্গে 'স্মৃতিশাস্ত্র' পড়ার অনুমতি চাইলেন। পেয়েও গেলেন অনুমতি। দু'তিন বছর একসঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করলে তবেই 'স্মৃতিশাস্ত্রে' পাশ করা সম্ভব। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে **মাত্র ছ'মাস পড়েই 'ল' কমিটির পরীক্ষায় পাশ করলেন ঈশ্বরচন্দ্র।** মাত্র সতেরো বছর—এত অল্প বয়সে কেউ 'ল' কমিটির পরীক্ষায় পাশ করতে পারে, তা কেউ বিশ্বাসের মধ্যে আনতে পারছেন না। ইতিমধ্যে ত্রিপুরায় একটা জজ পণ্ডিতের পদ খালি হলে ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে ঐ পদের জন্য আবেদন করলেন। যথা সময়ে নিয়োগপত্রও এসে গেল। কিন্তু অতো দূরে গিয়ে ছেলে চাকরি করবে, সেটা বাবা ঠাকুরদাসের পছন্দ নয়। বাবার পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দিতে গিয়েই আর ত্রিপুরায় চাকরি করা হলো না ঈশ্বরচন্দ্রের।

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

এবারে আসা যাক ঈশ্বরচন্দ্রের 'বিদ্যাসাগর'-এ উপনীত হওয়ার ঘটনায়। সংস্কৃত কলেজে যে যে বিষয়ে পড়ানো হয়, সব বিষয়েই উত্তীর্ণ হয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র। কলেজের বিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণ অবাক বিস্ময়ে মুগ্ধ, ঈশ্বরচন্দ্রের অগাধ পাণ্ডিত্যে। তাঁরা সবাই মিলে ঈশ্বরচন্দ্রকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি এবং এক মহামূল্যবান শংসাপত্র দিলেন। সেই শংসাপত্রে সই করলেন তখনকার দিকপাল পণ্ডিতেরা। ব্যাকরণে সই করলেন গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, সাহিত্যে সই করলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। এছাড়া সই করলেন অলংকারে—প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, বেদান্তে—শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি, ন্যায়শাস্ত্রে—জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, জ্যোতিষে—যোগধ্যান শর্মা, দর্শনে—জয়নারায়ণ তর্কভূষণ এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে—শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি প্রমুখ মহামনীষীগণ। ওই শংসাপত্রে তাঁরা আরো লিখলেন ঃ 'আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে প্রশংসাপত্র দিতেছি। এই কলিকাতায় শ্রীযুক্ত কোম্পানি-সংস্থাপিত বিদ্যামন্দিরে ১২ বৎসর ৫ মাসকাল অধ্যয়ন করিয়া তিনি উল্লিখিত শাস্ত্রগুলি পাঠ করিয়াছেন এবং ঐসকল শাস্ত্রে তাঁহার বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে। এই প্রশংসাপত্র দেওয়া হইল, ১৭৬৩ শকাব্দে সৌর অগ্রহায়ণ মাসের কুড়ি তারিখে।'

ইং ১০ ডিসেম্বর ১৮৪৪ — শ্রীরসময় দত্ত, সেক্রেটারী

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের পরিচয় ছড়িয়ে আছে বহু ঘটনায়। তার মধ্যে একটা ঘটনার কথা। বিদ্যাসাগর এলাহাবাদে লালা বংশীধরের বাড়িতে যাবেন। কিন্তু যে ট্রেনে তাঁর যাওয়ার কথা তার আগের ট্রেনে এলাহাবাদ স্টেশনে নেমেছেন। সুতরাং লালা বংশীধরের লোকজন তখনো স্টেশনে আসেনি। অগত্যা স্টেশনে পায়চারি করছেন বিদ্যাসাগর। পাঁচ-সাত মিনিট পরে একটা ট্রেন স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। একটা কামরা থেকে একজন বাবু নামলেন। হাতে একটা সেরখানেক ওজনের হ্যান্ডব্যাগ। নেমেই তিনি 'কুলি' ডাকতে লাগলেন। কিন্তু 'কুলি'-র কোনো পাত্তা নেই। কাছেই ছিলেন বিদ্যাসাগর—গায়ে

সাধারণ একটা মোটা চাদর, পায়ে সাধারণ একটা চটি জুতো। বাবুটির অবস্থা দেখেই, বিদ্যাসাগর বাবুটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কাঁহা জানে হোগা, বাবু!' বাবু জানালেন, গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত। বিদ্যাসাগর ব্যাগটি নিয়ে গাড়ি-বারান্দা পর্যন্ত এলেন। সেদিন কোনো কারণে স্টেশন চত্বরে কোনো গাড়ি, টাঙ্গা, এক্কা কিছুই ছিল না। বাবুটি বললেন, আমার বাড়ি খুব কাছেই, সা-গঞ্জে—আধ মাইল পথ হবে। বিদ্যাসাগর আবার হিন্দিতে বললেন, 'চলিয়ে বাবু!'—বলেই বিদ্যাসাগর হাঁটা শুরু করলেন, বাবুটির সঙ্গে।

যথা সময়ে সা-গঞ্জে পৌঁছলেন উভয়ে। বাবুর হাতে ব্যাগটা দিলেন 'কুলি'-বিদ্যাসাগর। বাবু মানিব্যাগ থেকে একটা দু'আনি বের করে কুলি-বিদ্যাসাগরকে দিতে গেলে,

তিনি পরিষ্কার বাংলায় বাবুকে বললেন, 'এ পয়সা আমি নিতে পারব না বাবু। কোনো গরিব-দুঃখীকে এই পয়সাটা দান করে দেবেন। বাবুটি বললেন—তুমি বাংলা জানো! তোমার বাড়ি কোথায়?

বিদ্যাসাগর ঃ মেদিনীপুর জেলায়।

বাবু ঃ তুমি বাঙালি হয়ে কুলি-র কাজ করো কেন?

বিদ্যাসাগর ঃ না-না, কুলির কাজ করি না। আমার অন্য অনেক কাজ আছে। দেখলাম, আপনি ঐ একসের ওজনের ব্যাগটির জন্য কুলি খুঁজছেন। তাই আপনাকে কষ্ট থেকে রেহাই দিতে আমি সাহায্য করলাম মাত্র। আর একটা কথা বাবু, নিজের কাজ যতটা পারেন নিজে করবেন—তাতে লজ্জার কিছু নেই।

এই বলে বিদ্যাসাগর হনহন করে হাঁটতে লাগলেন, গলির মধ্যে। কাছাকাছি একটা একতলা বাড়ির বাইরে একজন যুবক একটা বই নিয়ে পড়ছিলেন। বিদ্যাসাগরকে আসতে দেখে, ছুটে এসে যুবকটি তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। বিদ্যাসাগর ছেলেটিকে চিনতে পেরে বললেন ঃ শঙ্কর না! তা কী করছিস এখানে? শঙ্কর বললেন, এখানকার হাইকোর্টে ওকালতি করি।

ইতিমধ্যে বাবুটি বিদ্যাসাগরের সঠিক পরিচয় জানার আগ্রহ নিয়ে পিছন পিছন আসছিলেন। শঙ্করবাবুর সঙ্গে কথাবার্তার সময় বাবুটি জানতে পারেন, তিনি যাঁকে কুলির কাজ করিয়েছেন, তিনি আর কেউ নন, তিনি স্বয়ং বিদ্যাসাগর। সঙ্গে সঙ্গে বাবুটি বিদ্যাসাগরের পা-দুটি ধরে ক্ষমা চাইতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন—গুরুদেব! আপনার কথা আমি চিরদিন মনে রাখবো। নিজের কাজ নিজে করতে কোনো লজ্জা পাবো না। বিদ্যাসাগর বললেন—'তাই করো বাবা।' —এই হলো দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব।

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্বের আর একটা অপূর্ব ঘটনার কথা। বিদ্যাসাগর তখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মাসিক ৫০ টাকা বেতনে চাকরি করতেন। কালনার তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। ব্যাকরণ-সহ অন্যান্য শাস্ত্রে ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। এক সময়ে তিনি একটা কাজ জুটিয়ে দেওয়ার জন্য বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, 'চেষ্টা করবো।' কিছুদিন পর সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের ১ম এবং ২য় শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ খালি হলো। ১ম শ্রেণীর অধ্যাপকের বেতন মাসিক ৯০ টাকা। ময়েট সাহেব বিদ্যাসাগরকে ১ম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদটি দিতে চাইলেন। বিদ্যাসাগর বললেন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ব্যাকরণে মস্ত পণ্ডিত। তাঁকে এই পদটা দেওয়া হোক। কেন তিনি বেশি বেতনের চাকরি পাওয়া সত্ত্বেও নিলেন না এবং তা যথারীতি অন্যকে দিতে চাইলেন—তা সহজেই অনুমেয়। যাই হোক, যেদিন ময়েট সাহেবের সঙ্গে এই আলোচনা হচ্ছিল, সেদিন ছিল শনিবার। ময়েট সাহেব বললেন, সেটা না হয় হলো; কিন্তু যিনি কাজ করবেন, তিনিই তো এখানে নেই। অথচ সোমবার সকাল ১০টার মধ্যে তাঁর স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র অবশ্যই আসা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর সাহেবকে বললেন, আপনি যথা সময়ে আবেদনপত্র পেয়ে যাবেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ও বন্ধু তারানাথ তর্কবাচস্পতি

কিন্তু তারানাথবাবু আছেন কালনায়, কলকাতা থেকে প্রায় ৬০ মাইল দূরে। সোমবার কীভাবে এত দূর থেকে আবেদনপত্র আসবে! কিছুক্ষণ চিন্তার পর কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। **তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে একজন চাকরের সঙ্গে হাঁটা শুরু করলেন কালনার উদ্দেশে। সারারাত হেঁটে পরের দিন রবিবার সকালে কালনায় পৌঁছলেন। তর্কবাচস্পতি মশাই-এর পক্ষে এত পথ হেঁটে আসা সম্ভব নয়। এজন্য তাঁর স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র সঙ্গে নিয়ে আবার রওনা দিলেন কলকাতার দিকে। এবং যথারীতি সারারাত হেঁটে পরদিন অর্থাৎ সোমবার সকাল ১০টার সময় ময়েট সাহেবের হাতে তুলে দিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি মশায়ের স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র।** যথা সময়ে ৯০ টাকা মাসিক বেতনে ১ম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদে যোগ দিয়েছিলেন তারানাথ তর্কবাচস্পতি।

এই ছিলেন বিদ্যাসাগর—এই হলো তাঁর মহত্ত্ব আর অনুপম বন্ধুপ্রীতি।

সংগঠক

অবিস্মরণীয় 'নন্দ দা'

মিহির কুমার বসু *

পূজনীয় স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর ভাবনার আলোকে যে পরিপূর্ণ মানুষের কথা বলেছেন, প্রয়াত শ্রীনন্দদুলাল চক্রবর্তী সেই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের এক সাধক। আচার-আচরণে, কাজে-কথায়-কর্মে সকলের দৃষ্টিতে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। নিরলস, নিঃস্বার্থ কর্মের মধ্য দিয়ে মানবের মুক্তি তাঁর স্বপ্ন হয়ে উঠেছিল এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে কাজে ব্যাপৃত থাকতেন।

পরাধীন ভারতে নন্দদুলাল চক্রবর্তী জন্ম হয়েছিল এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে। পূর্ব-বাংলার বরিশাল জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশ) ৪ জুলাই, ১৯৩২ সালে তাঁর জন্ম হয়েছিল। ২৮ জানুয়ারি ২০২২ সালে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করেন। বয়স হয়েছিল নব্বই (৯০) বছর। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন, সব সময়ই তাঁর লেখনী বন্ধ হয়নি। লোকশিক্ষা পরিষদ থেকে অবসর নেবার পর, তিনি কয়েক বছর গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউ অব কালচারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

নন্দদুলাল চক্রবর্তী

পূর্ব-বাংলা থেকে সোজা মছলন্দপুরের লক্ষ্মীপুর গ্রামে অবস্থান করেন। ওখানেই বাড়িঘর করে থাকতে শুরু করেন। লক্ষ্মীপুর গ্রামে 'স্বামীজী সেবা সংঘে' তিনি দীর্ঘদিন সম্পাদকের দায়িত্বে থেকে বড় বড় কাজ করেছিলেন। ওখান থেকেই স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী নন্দদুলালদাকে নরেন্দ্রপুরে নিয়ে আসেন। সালটি ছিল ১৯৫৬। তাঁর কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বড় সেবা গ্রামবাংলার মানুষের কাছে গিয়ে কাজ করা। **আজকে লোকশিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত যত ক্লাব, ক্লাস্টার আমরা দেখছি, তার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান নন্দদার সুচিন্তিত কর্মকাণ্ডের ফল।** তিনি ছিলেন সু-লেখক। চমৎকার হাতের লেখা। সুন্দর ভাবনা-চিন্তার মধ্যে থেকে গ্রামের মানুষের জীবন ও কর্মকে নিয়ে লিখতে পারতেন। প্রথম থেকে দীর্ঘদিন ধরে 'সমাজশিক্ষা পত্রিকা'র সম্পাদক হিসাবে কাজ করে গিয়েছিলেন। লোকশিক্ষা পরিষদের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা, বিধিমুক্ত শিক্ষা, সৃজনী শিক্ষা ইত্যাদির কর্মসূচী যথেষ্টভাবে তিনি আমাদের সঙ্গে থেকে গ্রামীণ মানুষকে ক্লাবের মাধ্যমে সুপরামর্শ, পাঠ্যক্রম, আলোচনা যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন। ষাট থেকে নব্বই দশকে লোকশিক্ষা পরিষদ থেকে বয়স্ক শিক্ষা ও বিধিমুক্ত শিক্ষার সরকারি নিয়মানুযায়ী বহু পুস্তক লোকশিক্ষা পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল—যার ব্যবস্থাপনায় আমাদের মধ্যে নন্দদা তত্ত্বাবধান করতেন। লোকশিক্ষা পরিষদের এখন যে 'সচিব সম্মেলন' পরিচালিত হয়, তার সূচনা শ্রদ্ধেয় পরিচালক শিবশংকর চক্রবর্তীর চিন্তায় এবং শ্রদ্ধেয় নন্দদুলালদার ব্যবস্থাপনায় ক্লাব ও ক্লাস্টারের মাধ্যমে সূচনা হয়েছিল। সেখানেও নন্দদুলালদার অবদান অপরিসীম।

(এর পরবর্তী অংশ ৪৪৬ পৃষ্ঠায়)

* *সুসংগঠক এই বিদগ্ধ প্রবীণ মানুষটি লোকশিক্ষা পরিষদের চলমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও সমাজশিক্ষার পরম সুহৃদ।*

ঘরে বসে আয় করুন

রাণাপ্রতাপ চট্টরাজ *

অনেক মানুষ খরগোশকে (Rabbit Farming) খুব পছন্দ করে। আপনিও যদি প্রাণীপালন ব্যবসার সাথে জড়িত থাকেন বা হতে চান, তবে খরগোশের চাষ থেকে আপনি বার্ষিক বেশি পরিমাণে টাকা উপার্জন করতে পারবেন। এটি এমন একটি ব্যবসা—যা খুব অল্প পরিমাণে শুরু করা যেতে পারে। আপনি কীভাবে খরগোশ পালন ব্যবসা শুরু করতে পারেন, তা সম্পর্কে আজ আপনাকে তথ্য প্রদান করব।

বিশ্বজুড়ে খরগোশের প্রচুর জাত রয়েছে, এর মধ্যে কিছু রয়েছে উচ্চ উৎপাদনশীল জাত। কিছু কিছু জাত আমাদের আবহাওয়া অনুসারে ভারতে পালনের জন্য খুব উপযোগী। সর্বাধিক উৎপাদনশীল এবং উপযুক্ত খরগোশের জাতগুলি নিচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। আপনি এই জাতগুলির যে-কোনো একটি চয়ন করতে পারেন।

খরগোশ উৎপাদন

জনপ্রিয় খরগোশের জাত ঃ ১) হোয়াইট জায়ান্ট; ২) গ্রে জায়ান্ট; ৩) ফ্লেমিশ জায়ান্ট; ৪) নিউজিল্যান্ড হোয়াইট; ৫) নিউজিল্যান্ড রেড; ৬) ক্যালিফোর্নিয়ান; ৭) ডাচ; এবং ৮) সিভিয়েট চিঞ্চিলা।

আয়ের এক অনন্য উৎস ঃ অন্যান্য প্রাণীসম্পদের ক্রিয়াকলাপের তুলনায় খুব কম জায়গা নেয় বলে এর পালন বৃহদাকারে করা হয়। খরগোশ উৎপাদন পার্বত্য অঞ্চলে বেশি পরিমাণে করা হয়, যেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ খুব সীমিত, এটি সেখানে আয়ের অতিরিক্ত উৎসও সরবরাহ করে। মূলত মাংস এবং পশমের জন্যই এর পালন করা হয়।

অ্যাঙ্গোড়া জাতের খরগোশের কাছ থেকে খুব উচ্চ মানের পশম পাওয়া যায় এবং এটি মেশানো হয় সিল্কের সঙ্গে এবং সিল্কের সজ্জিত পশম উলের গুণমানকে অনেকাংশে উন্নত করে। খরগোশের উৎপাদন সাশ্রয়ী। খামার শুরু করতে অনেক খরগোশ লাগে না। খরগোশ দুর্দান্ত ব্রিডার। অন্যান্য মাংসের তুলনায় খরগোশের মাংসে বেশি প্রোটিন থাকে এবং বেশিরভাগের চেয়ে কম ফ্যাট থাকে। এটি ছোট ছোট বাচ্চাদের এবং বার্ধক্যজনিত বয়স্কদের খাওয়ানো যেতে পারে, কারণ হজম করা সহজ।

১ কেজি ওজনের খরগোশের জন্য আপনি তাদের প্রায় ৪০ গ্রাম দানা খাবার এবং ৪০ গ্রাম সবুজ খাবার খাওয়াতে পারেন। ভালো এবং পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি তাদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিষ্কার জল সরবরাহ করুন।

খরগোশের প্রজনন (Rabbit Breeding) ঃ খরগোশগুলি তাদের ৫ থেকে ৬ মাস বয়সের মধ্যে প্রজননের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

কোথায় খরগোশ পুষবেন ঃ বাড়ির ছাদ, আঙিনা বা বারান্দায় খরগোশ পোষা যায়। এ ক্ষেত্রে খরগোশের জন্য স্থান চিহ্নিত করে, সেখানে একটি শেড বানিয়ে নিতে পারেন। সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে খরগোশ পালন করা যায় ঃ ১) লিটার পদ্ধতি, ২) খাঁচা পদ্ধতি।

লিটার পদ্ধতি ঃ সংখ্যায় কম খরগোশ পালন করতে হলে এটি কার্যকরী পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে কংক্রিটের মেঝের ওপর ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি মোটা করে তুষ, কাঠের ছাল অথবা খড় ছড়িয়ে দিতে হবে। তবে এই পদ্ধতিতে ৩০টির বেশি খরগোশ পালন করবেন না।

আবার পুরুষ ও মহিলা খরগোশকে পৃথক পৃথক ঘরে রাখা উচিত। এরা খুব দ্রুত প্রজনন করে থাকে এবং একটি

* *প্রশিক্ষক, আশ্রম কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, নরেন্দ্রপুর।*

খরগোশ এক সঙ্গে ৮ থেকে ১০টি বাচ্চা প্রসব করে। প্রজননের উদ্দেশে ১০–১৫ মিনিটের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ খরগোশ একসঙ্গে রাখলেই যথেষ্ট।

খাঁচা পদ্ধতি ঃ বাণিজ্যিক কারণে খরগোশ পালনের পরিকল্পনা থাকলে, এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। লোহার পাত দিয়ে তৈরি ৩ থেকে ৪টি তাক-বিশিষ্ট খাঁচা তৈরি করে খরগোশ পালন করুন। তারপর প্রতিটি তাকে পর্যাপ্ত জায়গা রেখে খোপ করে দিতে হবে।

খাঁচায় খরগোশের জন্য কতটা স্থান রাখা উচিত ঃ ১) পূর্ণবয়স্ক পুরুষ খরগোশের জন্য ৪ বর্গফুট স্থান দরকার। ২) আবার পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী খরগোশের জন্য ৬ বর্গফুট জায়গা থাকতে হবে। প্রসবের জন্য বড় খোপের প্রয়োজন হয়। ৩) শিশু খরগোশের জন্য ১.৫ বর্গফুট যথেষ্ট।

অন্য দিকে পূর্ণবয়স্ক খরগোশের খাঁচা ১.৫ ফুট লম্বা, ১.৫ ফুট চওড়া এবং ১.৫ ফুট উঁচু হওয়া উচিত। এতে দুটি খরগোশ পালন করা যাবে। আবার বড় আকারের খরগোশের জন্য ৩ ফুট লম্বা, ১.৫ ফুট চওড়া এবং ১.৫ ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট খাঁচাই যথেষ্ট।

খাঁচায় খরগোশ পালন

খাবার ঃ বিভিন্ন বয়স ও প্রজাতির খরগোশের খাদ্য গ্রহণ ও পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন হয়ে থাকে। একটি বয়স্ক খরগোশের খাদ্যতালিকা এমন হতে হবে, যাতে ১৭ থেকে ১৮ শতাংশ ক্রুড প্রোটিন, ১৪ শতাংশ ফাইবার, ৭ শতাংশ মিনারেল ও ২৭০০ কিলো ক্যালরি/কেজি পুষ্টির জোগান সুনিশ্চিত হয়।

খাবারের পরিমাণ ঃ ১) বয়স্ক খরগোশের জন্য প্রতিদিন ১৩০–১৪৫ গ্রাম খাবার প্রয়োজন। ২) স্তন্যপান করানো খরগোশের জন্য প্রতিদিন ২৫০–৩০০ গ্রাম জরুরী। ৩) বাড়ন্ত খরগোশের জন্য প্রতিদিন ৯০ গ্রাম খাদ্য নিশ্চিত করতে হবে।

কী কী খাবার দেওয়া যায় ঃ সবুজ শাক-সবজি, পালং শাক, গাজর, মুলো, শসা, সবুজ ঘাস ইত্যাদি। এ ছাড়াও দিতে হবে চাল, গম, ভুট্টা।

খরগোশ অসুস্থ কি না কিভাবে বুঝবেন? ঃ ১) ফ্যাকাসে চোখ; ২) কান খাড়া থাকে না; ৩) লোম শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যায়; ৪) খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেয়; ৫) দৌড়ঝাঁপ কমিয়ে দেয় এবং শরীরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে।

খরগোশের কোন কোন রোগ হতে পারে ঃ কক্‌সিডিয়া, কৃমিরোগ, নিউমোনিয়া রোগে সাধারণত খরগোশ আক্রান্ত হয়। এ ছাড়াও মিক্সোমাটোসিস, সালমোনেল্লেসিস ইত্যাদি বিপজ্জনক রোগও দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

তাই বাড়িতে খরগোশ পালন করতে চাইলে সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করে দেখতে হবে।

খরগোশ পালনে আর্থিক লাভ ঃ কিছু দানাদার খাবার ও বাড়ির আশেপাশের ঘাস, লতাপাতা এবং রান্নাঘরের উচ্ছিষ্টাংশ প্রদান করে পারিবারিকভিত্তিতে ২০টি খরগোশ প্রতিপালন করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণের সাথে সাথে মাসিক ৬,০০০ টাকা আয় করা সম্ভব যা অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়।

এক কাঠা জায়গায় কমপক্ষে ১৩০টি খরগোশ পালন সম্ভব। সবুজ ঘাস, লতাপাতা, শাক-সবজি, ভাত খেতে এরা খুব পছন্দ করে। খুব সহজেই যে কেউ খরগোশ পালনকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে পারেন। ছয় মাস বয়সী ১০০টি স্ত্রী খরগোশের সঙ্গে ছয় মাস বয়সী ২৫–৩০টি পুরুষ খরগোশের মিলনের ফলে আড়াই কি তিন মাসে ৫০০–৬০০টি বাচ্চা পাওয়া সম্ভব। একটি খরগোশ বছরে ৫ থেকে ৬টি বাচ্চা দেয়। ছয় মাস বয়সী প্রতিটি খরগোশের মূল্য ৩০০–৫০০ টাকা (কলকাতার বাজার দরে)। খরগোশ বাচ্চা প্রদানের পর মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যেই প্রসবকৃত বাচ্চাগুলো চলাফেরা করতে পারে। বাচ্চা প্রসবের সময় এরা অবশ্য নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। কারণ বেজি, নেড়ি কুকুর, বিড়াল, সাপ এদের জাতশত্রু। এসব প্রাণী যাতে এদের ক্ষতি করতে না পারে, সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রতিটি বাচ্চা এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে বিক্রির উপযোগী হয়। তখন এদের প্রতিটির মূল্য দাঁড়ায় ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা (কলকাতার বাজার দরে)। কলকাতাসহ দেশের প্রসিদ্ধ শহরগুলোতে খরগোশ কেনাবেচা হয়।

ঘরে বসে তৈরি করুন

হরিদাস হালদার *

চাউমিন (NOODLES)

ভূমিকা ঃ চাউমিন বর্তমানে প্রথম সারির খাদ্য হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। অল্প সময়ে, অল্প দামে এবং সহজপাচ্য খাদ্য হিসাবে চাউমিনকে সাধারণ মানুষ সকালে কিম্বা বিকালের টিফিন হিসাবে খেয়ে থাকেন।

চাউমিন শিল্প বর্তমানে একটি প্রচলিত শিল্প, যেখানে কম টাকা খাটিয়ে বেশি টাকা লাভ করা যায়। সেকারণে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের কেন্দ্রেও চাউমিন শিল্প চালু করা হয়েছে। তবে সাধারণ বাজারে যে

সমস্ত চাউমিন বিক্রি হচ্ছে, তাদের থেকে বেশি গুণগত মানসম্পন্ন চাউমিন যাতে তৈরি হয়, সেজন্য পুষ্টি ও ভিটামিনযুক্ত উপাদান দিয়ে চাউমিন তৈরি করছে।

উপকরণ ঃ ময়দা, ভুট্টা গুঁড়া, সোয়াবিন গুঁড়া ও জল।

পদ্ধতি ঃ (ক) পরিমাণমতো ময়দা ও সোয়াবিন গুঁড়া বড় পাত্রে নিয়ে, তার মধ্যে প্রতি ১ কিলোগ্রাম মিশ্রণের মধ্যে ৩৫০ গ্রাম জল দিয়ে হাতের সাহায্যে অথবা মিক্সার মেশিনের সহায়তায় উপকরণগুলিকে সম্পূর্ণ একটি মিশ্রণে তৈরি করতে হবে।

(খ) মিশ্রণটি নিয়ে রোলিং মেশিনের সাহায্যে বেলে একটি বড় চওড়া আকারের রোল লাঠির মধ্যে তৈরি করতে হবে।

(গ) রোলটি তৈরি হয়ে গেলে উক্ত রোলিং মেশিনের মধ্যে চাউমিন-এর কাটিং মেশিনটি লাগাতে হবে। সমস্ত রোলটি কাটিং করে সম-আয়তন ও সম-পরিমাণ চাউমিন কাটিংগুলি লাঠির মধ্যে সাজাতে হবে। চতুর্দিক ঘেরা বিশিষ্ট একটি সিদ্ধ বা 'বয়েল' মেশিনে জল বাষ্প করার মাধ্যমে সিদ্ধ করতে হবে।

(ঘ) কাঁচা চাউমিনগুলি ১ ঘণ্টা যাবৎ সিদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর, মেশিন হতে সিদ্ধ চাউমিনগুলি বের করে রৌদ্রের মাধ্যমে অথবা 'ড্রায়ার' মেশিনের সাহায্যে শুকোতে হবে।

(ঙ) শুকানোর পর তা লেবেলযুক্ত পলিথিন কাগজের মধ্যে প্যাকেট করে বাজারে পাঠাতে হবে।

ভুজিয়া বা ঝুরিভাজা

ভূমিকা ঃ সকাল বা বিকালের জলখাবারের উপাদানগুলির মধ্যে ভুজিয়া অন্যতম। একে সাধারণ টিফিনে,

অফিসে, বিভিন্ন কাজে ও নানা অনুষ্ঠানের টিফিনে আমরা ব্যবহার করে থাকি। অল্প টাকায় অনেকটা পরিমাণ ভুজিয়া পাওয়া যায়। কম টাকা বিনিয়োগ করেও এই ভুজিয়া ব্যবসা করা যায়। এটি একটি লাভজনক ব্যবসা। কোনো সাধারণ মানুষ এই ব্যবসা ঠিক মতো করলে, একদিন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারে।

উপকরণ ঃ মটর অথবা ছোলার ব্যাসন, লবণ, বীটলবণ ও মশলা দিয়ে ভুজিয়া হয়।

পদ্ধতি ঃ মটর বা ছোলার বেসন নিয়ে লবণ পরিমাণ মতো দিয়ে, পাত্রের মধ্যে জল দিয়ে মাখিয়ে মণ্ড তৈরি করতে হবে। মণ্ডটি হ্যান্ড মেশিনের সাহায্যে গরম তেলের মধ্যে ছেড়ে ভুজিয়া ভাজতে হবে। এবং পরে তা ঠাণ্ডা হলে লবণ ও মশলা মাখিয়ে প্যাকেট করতে হবে। তারপরে বাজারে পাঠাতে হবে।

* *লোকশিক্ষা পরিষদের এই ভক্ত কর্মী সুমিষ্ট ব্যবহারে সর্বসম্মানিত।*

'হরিদ্রা'র কথকতা !

স্বাতী মণ্ডল (রায়) *

হলুদের অনেক নাম। হরিদ্রা তার মধ্যে একটি। ধর্মীয় চেতনায় শ্রীহরির প্রিয় বলে—এর নাম হরিদ্রা। হলুদের বোটানিক্যাল নাম হলো কারকুমা লাংগা। হলুদের মধ্যে রোগনাশ করার ক্ষমতা আছে। শরীরের মধ্যে বিষদোষকে নষ্ট করার ক্ষমতা থাকায় হলুদের আরও একটা নাম বিষঘ্নী। সমাজের সকল স্তরে হলুদের আনাগোনা। বেদে হরিদ্রাকে দেবতা ও মানুষের উপকার সাধনের জন্যে বলা হয়েছে। হলুদ শীত, পিত্ত ও চর্মরোগ চিকিৎসায় বিশেষ ফলপ্রদ। যে কোনো খাদ্যে শরীরে কিছু না কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে হলুদের দ্বারা প্রশমিত হয়। আর সেই কারণে রান্নায় হলুদের ব্যবহার স্বীকৃতি পায়। মশলা হিসেবে বিশ্বব্যাপী হলুদের সমাদর। যেকোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে হলুদের ব্যবহার বহুদিন ধরে চলে আসছে। সব রকমের অশুভকে দূর করার প্রধান দ্রব্য হিসাবে হলুদের ব্যবহার বহুদিন থেকে চলে আসছে। তা আমরা মনসার ভাসানে লখিন্দরের বিয়েতে গায়ে হলুদ দেবার রীতি রেওয়াজ থেকে দেখতে পাই। সম্ভবত সেই থেকে সধবাদের গায়ে হলুদবাটা দেবার রেওয়াজ চলে আসছে। তাছাড়া হলুদবাটা ও দূর্বাঘাস মেশানো জলে বাচ্চাদের স্নান করানো, গৃহপ্রবেশে ঘরের দরজায় হলুদ ও সিঁদুরের মিশ্রণে আঁকা স্বস্তিক চিহ্ন, পূজার ঘটে ও মণ্ডপে এই চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়।

এবারে হলুদের ব্যবহার সম্পর্কে কিছু বলছি। হলুদে কারকুমিন নামক বিশেষ পলিফেনিক যৌগ থাকায়, ভেষজটি এত গুণসম্পন্ন। এতে প্রোটিন, কার্বহাইড্রেটস, ফাইবার, ফোলেট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, কপার, ভিটামিন সি ও ই প্রভৃতি আছে। হলুদে কোলেস্টেরল নেই। কারকুমিন যৌগ অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট তৈরি করে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। হলুদের ব্যবহারে প্রস্টেট, কোলন ও যকৃতের ক্যান্সার আসতে পারে না। কাঁচা হলুদ প্রতিদিন খেলে ব্ল্যাড ক্যান্সার প্রতিহত হয়। মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপকে প্রতিহত করে অবসাদের হাত থেকে রক্ষা করে। মচকানো ব্যথায় চুন-হলুদের প্রলেপ আজও প্রচলিত। যকৃতকে সুস্থ রাখতে সকালে এক গাঁট হলুদ ছাড়িয়ে তার সঙ্গে ৫-৬টি থানকুনি পাতা ধুয়ে একসাথে খেলে উপকার হবে।

কাঁচা হলুদের রস বড়রা ২-৩ চা-চামচের সঙ্গে সামান্য নুন মিশিয়ে সকালে খালিপেটে ৩-৪ দিন খেলে ছোট-বড় ক্রিমির উপদ্রব কমবে। তিন চার মাস অন্তর আবার ব্যবহার করতে হবে।

বিভিন্ন রোগে হলুদের ব্যবহার

গেঁটে বাতে এক কাপ হালকা গরম দুধে এক চা-চামচ হলুদগুঁড়ো ফেটিয়ে একবার খান। যাদের দুধ সহ্য হয় না, তাঁরা এক চা-চামচ হলুদগুঁড়ো এক কাপ হালকা গরম জলে লবণ ও লেবুর রস মিশিয়ে খেলে উপকার পাবেন।

চোখ ওঠায় কাঁচা হলুদের রস দিয়ে বারবার চোখ মুছতে হবে। হলুদ জলে (কাঁচা হলুদ বেটে জলে মিশিয়ে ছেঁকে) পরিশোধিত তুলো ভিজিয়ে মাঝে মাঝে চোখে দিলে তাড়াতাড়ি কাজ হয়।

রক্তাল্পতায় সকালে টিফিনের পর, অথবা খালিপেটে ২ গ্রাম মাত্রা হলুদের গুঁড়ো সামান্য একটু মধুতে মিশিয়ে ২-৩ মাস খেতে হবে। তারপর রক্তের স্থিতাবস্থা হলে আর খাবার দরকার হবে না।

মধুমেহ বা ডায়াবেটিসে হলুদগুঁড়োর সঙ্গে আমলকীর

* *আশ্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই গৃহবধূ শিক্ষিকা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগিণী।*

গুঁড়ো সমভাবে মিশিয়ে ২ গ্রাম মাত্রায় দিনে ২–৩ বার সকালে খালিপেটে ও রাত্রে খাওয়ার আধঘণ্টা আগে খেতে হবে। ইনসুলিন ও অন্যান্য ঔষধের সঙ্গে এটিও চলতে পারে। ইনসুলিনের মাত্রা কমতে থাকলে চিকিৎসকের পরামর্শমতো অন্য ঔষধ কমানো যেতে পারে।

ওজন ও কোলেস্টেরল কমাতে কাঁচা হলুদ এক ইঞ্চি খানেক লম্বা ছাড়িয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে খালিপেটে চিবিয়ে খেতে হবে।

উচ্চ রক্তচাপে প্রতিদিন সকালে এক গাঁট হলুদ খাওয়ার অভ্যাস করতে হবে। রক্তচাপ আয়ত্তের মধ্যে থাকবে।

গলাবসায়, ঠাণ্ডা কিংবা সর্দি–কাশি, হাঁপানিতে এক গ্লাস গরম জলে ২–৩ গ্রাম হলুদের গুঁড়ো ও পরিমাণ মতো গুড় মিশিয়ে চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে খেতে হবে। একে দুভাগে ভাগ করে সকাল ও সন্ধ্যায় খাওয়া যেতে পারে।

চর্মরোগে যেমন, ব্রণ–ফুসকুড়ি, চুলকানি ইত্যাদিতে এক চা–চামচ হলুদের রসে আধ চা–চামচ মধু মিশিয়ে সকালে খালিপেটে কিছুদিন খেতে হবে। এছাড়া হলুদের গুঁড়ো যতটা তার অর্ধেক ভাজা নিমফলের শাঁস মিশিয়ে ভালো করে বেটে নারকেল তেলে ফেটিয়ে স্নানের ঘণ্টাখানেক আগে সর্বাঙ্গে লাগাতে হবে। কাঁচা হলুদ ও নিমপাতা সমপরিমাণে বেটে সরষের কিংবা নারকেল তেলে মাখিয়ে লাগালে উপকার হবে।

কোষ্ঠবদ্ধতায় এক গাঁট কাঁচা হলুদ ও ৩–৪টি থানকুনি পাতা সকালে খালিপেটে খেলে উপকার হবে। সমস্যা কমে গেলে, মাঝে মাঝে খাবার অভ্যাস করতে হবে। খুব বেশি খেলে উলটো ফল হতে পারে।

রূপলাবণ্যে কাঁচা হলুদ বাটা ও দুধের সর একসঙ্গে মিশিয়ে সপ্তাহে একদিন স্নানের আগে সর্বাঙ্গে মাখতে হবে। এছাড়া ঘৃতকুমারীর রসে হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে লেই তৈরি করে স্নানের আগে লাগানো যায়। মুখেও মাখা যায়। শুকিয়ে গেলে জল দিয়ে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে।

গর্ভাবস্থায় কাঁচা হলুদ না খাওয়াই ভালো। তরকারিতে সীমিত পরিমাণ হলুদ খাওয়া বাঞ্ছনীয়। হলুদের অধিক ব্যবহার কোষ্ঠবদ্ধতা, ডাইরিয়া হতে পারে। যাঁরা লো–প্রেসারে ভোগেন, নাড়ীর গতি ৬০–৬৪ কিংবা তারও কম, তাঁদের হলুদ খাবার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। গলব্লাডার স্টোন ও বাইল অবস্ট্রাকশনে অতিরিক্ত হলুদ না খাওয়া ভালো।

পরিশেষে বলি, হলুদ শরীরে টিউমার সৃষ্টিতে বাধা দেয়। কোলন, রেক্টাম, প্যানক্রিয়াস ও চামড়ার ক্যান্সারে হলুদ ভালো কাজ করে। কিডনির সমস্যা, গলস্টোন, মৃগীরুগি, অর্শ, সিস্টিক ফাইব্রেসিস, মাসিক স্রাবের গোলযোগে হলুদের ব্যবহার করা হয় ও হচ্ছে। হলুদ নিয়ে উন্নতমানের গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হলে সারা বিশ্ববাসী আরও উপকৃত হবেন।

(৪৪১ পৃষ্ঠায় 'অবিস্মরণীয় ''নন্দ দা'' '–র শেষাংশ)

নন্দদুলাল চক্রবর্তীর একটি বড় কাজের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। ১৯৭০–৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর মুহূর্তে মানুষের যা দুর্দশা হয়েছিল, তা বলবার নয়। খাদ্য নেই, জল নেই, সেই সময় রামকৃষ্ণ মিশন থেকে খাদ্য, জল, পোশাক ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল। সেই সময় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের শ্রদ্ধেয় সহ–সম্পাদক স্বামী অক্ষরানন্দজীর (৺কালীপদ মহারাজ) সঙ্গে নন্দদুলালদা নরেন্দ্রপুর থেকে ট্রাকে করে খাদ্য, বস্ত্র, জল ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে বাংলাদেশে Relief করতে যেতেন। এইটি নন্দদার একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। তাছাড়া ১৯৭৮ সালের বন্যায় কেলেঘাই নদী ভেঙে পূর্ব মেদিনীপুরের বাকচা, আড়ং কিয়ানারা প্রভৃতি গ্রাম ভেসে গিয়েছিল। নরেন্দ্রপুর থেকে রিলিফ করা হয়। তাতেও নন্দদার অবদান রয়েছে যথেষ্ট।

নন্দদুলালদা যেভাবে লোকশিক্ষা পরিষদের গ্রাম–সংগঠনটিকে সমাজশিক্ষা পত্রিকার মাধ্যমে এবং নিজস্ব আগ্রহে সাফল্যের চরমশীর্ষে আরোহণ করিয়েছিলেন, কেবলমাত্র এই অপূর্ব গঠনমূলক কার্যের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন, নরেন্দ্রপুর আশ্রমের হৃদয়ে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই বলে উঠি ঃ

'নিজের থেকে উর্ধ্বে ওঠে কে–বা,
পারে ক'জন করতে সমাজসেবা,
পারে ক'জন অহং দিতে বলি,
ঢোল পিটিয়ে যশের লোভে আঁকড়ে ধরে সকলি।
ভালোবাসার কষ্টিপাথর তোমাদের সম্বল,
চোখের পাতায় ভিজে আছো,
তোমাদের যা কিছু মরমীয়,
সময় তারে পরম করে নেবে তুলে ঘরে,
তাই তোমরা আজ স্মরণীয়।'

শবরজাতির সমাজজীবন

বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত *

‘শবর’ কথাটির উৎপত্তি হয়েছে ‘সপর’ থেকে। স্কাইথিয়ান ভাষায় ‘সপর’ মানে কুঠার। তার মানে সপররা কুঠার হাতে বনে–জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত। তারপর কুঠারের সঙ্গে বন্য জীবজন্তু শিকারের উদ্দেশ্যে তির–ধনুকও হাতে নেয় এবং ব্যাধরূপে পরিচিতি লাভ করে।

এদের অতীত অনেক পুরানো আর গৌরবময়। চর্যাপদে শবরদের সম্পর্কে লেখা আছে—‘উঁচা উঁচা পারত তোঁহি বসতি শবরী বালি’। দুই মহাকাব্যেও ওদের উল্লেখ আছে। গুরুকুলে শিক্ষালাভের সময় হতেই রামচন্দ্রের সখ্যতা স্থাপন হয় গুহকের সাথে। পরবর্তী কালে শবর রাজ্যের রাজা হন গুহক। রামচন্দ্রের বনবাসকালে অযোধ্যা থেকে বেরিয়ে অযোধ্যা রাজ্যের সীমানা পেরিয়ে সুমন্ত্রের রথ প্রথমেই রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে নিয়ে গুহক রাজ্যে প্রবেশ করে এবং রাম গুহক রাজ্যের অতিথি হয়ে ওখানে বিশ্রাম নেন। পরে ওখান থেকেই বিন্ধ্যপর্বতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকেও গুহক রাজকে অযোধ্যায় দেখা যায়।

এক শবর পরিবারের বাসগৃহ

মহাভারতে বৃষ্ণিবংশের ধ্বংস হওয়ার পর শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃক্ষোপরি বসেছিলেন (ইচ্ছামৃত্যু), তখন দূর থেকে শ্রীকৃষ্ণের পা দুটিকে হরিণের পা ভেবে এক শবর ব্যাধ তির ছুঁড়ে শ্রীকৃষ্ণকে আঘাত করে। মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সময়ে ব্যাধের ক্ষমা যাচ্ঞাকালে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধকে আশ্বস্ত করেন এবং নীলাচলে পুনর্বার মিলনের অঙ্গীকার করেন।

কলিতে শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথরূপে দর্শন দিলে, শবরদের রাজা বিশ্বাবসু ‘নীলমাধব’রূপে জগন্নাথদেবের পূজা শুরু করেন। এখনও পুরীর জগন্নাথদেবকে শবরদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা বলে গণ্য করা হয়।

সুতরাং দেখা যায়, শবরদের ইতিহাস বহু পুরানো। শবর প্রকৃতিগত কারণে উগ্র স্বভাবের হয়ে থাকে। উড়িষ্যা অঞ্চলে মহানদীর ও সমস্ত তীরবর্তী অঞ্চলের জঙ্গলেই ওদের আদি নিবাস। কালক্রমে এরা পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ব্রিটিশ আমলে আইন পাশ করে ১৮৭১ সালে বলা হয়, They are habituated offender। ১৯৫২ সালে Act amendment করে বলা হয় জঙ্গলবাসী উপজাতি। আবার আইন করে ‘বন সংরক্ষণ’ শুরু হলে ওদের গাছ কাটা, শিকার করা বন্ধ হয়ে গেল। বিপাকে পড়ে গেল শবররা। ওরা বিহারের ছোটনাগপুরে এবং পশ্চিমবঙ্গের সমতলে ছড়িয়ে পড়ে। ওদের এখন আর উপজাতি হিসাবে স্বীকৃতি নেই, যার জন্য ওরা লড়াই করে চলেছে।

শবরজাতি সাধারণত প্রকৃতি—যথা পর্বত, নদী, জঙ্গল, বজ্রপাত ও সূর্য দেবতার পূজার্চনা করে থাকে। ১৪ জানুয়ারি ওরা নতুন বৎসর পালন করে থাকে। ওদের বিশ্বাস, পূর্বে পৃথিবী যখন ছিল জলময়, তখন সূর্যদেবতা জল শুষে নেন ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়। তাই সূর্য বা সিংবোংগা ওদের উপাস্য দেবতা।

শবরদের বিবাহ রীতিতে সাধারণত একই গোত্রের

* *জেনারেল ইন্সিওরেন্স–এর অবসরপ্রাপ্ত এই আধিকারিক পরিষদে এখন স্বেচ্ছাসেবাদানে নিরত।*

মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। ছেলে মেয়ে মুখ দেখে, একে অপরকে পছন্দ করে। তারপর এরা নতুন বস্ত্র পরিধান করে। এটাকে বলে 'লোটাপানি' অনুষ্ঠান। বিয়ের পূর্বরাত্রে বরযাত্রী কনের বাড়ি আসে। সেই রাতে নৃত্যগীতের সাথে হাড়িয়া নামে দেশী মদ খাওয়ার ধূম পড়ে যায় প্রতিবেশীদের নিয়ে। একটি কাঁসার থালায় ফুলের মালা, কাজল, হলুদ, মেথি, তেল নিয়ে সমান ভাগ করে ছেলে মেয়ের হাতে দেওয়া হয়। একে 'লগন গাঁথা' বলে। কনেকে ৪ থেকে ২০ টাকা পণ দিতে হয়। ভোরে সূর্য উদিত হওয়ার সাথে সাথে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিধবারা দ্বিতীয় বার বিয়ে করতে পারে। এক গোত্রে বিবাহ হয় না।

শবরদের নৃত্য–গীতের অনুষ্ঠান

এদের সমাজে মৃতের সৎকারের পর একদিন ঘরে আগুন জ্বলে না। দশদিন এরা সাধারণ খাবার খায়। 'দানি' প্রথায় মুখাগ্নিদাতা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে খাবার দান করে। গ্রামের চৌধুরী, ধোবি, নাপিত ও পুরোহিতদের চাল, বস্ত্র, জল ও দক্ষিণা দেওয়া হয়। এই প্রথার নাম 'সেরসিদ্ধি'।

শবরদের পোশাক–পরিচ্ছদে কিছুটা ভিন্নতা দেখা দেয়। মহিলারা গলায় হাঁসুলি, হায়কল, শ্রীবন্ধী, পায়ে কাকন পরে। পুরুষেরা গামছা, ধুতি, গেঞ্জি ও কান ফুটো করে দুল পরিধান করে ও হাতে বালা পরার রীতিও আছে। ওদের বিভিন্ন উৎসবের নাম হলো ঃ 'সারহুল বা সারজানা'—চৈত্র মাসের উৎসব। 'কাডলেটা' বা 'বাতাউলি'—বর্ষার উৎসব। 'নানা' বা 'জমনানা'—নতুন ধানের উৎসব। 'খাড়িয়া'—শীতের উৎসব।

শবরদের মধ্যে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী থাকলেও অধিকাংশই সনাতন ধর্মের অনুসারী হিন্দুধর্মের দেবদেবীর পূজা করে থাকে এবং হিন্দু রীতিনীতি মেনে চলে।

(৪৩১ পৃষ্ঠায় 'ছোট যারে মনে কর, বড় সেই হয়'-এর শেষাংশ)

আরও জানলাম যে, গত বছর কোনো এক পিছিয়ে–পড়া গ্রামের দরিদ্র ২৬ জন স্কুল ছাত্রীদের পূজার সময় নূতন পোশাক দিয়ে এসেছে—তাতে ঐ ছাত্রী সকল ও অভিভাবকেরা খুবই উপকৃত হয়েছে। নূতন পোশাক পেয়ে সকলে ভীষণ আনন্দ পেয়েছে। তাদের অভিভাবকেরা বলেছে যে, এইভাবে তোমার মতো আমাদের পাশে কোনোদিন কেউ দাঁড়ায়নি।

বেশ কিছুদিন পর আমার এক বন্ধুর সাথে ঘটনাগুলো শেয়ার করলাম। ঘটনাগুলো তাকে যখন বললাম, তখন বন্ধুটি আমাকে বলল, আমি মেয়েটিকে জানি। ওর বাবার সাথে আমার পরিচয় আছে। ওর বাবাও কোনো এক সমাজকল্যাণ সংস্থার সাথে যুক্ত আছে। দীর্ঘদিন ধরে সেবামূলক কাজ করে আসছেন।

আমার ইচ্ছা হলো মেয়েটির সাথে দেখা করার। একদিন বন্ধুটিকে নিয়ে দেখাও করলাম। কথা বললাম, শান্তশিষ্ট মেয়েটি। কথাবার্তা সুমধুর। বুঝলাম সেবাপরায়ণা। জানলাম, তার মা-ও একজন আদর্শ শিক্ষিকা। নামকরা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। মেয়েটিকে প্রশ্ন করলাম, তোমার পরবর্তী সেবা কর্মসূচী কি আছে? সে বলল, এবার আমার ইচ্ছা, একটি হোমের দরিদ্র মেয়েদের সেবা করা। হোমেতে তারা এতদিন সাধারণত একই রকম খাদ্য খায়। আমার ইচ্ছা, হোমের মেয়েদের একদিন ভালোমন্দ খাওয়ানো। শুনে খুবই ভালো লাগল। বললাম, ভালো থেকো। জীবনে উন্নতি করো, ভালো করে কাজ করো। ঈশ্বর তোমাকে শতকোটি আশীর্বাদ করবেন।

আমার মনে যেন আজ একটা আশার আলো জ্বলে উঠল। এই মেয়েটির সবুজ প্রাণে এক জয়দীপ্ত মানবতার জ্যোতি আজ যেন নতুন আলোকে জানিয়ে দিয়ে গেল।

'আন্তরিকতাকে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ রাখাই জয়লাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা।' —*ভগিনী নিবেদিতা।*

স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৫ আগস্ট ২০২২, সোমবার, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হলো। সকাল সাড়ে আটটায় পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ডিরেক্টর বিমল রায় এবং ডিসান হসপিটালের প্রথিতযশা চিকিৎসক সৌমেন বসু। এরপর জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। আশ্রমের সমস্ত ছাত্র ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের প্রশিক্ষার্থী, শিক্ষক, বিভাগীয় কর্মিগণ উপস্থিত ছিলেন উক্ত অনুষ্ঠানে।

ড্রিল, ব্রতচারী ও কুচকাওয়াজ–এর মধ্য দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫ বর্ষপূর্তি 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব'। এই উপলক্ষ্যে বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী হলে বক্তৃতা ও এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করে আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অশিক্ষক, বিভিন্ন বিভাগের কর্মী, ছাত্র এবং প্রশিক্ষার্থীরা।

ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমী

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য শাখাকেন্দ্রের মতো রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম নরেন্দ্রপুরেও অনুষ্ঠিত হয়েছে ভারত সরকারের উদ্যোগে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব'–এর মাসব্যাপী অনুষ্ঠান। গত ৬ আগস্ট ২০২২, শনিবার, আন্তঃবিদ্যালয় (Inter School

Elocution Competition) বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হলো আশ্রমের ব্লাইন্ড বয়েজ একাডেমীতে। ঐদিন সকল সফল প্রতিযোগীকে

'Certificate of Merit' বা 'উৎকর্ষের শংসাপত্র' এবং বিবেকানন্দ বিষয়ক পুস্তক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে ৮ আগস্ট ২০২২ তারিখে প্রত্যেক সফল প্রতিযোগীকে 'বিবেকানন্দ মেমেন্টো' প্রদান করা হয়।

বিদ্যালয়

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৫তম বর্ষপূর্তি–তে ভারত সরকার দ্বারা আয়োজিত 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুরে গত ১৯ জুলাই ২০২২, মঙ্গলবার, প্রবন্ধ রচনা, বক্তৃতা, স্বরচিত কবিতা রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত প্রতিযোগিতায় কলকাতা ও তৎসংলগ্ন ৩৪টি স্কুল থেকে মোট ১,২৩৬ জন ছাত্র–ছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

২৪ জুলাই ২০২২, রবিবার, যোগাসন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতায় ১৪১টি স্কুল থেকে মোট ৩২১ জন ছাত্র–ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণী সভা উক্ত দিনগুলিতেই প্রতিযোগিতা শেষে অনুষ্ঠিত হয়।

লোকশিক্ষা পরিষদ

ভারত সরকারের উদ্যোগে 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদে বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে আসা তরুণ–তরুণী ও কিশোর–কিশোরীদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং তার পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

প্রবুদ্ধ ভারত

গত ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে আশ্রমের বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় নৃত্যনাট্য 'প্রবুদ্ধ ভারত'। রামকৃষ্ণ মিশন এবং পূর্বাঞ্চল আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের (Eastern Zonal Cultural Centre বা EZCC) যৌথ পরিবেশনা এটি। 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসবের' অঙ্গ হিসাবে এই নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করা হয়। এতে অংশগ্রহণ করেছিল বিদ্যালয়ের ছাত্ররা, উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ–সাধারণ সম্পাদক স্বামী বলভদ্রানন্দ মহারাজ। ঐদিন বিকাল ৩টা ৩০ মিনিটে স্বামীজীর জীবনের উপর একটি নাটকও পরিবেশিত হয়।

অভ্যুদয়ের নবোদ্যোগ

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২, অভ্যুদয়-হলদিয়ায় ২৫ জন মহিলাদের টেলারিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সরঞ্জাম ও টেলারিং মেশিন প্রদান করা হয়। উক্ত টেলারিং প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথি-বর্গগণ হলেনঃ ডাঃ পার্থ প্রতিম দাস, কর্মাধ্যক্ষ, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ; মিলন কুমার পাত্র, সদস্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ।

১৫ মার্চ ২০২২, অভ্যুদয়-হলদিয়ার ৬টি ব্লকে ২৫০ জন **দিব্যাঙ্গদের** সহায়তা প্রদান করা হয় (ট্রাই সাইকেল, হুইলচেয়ার, কৃত্রিম পা ও হাত, শ্রবণ যন্ত্র, কেচ)। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দগণ হলেনঃ সুধাংশু শেখর মণ্ডল, পৌরপিতা, হলদিয়া পৌরসভা; সৌরভ ভট্টাচার্য, H.R. Head, ইন্দোরামা হলদিয়া; প্রসূন চক্রবর্তী, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তর (পশ্চিমবঙ্গ সরকার), স্বামী পবিত্রচিত্তানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর। —*প্রণব কুমার বেরা*

বলরাম স্মৃতি সংঘ, গ্রাম ঃ চকশ্রীকৃষ্ণ, পোঃ-পটাশপুর, জেলা ঃ পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ঃ ৭২১৪৩৯।

বলরাম স্মৃতি সংঘ গত ১১ জুন ২০২২, সংঘের উদ্যোগে এগরা সুপার ফেসিলিটি হাসপাতালের সহযোগিতায় 'রক্তদান শিবির'এ ছয় জন মহিলা-সহ মোট পঞ্চাশ জন রক্তদান করেন। এবং বিবেকানন্দ মিশন, চৈতন্যপুর নেত্র নিরাময় কেন্দ্রের সহযোগিতায় চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে একশত পঁয়তাল্লিশ জন বয়স্ক মানুষ চক্ষু পরীক্ষা করান। এগার জন ব্যক্তি ছানি অপারেশনের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন। আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে প্রধান, পটাশপুর গ্রামপঞ্চায়েত; ম্যানেজার, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, কসবা-পটাশপুর শাখা; প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, চাঁদপুর হাড়োচরণ বিদ্যামন্দির এবং পঞ্চায়েত সদস্য মহাশয় উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৬ জুন ২০২২, বিকাল ৩টায় মহিলা সচেতন শিবির অনুষ্ঠিত হয়, শিবিরে ৭০ জন মায়েরা অংশগ্রহণ করেন। মহিলা সর্বশক্তিকরণ, অপ্রাপ্তবয়স্কা বিবাহ, লিঙ্গ বৈষম্য—বিবিধ বিষয়ে আলোচনায় জেলা নেহেরু যুব কেন্দ্রের প্রতিনিধি সৌম্যদীপ মাইতি, গ্রামমঙ্গল প্রতিনিধি কৌস্তভ মাইতি, বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রভাত চন্দ, সম্পাদক প্রণব প্রধান এবং বাদল বারিক বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন নিমাই চাঁদ প্রধান মহাশয়।

—*প্রণব কুমার প্রধান*

শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পালন

গত ১৮ আগস্ট ২০২২, বৃহস্পতিবার, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে সাড়ম্বরে পালিত হলো জন্মাষ্টমী উৎসব। ঐ দিন সন্ধ্যাবেলায় সন্ধ্যারতির মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হয়। রাত্রি ৭.১৫ মিনিটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা শুরু হয়। পূজান্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভোগারতি সম্পন্ন হয়। পূজা সমাপনান্তে ভক্ত ও সাধুদের মধ্যে হাতে-হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।।
(শ্রীশ্রীচণ্ডী–১/৭৭)

ভাঙতে সব্বাই পারে, গড়তে পারে কজন? নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সব্বাই, কিন্তু তাকে ভালো করতে পারে কজন? দুর্বলতা তো মানুষের আছেই।

অতসীপুষ্পবর্ণাভ্যাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্বাভরণভূষিতাম্।।
সুচারুদশনাং তীক্ষ্ণাং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দিনীম্।।
(শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর ধ্যানমন্ত্র)

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

প্রসেনজিৎ কুণ্ডু

আরামবাগ, হুগলী–৭১২৬০১

ব্রহ্মানন্দং শিবং শান্তং প্রেমরূপং নিরঞ্জনম্।
যোগীশমদ্ভুতং নিত্যমখণ্ডাদ্বৈতলক্ষণম্।।
বিজ্ঞানং ত্রিগুণাতীতং তুরীয়াভেদসংজ্ঞিতম্।
সুবোধং সারদং চৈব বিবেকশশিভূষণম্।।
সমন্বয়মহাচার্যং যুগধর্মস্বরূপিণম্।
সর্বদেবস্বরূপং শ্রীরামকৃষ্ণং নমাম্যহম্।।

(স্তবনাঞ্জলি)
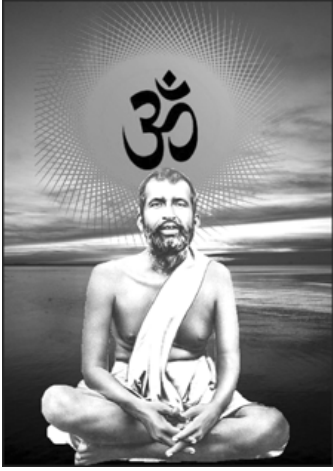
'ছেলের হাত যদি বাপ ধরে, আর ভয় নাই।'

শারদ –শুভেচ্ছা সহ

সুব্রত ভট্টাচার্য্য

চন্দননগর, হুগলী

'মন্ত্রের দ্বারা দেহশুদ্ধ হয়। ভগবানের মন্ত্র জপ করে মানুষ পবিত্র হয়।'

শারদ –শুভেচ্ছা সহ

তরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

৫৫ রিজেন্ট কলোনী, কোলকাতা–৭০০০৪০

(ওঁ ঐঁ) বিশ্বেশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্।
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ।।
(শ্রীশ্রীচণ্ডী–১/৭১)

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

৫৫ রিজেন্ট কলোনী, কোলকাতা–৭০০০৪০
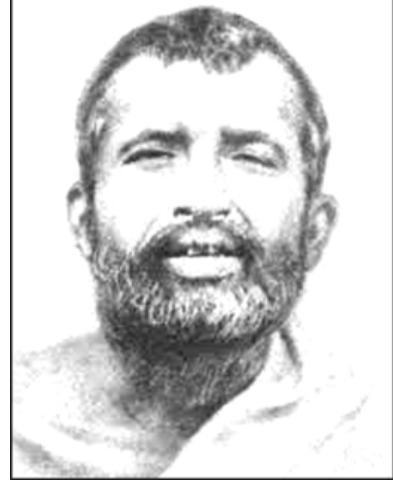
'তাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বা এ–মনের দ্বারা জানা যায় না। যে–মনে বিষয়বাসনা নাই সেই শুদ্ধমনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

হৃদয় গোপাল বসাক

৩/১২৮ গান্ধী কলোনী, কোলকাতা–৭০০০৯২
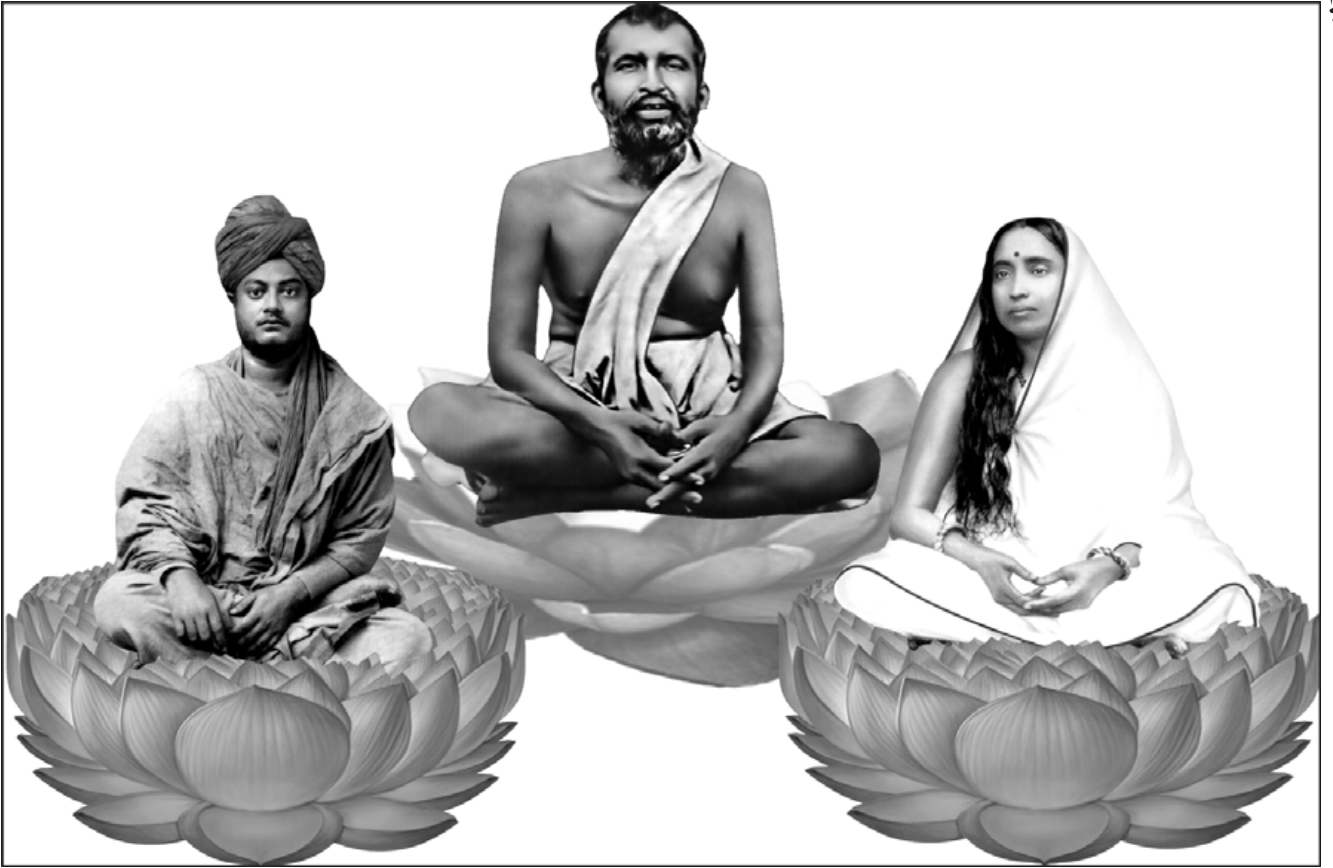
'কারু নিন্দা করো না—পোকাটিরও না। তুমি নিজেই তো বল, লোমস মুনির কথা। যেমন ভক্তি প্রার্থনা করবে তেমনি ওটাও বলবে—''যেন কারু নিন্দা না করি''।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

জনৈক

ভক্ত-দম্পতি

কোলকাতা ৭০০ ০৯৪

৺বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী

জন্ম ঃ ০৯.০৫.১৯৪৫

মৃত্যু ঃ ০৬.০৩.২০২২

শ্রীরামকৃষ্ণে সমর্পিত প্রাণ পিতৃদেবের চরণে 'আপ্তবাক্যের দ্বারা' শ্রদ্ধাঞ্জলি—যা সারাজীবন তিনি কায়মনোবাক্যে অনুশীলনের চেষ্টা করেছেন।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থূঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।।

ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য–
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।।

(নির্বাণষট্কম্)

'তিনি (ঠাকুর) নিয়েছেন সব বাছা বাছা ছেলে কটি—তা আবার এখানে মন্ত্র টিপে, ওখানে মন্ত্র টিপে। আর আমার কাছে ঠেলে দিয়েছেন সব পিঁপড়ের সার।'

'ভারী সাবধানে চলতে হয়। প্রত্যেক কর্মের ফল ফলে। কাউকে কষ্ট দেওয়া, কটু কথা বলা ভাল নয়।'

শারদ -শুভেচ্ছা সহ

ভাস্করজ্যোতি পাল

নেতাজী নগর, কোলকাতা-৯২

দিবা অবসান রাত্রিকালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা বলে।
মম জীর্ণ তরী মা আছ কাণ্ডারী, (তবু) ডুবিল ডুবিল ভরা।।

—রামপ্রসাদ

শারদ -শুভেচ্ছা সহ

গীতা দাস

নেতাজী নগর, কোলকাতা-৯২

'ঈশ্বরেচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার সাধ্য নেই, তৃণটিও নড়ে না। যখন জীবের সুসময় আসে, তখন ধ্যানচিন্তা আসে, কুসময়ে কুপ্রবৃত্তি কুযোগাযোগ হয়। তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমনি কালে সব আসে, তিনিই তাঁর ভিতর দিয়ে কার্য করেন। নরেনের কি সাধ্য? **তিনি তার ভেতর দিয়ে সব করলেন বলে তো নরেন সব করতে পেরেছিল।'**

শারদ-শুভেচ্ছা সহ

শুভেন্দু ঘোষ দস্তিদার ও কমল মুখোপাধ্যায়

গান্ধী কলোনী, কোলকাতা-৪০
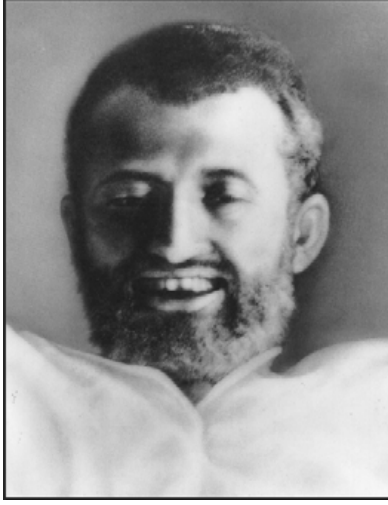
ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্ ।।
(শ্রীশ্রীচণ্ডী–১১/৫৪–৫৫)

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

মিলি শিকদার

সারদামঙ্গল পাঠচক্র, বিধাননগর, কোলকাতা

'খিদের জ্বালা কি কম! দেহ ধরলেই খিদে তেষ্টা সব আছে। এবার বাড়িতে অসুখের সময় একদিন মাঝরাতে আমার এমনি খিদে পেলো! সরলা টরলা সব ঘুমিয়েছে। আহা! ওরা এই খেটে–খুটে শুয়েছে, ওদের আবার ডাকব? নিজেই শুয়ে শুয়ে চারদিকে হাতড়াতে লাগলুম। দেখি, চারটি খুদভাজা একটা বাটিতে রয়েছে। আবার মাথার বালিশের পাশে দুখানা বিস্কুটও পেলুম। তখন ভারি খুশি। তাই খেয়ে তো জল খেলুম—জল ঘটিতে সামনেই ছিল। খিদের জ্বালায় খুদভাজা যে খাচ্ছি তা জ্ঞান নেই।'

সকলের মঙ্গলের জন্য, এমনকী তোমার অহিতকারীদের জন্যও ঠাকুর-মার কাছে প্রার্থনা কর। —**স্বামী গীতানন্দ**

শারদ –শুভেচ্ছা সহ

মঞ্জুলা দত্ত বনিক

সারদামঙ্গল পাঠচক্র, বিধাননগর, কোলকাতা

'ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়। তাঁর নিজের হাতের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়।'

শারদ –শুভেচ্ছা সহ

নৈঋতা সাহা

সারদামঙ্গল পাঠচক্র, বিধাননগর, কোলকাতা

'ভাববে আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন।'

৺দেবাদৃতা স্মরণে

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

সুভদ্রা ঘোষ

শ্রীশ্রীমা সারদা সংঘ, চুঁচুড়া

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।

(শ্রীশ্রীচণ্ডী–১১।১০–১২)

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

প্রাংশুপ্রতিম কুণ্ডু

নাকুণ্ডা, হুগলী

'জানবে এই তিনটির সম্বন্ধে খুব সাবধানে চলতে হয়—প্রথম নদীর তীরে বাসস্থান; কোন সময়ে নদী হুস করে এসে বাসস্থান ভেঙে নিয়ে চলে যাবে। দ্বিতীয়, সাপ; দেখলেই খুব সাবধানে থাকতে হয়—কখন এসে কামড়ে দেবে তার ঠিক নেই। তৃতীয়, সাধু; তাঁদের কোন্ কথায় বা মনের ভাবে গৃহস্থের অমঙ্গল হতে পারে তা তুমি জান না। তাঁদের দেখলে ভক্তি করতে হয়; কোনও জবাব করে অবজ্ঞা দেখানো উচিত নয়।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

লিপি চৌধুরী

সারদামঙ্গল পাঠচক্র, বিধাননগর, কোলকাতা

'যদি শান্তি চাও মা কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

সুমনা চৌধুরী

শ্রীশ্রীমা সারদা সংঘ, চুঁচুড়া

'যে তাঁর উপরে নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।'

৺নিরঞ্জন দাস স্মরণে

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

রত্না দাস

শ্রীশ্রীমা সারদা সংঘ, চুঁচুড়া

'যে ঠাকুরকে চিন্তা করবে তার কখনো খাওয়ার কষ্ট হবে না।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

পাপড়ি দাস

শ্রীশ্রীমা সারদা সংঘ, চুঁচুড়া
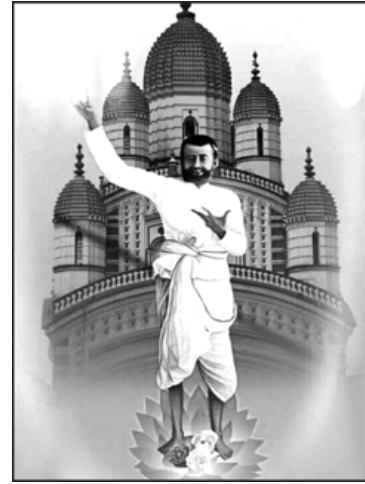
'ভক্তি পাকলে ভাব, তারপর মহাভাব, তারপর প্রেম, তারপর বস্তুলাভ।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

শম্পা শীল

শ্রীশ্রীমা সারদা সংঘ, চুঁচুড়া

'হাততালি দিয়ে সকাল সন্ধ্যায় হরিনাম করো, তা হলে সব পাপ তাপ চলে যাবে।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

সুজাতা পাল

শ্রীশ্রীমা সারদা সংঘ, চুঁচুড়া

'একমাত্র সৎ বা নিত্যবস্তু ঈশ্বর, আর সমস্ত অসৎ বা অনিত্য।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

রীনা দাস

শ্রীশ্রীমা সারদা সংঘ, চুঁচুড়া

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্কারঃ স্মরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।।
(শ্রীশ্রীচণ্ডী–১/৭৩)

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

রূপা মুখার্জী

শ্রীশ্রীমা সারদা সংঘ, চুঁচুড়া

'জ্ঞান হলে তাঁকে আর দূরে দেখায় না। তিনি আর ''তিনি'' বোধ হয় না, তখন ''ইনি''। হৃদয় মধ্যে তাঁকে দেখা যায়।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

জ্যোতি বিশ্বাস

শ্রীশ্রীমা সারদা সংঘ, চুঁচুড়া

'শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ পরিপূর্ণভাবে এই সংশয়, এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সতেজে ও সগৌরবে দাঁড়াতে দেখেছি, এইরকম আর কাকেও বোধহয় দেখিনি।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

উমা ব্যানার্জী

শ্রীশ্রীমা সারদা সংঘ, চুঁচুড়া

'যে শিক্ষা চিত্তবৃত্তির উন্মেষ সাধন করতে গিয়ে নম্রতা ও কমনীয়তা বিনষ্ট করে তা প্রকৃত শিক্ষা নয়।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

সিস্টার নিবেদিতা পাঠমন্দির

সাহেব বাগান, ব্যাণ্ডেল, হুগলী

'আমার বিশ্বাস—গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে গুরুগৃহবাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইতে থাকে। গুরুর সাক্ষাৎ সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

সুমিত নন্দী

চন্দননগর, হুগলী

'মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্তমান, তাহারই প্রকাশ–সাধনকে বলে শিক্ষা।'

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

শিবসাধন মজুমদার

চন্দননগর, হুগলী

ততঃ সোহপি পদাক্রান্তস্তয়া নিজমুখাত্ততঃ।
অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসীৎ দেব্যা বীর্যেণ সংবৃতঃ ।।
অর্ধনিষ্ক্রান্ত এবাসৌ যুধ্যমানো মহাসুরঃ।
তয়া মহাঽসিনা দেব্যা শিরশ্ছিত্ত্বা নিপাতিতঃ ।।

(শ্রীশ্রীচণ্ডী–৩/৪১–৪২)

শারদ–শুভেচ্ছা সহ

পূর্বিতা গঙ্গোপাধ্যায়

'ত্যাগই হচ্ছে আসল কথা—ত্যাগী না হলে কেউ পরের জন্য ষোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে, সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। বেদান্তেও পড়েছিস—সকলকে সমানভাবে দেখতে হবে।'

শারদ-শুভেচ্ছা সহ

অভ্রদীপ দাঁ

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
নরেন্দ্রপুর, কলকাতা–৭০০ ১০৩, পশ্চিমবঙ্গ
(রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া,
পশ্চিমবঙ্গ–৭১১২০২–এর একটি শাখা কেন্দ্র)

।। আবেদন ।।

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর প্রতি বছরের মত এবারও এগিয়ে এসেছে যাতে আমাদের ছোট ছোট অপু দুর্গারা নিজেদের পুজোর আনন্দ সবার সাথে ভাগ করে নিতে পারে।

১১টি জেলায় ১৩১টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের ৪৫০০ জন শিশুকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়।

আমাদের এই অপু দুর্গাদের কাছে পুজো মানেই নতুন রঙিন পোশাক। সারা বছরে দুর্গাপুজো এমন এক সময়, যখন তারা তাদের পরিবার ও বন্ধু বান্ধবের সাথে ভাগ করে নিতে পারে এক অনাবিল আনন্দ। এই সময় একজন অপু বা দুর্গাকে রঙিন পোশাক উপহার দিয়ে আপনারা তার পুজোকে আনন্দময় করে তুলতে পারেন।

ন্যূনতম ৪০০্ টাকায় একজন অপু বা দুর্গাকে নতুন পোশাক দিতে পারেন। আপনারা চাইলে একাধিক অপু দুর্গাদের ভারও নিতে পারেন। চেক পাঠিয়ে অথবা নগদে অনুদান দিতে পারেন লোকশিক্ষা পরিষদের দপ্তরে বা মন্দির গেট বিক্রয় কেন্দ্রে। সরাসরি ব্যাঙ্কের মাধ্যমে NEFT করেও পাঠাতে পারেন নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টে ঃ

RAMAKRISHNA MISSION ASHRAMA, NARENDRAPUR
IDBI A/C No.0419104000056203, IFS Code IBKL0000419
(কেবলমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের জন্য)

সমস্ত দানে (নগদে দান করা অর্থ ছাড়া) আয়কর আইনের ৮০জি ধারায় ছাড় আছে। NEFT–র ক্ষেত্রে e-mail করে এবং Cheque–র ক্ষেত্রে চিঠি দিয়ে নিম্নলিখিত বিষয়ে বিশদ অবশ্যই জানান।

১। দাতার নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, প্যান নম্বর বা আধার নম্বর আবশ্যক।

২। দানের পরিমাণ ও প্রেরণের তারিখ এবং NEFT–র ক্ষেত্রে Transaction ID আবশ্যক।

যোগাযোগ করুন ঃ ফোন নং ঃ ০৩৩–২৪২৭–৪৫১৬, মোবাইল/হোয়াটস অ্যাপ নং ঃ ৯৩৩০৮২৭০৯৬
ই–মেল ঃ rkmlpvcdf@gmail.com

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামীজীর নিকট সকলের কল্যাণ প্রার্থনা জানাই।

নমস্কার ও ধন্যবাদান্তে,

স্বামী সর্বলোকানন্দ
সম্পাদক

১লা জুলাই, ২০২২

সৌজন্যে ঃ জনৈক ভক্ত–দম্পতি